খারিজ

আদান-প্রদান

খারিজ

রাম সরূপ অনখী

অনুবাদ

ধ্রুবজ্যোতি রায়চৌধুরী

ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, ইণ্ডিয়া

ভূমিকা

সার্থক কোনও শিল্পী বা সাহিত্যিক, ঐতিহাসিক দৃষ্টি ও সময়ের ভাষায়, কখনও-ই তাঁর পূর্বসূরির অনুকৃতি হতে চান না, বরং আত্মাশ্রয়ী প্রকাশে প্রয়াসী হয়ে ব্যতিরেক হতে চান। যে কোনও লেখক-সাহিত্যিকের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক মূল্যবিচারে এইটিই হলো মূল আভাস। এই দৃষ্টিকোণ থেকে, 'কোঠে খড়ক সিং' (বাংলা অনুবাদে 'খারিজ') সম্বন্ধে চূড়ান্ত কিছু অভিমত প্রকাশের আগে, পাঞ্জাবি উপন্যাসের ঐতিহাসিক পটভূমি ও তার সংবীক্ষণে **রাম সরূপ অনখীর সাহিত্যকতিতে এক ঝলক চোখ বুলিয়ে নেওয়াটা খুবই প্রাসঙ্গিক হবে।**

উপন্যাস মানেই হলো দেশকাল পাত্রের বৃত্তে মানুষীজীবনের এক বাস্তব ও সৃজনী রূপ। যার জন্যে, লেখকের বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গি সবার আগে নির্ণয় করাটা জরুরি হয়ে পড়ে। এই দৃষ্টিবিন্দুতেই পাঞ্জাবি চেতনাপ্রবাহী মন সামন্ততন্ত্র থেকে আধুনিক বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারার মধ্যে বাঁক নিয়েছে। ভাই বীর সিংহ-ই (১৮৭২-১৯৫৭) প্রথম পাঞ্জাবি সাহিত্যকে উপন্যাসের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে দেন। তাঁর উপন্যাস 'সুন্দরী' (১৮৯৭) 'বিজয় সিংহ' (১৮৯৯) ইত্যাদি সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দীর সামন্ততন্ত্রের পরিপ্রেক্ষিতে লেখা। এই উপন্যাসগুলিকে ঐতিহাসিক রোমান্স হিসেবে চিহ্নিত করাই যুক্তিযুক্ত। এগুলি থেকে বোঝা যায়, লেখক রচনার গঠননির্মিতি সম্পর্কে বিশেষ চিন্তিত ছিলেন না। তিনি চিন্তিত ছিলেন ঐতিহাসিক দৃশ্যপটে সমকালিক সাংস্কৃতিক চেতনার উৎস অনুসন্ধানে। যার জন্যে, এই জাতীয় রচনার ঐতিহাসিক ভূমিকা ও মূল্য অনস্বীকার্য। ভাই বীর সিংহের সমসাময়িক, ভাই মোহন সিংহ বৈদ, তৎকালীন সমাজের সাধারণ মানুষের ভূমিকা কিছুটা ধরার চেষ্টা করলেও, তাঁর মনোরঞ্জক গদ্য কিন্তু সাহিত্যের বিচারে ভাই বীর সিংহের সাহিত্যকৃতিকে অতিক্রম করতে পারেনি।

এই কারণেই, আধুনিক পাঞ্জাবি উপন্যাসের প্রারম্ভ চিহ্নিত করা যায় নানক সিংহ (১৮৯৭-১৯৭১) থেকে। নানকের উপন্যাস রচনার মূল প্রেরণা ছিলেন প্রেমচাঁদ মুনশি। এই সময়ে, বাংলা সাহিত্যে বঙ্কিম ও শরৎচন্দ্র শ্রেষ্ঠ সাহিত্যকৃতির দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন। পশ্চিমি, বিশেষ করে ইংরেজি সাহিত্যের গঠননির্মিতির সঙ্গে এঁরা খুবই পরিচিত ছিলেন। আর ওই সবের ফলশ্রুতি হিসেবে, নানক সিংহ-ও পশ্চিমি উপন্যাসের উপাদান সম্পর্কে সচেতন হতে পেরেছিলেন।

তাঁর উপন্যাস, তাই আধুনিক বুর্জোয়া সমাজের মধ্যবিত্তিক নাগরিকজীবন ও সমকালীন সমাজের নৈতিক পতন অনুপুঙ্খভাবে বিশ্লেষণে সমর্থ হয়েছে। এই কারণেই নানক সর্বসম্মানিত লোকপ্রিয় এক উপন্যাসকার হিসেবে সমাদৃত হয়েছিলেন।

নানক সিংহের উত্তরসূরি হিসেবে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছিলেন মোহন সিংহ "শীতল" (১৯০৮-)। গ্রামীণ জীবনের কৃষক সমাজের যথার্থ অনুভূতিময় চিত্র তাঁর উপন্যাসে পাওয়া যায়। তাঁর বহু-আলোচিত উপন্যাস 'তুতাওয়ালা-খু' (১৯৬২) হিন্দু মুসলিম

বিচ্ছেদের আগে পরস্পরের মধ্যে সৌভ্রাতৃত্বের যে উষ্ণ অতীত ছিল সেই বিন্দু থেকে শুরু করে বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে যে সাম্প্রদায়িকতাবিরোধী ও সাম্প্রদায়িকতামুক্ত শক্তির আবির্ভাব হয়ে দেশবিভাজনে পরিণতি লাভ করে, তারই কাহিনী অত্যন্ত মর্মস্পর্শীভাবে চিত্রিত করেছে। "শীতল"-এর রচনায় ও চেতনায় সহজ সরল গ্রামের মানুষের ছবি যেভাবে ফুটে উঠেছে, তা সমসাময়িক অন্য কোনও উপন্যাসে বিরল। দুর্ভাগ্যের বিষয়. অত্যন্ত শক্তিশালী এই ঔপন্যাসিক, পাঞ্জাবি লেখক ও বুদ্ধিজীবী দ্বারা দীর্ঘকাল উপেক্ষিত অনাদৃত, এমনকী অস্পৃশ্য-ও ছিলেন—সত্তর দশক থেকে তাঁর পুনর্মূল্যায়ন হয়েছে, এবং তিনি ব্যাপক আলোচনার বিষয়বস্তু হয়ে উঠেছেন।

নানক সিংহের পর, পাঞ্জাবের সর্বাধিক লোকপ্রিয় উপন্যাসকার যশবন্ত সিংহ "কেবল" (১৯১৯)। যশবন্তকে অনেকে নানকের সার্থক উত্তরসূরি বলে চিহ্নিত করেছেন। লৌকিক ভাবনার অভিব্যক্তি ও কাহিনীর যুগলবন্দিত্বে নানক সে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন, তারই নিপুণ পারদর্শিতা যশবন্তের রচনাশৈলীতে উপস্থিত। তবে, দু জনের মধ্যে সব চেয়ে বড় বৈসাদৃশ্য হলো, নানক এঁকেছেন সমাজের উঁচু মহলের ছবি, যশবন্ত নিচু মহলের। সমাজবাদী আদর্শে বিশ্বাসী এই লেখক, তাঁর উপন্যাসে পাঞ্জাবের কৃষিজীবী মানুষের আর্থনীতিক ও সামাজিক সমস্যাকে প্রাধান্য দিয়েছেন। কৃষিপ্রধান অর্থনীতিনির্ভর সামাজিক সম্বন্ধই তাঁর উপন্যাসের প্রতিপাদ্য বিষয়। আদর্শবাদী সংস্কারে প্রতিকূলে যে অবস্থাটির সৃষ্টি হয়, তারই এক অনুপুঙ্খ ছবি যশবন্তের রচনায় স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

গুরদয়াল সিংহ (১৯৩৩-) আরও এক ধাপ এগিয়ে গিয়ে গ্রামীণ সমাজের একেবারে নিচুতলার মানুষের সংস্কৃতিকে তাঁর সৃজনী-মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করেছেন। তাঁর লেখা 'মাঢ়ি কি দিওয়া', 'আনহোয়ে', 'আথন', 'উগ্‌গান' প্রভৃতি পাঞ্জাবি উপন্যাসের এক নতুন দিগ্‌দর্শন। ঔপন্যাসিক হিসেবে গুরদয়ালের সব চেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য হলো, নামহীন মানুষের অস্তিত্বকে খুঁজে বের করা। তাঁর রচনাশৈলীতে মালবীর মাটির সৌগন্ধ, মালবী ভাষার মাধুর্য ও সংস্কৃতি যেন টলটল করে ওঠে। কিন্তু, গুরদয়ালকে কখনও-ই আঞ্চলিকতার ঘেরাটোপ অতিক্রম করে বৃহৎ কোনও দৃশ্যপটে প্রয়াসী হতে দেখা যায় না।

এইভাবে, একদিকে পাঞ্জাবি উপন্যাসে যেমন গ্রামীণ নিম্নবিত্তদের অন্ত্যশীলতা ভাষা পেয়েছে, অন্যদিকে তেমনই, সুখবীরের 'সাড়কাতে কামরে' সুরজিৎ সিংহ শেঠির 'আবরা-কাদ্‌ব্‌রা', নরিন্দর পাল সিংহের 'বামুলা হিজা হোশিয়ার', নিরঞ্জন তসনিমের 'এক হৌর নয়া সাল' পুঁজিবাদী নাগরিক সভ্যতায় সমর্পিত দিগ্‌ভ্রান্ত মানুষের অস্মিতা ও বিপন্ন অস্তিত্বকে উপস্থিত করেছে।

পাঞ্জাবি উপন্যাসের এই পটভূমিতে, এক দশক আগে, রামস্বরূপ অনখী ঔপন্যাসিক হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেন।

অনখী (১৯৩০-) সাহিত্যের বিভিন্ন শাখায় বিচরণ শুরু করেছিলেন। তাঁর প্রথম আবির্ভাব কবি হিসেবে; কিন্তু অল্প সময়ের মধ্যেই তিনি গল্প লেখা শুরু করে দেন। এবং, স্বীকৃতিও লাভ করেন। এরই মধ্যে, হঠাৎ একদিন তিনি উপন্যাস লিখতে শুরু করে দেন। ১৯৮১-তে তাঁর প্রথম উপন্যাস 'জখমী অতীত' প্রকাশিত হতে, পাঠকবর্গ সোল্লাসে তাঁকে উৎসাহিত করেন। উৎসাহিত অনখী, এর পরই গোটা ছয়েক হালকা উপন্যাস লিখে

ফেলেন। এই উপন্যাস-সমগ্রের মধ্যেই তাঁর কাহিনী বিস্তারের দক্ষতা, যেমন 'আধধা আদমি', উপন্যাসের ব্যপকতা, যেমন 'সুলগদি রাত', লক্ষ করা যায়। এই পরিমিতিতে অনখীর 'কোঠে খড়ক সিং'-এর মতো বিশালাকার রচনা অনখীর উপলব্ধি তো বটেই, পাঞ্জাবি কথাসাহিত্যে তার বিশিষ্টতাকেও স্বীকৃতি দিয়েছে। এই জাতীয় দৃষ্টান্ত পাঞ্জাবের উপন্যাস সাহিত্যে খুবই কম। পাঞ্জাবি আঙুলগুনতি যে কটি উপন্যাস, মহা-উপন্যাস বা এপিক নভেলের পরিব্যাপ্তি স্পর্শ করতে প্রয়াসী হয়, এই উপন্যাস তারই মধ্যে এক সক্ষম উদাহরণ।

তিন পুরুষের কাহিনী 'কোঠে খড়ক সিং'। ১৯৩০-৪২, অর্থাৎ দেশবিভাগের কিছু আগে থেকে কাহিনী শুরু হয়ে শেষ হয় ১৯৭৭-এর পর। জনতা পার্টির স্বল্পমেয়াদি প্রশাসন, ইন্দিরা কংগ্রেসের পুনরায় ক্ষমতা প্রত্যাবর্তনের পরও কাহিনী চলতে থাকে। 'কোটে খড়ক সিং' গ্রাম হলেও তা পুরো সমাজের প্রতিনিধি। এই সমাজের কাঠামোটি তৈরি করেছে জোতদার জায়গিরদাররা তাদের বর্তমান পুঁজিপতি ভূমিকায়। একশো বছরের বেশি ভিন্ন-ভিন্ন রাজনৈতিক আদর্শ, সাম্প্রদায়িক শক্তি এবং তাদের সমর্থক দলবলের ভূমিকা গ্রামীণ সমাজে যে বিষবৃক্ষ রোপণ করেছে, এই উপন্যাসে তারই এক পক্ষপাতহীন বাস্তব চিত্র উপস্থিত। এই প্রেক্ষিতে নানা চরিত্রের ব্যবহারিক জীবন ও আচরণবিধি অনখী খুবই সূক্ষ্মভাবে, পরিমিত দৃশ্যচিত্র দিয়ে ফুটিয়ে তুলেছেন। তাদের সাংস্কৃতিক ও মানবিক মনের গভীরে তিনি ডুব দিয়েছেন।

উপন্যাসের কেন্দ্রবিন্দু রচিত হয়েছে ভূমি নিয়ে। কৃষিপ্রধান সমাজে ভূমিই সমাজের অস্তিত্বকে রক্ষা করে। যার জন্যে, তিন প্রজন্মের এই উপন্যাসের প্রায়, প্রতিটি চরিত্রই কোনও-না-কোনও ভাবে ভূমির সঙ্গে জড়িয়ে আছে। গ্রামীণ সমাজের সংস্কৃতি অর্থনীতি রাজনীতি সমাজনীতি ভ্রাতৃত্ববোধ সব কিছুই ভূমিকেন্দ্রিক। জমির জন্যে এখানে ভাই ভাইয়ের রক্তের সম্পর্ক ভুলে যায়। স্নেহ-ভালবাসার ফল্গুধারা শুকিয়ে যায়। এই কারণে, ঝাণ্ডা খুশি হয় তার ভাইকে খুন হতে দেখে, কেননা ভাইয়ের দশ বিঘা জমি এবার তার কব্জা হবে। এই জমির জন্যে বড় ভাই তার বউকে ছেড়ে দেয় ছোট ভাইয়ের যৌন লালসা পূরণের জন্যে। ঝাণ্ডার বউ বান্তি সম্পর্কে এটাই শোনা যায় গাঁয়ে। এইভাবেই, কৃষিপ্রধান গ্রামীণ সমাজে সাংস্কৃতিক ও মানবিক মূল্যবোধ লুপ্ত হয়ে যায়। কারও হাতে প্রচুর জমি আসে, আর, কারও হয়তো কিছুই থাকে না। এমনকি, ক্ষুন্নিবৃত্তি মেটাবার মতো জমিও থাকে না। জালজোচ্চুরি দাগাবাজি করে ঝাণ্ডা হরদিৎরা 'প্রতিষ্ঠিত' হয়—আর, প্রীতম গিন্দর হরনামিরা সবই হারায়। নারীরাও এই সমাজে সম্পত্তির মতো। ভেড়া ছাগল জমির মতোই তাদের কেনাবেচা করা যায়। মেয়েদের খুন করা বা জোর করে তুলে নিয়ে যাওয়া—এসব স্বাভাবিক ঘটনা। উপন্যাসের শুরুতে মুখ্য ঘটনা অর্জুনের খুন সম্বন্ধে, শেষে নসিবের। পাঞ্জাবের জাঠ-অবচেতনায় জিঘাংসা যে কতটা প্রবল, তারই দৃষ্টান্ত অর্জুন-নসিব ঘটনায় পাওয়া যায়।

অনখী তাঁর উপন্যাসকে চারভাগে ভাগ করেছেন। প্রথম ভাগের বিষয়বস্তু, মানুষের মূল প্রবৃত্তি : ক্ষুধা। এই ক্ষুধা কখনও জমির, কখনও শরীরের। দ্বিতীয় ভাগ : লিপ্সা, জমির লিপ্সা, ঐশ্বর্যের লিপ্সা। এরই সঙ্গে যুক্ত হয়েছে বদ্রিনারায়ণের মতো যুবকদের নতুন চেতনা

ও মানসিকতা, কেননা বদ্রিনারায়ণ 'রুশীয় সমাজবাদী সাহিত্যের সবই পড়ে ফেলেছে'। তৃতীয়ভাগ : নব-প্রজন্ম ও আত্মপ্রকাশ। অধ্যাপক সজ্জনের মাধ্যমে তৃতীয় প্রজন্মের আত্মচেতনা ও গ্রামীণ পরিবেশে নাগরিক মানসিকতার প্রকাশ ঘটেছে, যাতে আধুনিক মননের রূপটি খুবই স্পষ্ট। চতুর্থ ভাগ : নব প্রজন্মের পরিণতিলাভ সমৃদ্ধ সামাজিক চেতনা ও আদর্শে। বাপদাদাদের ঐতিহ্যবাহী অন্যায় অনাচার প্রতারণা তারা একেবারেই ক্ষমা করছে না। নসিব পুষ্পিন্দর ও হরিন্দর সমকালিক এই মূল্যবোধকেই প্রতিষ্ঠা করেছে।

ভাই বীর সিংহ থেকে যশবন্ত সিংহ "কেবল" পর্যন্ত যত উপন্যাস লেখা হয়েছে, তাতে দেখা যায়, উপন্যাসকার আগে থেকেই একটি ছক বানিয়ে নেন, যে ছকের মধ্যে সংকট-সমাধানের সূত্রটি থেকে যায়। গুরদয়াল অবশ্য এই নির্মিতির কিছুটা ব্যতিক্রম, কেননা তিনি চরিত্রদের স্বতন্ত্রভাবে বিচরণের সুযোগ দেন, পূর্ব-নির্ধারিত পথে ছেড়ে দেন না। আবার, তেমন কোনও জটিল সমস্যাও সৃষ্টি করেন না যাতে চরিত্রদের অসুবিধা হয়। এদিক থেকে অনখী একেবারেই বিপরীত ধর্মী। অনখীর রচনাশৈলীতে—সমাজমুখী ও মানবতামুখী—এই দুটি চিন্তার অন্বয় সংঘটিত হয়েছে। অনখীর চরিত্ররা সমস্যার মুখোমুখি হয়ে সাহসের সঙ্গে যুঝে যায় ও সমাধানের পথ খোঁজে। 'কোঠে খড়ক সিং'-এও ঠিক এই ঘটনা ঘটেছে। অনখী তাঁর চরিত্রদের জন্যে ধরা-বাঁধা কোনও ছক রাখেননি। এমনকি, নতুন প্রজন্মের যে চরিত্রদের তিনি উপস্থিত করেছেন, তাতেও তিনি আদর্শবাদের চড়া রঙ ব্যবহার করেন নি। বরং, আদর্শবাদিতার বিচারে এদেশের বামপন্থীরা কীভাবে ফিকে বিবর্ণ ও দেউলিয়া হয়ে যান, পুঁজিবাদী যূপকাষ্ঠে কীভাবে নিজেদের সমর্পিত করেন; তা পক্ষপাতহীনভাবে দেখিয়েছেন। ঐতিহাসিক বাস্তবের দ্বান্দ্বিক দর্পণে সমাজবাদ কীভাবে রোমান্সের মায়াজালে মোড়কাবৃত, তা অনখী নির্মম ভাবে উন্মোচন করেছেন। পাঞ্জারেব সমাজ, বিশেষ করে গ্রামীণ সমাজ, সামন্ততান্ত্রিকতার বৃত্ত থেকে আজও মুক্তি পায়নি, এমনকি পুঁজিপতি সমাজবাদের বুর্জোয়া মূল্যবোধ-ও পুরোপুরি প্রতিষ্ঠিত হয়নি এখনও। শুধু পাঞ্জাব কেন, সারা ভারতেই এখন এক অবস্থা; অর্থাৎ পুঁজিবাদী সংস্কৃতি বিকাশশীল একটি অবস্থার মধ্যে আছে। পুষ্পিন্দর হরিন্দররা তাই সামন্ত্রতান্ত্রিক মূল্যবোধকে খারিজ করেছে। এই উপন্যাস তাই হয়ে উঠেছে জীবনপ্রবাহী। কেননা জীবন এক প্রবাহের মতো, স্তব্ধগতি জলাশয় নয়। এই প্রবাহেরই প্রতিরূপ উপন্যাস। ভিন্ন প্রজন্মের স্বভাবগত পার্থক্য, মূল্যবোধের পার্থক্য—সবই এই প্রবাহের অন্তর্গত। 'কোঠে খড়ক সিং'-এ রাম সরূপ অনখী জীবনের এই নিঃসৃতির পরিব্যাপ্তিকেই প্রতিবিম্বিত করেছেন।

কয়েক বছর আগে আমার এক রুশ বন্ধু, রুশ ভাষায় অনুবাদের জন্যে এমন এক পাঞ্জাবি উপন্যাস খুঁজছিলেন যাতে পাঞ্জাবি জীবনস্পন্দন ধ্বনিত হয়েছে। আমি তাঁকে কিছু উপন্যাস পড়তে দিই— কিন্তু কোনওটিই তাঁর ভাল লাগেনি। মনে হয়, তখন 'কোঠে খড়ক সিং' দিতে পারলে তিনি হয়তো তৃপ্তি পেতেন। অনখীর এই মহা-উপন্যাস, বা এপিক-নভেলের গঠননির্মিতির বাতাবরণটি সক্ষমভাবে প্রথম রচনা করেছিলেন কর্তার সিংহ দুগাল তাঁর 'খা পিও যায়ে' উপন্যাসে। পাঞ্জাবি উপন্যাসে সেইদিনই ঋদ্ধি সম্পন্ন হবে, যেদিন আমাদের লেখক ও সমালোচকরা বড় গল্প বা লঘু কাহিনীকে উপন্যাসের স্বীকৃতি দিতে অনীহা প্রকাশ করবেন। তারপরই হয়তো সেই উপন্যাস রচিত হতে থাকবে, যাতে পাঞ্জাবি

মনন সমাজ ও সংস্কৃতির বহু বিচিত্র শতধা-প্রসারিত চিত্র সমাকৃতি পাবে; পাঞ্জাবের হৃৎস্পন্দন অনুরণিত হবে।

করণজিৎ সিংহ

প্রথম খণ্ড

পূজো-পাব্বনের দিন।

আট ন দিন ধরে সেলবাড়ার মেলায় ভিড় উপচে পড়ে। ভাইবোনের কথা মনে পড়ে। গুরুদ্বারের শান বাঁধানো চত্বরে কোথাও চলে অখণ্ড পাঠ আর ভোগ, কোথাও জমে ওঠে কীর্তনের আসর। কবিরা কবিতা পড়ে, গায়কেরা গান গায়। দুপুর থেকেই দোকানপত্তর খুলে যায়। লাড্ডু জিলিপি পকৌড়া বাতাসা ও চিনির হরেক রকম খাবারদাবার। কোথাও আবার চুড়ি থালাবাসন ঘুঙুর কিংবা হার বিক্রির ধুম পড়ে যায়। সাজগোজের সস্তা মাল। দঙ্গল বেঁধে যুবতী মেয়েরা বসে পড়ে, হাতে চুড়ি গলিয়ে নানাভাবে পরখ করে। তাদের হাতে চুড়ির নানা রঙ ঝকমকিয়ে ওঠে।

সন্ধ্যে হলেই সারেঙ্গিওয়ালারা তাদের বাজনা শুরু করে আসর জাঁকিয়ে বসে। কুস্তির আখড়ায় প্যাঁজ পয়জার শুরু হয়ে যায়। মনে হয় পুরো গ্রামটাই যেন একটা মেলা। এক একটা বাড়ি থেকে লোক চার পাঁচবার মেলা দেখতে আসে। মেলা দেখে তাদের আর আশ মেটে না। সঙ্গে সঙ্গে মদ খাওয়ারও হিড়িক পড়ে যায়। কোনও কোনও বছর মারপিটও হয়। কে কাকে মারে, কে মার খায়, ভিড়ের মধ্যে টেরও পাওয়া যায় না। ভিড়ের সেই সমুদ্রে, কে কখন হারিয়ে যায়— তার ঠিক নেই। আশপাশের গ্রাম ঝেঁটিয়ে লোক এসে হুমড়ি খেয়ে পড়ে এই মেলায়। একদিক থেকে আসে দুল্‌লেওয়ালা দয়ালপুরা ছান্না গুলাব-সিং দপালি ধিঙ্গড় আর ভাইরূপার লোক, অন্যদিক থেকে আসে জালাল-গুমটি কোটে খড়ক সিং বুর্জগিল্লা হরনাম-সিংওয়ালা কলোক ও সাধনিয়ার লোক।

কোটে খড়ক সিং থেকে যারা মেলা দেখতে এসেছিল, তারা সবাই ফিরে এসেছে। আর একবার হয়তো যেত, কিন্তু বাড়ির দরজায় পা দিতেই আকাশ অন্ধকার হয়ে ওঠে। কেহরের ছেলে গিন্দর অনেক আগেই ফিরেছে। বিকেলের দিকেই মেলা ঘুরে এসেছে সে। পাঁচ পয়সার বাতাসা, বাবার জন্যে এক ঠোঙা সিঙ্গাড়া পুঁটুলিতে বেঁধে এনেছে। ফেরার পথে দু একজন জিজ্ঞেস করেছে, 'কী রে, মেলা দেখা হয়ে গেল এর মধ্যে ?' সে জবাব দিয়েছে, 'আর কী দেখব? মেলার রঙ-ঢঙ সব দেখা হয়ে গেছে। তা তুমি এখন যাচ্ছ নাকী?' চলতে চলতেই পড়শি জবাব দিয়েছে : 'হ্যাঁ। আসল মেলা তো এখনই জমবে!'

গিন্দর বাড়ির গলিতে ঢুকে পিছন ফিরে তাকায়। অন্ধকারে কিছু চোখে পড়ে না। বাড়ির মধ্যে ঢুকে পড়ে সে। বারান্দায় ঠেস-দেওয়া খাটিয়াটা পেতে ফেলে। বুড়ো বাবার সঙ্গে হালকা কথাবার্তা বলে। বাবা বলে: 'আলোটা জ্বালিয়ে দে। একেবারে গুমোট অন্ধকার। তোর বউ তো এখনও—' কথাটা কেহর শেষ করে না, কিন্তু গলার আওয়াজ তিক্ততা ঢাকা পড়ে না।

'আলো জ্বালছি—কিন্তু হরনামি এখনও ফিরল না। সবাই ফিরে এসেছে। কোথাও আটকা পড়লো না তো? এত অন্ধকার—' গিন্দর বাবার পাশে বসে পড়ে।

'কী করে বলি, বল?' কেহর খাটিয়ার ওপর উঠে বসে। গলার আওয়াজ ভারি ভারি শোনায়। বাবার মনের ভাব গিন্দর ঠিক আঁচ করে উঠতে পারে না। বুড়ো মানুষ হলে কি হবে, গিন্দর ভাবে, স্পষ্ট কথা বাবার মুখ দিয়ে কখনও-ই বেরোয় না। মনের কথা কাউকে টের পেতে দেয় না। মুখ বুজে সব কষ্ট সহ্য করবে, কিন্তু একটি উচ্চবাচ্য করবে না। গিন্দরের বউ সম্পর্কে কেহরের মনোভাব আন্দাজ করা শক্ত নয়। হরনামকে হয়তো একটু ভয় পায়। সংসারটা যদি ভেসে যায়। গিন্দরের বউ কোন প্রকৃতির তা বুঝতে কেহরের অসুবিধে হয়নি। প্রথম-প্রথম সে পুত্রবধূকে বলত: 'বউমা, এখন থেকে বাড়ির সব দায়িত্ব তোর। বিশ বছর আগে গিন্দরের মা মরেছে। গিন্দরের বয়েস তখন নয় কি দশ। তারপর কষ্ট করে ওকে মানুষ করতে করতে এত দুর এনেছি। এখন তো আমার দিন প্রায় শেষ। তুই এসে গেছিস, ভালই হয়েছে। বুঝে-সুঝে চলিস।' হরনামি শ্বশুরের কথার জবাব দিত না। কথার মাঝখানেই দরজায় কিল মারতে-মারতে তাল ঠুকত। কেহর বাধ্য হয়ে চুপ করে যেত। ইষ্টনাম জপ করত: 'বাখরু-বাখরু' (বাহে গুরু, বাহে গুরু)।

হরনাম একদিন বাইরের ঘর থেকে একটা ঝুড়ি আনতে গেছে। কিন্তু, ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যেও ফেরে না। কেহর একটু রেগেই জিজ্ঞেস করে, 'এত দেরি হলো যে? কোথায় গিয়েছিলি?'

কথাটা শোনার সঙ্গে সঙ্গে হরনাম ঝুড়িটা আছড়ে ফেলে। তারপর সটান বুড়ো শ্বশুরের পাছায় একটি লাথি কষায়: 'বুড়ো ভাম! আমার কাছে কৈফিয়ৎ চাওয়া হচ্ছে? দু দিন বাদে ভাগাড়ে যাবি—খবর্দার—এরপর আমাকে যদি কিছু বলিস, তোকে গলা টিপে মারব—বলে দিচ্ছি!'

কেহর প্রচণ্ডভাবে রেগে গেলেও, চুপ করে থাকে। গিন্দর সেদিন সকালেই রামপুরা গেছে। তখনও ফেরেনি। কেহরও অবশ্য এ নিয়ে ছেলের কাছে টুঁ শব্দও করে না। হরনামের দাপট এই ভাবেই বেড়ে চলে। বুড়োকে কে পরোয়া করে? গিন্দরতো হাতের

মুঠোয়। বউয়ের মিষ্টিমুখ তাকে জাদু করে রাখে। হরনাম মিষ্টি-মিষ্টি কথা বলে গিন্দরের সঙ্গে। চার বছর হলো বিয়ে হয়েছে। ছেলেপুলে হয়নি এখনও। গিন্দর অবশ্য এসব নিয়ে মাথা ঘামায় না। তাছাড়া, হরনামির ছেলেমানুষি চালচলনের দিকেও তার কোনও নজর নেই। কিন্তু, কেহর এসব নিয়ে বেশ ভাবত। ভবিষ্যৎ অন্ধকার বলে মনে হতো।

হরনামি কোন মেয়ের সঙ্গে মেলায় গেছে, গিন্দর জানত না। সে আন্দাজ করে নেয়, নিশ্চয়ই পাশের বাড়ির বউ নন্দর সঙ্গে গেছে। নন্দর সঙ্গে হরনামির দহরম-মহরম একটু বেশি। বাবাকে কিছু না বলেই গিন্দর উঠে পড়ে। নন্দদের বাড়ির সামনে গিয়ে দাঁড়ায়। তাদের বাড়ির উঠোনে জনা চারেক লোক মদ খাচ্ছে। সামনে পড়ে আছে আম-আচারের চাট। টুকটাক কথা চলছে। কাউকে গালাগালি, কাউকে প্রশংসা। প্রশংসার ভাষাটাও অবশ্য খিস্তির, কখনও মা তুলে, কখনও বোন তুলে। গিন্দরকে দেখে ওরা হই হই করে ওঠে: 'যোগিন্দর! এসো, এসো জুড়িদার—এক পাত্তর হয়ে যাক?'

'ন্-না। তোমরা খাও বরং। আমি এখনই খেয়ে এলাম। একটা কাজ আছে এখানে—' বুকের মধ্যে আছড়ে পড়ে কথাটা গিন্দর কিছুতেই প্রকাশ করতে পারে না।

'তোমার যা ইচ্ছে।' একজন জবাব দেয়, তারপর মাথাটা ঝুঁকিয়ে উঠে পড়ে, মেলার দিকে হাঁটা দেয়।

গিন্দর চুপ করে থাকে। একটু দূরে পেট সমান উঁচু একটি উনুনে একজন দুধ জ্বাল দিচ্ছিল। গিন্দর তার কানের কাছে মুখ এনে জিজ্ঞেস করে, 'তাই, নন্দ মেলায় গিয়েছিল?'

'হ্যাঁ। কেন?'

'ওকে একটু ডেকে জিজ্ঞেস করো তো, আমার বউ সঙ্গে ছিল কী না?'

তাইয়ের বউ মোষের জাব তৈরি করছিল। পর্দা আড়াল করা ছিল। এবার সে দুধের বালতি হাতে বেরিয়ে আসে। গিন্দরের কথা তার কানে গেছে। সে পুত্রবধূকে ডেকে জিজ্ঞেস করে, 'কীরে, হরনামি তোর সঙ্গে মেলায় যায়নি?'

'গেছল তো। কেন, কী হয়েছে?' সে সকৌতূহলে জানতে চায়।

'তোর সঙ্গে ফিরে আসেনি?' শাশুড়ি পাল্টা প্রশ্ন করে।

গিন্দর কান পেতে থাকে জবাব শোনার জন্যে। তার সারা শরীরটাই এখন যেন কান হয়ে গেছে।

'হ্যাঁ। বাবা ঠাকুরের কাছে পেন্নাম করে আমার সঙ্গেই মেলায় গিয়েছিল। তারপর চুড়িটুড়ি কিনে ....' তড়বড় করে বউটা কথা বলে যায়।

শাশুড়ি থামিয়ে দেয়, 'আরে, একটু ধীরে-ধীরে বল। দম নে একটু—।'

'মেলায় হলো কি, ও আর শ্যামি কখন যেন আমার কাছ থেকে পিছিয়ে পড়ে। তারপর — ফেরার সময় দেখি, ওদের দুজনের কেউ আমার সঙ্গে নেই!' বউ এক নিঃশেষে সব বলে দেয়।

'শ্যামি? মানে প্রতাপের ছেলের বউ?' গিন্দর প্রশ্ন করে।

'হ্যাঁ'। ঘোমটার ফাঁক দিয়ে বউটি মাথা নাড়ে।

গিন্দরের মনে হয় তার পায়ের নিচে থেকে যেন মাটি সরে যাচ্ছে। সে উঠে দাঁড়ায়, তারপর চটপট বেরিয়ে যায়।

গিন্দর চলে যাওয়ার পর শাশুড়ি-বউ চুপিসাড়ে কথা বলে। ঠাট্টা ইয়ারকিও চলে। মাতালদের একজন গলা উঁচিয়ে বলে, 'মাংস কী হলো? য়্যাঁ! তা কেহ্‌রের ব্যাটা এখানে কেন এসেছিল?'

তাইয়ের বউ কোনও জবাব দেয় না। উনুনে খাসির মাংস সেদ্ধ করতে ব্যস্ত হয়ে ওঠে। তারপর, রান্না-মাংস মাতালদের কাছে নিয়ে যায়।

শ্যামি গাঁয়ের চালু মেয়েদের একজন। বেজায় বদনাম। ওর কীর্তিকাহিনী গাঁয়ের সবাই জানে। ওকে বাড়িতে আনাটাও কেউ বড় একটা পছন্দ করে না। যে বাড়িতেই সে গেছে, সেই বাড়িতে কিছু না কিছু কেলেংকারি ঘটেছে। কার কানে যে সে কী মন্ত্র দেয়, তার ঠিক নেই। কানে একটা কথা গেলেই হলো, কথাটাকে ডানা-পালক লাগিয়ে সে এমন করে দেয় যে পালাবার পথ থাকে না। অনেকের সংসারে সে এইভাবে আগুন ধরিয়ে দিয়েছে। তার নিজের সংসারেও শান্তি নেই। শ্যামির স্বামী বোধ করি এই দুঃখেই ফৌজি হয়ে যায়। দুই ছেলে—ছেলেরা ছোট। শ্বশুর-শাশুড়ি বেঁচে। কিন্তু ফৌজি স্বামী যাকে কাবু করতে পারেনি—বুড়ো শ্বশুর তার সঙ্গে এঁটে উঠবে কেমন করে? কিছু বললে তো জুতিয়ে একেবারে মুখ ছিঁড়ে দেবে! তার ওপর, শ্যামি মদটদও ভালই টানে।

প্রতাপদের বাড়ি অন্য পাড়ায়। গিন্দর অগত্যা সেই দিকেই হাঁটা দেয়। মনে পড়ে যায়, গত বৈশাখীতে হরনামি শ্যামির সঙ্গে গিয়েছিল ভদৌড়। কিন্তু শ্যামির মতো মেয়ের সঙ্গে হরনামি মেলায় গেল কেন, গিন্দর কারণ খোঁজার চেষ্টা করে। কিছুতেই আন্দাজ করতে পারে না, শ্যামির সঙ্গে হরনামির এত ভাব-ভালবাসা কী করে হয়। শ্যামি তো . . . না, হরনামি কখনও অমন হতে পারে না। হঠাৎ একটা কথা মনে পড়তে গিন্দরের মাথায় যেন বাজ পড়ে। যেদিন হরনামি ভদৌড়ের বৈশাখী-মেলা দেখতে গিয়েছিল, সেদিনও সে রাতে ঘরে ফেরেনি। হরনামি বলেছিল, ভদৌড়ের কাছে হন্ডিয়ায় তার এক বান্ধবীর বিয়ে হয়—বেজায় বড়লোকের বউ—তার সঙ্গে দেখা হওয়ায় সে তাকে আর রাতে ফিরতে দেয়নি। অনুরোধ করেছিল, 'আজ থেকে যা। আজই এসে চলে যাবি—সে হতে পারে না।' ফলে, শ্যামির সঙ্গে হরনামি ওখানে থেকে যায়। কথাটা শুনে গিন্দরের একবার মনে হয়েছিল, ভদৌড় গিয়ে ঘটনার সত্যতা যাচাই করে আসে। কিন্তু, তারপর আর যাওয়া হয়ে ওঠেনি।

প্রতাপের স্ত্রী রুটি সেঁকছিল। উনুনের এক পাশে বসে প্রতাপ আর তাই দুই নাতি রুটি খাচ্ছিল। সবাই চুপচাপ। কারও মুখে কোনও কথা নেই। গিন্দর বুড়িকে কথাটা জিজ্ঞেস করে। উনুনের ওপর তাওয়ায় রাখা রুটি উলটোতে-উলটোতে বুড়ি জবাব দেয়, 'না। এখনও ফেরেনি তো।' অন্ধকারে দাঁড়ানো গিন্দরের চেহারাটা বুড়ি ঠিক মতো ঠাহর করতে পারে না। গলার আওয়াজটা চিনে বলে ওঠে, 'যোগিন্দর—না?'

'হ্যাঁ, আম্মা।' গিন্দর আর একটু কাছে চলে আসে।

'তোকে আর কী বলব, বাবা—' বুড়ি কথাটা আর শেষ করে না। লম্বা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে।

'নে—একটা পিঁড়ি নিয়ে বসে পড়। একটা রুটি আছে। খেয়ে নে—' প্রতাপের স্ত্রী বলে ওঠে। কিন্তু, গিন্দর ওখানে আর থাকতে চায় না। সে পায়ে-পায়ে বাড়ি ফিরে আসে।

ঘরে এসে দেখে, বাবা সর্ষের তেলে প্রদীপ জ্বেলে আটা ছাঁকতে ব্যস্ত। পায়ের আওয়াজ শুনে কেহর জিজ্ঞেস করে, 'কে?—গিন্দর? কোনও খবর পেলি?'

'না। কেউ কিছু বলতে পারল না।' গিন্দর বারান্দার ওপর ঠায় দাঁড়িয়ে থাকে। কেহর আবার বলে:

'মোষের জন্যে ভূসি বের কর। আমি ততক্ষণে রুটি বানিয়ে ফেলি। পিঁয়াজের আচার দিয়ে খেয়ে নেওয়া যাবে।'

বাবা যেন আজকাল সব ভুলে যেতে চায়।

দুই

দুধ আর দইয়ের সঙ্গে রুটি খেয়ে, বাপ-ব্যাটা উঠানে খাট পেতে শুয়ে পড়ে। কেউ কোনও কথা বলে না। বলার মতো কিছু নেই-ও। আগে বাপ ছেলের মধ্যে অনেক কথা হতো। তর্কবিতর্ক হতো। বাবা বুঝিয়ে বলত কোন পরিস্থিতিতে কি করা উচিত। ইদানীং আর এই ধরনের কথাবার্তা হয় না। গিন্দর বুঝতে পারে, বাবা রেগে আছে। তবে, লোকলজ্জার ভয়ে কিছু বলছে না। বউ মেলায় গেছে, এখনও ফেরেনি, একথা শুনে লোকে হাজার কথা বলবে। কানাকানি করবে। এলোমেলো চিন্তার ঝড় তুফান ওঠে গিন্দরের মনে। কেহর অবশ্য বাতি নিভিয়ে ছেলেকে ঘুমিয়ে পড়তে বলে। ফালতু ভেবে লাভ কি — সবই 'বাহে গুরু'র ইচ্ছে — তিনি যা করাবেন, তাই হবে। ওঁরই হাতে সব বাঁধা আছে।

বাপ ছেলে অন্ধকারে, চুপচাপ খাটের ওপর পড়ে থাকে। কেউ কথা না বললেও, দু জনের মনের মধ্যেই একই ঝড় বয়। কেহর মাঝে মাঝে কাশে, অস্ফুটস্বরে উচ্চারণ করে, 'বাহে গুরু।' গিন্দরেরও ঘুম আসে না। চোখ বুজলেই দুঃস্বপ্নের একটা ঝলক ভেসে ওঠে। চোখ খুলে সে আবার পাশ ফিরে শোয়। দীর্ঘশ্বাস পড়ে। দাঁত কিড়মিড় করে নিজের মনেই বলে, 'কুত্তি—খানকি মাগি! একবার আয়, তোর হাত ভেঙে যদি না দিই, তাহলে আমার নাম গিন্দর নয়!' কিন্তু কথাটা ভেবেই গিন্দর মিইয়ে পড়ে। এসব করলে লোকে কী বলবে? তার চেয়ে বরং ভালোয়-ভালোয় ফিরে আসুক হরনামি। সব অপবাদ, বদনাম চাপা পড়ে যাবে।

গিন্দর উঠোনে নেমে আসে। আকাশের তারা দেখে। একটু একটু করে রাত বাড়ছে। জল খেয়ে, খাটিয়ায় শুয়ে আবার ঘুমোবার চেষ্টা করে সে। বাবা বোধ হয় এতক্ষণে ঘুমিয়ে পড়েছে। গিন্দর চোখ বুজে পড়ে থাকে। বাইরের দরজায় শিকল নাড়ার একটা আওয়াজ পাওয়া যায়। গিন্দর উঠে বসে। আবার আওয়াজটা পাওয়া যায়, এবার জোরালো। গিন্দর উঠে দাঁড়ায়। জুতোটা পায়ে গলিয়ে উঠোনে নেমে আসে। এত রাতে কে আসতে পারে?

ছিটকিনি খোলাটা কী ঠিক হবে? তবে, মেলার রাত, কে কি মনে করে কখন আসে, বলা যায় না। বাইরে আবার শিকল নাড়ার আওয়াজ। সঙ্গে সঙ্গে মেয়ে গলায় ডাক: 'গিন্দর!' গিন্দর একটু আনমনা হয়েই দরজা খোলে। বাইরে দুটি নারীমূর্তি। শ্যামির গলার আওয়াজ পাওয়া যায়। পরের জন কে বুঝতে অসুবিধে হয় না।

শ্যামি হরনামিকে বলছিল: 'যা ভেতরে যা। সব কথা খুলে বললে কেউ তোকে কিছু বলবে না।'

গিন্দর একটু দুরে দাঁড়িয়ে চুপ করে ওদের কথাবার্তা শোনে। মনের মধ্যে অদ্ভুত এক শূন্যতা অনুভব করে। ওরা ততক্ষণে ভেতরে ঢুকে, দরজার কাছে দাঁড় করানো খাটিয়াটা নামিয়ে বসে পড়েছে। উঠোনের আর এক কোণে মোষটাও উঠে পড়েছে। দু চারবার ডেকেও ওঠে। অসময়ে ঘুম ভাঙলে পশুদের রাগ হয়।

'গিন্দর ভাই—দরজার শেকলটা টেনে দিয়ে এসো—একটা কথা শুনে যাও—' চাপা গলায় শ্যামা ফিসফিস করে বলে।

গিন্দর ভেতর থেকে শেকলটা টেনে দেয়। মনে মনে নমস্কার জানায়। যাক, হরনামি ফিরে এসেছে তাহলে। একটু আগে যে-কথা ভেবেছিল মনে পড়ে, একটা লাঠি দিয়ে হারামি মাগিটার ঠ্যাং ভেঙে দেবে। কিন্তু কী আশ্চর্য, এখন আর সে রকম কিছু করতে ইচ্ছে করছে না। খাটিয়া থেকে উঠে দাঁড়িয়ে শ্যামি গিন্দরকে বলে: 'কী বলব ভাই, এক বাজে ঝামেলায় ফেঁসে গিয়েছিলাম আমরা। গুমটির এক মেয়ের হার ছিনতাই হয়ে যায়। পুলিশ এসে ধরে আমাদের, কেননা মেয়েটা নাকী আমাদের কাছেই দাঁড়িয়েছিল। কোনও রকমে বেঁচে গেছি—না, না, কেউ মারধোর করেনি, গায়ে অবধি হাত দেয়নি—শালা ছোট-দারোগা খালি আমার দিকে তেড়ে-তেড়ে আসছিল। শেষ অবধি মহদুদ—সেলবাড়ার ওই নম্বরদারের জন্যে ছাড়া পেলাম। আমিতো ও-বেচারাকে চিনতাম না। নাম-ধাম জাত-টাত সাকিন-টাকিন জেনে—ওই নম্বরদার আমাদের গাঁ অবধি পৌঁছে দিয়ে গেল। বড় ভাল লোক! ফ্যাসাদ আর কাকে বলে! না, না, এতে তোমার বউয়ের কোনও দোষ নেই। ওকে খামোকা বকাঝকা কোরো না!'

তারপর হরনামির উদ্দেশে: 'নে শুয়ে পড় এখন। ও-রকম বেশ্যো কাঠের মতো বসে থাকিসনি।' তারপর আবার গিন্দরকে: 'চলো ভাই—আমাকে বাড়ি অবধি একটু পৌঁছে দাও। বুড়ো তো এতক্ষণে খেপে ব্যোম হয়ে গেছে। আমাকে তো বাঁদি ছাড়া আর কিছু মনে করে না। তুমি ভাই সমঝদার লোক, ব্যাপারটা বুঝে গেলে, কিন্তু বুড়ো এত চট করে বুঝতে চাইবে না—'

শ্যামির কথায় গিন্দরের মন ঠাণ্ডা হয়। কিন্তু, একটা খটকাও লাগে। শ্যামির মুখ থেকে মদের গন্ধ আসছে। তবুও, শ্যামিকে সে তার বাড়ি অবধি পৌঁছে দেয়।

ফেরার পথে শ্যামির মুখ থেকে বেরোনো মদের গন্ধের কথা আবার মনে পড়ে। তবে, মাথা ঘামায় না। শ্যামি মদ খায়। এমনকি, শ্যামির শ্বশুরশাশুড়িও এ বিষয়ে চিন্তিত বলে মনে হয় না। শ্যামির শাশুড়িই দরজা খুলে দেয়। গিন্দরের সব কথায় 'আচ্ছা' গোছের দায়সারা জবাব-ও দেয়। শ্যামি সোজা ঘরের মধ্যে ঢুকে যায়। গিন্দর অবশ্য জানিয়ে দেয়: হরনামিও শ্যামির সঙ্গেই ফিরেছে।

ঘরে ফিরে সে দেখে হরনামি বিছানা ছাড়াই খাটের ওপর শুয়ে। ঘুমিয়ে আছে না জেগে, বোঝার উপায় নেই। গিন্দর ওকে আর ডাকে না। ভাবে এখন কথা বললেই রাগারাগি হবে, মাঝরাতে চেঁচামেচি শুরু হয়ে যাবে। পাড়াপড়শি জেগে উঠবে— লোক জানাজানি হয়ে যাবে ব্যাপারটা। বারান্দায় খাট টেনে সে শুয়ে পড়ে। ঘুমোবার চেষ্টা করে। একবার ভাবে, বাবাকে ডেকে বলে দেয়, হরনামি ফিরেছে। আবার ভাবে, হরনামিকে রুটি খাওয়ার কথা বলে। দুটো রুটি এখনও পড়ে আছে—আচারের সঙ্গে খেতে পারে। না হলে, কে খাবে রুটি দুটো? হরনামির হয়তো খাওয়াদাওয়া হয়নি। একই ঘরের মধ্যে একজন না খেয়ে থাকবে? গিন্দর এ-সব ভেবে গেলেও কিন্তু মুখে কিছু বলে না। চোখ দুটো করকর করে ওঠে। এবার সে ঠিক ঘুমিয়ে পড়বে বলে মনে হয়।

সকালে উঠে গিন্দর নিজেই চা বানিয়ে ফেলে। একটি লোটা ভর্তি করে, সেটি একটি বড়ো জায়গার মধ্যে রেখে, মুখ আটকে, বাবার মাথার কাছে রেখে দেয়। আরও দুটি বড় পাত্রে সে চা ঢালে। একটা নিজে নেয়, অন্যটি হরনামির মাথার কাছে রাখে। আস্তে আস্তে ডাকে, 'ওঠো—চা খেয়ে নাও। এখনও গরম আছে।'

হরনামি পাশ ফেরে, একটু আড় হয়, ফের চিৎ হয়ে আড়ামোড়া খায়। চেহারাটা বেশ খারাপ হয়ে গেছে। গিন্দর দ্বিতীয়বার ডাকতেই সে উঠে বসে। গিন্দরের হাত থেকে চায়ের পাত্রটি নিয়ে চুমুক দেয়। ফাঁকা পাত্রটি নিয়ে গিন্দর ওর খাটে গিয়ে বসে। কেমন যেন মায়া লাগে। হঠাৎ, হরনামির কাপড় থেকে সে মদের গন্ধ পায়। হরনামিকে বলে, 'গা ঝাড়া দিয়ে উঠে পড়ো। বেলা বাড়ছে—হাত মুখ ধুয়ে এসো।'

'উঠছি। উঠতে তো হবেই।'

গিন্দর সহসা হরনামির মাথায় লেগে থাকা দোপাট্টার একটা দিক ধরে: 'এখানে মদের গন্ধ কেন?'

'মদের গন্ধ? তুমি মদের গন্ধের কী জানো? জীবনে তো কোনওদিন মদ খাওনি!'

'তুমিই জানো তাহলে?' গিন্দর অল্প হেসে উত্তর দেয়।

হরনামি জবাবে মুখের একটি আদুরে ভঙ্গি করে।

গিন্দরের আরও কিছুক্ষণ বসে থাকতে ইচ্ছে করে। ওদিকে, বারান্দায় চা খেয়ে বাবা আবার শুয়ে পড়ে। মাঝে-মাঝে কাশে। বাবার দিকে এক পলক তাকিয়ে, গিন্দর আর একটু কাছ ঘেঁষে বসে। শরীরটা যেন কেমন আনচান করে ওঠে। এক হাত হরনামির কাঁধের ওপর রেখে, অন্য হাতে তার গলা জড়িয়ে, গাল ঘসে। কিন্তু পরক্ষণেই থেমে যায়। হরনামিও কাঁধ ঝাঁকিয়ে চট করে সরে আসে। হরনামির নাক মুখে মদের পচা গন্ধ! গিন্দর তবুও কোনও মন্তব্য করে না।

খাট ছেড়ে হরনামি উঠে দাঁড়ায়। পায়ে জুতো গলায়। পুরনো দোপাট্টা মাথায় দেয়। সালোয়ার কামিজ বের করে। কেহরও তার খাট থেকে আড়চোখে তাদের লক্ষ করে। মুখে কিছু বলে না। হরনামি এক লোটা জল নিয়ে বাইরে পা বাড়ায় প্রাতঃকৃত্যাদির জন্যে।

গিন্দর ঠিক করে, চায়ের বাসনগুলো মেজে নিলে ভাল হয়। ঘরের মেয়েলি কাজকর্ম করতে তার খারাপ লাগে না। অভ্যেসে দাঁড়িয়ে গেছে। হরনামি আসার আগেও সে

রান্নবান্নার কাজ করেছে। অবশ্য কেহ্রও করেছে। কেননা, কাজ করার তো আর কেউ ছিল না বাড়িতে।

কেহ্র ধীরে ধীরে খাট থেকে ওঠে। লাঠিটা হাতে নিয়ে বেরিয়ে যায়। যাওয়ার আগে বলে, 'গিন্দর, বউকে এখনই কিছু বলিস না। চেঁচামেচি শুরু হয়ে যাবে তাতে। এখন, মাথা ঠাণ্ডা রাখতে হবে তোকে।'

বাবার কথা শুনে গিন্দর বিস্মিত হয়। মাথায় হিজিবিজি বিদ্যুৎ খেলে যায়। চায়ের বাসন ধোয়ার কথা আর মনে আসে না। ঘরের ভেতর গিয়ে, আলনায় রাখা হরনামির রাতের দোপাট্টা টেনে নিয়ে দুহাতে মেলে ধরে। পুরো দোপাট্টায় হলুদ-হলুদ ছোপ। দোপাট্টাটা জড়ো করে এবার সে শোঁকে। মদ-মাংস, দুটোর কোনওটাই গিন্দর অবশ্য খায় না। কিন্তু, তার চেনাজানারা খায়। ফলে, মদ-মাংসের গন্ধটা তার বেশ পরিচিত। উনুনের ওপর সেদ্ধ মাংসের গন্ধটা তার খুবই পরিচিত। অনেক সময়, বন্ধুবান্ধব মদের গেলাস আর মাংস সাজিয়ে তাকে টেনেও নিয়ে গেছে। সেখানে গিয়ে, সে কখনও তাদের জল গড়িয়ে দিয়েছে, টুকিটাকি ফাইফরমায়েশ খেটেছে, এমনকী মদও ঢেলে দিয়েছে। ফলে, গন্ধটা তার অচেনা নয়।

গতকাল রাতে হরনামি তাহলে মেলায় গিয়ে শ্যামির সঙ্গে শুধু মদই খায়নি, মাংসও খেয়েছে। মুখ মুছেছে এই দোপাট্টায়। কথাটা ভাবতেই গিন্দরের মাথা ঝাঁ-ঝাঁ করে ওঠে। ঘরের বউ মদ-মাংস খাচ্ছে, এ কথাতো কোনও দিন শোনা যায়নি। কী দিনকালই না পড়েছে! গাঁয়ে এসব করত শুধু শ্যামি। এবার তাহলে আর এক শ্যামির জন্ম হলো। শ্যামি, শোনা যায়, ঘরে বসেই মদ খায়। গিন্দরের ইচ্ছে করে, এক লাথি মেরে হরনামির কোমর ভেঙে চিরজীবনের মতো তার মদ খাওয়া ঘুচিয়ে দেয়। কিন্তু, দেরি হয়ে গেছে। আর কিছু করার নেই। না কী কুয়োর জলে ঝাঁপ মেরে নিজেই সে এবার মরবে? এ-রকম বউ থাকার চেয়ে না থাকাই ভাল। এতো মরে যাওয়ার উপক্রম। এই সব মেয়ে সাপের চেয়েও সাংঘাতিক। সাপের মতোই বিষ ঢালবে, আর লোককে আঁকা-বাঁকা রাস্তায় দৌড় করাবে। হাতে একটা খেঁটে লাঠি, আর কাঁধে একটা দড়ি ফেলে গিন্দর টলতে-টলতে ঘরের একদিকে যায়, তারপর, রাস্তায় বেরিয়ে পড়ে। দরজাটাও আটকায় না।

খেতে পৌঁছে সে খেঁটে লাঠিটা মাটিতে পুঁতে দেয়। তারপর তাতে দড়ি বেঁধে সঙ্গে র গাঁটরিটা সাজিয়ে গুছিয়ে নেয়। গায়ের জোরে খেঁটেটা টেনে তোলার চেষ্টা করে। পারে না। বেশ শক্তভাবেই ওটা মাটিতে গেড়ে গেছে। কিছুদিন অগেও তো সে এক ঝটকায় এই গোঁজ তুলে নিতে পারত। কিন্তু, আজ হলো কী? একটু দূরে, একটা শিরীষ গাছের নিচে সে বসে পড়ে। গাঁটরিটা মাথা তোলার জন্যে সে অপেক্ষা করতে থাকে। আশপাশে কাউকে দেখতে পেলে ডাকবে।

তিন

হরনামিরা দুই ভাই, এক বোন। হরনামি সবার ছোট। ভাইয়েদের বিয়ে থা হয়ে গেছে। দুজনেরই দুটি করে সন্তান। বাড়ির কাজকর্ম হরনামি বড় একটা করত না। ছোটবেলা থেকেই ভাল খাওয়াদাওয়া, ভাল কাপড়চোপড় পরায় সে অভ্যস্ত। দীঘল চেহারা, ফর্সা রং, গলায় কালো সুতোয় বাঁধা সোনার তাবিজ, হাতে তাগা। ঘরে থাকতে তার একেবারেই ভাল লাগত না। সারাটা দিনই কাটিয়ে দিত এর বাড়ি, ওর বাড়ি করে। মাসের পর মাস—তার গতিবিধি এক। বড়-বড় চোখে সব সময়েই কাজল লাগিয়ে রাখত। কাগজি-লেবুর কোয়ার মতো গোলচে চোখ। ভাল গান গাইতে পারত। গাঁয়ে কোনও মেয়ের বিয়ে হলেই তার ডাক পড়ত গান গাওয়ার জন্যে। গান শুনতে বরযাত্রীরা অবধি উঠে আসত খাওয়া ছেড়ে। কনে চলে গেলে হরনামি বাকি মেয়েদের সঙ্গে নাচগানের আসর জমাত। দু ভাগে ভাগ হয়ে যেত দুটি দল, ছড়া কেটে-কেটে প্রতিযোগিতা চলত। হরনামি একাই একটা দল, বিপক্ষে অন্য সবাই। মেলায় যে-সব বউয়েরা আসত, তাদের বরেরা হরনামির নামেই কেমন যেন আনমনা হয়ে যেত।

যে সময়ের কথা, সেই সময় কোনও-কোনও বাড়িতে হ্যান্ডপাম্প ছিল। জল পাওয়া যেত প্রচুর। অবশ্য, সবাই যে পাম্প বসাতে পারত, তা নয়, কেননা ব্যাপারটা ছিল খরচসাপেক্ষ। পাড়ার বেশির ভাগই জল আসত কুয়ো থেকে। কুয়োর জলটাও ছিল বেশ মিষ্টি। সেই তুলনায় পাম্পের বা কলের জল বিস্বাদ।

দুল্লা জেলে ভোর হওয়ার আগেই মোষ ছেড়ে দিত। দুপুরের দিকে করত কুয়োতলার কাজ। সন্ধ্যেবেলাতেও ঘণ্টা দুয়েক মোষ জোতা থাকত। কিংবা, ছাগল চরিয়ে আনত দুল্লা। শীত গ্রীষ্ম বর্ষা, সকাল-সন্ধ্যে এই ছিল দুল্লার নিত্যদিনের কাজ। দুল্লার বউ মারা গেছে বেশ কয়েক বছর আগে। একটিই ছেলে: রাজ্জব। বয়েস সাত আট। চেহারাটা দুল্লার মতোই। বেশ মজবুত গড়ন। দুল্লার ঘরে একটি মোষ সব সময়ই থাকত। রুটি-টুটি নিজেই বানিয়ে নিত। বাড়িতে পেষাই করা আটায় দিব্যি চলে যেত। ফসল কাটার সময় ভূসির টিন ভর্তি হয়ে যেত। ছেলে রাজ্জবকে কুয়োতলায় নিয়ে গিয়ে, দুল্লা গায়ে ভাল করে তেল মেখে, প্রচুর ডন-বৈঠক মারত। ছেলেকেও তালিম দিত। বড় হয়ে সে বিরাট এক পালোয়ান হবে, এই রকম একটা আশা ছিল দুল্লার। গ্রামের সবাই এক ডাকে দুল্লাকে চিনত।

দুল্লা আর দ্বিতীয়বার বিয়ে করেনি। আশপাশের গ্রামগঞ্জে হিন্দু জেলে অনেক থাকলেও, মুসলমান জেলের সংখ্যা ছিল কম। তা-ও, কোনও-কোনও গাঁয়ে। রাজ্জব যখন দু বছরের, তখনই তার মা মারা যায়। রাজ্জবের দিদিমা তখন তাকে নিয়ে যায়। ছেলের বয়েস চার-পাঁচ হতে, দুল্লা তাকে নিয়ে আসে নিজের কাছে। দুলার বয়েস তখন পঁয়ত্রিশ-ছত্রিশ। পাট্টা জোয়ান, কিন্তু থাকত সাধু-সন্ন্যাসীদের মতো। ছোট বেলায় সাধুবাবাদের আখড়ায় যাতায়াত করতে করতে গুরুমুখি ভাষাটা পড়তে শিখেছিল। পনেরো-ষোলো বছর বয়েসেই সে 'বারিশ শাহের সদুপদেশ' যোগাড় করে ফেলে। এরপর থেকেই 'সদুপদেশ'-এর গান পড়া তার অভ্যেস দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। রাজ্জবের মা মারা যাওয়ার পর, সদুপদেশ পড়া ওর কাছে ধর্মশাস্ত্র হয়ে ওঠে। দুপুরের দিকে কুয়োয় নেমে যেত। তারপর, রুটি খেয়ে

খাটিয়াটা টেনে আনত নিমগাছের নিচে। কিছু জিনিসপত্রের ওপর বইটা রেখে, একমনে সে পড়ে যেত। ভরাট গলায় গুনগুনিয়ে উঠত। মনের মধ্যে জমাট আবেগ এইভাবে মুক্ত হতো। কেউ কাছে এলে, তাকেও সে দু-তিন স্তবক শুনিয়ে দিত। তা সে শুনতে চাক, আর নাই চাক।

গাঁয়ের অন্য মেয়ে বউদের মতো হরনামিও এখানে আসত। লাফ-ঝাঁপ দিত। সারা শরীরটা টলটল করে উঠত মেঘলা দিনে বিদ্যুতের চিক্‌কুরের মতো। কখনও-কখনও দুল্লাকে কাঁকে ঘড়াটা তুলে দেওয়ার জন্যে বলত। ফাঁকে ফাঁকে হালকা ইয়ারকি মারত। ব্যাপারটা অন্য কেউ জানত না। প্রথমদিকে, দুল্লাও বিশেষ গুরুত্ব দিত না। ভাবত, মেয়েরা এমনিই হয়। পাখির মতো। বয়েসের ধর্ম। তবুও, মেয়েদের কথা মনে পড়লেই দুল্লার শরীরটা কেমন যেন তেতে উঠত। ব্যাস, এরপর দুল্লার আর সাধু-সন্ন্যাসীমার্কা 'পবিত্রজীবন' ভাল লাগল না। ভোরবেলায় দুল্লার ঘরে উনুনের গনগনে আঁচ ঝলসে উঠতে দেখলেই, হরনামি পায়ে-পায়ে বেরিয়ে পড়ত। অসুবিধে হতো না, কেননা দাদা-বউদিরা এই সময় ঘুমোত। হরনামি জলের ঘড়া কাঁকে নিয়ে চলে আসত কুয়োতলায়। কিছুক্ষণ পর দুল্লাও আসত। সেদিন অবশ্য তার ডন-বৈঠক মারা হতো না। ঘড়ার লাইনে রোজই হরনামির ঘড়াটা থাকত সবার আগে। দুল্লার হাঁকডাক হন্ডিয়া গ্রাম ছাড়িয়ে শোনা যেত। ছাগল বের করে, মোষের পিঠের ওপর দড়িদড়া রেখে, রাজ্জবের আগেই দুল্লা কুয়োতলায় পৌঁছে যেত। যাওয়ার আগে সে রাজ্জবকে ঘুম থেকে তুলে দিত। ঘুম থেকে উঠে রাজ্জব প্রথমে, রাতে রাখা দুধটা গরম করে খেয়ে নিত, তারপর পেতলের একটা গেলাসে বাবার জন্যে দুধ নিয়ে কুয়োতলায় পৌঁছে যেত। ওখানে হরনামিকে সবার আগে দেখতে পেয়ে সে মনে-মনে একটু অস্বস্তি বোধ করত। দু চৌবাচ্চা জল ভরে ছাগল ছেড়ে দিত। আর, দুল্লা ততক্ষণে ঘরে এসে পোষা মোষটার দুধ দুয়ে, রুটি বানাতে বসে যেত। রুটি বানাবার পর ফের চলে যেত চৌবাচ্চার কাছে। চৌবাচ্চার জলে ভূসি গুলে দিত, জাব দিত ছাগলগুলোকে।

হরনামি এখন আর আগের মতো লাফঝাঁপ মারে না। কেমন যেন গম্ভীর, চুপচাপ থাকে। সব সময় একমনে কি যেন ভেবে চলে। বছর কুড়ি বয়েস হলো তার। পিসির বিয়ে হ ে য . ে ছ ধিঙ্গড়ে। হন্ডিয়া এলেই হরনামির মা তাকে আর কাছ ছাড়া করতে চায় না। বলে, 'কাজের চাপে একদম বেরোতে পারছি না। তুই হরনামির একটা হিল্লে করে দে—বয়েস তো বাড়ছে।'' কোটে খড়ক সিং গ্রামে পিসির ননদের এক ঘনিষ্ঠ আত্মীয় থাকত। ওখান থেকেই হরনামির সম্বন্ধ এলো। এর ঠিক এক বছরের মধ্যেই তার বিয়েও হয়ে গেল।

হরনামির বিয়ের পর দুল্লার মন খারাপ হয়ে যায়। কোনও কিছুতেই তার আর মন বসে না। কাজ করতে ইচ্ছে করে না। বেলায় ঘুম থেকে উঠে, দুপুরের আগেই মোষ খুলে নেয়। আশপাশের লোক ওর ভাবসাব দেখে অবাক হয়। গাঁয়ের বয়স্ক মহিলারা জিজ্ঞেস করেন, 'দুলে—তোকে ভূতে পেয়েছে নাকী? ঘরে এক ফোঁটা জল নেই, আর তুই কীনা বই মুখে বসে আছিস? কথাবার্তা বলা-ও ছেড়ে দিয়েছিস আজকাল। বলি, এমন করে আর কতদিন চলবে?'

দুল্লার কানে কিন্তু কারও কথা ঢোকে না। বুঝে উঠতে পারে না, তাকে কে কি বলছে। আগে সকালে উঠেই সদুপদেশের বইটা হাতে নিয়ে গুনগুন করে গাইত। এখন, অভ্যেসমতো গুনগুন করে বটে, কিন্তু বইটা আর পড়ে না। মনে হয়, গানের প্রতিটি শব্দের অর্থই তার জানা। শব্দের গভীর অর্থ বুঝে সে কেঁদেও ফেলত। বিকেল বেলায় কুয়োতলা থেকে ফিরেই দুল্লা তার বই নিয়ে বসে যেত। রাজ্জব অবাক হয়ে বাবার দিকে তাকিয়ে থাকত। বাবার কী হয়েছে, বেচারা বুঝে উঠতে পারত না।

বিয়ের পর মাস দুয়েকের মধ্যে হরনামি আর গাঁয়ে আসেনি। তারপর, হঠাৎ একদিন গাঁয়ে আসতে দুল্লার সঙ্গে তার দেখা হয়ে যায়। অপ্রত্যাশিত এই সাক্ষাতে দু জনের মধ্যে যেন বাঁধ-ভাঙা জলের ঢল নামে। ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যেও তাদের আর কথা ফুরোয় না। 'কোটেতে এলেই তো পারো—এখানে বসে অনর্থক মন খারাপ করা কেন?' হরনামির কথায় দুল্লার ভয় করে। অজানা অচেনা গাঁয়ে যদি কোনও বিপদে পড়ে? ভিন গাঁয়ের জাঠেরা তো ওকে কেটে পুঁতে দেবে। 'আরে না, না,' হরনামি অভয় দেয়, 'আমার শ্বশুর খুব মাথা ঠাণ্ডা লোক। বর একেবারে মাটির মানুষ। দুনিয়ার কোনও খবর রাখে না। দু-তিন মাস অন্তর তুমি আমার ওখানে চলে এসো।' স্বামীকে যে ভাল লাগে না, হরনামি তাও বুঝিয়ে দেয়। এইসব বলে দিন ছয়েক হভিয়ায় থেকে সে চলে যায়।

হরনামি যাওয়ার পর দুল্লা ফের মনমরা হয়ে পড়ে। কুয়োর কাজকর্ম ছেড়ে দিলে গ্রামের লোক ছেড়ে কথা বলবে না। একদিনেই শায়েস্তা করে দেবে। রাজ্জব এখনও ঠিক মতো ছাগল চরাতে শেখেনি। তা না হলে, সব ছেড়ে-ছুড়ে সে ঠিক পাখির মতো উড়ে যেত কোটে খড়ক সিং গ্রামে হরনামির কাছে। কিন্তু, তা-তো আর সম্ভব নয়। হরনামি গেছে আজ দু মাস হলো। একদিন রাত্রে, দুল্লা ছেলেকে জানায় পরের দিন সকালের ট্রেন ধরে তাকে এক জায়গায় যেতে হবে, 'লোকে জিজ্ঞেস করলে বলিস, বাবা জরুরি কাজে এক আত্মীয়ের বাড়িতে গেছে।' ফাগুন মাস। খেতে নতুন টাটকা গমের ফসল টলমল করে। রাত পেরোবার আগেই, দুল্লা বিছানা ছেড়ে উঠে পড়ে। অন্ধকার থাকতে-থাকতেই স্টেশনে পৌঁছে যায়। ট্রেন আসতে আরও আধ ঘণ্টা। স্টেশনের এক কোণে দুল্লা চুপচাপ বসে পড়ে। ইচ্ছে করেই সে কাক-ভোরে এসেছে, যাতে গাঁয়ের কেউ না জানতে পারে সে বাড়ি নেই। সূর্য ওঠার সঙ্গে-সঙ্গে ট্রেন আসে। দুল্লা উঠে পড়ে। রামপুরফুলায় নেমে সে বাজারের দিকে হাঁটা দেয়। বাজার থেকেই একটা টাঙ্গা নেয় সে। অন্য যাত্রীদের মুখের দিকে তাকায় না। ফুলে এসে টাঙ্গা থামতে কিছু যাত্রী নেমে যায়, কিছু ওঠে। যে যার পথ ধরে। এখান থেকে কোটে খড়ক সিং ঘন্টা দেড়-দুইয়ের পথ। দুল্লা গরম চারদটা বের করে কান মুখ ঢেকে নেয়। তেল চকচকে লাঠিটায় ভর দিয়ে এগোতে থাকে। রাস্তার ওপরেই পড়ে কলোক গাঁ। এখানে, জলটল খেয়ে, সে কোটের পথটা জেনে নেয়। তারপর হাঁটতে থাকে। এগারোটা-বারোটা নাগাত সে কোটে পৌঁছে যায়।

হরনামির শ্বশুর রুটি খেয়ে বারান্দায় বসে। গিন্দর সূর্য ওঠার আগেই খেতে গিয়ে জল দিতে লেগেছে। হরনামিও খেতে যাবে রুটি দিয়ে আসতে। লোকজনকে জিজ্ঞেস করতে-করতে দুল্লা এসে পৌঁছয়। হরনামি ওকে দেখে বেজায় খুশি। কিন্তু, কি করবে ঠিক পরে উঠতে পারে না। দুল্লাকে সে তাড়াতাড়ি ভেতরে ডেকে এনে খাট পেতে বসতে দেয়।

নিজেও বসে তার পাশে। কথা বলতে-বলতে হরনামি কখনও হেসে ওঠে, কখনও উদাস বিষন্ন হয়ে যায়। চুপচাপ হয়ে পরস্পরের দিকে তাকিয়ে থাকে। বহু কথা জমা হয়ে আছে। কোনও কথাই যে শেষ হয় না। হতে চায় না। একটি কথাই ওরা বলে, দু জনে দুজনের কাছে আজীবন থাকতে চায়।

বেলা গড়িয়ে যায়। হরনামির এখনও খাওয়াদাওয়া হয় নি। দু তিনটে রুটি অবশ্য আলাদা করে রাখা আছে। উনুনে আঁচও আছে। দু তিন মুঠো আটা মেখে, হরনামি চটপট কয়েকটা রুটি বানিয়ে ফেলে। এক ফাঁকে মুদির দোকান থেকে একটু চিনিও কিনে আনে। বারান্দায় দুল্লাকে বসিয়ে রুটি খেতে দেয়। ডাল চিনি দিশি ঘি—কিছুই বাদ যায় না।

রুটি খাওয়ার পর দুল্লা বারান্দায় আড় করে রাখা খাটটা টেনে নেয়। হরনামি রুটি নিয়ে চলে যায় খেতে। যাওয়ার সময় কেহরকে বলে, 'হিন্ডিয়া থেকে এসেছে। আমার বাড়ির লোক। তোমরা কথাবার্তা বলো। একা-একা বসে থাকতে বেচারার ভাল লাগবে না। ফুলে—একটা কাজে এসেছে। রুটি খাওয়া হয়ে গেছে—একটু জিরিয়েই চলে যাবে।' খেতে এসে হরনামি গিন্দরকেও ওই একই কথা বলে। গিন্দরের রুটি খাওয়া হয়ে গেলে সে নিজেও রুটি খেয়ে নেয়।

ঘণ্টা খানেক কেহরের সঙ্গে কথা বলার পর দুল্লাও উঠে পড়ে। কেহর খুশি হয়ে বলে, 'তুমি এসে ভালই করেছ, ভাই। ওখানকার খোঁজখবর পাওয়া গেল। অনেকদিন হরনামি ওর মা বাবার খবর পায়নি। আরে বাবা, কথায় বলে না, গাঁয়ের চেনা কুকুর দেখলেও লোক খুশি হয়—আর তুমি তো মানুষ! যখনই এদিকে আসবে, এখান থেকে ঘুরে যেও—ভাই।'

চার

ঝান্ডা আর অর্জুন — দুই ভাই। ঝান্ডা বড়। অর্জুন ঝান্ডা থেকে দশ বছরের ছোট। বিবাহিত ঝান্ডার দুই ছেলে, এক মেয়ে। দুই ভাইয়ের জমির পরিমাণ বিশ বিঘা। অর্থাৎ, এক এক ভাইয়ের দশ বিঘে করে। এত জমি থাকলে বিয়ে সম্বন্ধ সহজেই আসে। তবুও, অর্জুনের বিয়ে হয়নি। কেননা, ওর চালচলনটাই ছিল খাপছাড়া, বাউণ্ডুলে। ছোট থেকে সে মা'র আদরের গোপাল। মা তাকে কোনও কাজকর্ম করতে দিত না। খেতেও দিত ঝান্ডার চেয়ে বেশি। বাইরে, অর্জুন কোনও ঝগড়াঝাঁটি মারপিট করে এলে, বুড়ি চুটিয়ে গালাগাল দিত সবাইকে। ফলে অচিরেই অর্জুন আদরে বাঁদর হয়ে ওঠে। চোদ্দ-পনেরো বছর বয়েসেও সে মোষ নিয়ে খেতে যেত না। আড্ডায় বসে তাস পিটিত মনের সুখে। বাবা নেই। বুড়িই সব। ঘরদোর খেতখামারের কাজ ঝান্ডাকেই করতে হতো। বিচক্ষণ এবং কর্মঠ হিসেবে ঝান্ডার পরিচিত ছিল। কোনওদিন কারও সঙ্গে তার ঝগড়াঝাটি বা মনোমালিন্য হতো না।

আর একটু বড় হয়ে অর্জুন এক সাধুর আড্ডায় যাতায়াত শুরু করে দেয়। সাধুজি তো তাকে একেবারে পুষ্যি বানিয়ে খেলে। অর্জুন লোকের বাড়ি-বাড়ি গিয়ে সাধুর জন্যে

দুধ সংগ্রহ করে আনত। আর, লোকের বাড়িতেও তখন দুধ ছিল অঢেল। কাজেই দুধ পেতে অসুবিধে হতো না। কিন্তু, সাধুজির আড্ডায় দুধের স্বাদ ছিল ভিন্ন রকম। যে-সব বাড়ি দুধ দিত, সঙ্গে তারা প্যাড়াও দিত। সকালে গুরুশিষ্য মনের সুখে দুধ খেত। এছাড়া, রুটি মাখনও পাওয়া যেত। অর্জুন সারা দিনই সাধুর আড্ডায় পড়ে থাকত।

একবার সাধুর আড্ডায় এসে হাজির হয় জনা তিন-চার পালোয়ান। তাদের কথাবার্তা চালচলন অর্জুনের বেশ ভাল লাগে। ব্যাস, অর্জুন এবার ল্যাঙট-জাঙ্গিয়া নিয়ে পালোয়ানদের সঙ্গ নেয়। মাস ছয়েক তাদের সঙ্গে ঘুরে বেড়ায়। কুস্তির নেশা তাকে পেয়ে বসে। ঘোরা ফেরার ফাঁকে, এক-এক সময় সে গ্রামে এসে কিছুদিন থেকে যায়। মা এই সময় ছেলেকে সের দুয়েক করে দুধ, আর সকালে গরম ঘি-দুধ খাওয়াত আদর করে। এইসব খেয়ে, ঠিক পালোয়ানদের মতোই অর্জুন কষে ডন বৈঠক মেরে যায়। দেখতে-দেখতে তার চেহারাটাও তাগড়া হয়ে ওঠে। চওড়া বুক কাঁধ কবজি—সরু কোমর। সমবয়সীদের সে ইয়া-ইয়া মাংসপেশি দেখায়।

মা'র মনে মনে ইচ্ছে অর্জুন বিয়ে থা করে ঘর সংসারি হোক। দু একটা সম্বন্ধও আসে। মা তো ছেলের হয়ে সাতকাহন গুণপনা ব্যাখ্যা করে। কিন্তু, শেষ অবধি কথাবার্তা মাঝপথে এসে থেমে যায়। কেননা, ঝান্ডা ঠিক সময় একটা ভাংচি দিয়ে বসে। সরল মুখ চোখ করে, হেসে-হেসে বলে, 'আরে—আমার ভাইতো এখনও ছেলেমানুষ! কখন সাধু সন্ন্যাসী হয়ে যায় ঠিক নেই। কাজকর্ম? হরি হরি! কিস্যু করে না। ওর হাতে মেয়ে দেওয়া মানেই মেয়েকে জলে ফেলে দেওয়া! এই তো গেল পালোয়ানদের সঙ্গে—গতমাস অবধি কোনও পাত্তা নেই বাবুর! আবার ফিরে এসে আমার কাছেই কাঁদুনি গাইতে বসবে, বলবে কী ভুলই না করেছে! .... এই সব বলে দিলাম ভাই হক কথা— এবার আপনি যা ভাল বুঝবেন.... না, না, আমার তরফে কোনও আপত্তি নেই। আপনি বরং অর্জুনের সঙ্গে আর একবার কথা বলে নিন। মাকেও জিজ্ঞেস করে নিন। মার ওপরই তো সব ভার—' এই সব কথা শোনার পর, স্বভাবতই, কথাবার্তা মাঝপথে থেমে যায়। পাত্রীপক্ষ ঘাবড়ে যায়। মার সঙ্গে আর কেউই কথা বলতে যায় না। অর্জুন যথারীতি নির্বিকার থাকে।

বাইরে অনেকদিন থাকার পর, অর্জুন ঘরে এলেই বউদির সঙ্গে তার খুনসুটি, বেশ মিঠেকড়া খুনসুটি চলে। বউদি খোঁচা মেরে বলে, 'ঘরে থাকতে মন নেই। থাকবেই বা কেন? বাউন্ডুলেদের মত—'

অর্জুন হাসে। জবাব দেয় না। একটি ইঙ্গিতপূর্ণ রসিকতার জবাবে শুধু বলে, 'এইখানেই তো ঘুরে-ফিরে আসি। তুমিই তো আমার পায়ে বেড়ি পরিয়ে রেখেছ।'

'বটে!'

বউদি দেওরের মধ্যে আদিরস বিনিময় এইভাবেই চলে। শেষ অবধি দেখা যায়, বউদি যথার্থই অর্জুনের পায়ে বেড়ি পরিয়ে দিয়েছে। কেননা, ওই দিনই মা মারা যায়। মা মারা যাওয়ার পরই অর্জুন বাইরে যাওয়া ছেড়ে দেয়। পালোয়ানি নেশাটা অদৃশ্য হয়ে যায়। সাধুজির আড্ডায় যায় কালেভদ্রে। সারাদিনই খেতে ঘুরে বেড়ায়। কোনও কাজকর্ম অবিশ্যি করে না। বউদিই ওকে আগলে রাখে সারাক্ষণ। যা চায়, তাই দেয়। খাওয়াদাওয়ার কোনও ত্রুটি নেই। ঝান্ডা কোনও কাজ দিলে, ঝান্ডার বউ বাধা দেয়, 'আক্কেলের মাথা খেয়েছ

নাকী? ও বেচারা এসব কাজ আগে কখনও করেছে যে, এখন করবে? বলি, কোন কাজ শিখিয়েছ ওকে?'

'হুঁ! আরে, আমি তো ওকে কাজ শেখাবারই চেষ্টা করছি। লাঙ্গল ধরাটা শিখুক—রান্নাঘরে বসে তোমার সঙ্গে গালগল্প না করে—খেতে রুটি আনুক, মোষ চরাক, ঘাসের গাঁটরি বাঁধুক—তবেই না কাজ শিখবে? শরীরটাতে আর ক্ষয়ে যাবে না তাতে!' ঝান্ডা গজগজ করে।

অর্জুন এমনিতে খুবই মেজাজি। মনে যা আসে, তাই করে। ইচ্ছে হলো না তো, করল না। ঝান্ডা ওকে ঠিক ধমকাতে পারে না। একটু জোর গলায় কিছু বললেই , অর্জুন সটান চলে যায় সাধুজির আড্ডায়। ঝান্ডার বউ বুঝিয়ে-সুঝিয়ে আবার ফিরিয়ে আনে।

ঝান্ডার ছেলেই একদিন খবরটা দেয়। অর্জুন গিন্দরদের বাইরের ঘরে বসে একটা লোকের সঙ্গে মদ খাচ্ছে। সেদিন মদ খেয়ে বাড়ি ফিরতে, বউদি রুটি দিয়ে নিঃশব্দে তাকিয়ে থাকে। অর্জুনও চুপচাপ রুটি খেয়ে যায়। মুখে কিছু বলে না। চোখও তোলে না। ঝান্ডা ব্যাপারটা লক্ষ করে সরে যায়। বাইরে এসে গোরু-ছাগলের জাব বানাতে বসে। অর্জুন খাওয়া শেষ হলে, খাটিয়া টেনে শুয়ে পড়ে। ঝান্ডার ছেলেও 'চাচা, চাচা' বলে ওর পাশে গিয়ে শোয়। জিজ্ঞেস করে, 'চাচা—ঘুমিয়ে পড়লে নাকী?'

ঝান্ডা আর তার বউ বান্তি এ নিয়ে কোনও কথা বলে না। বলে কী হবে—বোঝাই তো যাচ্ছে অর্জুন মদ টেনে এসেছে।

গিন্দরের বাইরের ঘরে অর্জুন যার সঙ্গে মদ খেয়েছে, সে প্রীতম। গিন্দরদের পড়শি। নন্দ কৌরের স্বামী। এই নন্দর সঙ্গেই হরনামি একেবারে হলায়-গলায়। একসঙ্গে ওঠা বসা। হরনামির সঙ্গে প্রীতমের হাসি মস্‌করা চলছিল, যেমন চলে বউদি-দেওরের মধ্যে। অনেক কথার জবাব প্রীতম ঠিকমতো দিতে গিয়েও থেমে গেছে—সামনে বউ থাকার ফলে। বাধ্য হয়ে সংযত থাকতে হয়েছে।

গিন্দর তো মদই খায় না। সেদিন আবার বাড়িতেও ছিল না। পড়শি হিসেবে প্রীতম গিন্দরদের আপনজনের মতোই। প্রীতম ও অর্জুন ছেলেবেলার বন্ধু। একসঙ্গে খেলাধুলো করে ঝগড়াঝাটি করে বড় হয়েছে। কিন্তু, বন্ধুত্ব কোনও দিন নষ্ট হয়নি। একটু বড় হয়ে লুকিয়ে-চুরিয়ে নেশাও করত। মদ খেয়ে গুড় চেটে, মুখের দুর্গন্ধ মারত। নেশার ব্যাপারটা অবশ্য চট করে কেউ টের পেত না। প্রীতম বিয়ে-ও করে যথাসময়ে। কিন্তু, বিয়ের পরও ওদের বন্ধুত্ব অক্ষুণ্ণ থেকে যায়। এক সঙ্গে বসলেই মদ চলত। তবে, প্রীতমের সঙ্গে বসে নেশা করলে, সেই রাতে অর্জুন আর বাড়ি যেত না। অর্জুনের মা তখনও বেঁচে। তারপর, দাদা-বউদির হেফাজতে থাকার সময়ে অর্জুন ব্যাপারটা দিব্যি গোপন রাখত। কিন্তু, সেদিন কি মনে হতে, সে ঠিক করে ফেলে, মদ খেয়েই বাড়ি ফিরবে। যথারীতি রুটি খেয়ে শুয়ে পড়বে। দাদাকে এত ভয় করার কি আছে? বউদির জন্যেই বা লজ্জা করতে যাবে কেন?

গিন্দরের বাড়িতে সেদিন চাষবাসের কথা নিয়েই কথাবার্তা শুরু হয়। প্রীতম হঠাৎ নিজের বউকে নিয়ে সরস মন্তব্য করে বসে। এই জাতীয় কথাবার্তা অর্জুনের ভালই লাগত। প্রীতম নন্দ-প্রসঙ্গে কথা বলতে বলতে এক সময় হরনামি-প্রসঙ্গ আনে। 'যাই বল অর্জুন—কপাল আমাদের গিন্দরের। মালটা যা খাসা পেয়েছে মাইরি! শালীর চোখ দেখলে

কল্‌জে উপড়ে যায়— চোখ দিয়েই বুকের মধ্যে একদম চাকু চালিয়ে দেয়। আর কথাও বলে শালী ফটাফট—মুখে কিছু আটকায় না!'

'তা, আমার সঙ্গে একটু কথা বলিয়ে দে না— দেখব কেমন বোল্ ফোটে।' অর্জুন ঈষৎ জড়ানো গলায় বলে।

'এই কথা! তা হলে আসিস একদিন আমার বাড়ি। একটু মালও টানা যাবে—'

'তোর বাড়ি কেন?'

'কেননা, আমার বউ, মানে নন্দর সঙ্গে হরনামির দারুণ ভাব।'

'নন্দ যদি তোকে কিছু বলে?'

'দ্যুৎ! নন্দ আবার কী বলবে? তুইতো স্রেফ চোখের দেখা দেখবি, আর হয়তো দু-চারটে কথা। এতে নন্দ আপত্তি করবে কেন?'

'অজানা অচেনা লোকের সঙ্গে হরনামি কথা বলে?'

'নিশ্চয়ই বলবে!'

'তুই বলে দেখেছিস?'

'আমি? না। তুইতো জানিস ভাই—আমি একটু ভীতু লোক। আমার ঠিক সাহস হয় না। কোন কথায় কোন ঝামেলায় পড়ে যাই। তাছাড়া, আমার দরকারই বা কী? বেঁচে থাক আমার নন্দরানী!'

'ঠিক আছে। তাহলে আমার সঙ্গে কথা বলিয়ে দিবি।' অর্জুন উবু হয়ে বসে সোৎসাহে।

'আরে, ঠিক হয়ে বস্। তুই তো এমন করছিস যে, যেন কেউ তোকে এক ড্যালা গুড় খাইয়ে দিয়েছে! আরে বাপু, এসব কাজ কী এতো চট করে হয়? আমাকে একটু চেষ্টা চরিত্তির করতে হবে না?'

সেইদিনই, গিন্দরের ঘরে বসে মদ খেতে-খেতে দুই বন্ধু হরনামি সম্পর্কে আরও কিছু আলোচনা করে। প্রীতমই অর্জুনকে তাতিয়ে দেয়, উসকে দেয়।

পরের দিন বেলা দশটায় অর্জুনের ঘুম ভাঙে। চায়ের জন্যে মনটা আনচান করে ওঠে। একটু জোর গলায় ভাইপো হরদিৎ-কে সে ডাকে। হরদিৎ অনেক আগেই চা খেয়ে বেরিয়ে গেছে। বন্ধুদের সঙ্গে সে এখন খেলছে। অর্জুন আর একবার ডাকে। জবাব দেয় ঝান্ডার বউ বান্তি। 'যাক—এতক্ষণে ঘুম ভাঙল—এখন কী চাই, বলো দেখি।'

'চা।' মাথাটা চেপে ধরে সে খাটিয়ার ওপর বসে।

'দু মিনিট সবুর করো। মোষের ভূসিটা মেখে চা বানিয়ে দিচ্ছি—'

বান্তি কাছে এসে ওর মাথায় হাত দেয়। চুলে বিলি কাটে। ঘাড়ের ওপর আঙুল বোলায়।

পাঁচ

সেদিন সন্ধ্যেবেলায় অর্জুন বাইরে বেরিয়েই এক পাঁইট মদ কেনে। স্বাদ বোঝার জন্যে কয়েক ঢোক খেয়ে দেখে। ভালই, খেতে বেশ লাগে। অর্জুন আর কয়েক ঢোক খায়। তারপর, বোতলটা সযত্নে কাপড়ে বেঁধে প্রীতমদের বাড়ির দিকে এগোয়। প্রীতম সবে খেত থেকে ফিরেছে। গরম জলে হাত পা ধুচ্ছিল। পোষ মাসের ঠান্ডা। হাড় একেবারে জমিয়ে দেয়। কিছুদিন আগেই দেওয়ালি হয়ে গেছে। গমের ফসল দিব্যি মাথা চাড়া দিয়েছে। খেতে এখন জল দেওয়া আর মাটি ঠিক করা ছাড়া আর কোনও বিশেষ কাজ নেই। বিকেলে চা খাওয়ার সময়ই মাটি ঠিক করার কাজ হয়ে গেছে। ভূসির একটা ছোট বস্তা আর কিছু কাঠ নিয়ে সে বাড়ি ফিরে এসেছে।

অর্জুন দরজার গোড়ায় এসে দাঁড়ায়। গলা খাঁকারি দিয়ে ইশারা করে। প্রীতম ইশারাটা বোঝে। পা ধুতে-ধুতেই সে বলে ওঠে, 'আরে অর্জুন যে! ভেতরে চলে আয় সোজা।'

অর্জুন প্রীতমের মাকে জিজ্ঞেস করে, 'তাই—কেমন আছ?'

প্রীতমের মা হেসে জবাব দেয়, 'ভালই। তোরা কেমন আছিস? তা ঘরসংসার কাজকর্ম কিছু করিস? না, সারাদিনই টো-টো করে বেড়াস?'

'বউদির পুরো জল ওই তুলে দেয়, মা!' অর্জুন কিছু বলার আগেই নন্দ বলে ওঠে।

'হিংসে হচ্ছে বুঝি? বললে, তোমার জলও আমি তুলে দিতে পারি। বিনা মাইনেতে কাজ করতে আমার জুড়ি পাবে না, হ্যাঁ। শুধু একটু হুকুম দাও ভাবি-সাহেবা!' অর্জুনের বথার ভঙ্গিতে শ্বাশুড়ি-বউ না হেসে পারে না। শ্বাশুড়ি, বউকে দেওয়ালের সঙ্গে ঠেস দিয়ে রাখা খাটিয়াটা অর্জুনের জন্যে পেতে দিতে বলে। অর্জুন বাধা দেয়, 'না—না। আমরা বরং বৈঠকখানায় বসব। তুমি স্রেফ একটা গেলাস আর এক লোটা জল দিয়ে যাও।'

নন্দ গেলাস আর লোটা বৈঠকখানায় রেখে আসে।

গামছায় মুখ মুছে প্রীতমও বৈঠকখানায় যায়। নন্দর সঙ্গে চোখাচোখি হয়। মা ছেলেকে এক ফাঁকে সতর্ক করে দেয়, 'সাবধান। বুঝেসুঝে চলিস। তোর অনেক দায়িত্ব—'

প্রীতম আমতা-আমতা করে, 'রোজ তো আর আসে না। আজ কীভাবে এসে পড়েছে। আর বোধ হয় আসবে না।' প্রীতম মা-বউকে আশ্বস্ত করার চেষ্টা করে।

প্রীতম বৈঠকখানায় ঢুকতে অর্জুন মন্তব্য করে, 'বউকে খুব ভয় পাস, না? জুতোটুতো পড়ার আগে আমি কেটে পড়ি বাবা!' তেপায়ার ওপর রাখা বোতলটা তুলে অর্জুন সত্যি সত্যি উঠে পড়ে।

'ধ্যুৎ শালা! মা কথাটা এমনি বলেছে ঘরের ব্যাপারে। তোকে কোন শালা কী বলবে রে? নে, নে—বস্।'

দুজনেই এবার মদ ঢালে। বাইরে অন্ধকার। নন্দ একটা লণ্ঠন দিয়ে যায়। ততক্ষণে দু পাত্র মদ সাবাড় হয়ে গেছে। গেলাসে জলের ভাগ কম। মদের ভাগ বেশি। সঙ্গে আম আচারের চাট। অর্জুনের নেশা ক্রমশই চড়তে থাকে। গিন্দরের বউ হরনামির কথা এসে পড়ে। প্রীতম জিজ্ঞেস করে, 'যাবি ওর ওখানে? গিন্দর এতক্ষণে খেত থেকে ফিরে এসেছে।

আমরা গিয়ে গমটমের চাষ নিয়ে কথা পাড়ব—তুই এক ঝলক হরনামিকে দেখে নিতে পারবি।'

দুজনে মিলে আরও খানিকটা মদ খেয়ে গিন্দরের বাড়ি যাবে বলে ঠিক করছে, এমন সময় হরনামিকেই আসতে দেখা যায় প্রীতমদের বাড়িতে। প্রীতম সোল্লাসে বলে ওঠে, 'এতো দেখি মেঘ না চাইতেই জল! নন্দর সঙ্গে গল্পটল্প করবে। নে নে মদটা খেয়ে নে—তুই ওর সঙ্গে কথা বলবি বলেছিলি, না? দেখবি, এখন মজা জমবে কেমন। দেখবি মাইরি— কেমন কথা বলে, কোনও 'ভুরুক্ষেপ' নেই— যা মনে আসে বলে দেয় — হ্যাঁ!'

আরও কিছুটা মদ খেয়ে ওরা উঠে পড়ে। উঠোনের দিকে যায়। চাতালে বসে নন্দ হরনামি আর নন্দর শ্বাশুড়ি গল্পগাছা করছে। ওরা কাছে আসে। প্রীতম মাকে জিজ্ঞেস করে, 'কী হলো, আমাদের দেখে চুপ মেরে গেলে কেন?'

'আমাদের মোষটা — দুবার খুঁজে এলাম, কোথাও পেলাম না। কোথায় যে গেল—' মা একটু চিন্তিতভাবে বলে।

'এই কথা! তা আমরা খুঁজে আনছি। তুমি বরং বৈঠকখানা থেকে আলোটা নিয়ে এসো।'

প্রীতমের মা আলো আনতে যায়। যাওয়ার আগে বলে, 'আরে, তোরা দাঁড়িয়ে রইলি কেন? বস্ বস্।'

'বসব। তার আগে তোমার মোষটা কোথায় গেল দেখে আসি। অর্জুন একটা খবর নিতে এসেছিল। আমি বেরোবো—' প্রীতম অজুহাত দেখায়। কথা বলতে-বলতেই প্রীতম দেওয়ালে ঠ্যাসান-দেওয়া খাটিয়াটা পেতে ফেলে। একটু দুরে সর্ষের তেলের পিদিম জ্বলছে। প্রীতম হরনামিকে রসিকতা করে জিজ্ঞেস করে, 'কী, এতে মুখ ভার কেন?'

'একটু শাক বানিয়ে ছিলাম—তাই এখানে দিতে এসেছি। আমাদের খাওয়া হয়ে গেছে—কিন্তু আমার বর তো এখনও খেত থেকে ফিরল না।' হরনামি জবাব দেয়।

প্রীতম একটু অবাক হয় 'গিন্দর খেতে এখনও কী করছে?'

'গম পুতছে বোধহয়। সব কাজ একদিনেই সেরে আসবে আমার স্বামীরত্ন!'

প্রীতম মোষের খোঁজে বেরিয়ে যায়।

নন্দ মাঝখান থেকে ফোড়ন কাটে, 'অর্জুনের হলো কী? একদম বাঁদরের মতো মুখ করে বসে আছে?'

'এই তোমাদের কথা শুনছি আর কি।' অর্জুন কিছুটা অপ্রস্তুত হয়ে জবাব দেয়।

'বিয়ে থা করো। একা—একা আর কতদিন কাটাবে?' নন্দ একটু গম্ভীরভাবে মতামত দেয়।

'বেঁচে থাকো ভাবি! দিন কাটানো শক্ত নয়, বরং রাত—'

বাকি কথাটা অস্পষ্ট রেখে অর্জুন রসিকতা করে।

'আমাদের একটা চেনা মেয়ে আছে।' নন্দই প্রসঙ্গটা উত্থাপন করে।

'কার কথা বলছ?' অর্জুন জানতে চায়।

'কেন? আমাদের সুরজিতি।'

'কে সুরজিতি?'

'তোমাকে নিয়ে আর পারা যাবে না। আমাদের মুকুন্দকাকির ভাইঝি সুরজিতি। কাকার তো ছেলেমেয়ে নেই, সুরজিতিকেই নিজের মেয়ের মতো মানুষ করেছে। শান্তিকাকি—মানে মুকুন্দকাকি—সুরজিতির বিয়ের জন্যে আমাকে খোঁজখবর নিতে বলেছে।' নন্দ কথাগুলো ব'লে পা ছড়িয়ে বসে।

'চিন্তার কী আছে ভাবি— তুমি কাউকে না কাউকে ঠিক পেয়ে যাবে তোমার সুরজিতির জন্যে।' কথা বলতে বলতে অর্জুন আড়চোখে হরনামিকে দেখে, বলে, 'ভাবি বটে আমার নন্দভাবি! আমার বিয়ের জন্যে একেবারে উঠে পড়ে লেগেছে।'

'লাগবেই তো। দেওর বলে কথা!' হরনামি একবার অর্জুন, একবার নন্দর দিকে তাকায়।

'তাহলে—আমার কথাটা তোমার মনে ধরেছে?' নন্দ কথা এগিয়ে নিতে চায়।

লণ্ঠন হাতে প্রীতমের মা ফিরে আসে ততক্ষণে। লণ্ঠনের আলোয় হরনামি অর্জুনকে ভাল করে দেখে। মুখ লাল, জোয়ান শরীর। চওড়া কাঁধ পিঠ বুক। পেশিবহুল হাত। শরীরটা দেখে হরনামি মনে-মনে লোভী হয়ে ওঠে।

বাড়ি ফেরার সময় হরনামি নন্দকে বলে, 'জাঠ মেয়ের জন্যেই এই ছেলে। লাখে একটা...'

অর্জুন গোঁফে তা দেয়। হরনামিকে পেছন থেকে তারিয়ে-তারিয়ে দেখে বৈঠকখানায় গিয়ে আবার মদে চুমুক দেয়। প্রীতম ততক্ষণে হারানো মোষ খুঁজে আনে। দুধের বালতি ওপরে রেখে এসে নন্দকে জিজ্ঞেস করে, 'কী কথাবার্তা হলো তোমাদের?'

'মুকুন্দকাকির ভাইঝি সুরজিতি—ওর কথাটা তুলেছিলাম।'

'অর্জুন কী বলল?'

'স্পষ্ট করে কিছু বলল না। মনের ভাব ঠিক আঁচ করতে পারলাম না।'

প্রীতমের মা হাসে নন্দর কথায়: 'তোদের বুদ্ধিসুদ্ধি হতে দেরি আছে। আমি বলি শোন, আসল ব্যাপারটা হলো ওর বউদিই ওকে বিয়ে করতে দেবে না!'

'কেন, মা?'

'বান্তিকে কে না জানে? বিশ বিঘে জমি নিজের কবজায় রেখে দিয়েছে। সারা জীবন এইভাবেই কাটিয়ে যাবে।'

শাশুড়ির কথাগুলি হেঁয়ালির মতো শোনায়। নন্দ ব্যাপারটা ঠিক বুঝে উঠতে পারে না। শাশুড়ি বুঝিয়ে দেয় :

'এই ছেলের এ্যদ্দিনে বিয়ে হলো না কেন? দশ বিঘে জমির সে মালিক। কম করেও গোটা আট দশটা সম্বন্ধ এসেছে, কিন্তু কথা এগোয়নি। মানেটা তাহলে দাঁড়াল, হয় বান্তি ভাংচি দেয়, নয় ঝান্ডা। অর্জুন যে এটা বোঝে না, তা নয়। কিন্তু ওর হয়েছে কিল খেয়ে কিল চুরির অবস্থা। চক্ষুলজ্জা বলে তো একটা জিনিস আছে। বান্তি ওকে একেবারে জাদু করে রেখেছে!'

বুড়ি বিস্তারিতভাবে বিষয়টিকে বুঝিয়ে দেয়।

মদ শেষ করে দু জনে আবার গিন্দরের বাড়ি এসে হাজির হয়। আসার আগে, খালি বোতলে জল ঢেলে প্রীতম অর্জুনকে খাইয়ে দিয়েছিল। দরজার কাছে দাঁড়িয়ে সে গিন্দরের নাম ধরে ডাকে। গিন্দরের খাওয়া শেষ হয়ে গিয়েছিল। বাবার সঙ্গে একটা বিষয় নিয়ে কথা কাটাকাটি করছিল। হরনামি উনুনের কাছে বসে বাসন মাজছিল। প্রীতমের ডাক শুনে গিন্দর উঠোনে এসে দাঁড়ায়, 'কে?'

'কে বললে কী আর চিনতে পারবে? তা, গমের চারা পোতার কাজ শেষ হয়েছে?' প্রীতম কথা বলতে-বলতে উঠোনের মধ্যে চলে আসে। একটু আগ্রহ দেখিয়ে বলে, 'কেহর চাচা আছে তো?'

'আরে প্রীতম? এসো, এসো। আমি তো সব সময়েই আছি। একটু আগে গিন্দরকে বলছিলাম আর এক খেপ চারা ফেলতে—আর এক খেপ ফেললে কাজটা চুকে যেত। মোষ জোতা যাচ্ছে না। এক গাদা ঝঞ্ঝাট। কিন্তু যাক, তা হঠাৎ কী মনে করে?'

'এই এলাম আর কি।' ওরা দুজনে কেহরের পাশে বসে পড়ে। বাবার সঙ্গে ওদের কথা বলতে দেখে, গিন্দর মোষের ভুসি মাখতে বসে যায়। ছোলার দানা গুঁড়ো করে। মোষ জাবর কাটতে থাকে। গিন্দর দুধ দুইতে তৈরি হয়।

ছোট একটা তাওয়ায় হরনামি শাক গরম করে। এক চামচ মাখন দেয়। তারপর, একটা লোটা ভর্তি করে জল নিয়ে আসে। কেহর আর প্রীতম তখন গল্পে মশগুল। হরনামি লোটাটা খাটিয়ার একটু নিচে রাখার সময়, অর্জুন ওর হাতের ওপর নিজের হাত রাখে। হরনামি কিছু বলে না। শুধু যাওয়ার সময়, লোটার জলে আঙুল ডুবিয়ে অর্জুনের মুখে একটু জল ছিটিয়ে যায়।

কথা বলতে-বলতে দুজনেরই শাক খাওয়া হয়ে যায়। জলে হাতও দেয় না। প্রীতমের বোতলে জল ছিল গিন্দরকে বোকা বানাবার জন্যে, কেননা গিন্দর মদ খায় না। তবে, এই নাটকের দরকার হলো না। কেননা, গিন্দর আর এদিকে আসেনি। এরা উঠোন পার হতে, গিন্দর জিজ্ঞেস করে, 'চললে?'

'হ্যাঁ। না গিয়ে আর উপায় কী? তুমি তো কথাই বললে না। স্রেফ কাজ করে গেলে।' প্রীতম খোঁচা দিয়ে কথা বলে।

'কাজ আর কাজ! একটু আগেই খেত থেকে ফিরে এখন দুইতে বসেছে!' হরনামি গিন্দরের হয়ে জবাব দেয়।

'কেন, তুমি মোষ দুইতে পার না?' প্রীতম পাল্টা প্রশ্ন করে।

'আমি তো আগে কোনও দিন দুইতে—' হরনামি হেসে ফেলে।

'সে কী! জাঠেদের মেয়ে দুধ দুইতে জানে না!' প্রীতম যেতে-যেতে বলে ওঠে।

ছয়

রাতে শাশুড়ি বউয়ের মধ্যে কোনও কথা হয় না। সকালে প্রীতম বৈঠকখানা থেকে বেরোতেই, মা-বউ. একেবারে ঝাঁপিয়ে পড়ে। নন্দ বলে ওঠে, 'বলি, আক্কেলের মাথা খেয়েছ নাকী? অর্জুন বেকার বাউণ্ডুলে চালচুলোর ঠিক নেই— তুমি রোজ মদ গিলছ ওই হতচ্ছাড়ার সঙ্গে?'

মা প্রশ্ন করে, 'মদ খেয়ে গিন্দরদের বাড়ি তোরা কোন মতলবে ধাওয়া করেছিলি? এটা তো ভাল কথা নয়, বাপু।'

নন্দ আর এক পর্দা গলা তোলে. 'ফের যদি আপদটা এ বাড়িতে আসে—'

মা ছেলেকে বোঝায়, 'দেখ, যারা জঙ্গলে থাকে, তাদেরও মানইজ্জত বলে একটা ব্যাপার আছে। তুই সাদাসিধে লোক। অর্জুন কেন গিন্দরদের বাড়ি তোকে নিয়ে গেল, তা বোঝার সাধ্যি তোর নেই। তোকে টেনে নিয়ে গেল, আর তুইও চললি। মাতলামো করলে তো, তোর-ও মানইজ্জত যেত—এটা বুঝলি না? তারপর, বাড়িতে ঢুকে তোকে যেভাবে মদ খাওয়ালো, তোকে দিয়ে কোন কাজ হাসিল করাবে কে জানে! ওর আর কি — ছাড়া গোরু! বুঝে-সুঝে চল এখনও। কোন বিপদে পড়বি কখন—'

মা বউয়ের যৌথ আক্রমণে প্রীতম ফাঁপরে পড়ে। বোঝে, মদ খেয়ে অর্জুনকে গিন্দরদের বাড়ি নিয়ে যাওয়াটা ঠিক হয়নি। আর এতে ওর লাভই বা কী? অর্জুন বন্ধুই থাকুক। প্রীতম মনে মনে ঠিক করে, না—আর অর্জুনের সঙ্গে বাড়িতে বসে মদ খাবে না। হরনামির কথাও তুলবে না আর। হরনামির নাম শুনলে অর্জুন ঠিক থাকতে পারে না। গতকাল হরনামির কথা না তুললে, এই ঝককি আর পোয়াতে হতো না। পাড়াপড়শির ব্যাপারটা আর, অর্জুন-হরনামি ঘনিষ্ঠ হলে, ওর লাভটাই বা কী? সেদিন গিন্দরের ঘরে বসে, মদের নেশায় প্রীতমও হরনামি সম্পর্কে ইয়ারকি মেরেছে। কিন্তু গতকাল রাতে অর্জুনকে নিয়ে যাওয়াটা ঠিক হয়নি। খুব ভুল হয়ে গেছে। হরনামি যেমন মেয়েই হোক, গিন্দর আর গিন্দরের বুড়ো বাপ কেহরের কথাটা তার ভাবা উচিত ছিল। ছিঃ ছিঃ, মদ টেনে ওদের বাড়ি যাওয়ার কথাটা লোকে শুনলে কী বলবে? নিজের বাড়ির লোকও তো ছেড়ে কথা বলেনি। কেহর চাচাও একদিন না একদিন কিছু একটা বলবে। হয়তো, স্পষ্ট করে বলবে না। না, অর্জুনকে আর বাড়িতে আনা নয়। বরং, বাইরেই দেখাসাক্ষাৎ করবে। দূরত্ব বজায় রেখে চলতে হবে। সাফ-সাফ বলে দেবে, 'তোমার ব্যাপারস্যাপারে আমাকে জড়াবে না। আমি গরিব মানুষ। মাঝখানে থেকে জানটা দিতে পারব না, বাপু।' প্রীতম ঠিক করে, অর্জুনকে বুঝিয়ে বলতে হবে, যেন হরনামির ফাঁদে পা না দেয়। মালফাল টেনে একদিন গেছ। ব্যাস, ওই পর্যন্তই। আর এগোনো ঠিক হবে না। কিন্তু, প্রীতম এসব ভেবে কী করবে? সে তো আর গত রাতে, অর্জুনের মুখে হরনামির জলের ছিটে দেওয়াটা লক্ষ করেনি। লক্ষ করলে আঁচ করতে পারত দুজনের মধ্যে কোন ইশারা চালাচালি হয়ে গেছে।

তিন চারদিন পর অর্জুনের সঙ্গে প্রীতমের দেখা হয়। চৌপালে বসে দু-চারজন রোদ পোয়াচ্ছে। তাদের মধ্যে বসে প্রীতম কাগজ পড়া শুনছে। কাগজ পড়ে মিলখা সিং। তার পড়াশোনা চার ক্লাস অবধি। তারপর, ফৌজি হয়ে এখন পেনশনে আছে। মিলখা উর্দু

কাগজ পড়ে বিশ্বযুদ্ধের খবর শোনায়। ভারতের সব গ্রামেই এখন হিটলার চার্চিল পরিচিত নাম। পাঞ্জাবের অনেক জোয়ান এখন ফৌজিতে। বিদেশের মাটিতে লড়াই করছে। নানা দেশের লড়াইয়ের খবরে কাগজ ভর্তি। গাঁয়ের মানুষ চৌপালে বসে সেইসব খবর একমনে শুনে যায়। রামপুরামন্ডিতে একজন কাগজ আনে। মিলখা আবার তার কাছ থেকে কাগজটা আনায়।

প্রীতম দূর থেকে অর্জুনকে আসতে দেখে। দেখেই উঠে যায়, একান্তে গিয়ে সব কিছু বলে। 'বাড়িতে কেলেংকারি অবস্থা! বড় অশান্তি হচ্ছে ভাই—কিছু মনে করিস না—'

অর্জুন একটু চুপ করে থাকে। তারপর জবাব দেয়, 'না, না—এতে মনে করার কী আছে? তোর বাড়িতে আর মাল খেতে যাব না। আমার জন্যে তোকে ঝক্কি পোয়াতে হবে — তোর মা-বউ কষ্ট পাবে—এ আমি হতে দেব না!'

'ব্যাস, রেগে গেলি তো?'

'ধ্যুৎ! রাগব কেন?' অর্জুন হাসে, 'সেদিন নেশার ঘোরে একটু বাড়াবাড়ি হয়ে গিয়েছিল। কেন যে ফালতু গিন্দরদের ওখানে গেলাম। আমি তো সেদিন থেকেই কথাটা ভেবে যাচ্ছি।'

কথাবার্তা শেষ করে প্রীতম আবার ফিরে আসে খবর পড়া শুনতে। অর্জুনকে দেখে মিলখা খবর পড়া থামায়। তাকে দেখে এক নজর। তারপর বলে, 'দেখছিস—আমাদের ছেলেরা কেমন লড়ে যাচ্ছে? শত্রুদের একদম নাকানিচোবানি খাওয়াচ্ছে!'

'শত্রু কারা?' অর্জুন প্রশ্ন করে।

'তুই কিস্যু বুঝিস না!' মিলখা ব্যাখ্যা করে, 'আরে বোকা, ইংরেজরা জিতছে। জার্মানদের গো-হারান হারাচ্ছে। জার্মানরাই হলো আমাদের শত্রু।'

'জার্মানরা আমাদের শত্রু হলে, ইংরেজরা কে?' অর্জুন ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারে না।

'এটাও বুঝলি না? আমাদের জোয়ানরা ইংরেজদের হয়ে লড়ছে। ইংরেজদের শত্রু, আমাদের শত্রু!' মিলখা সরলভাবে বুঝিয়ে দেয়।

'কিন্তু চাচা, আমাদের শত্রু তো ইংরেজ। জোর জবরদস্তিতে আমাদের দেশ দখল করে রেখেছে। আমাদের গোলাম করে রেখেছে। আমাদের জোয়ানদেরও তো জবরদস্তি করে ফৌজিতে টেনে নিয়ে যায়।' অর্জুন বেশ স্পষ্টভাবে কথাগুলো বলে। একদিনই সে মিলখার খবর পড়া শুনেছে। তাই শুনেই তার এই ধারণা হয়েছে। মিলখা অর্জুনের কথার জবাব দিতে পারে না। সে অন্য খবর পড়তে শুরু করে।

সেইদিন দুপুরবেলা। প্রীতম কাজে যায়নি। অর্জুনকে তো এমনিই কোনও কাজ করতে হয় না। এখানে-ওখানে ঘুরে বেড়ায়। সাধুজির আড্ডায় যায়। নইলে রাস্তায় ঘুরপাক দিতে দিতে গাঁয়ের নতুন বউদের আড়চোখে দেখে। ডাগর হয়ে ওঠা মেয়েদের লুকিয়েচুরিয়ে লক্ষ করে। অর্জুন গাঁয়ের চৌপালে বসে আড্ডা মারছিল। কিছুক্ষণ গল্পগুজব করে, কি ভেবে বাড়ির দিকে হাঁটা দেয়।

যেতে-যেতে প্রতাপের ছেলের বউ শ্যামির কথাটা মনে পড়ে যায়। মনে-মনে ঠিক করে নেয়, শ্যামিকে হাত করতে হবে। শ্যামিকে হাত করলেই কাজ হয়ে যাবে। পাড়ার ছেলেছোকরাদের জন্যে শ্যামি এই জাতীয় কাজ আগে করেছে, এটা অর্জুন জানে। কেউ অপমান-টপমান করলেও শ্যামি গায়ে মাখে না। আর ওকে হাত করা কঠিন কাজ নয়। মদ আর মাংস খাওয়ালেই হলো। আর নগদ কিছু টাকা। কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে, চা খেয়ে অর্জুন বেরিয়ে পড়ে প্রতাপদের বাড়ির উদ্দেশে।

বুড়ো প্রতাপ আর তার দুই নাতি, এখনও খেত থেকে ফেরেনি। বুড়ি বোধহয় পাড়ার কোনও বাড়িতে গেছে। ঘরে শ্যামি একা। চরকা কাটছিল।

অর্জুন উঠোনে এসে দাঁড়ায়। মনে জোর এনে জানায়: 'সৎশ্রী আকাল! তাই-কে দেখছি না?'

'আরে—অর্জুন ভাই! এসো, এসো। বুড়ি গেছে পাড়া বেড়াতে। দাঁড়াও, পিঁড়ি এনে দিই।' শ্যামি সাদর অর্ভ্যথনা জানায়।

'ছেলেরা কোথায়?' অর্জুন আশপাশটা দেখে নেয়।

'খেত থেকে এখনও ফেরেনি।' শ্যামি চরকাটা সরিয়ে রাখে এক পাশে।

অর্জুন পিঁড়ির ওপর বসে। বলে, 'আমি তোমার ফৌজির খবর নিতে এসেছিলাম। চিঠিপত্র আসেনি?'

'হঠাৎ ফৌজির জন্যে তোমার দরদ উথলে উঠল যে! তা গতকালই চিঠি পেয়েছি।' শ্যামি তীক্ষ্ণ চোখে তাকায়।

'টাকাকড়ি ঠিক মতো পাঠায়, না বাইরেই সব উড়িয়ে দেয়?'

'পাঁচ ছ মাস বাদে-বাদে পঞ্চাশ একশো টাকার মনিঅর্ডার আসে। ছুটিছাটায় এলে অবিশ্যি একসঙ্গে অনেক টাকা আনে। বাজে নেশাটেশা নেই। অন্যদের মতো গাঁয়ে ঢুকেই সারাদিন মদ গিলতে বসে না। দেখেছ, ওকে কোনওদিন মদ খেতে?'

অর্জুন হেসে ফেলে, 'আরে বাবা, কে কত মদ খায় আর খায় না—আমার চেয়ে তুমি বেশি জানো, ভাবি!'

'বটে! তা তুমি কী করে জানলে আমি জানি?'

'সবাই বলে।'

'বললেই হলো? আসলে, যার যা মুখে আসে বলে।'

অর্জুন কথা বাড়াতে চায় না। কাজের কথাটা চটপট বলে ফেলতে চায়। তবে, তাকে আর অপেক্ষা করতে হয় না। শ্যামিই কথাটা তোলে: 'তা আসল কথায় এসো। তুমি তো এমনি আসোনি চাঁদ!, হঠাৎ ফৌজি-ভাইয়ের ছুতোয় আমার কাছে কেন?'

'না। না। তেমন কিছু নয়।' কথাটা কীভাবে পাড়বে অর্জুন ঠিক করতে পারে না। শ্যামি তাড়া দেয়, 'চটপট বলে ফেলো—কেউ এসে গেলে আর বলতে পারবে না।'

চরকা থেকে শ্যামি সুতো বের করতে থাকে, টেনে টেনে।

অর্জুন চরকার ওপর হাত রাখে, যাতে মাকুটা না ঘোরে। তারপর ঈষৎ ঝুঁকে দশ টাকার একটা নোট, শ্যামিকে দেখিয়ে ঝোলাটার মধ্যে ভরে দেয়। শ্যামি নোটটা তুলে ফেরত দিতে যায়।

অর্জুন বাধা দেয়, 'না, না। ওটা তোমার জন্যে। রেখে দাও।'

'ব্যাপারটা কী? কী চাইছ?'

শ্যামির সামনে রাখা পিঁড়িটা টেনে, অর্জুন এবার জমিয়ে বসে। তারপর, চরকার ওপর হাত রেখেই হরনামি-প্রসঙ্গ তোলে।

সাত

ঝান্ডার বাড়ির পেছন দিকে যে ঘরটা, তার একটা দরজা খোলে খিড়কির দিকে। ওদিকটা একেবারে ফাঁকা। কোনও বাড়িটাড়ি নেই। একটা নালা, আর নালার লাগোয়া ঝোপঝাড় আবর্জনা। কিছুটা এগোলে একটা খেত, নাম নিজাইয়া। নিজাইয়া থেকে কিছুটা দূরে একটা মেঠো রাস্তা। গাঁয়ের দক্ষিণ-পশ্চিমকে বেড় দিয়ে রাস্তাটা চলে গেছে বুর্জগিল্লায়। ওখান থেকে কোটে খড়ক সিং হয়ে, সেলবাড়াকে একটু পেছনে ফেলে, উঠেছে সোজা নাথানে।

নালার দিকে দরজাটা বড় একটা খোলা হয় না। অর্জুন থাকে এই ঘরটায়। শোয়া-বসা সবই এখানে। ইয়ারদোস্ত এলে এখানেই আড্ডা জমায়। ঝান্ডা মাঝেসাঝে আসে।

গাঁয়ে ঠিক যেমনটি হয়, মেয়েরা ভোর থাকতেই হাতে লোটা নিয়ে বেরিয়ে পড়ে। নালার লাগোয়া ঝোপঝাড়ের আড়ালে বসে পড়ে 'জঙ্গলপানি' সারে। পুরুষরা যায় নিজাইয়ার দিকে। হরনামি আসে ঠিক ভোর চারটেয়। এই সময় অন্য কোনও মেয়ে বউদের দেখা যায় না। কেহরের অবশ্য এই সময়টায় ঘুম ভেঙে যায়। সে জেগে উঠে কাশতে থাকে। গিন্দর ঘুমিয়েই থাকে। 'ভোরবেলার কাজ' সেরে এসে হরনামি চা করে দেয়। চা না পাওয়া অবধি বাপ-ব্যাটা খাটিয়া থেকে ওঠে না।

প্রাতঃকৃত্যাদি সেরে হরনামি চার পাশটা একবার ভাল করে নেয়। তারপর, অর্জুনের দরজায় টোকা মারে। কিছুক্ষণ পরই সে অর্জুনের ঘর থেকে বেরিয়ে আসে মুখে কাপড় ঢাকা দিয়ে। আজকাল সে রোজই অর্জুনের ঘরে যায়। তবে আজ অবধি কেউই তাকে ঢুকতে বা বেরোতে দেখেনি।

হরনামি, শ্যামি ও বান্তির বাড়িতেও যাতায়াত করে। শ্যামির সঙ্গে এখন দারুণ ভাব। গল্প করতে-করতে একেবারে হেসে গড়িয়ে পড়ে। শ্যামির শাশুড়িও এটি লক্ষ করে। ধরে উঠতে পারে না, হঠাৎ এত গলাগলি কেন। ফাঁকে-ফাঁকে অর্জুনও আসে। ঠারে-ঠোরে ইশারা বিনিময় হয়। বান্তির কাছে গিয়ে হরনামি প্রেম ভালবাসার গল্প জুড়ে দেয়। বান্তির ছেলে হরদিৎ-কে কোলে তুলে আদর করে। চুমুতে চুমুতে ভরিয়ে দেয়। আবার বাড়িতেও নিয়ে আসে। হরদিৎও হরনামির গলা জড়িয়ে ধরে, আধো-আধো গলায় 'চাচি-চাচি' বলে ডাকে।

এদিকে, দুল্লাও গত তিন মাস ধরে কোটেতে যাতায়াত শুরু করেছে। মন খারাপ হলেই সে ভোরে ট্রেন ধরে। রামপুরায় নেমে সাধনিয়া আসে। তারপর হাঁটা দেয় কোটের

দিকে। কেহরের সঙ্গে এর মধ্যে দিব্যি ভাবখাতির জমে উঠেছে। গিন্দরের সঙ্গে বন্ধুত্ব। কোনও-না-কোনও ছুতোয় আসে। কখনও বলে, দয়ালপুরায় কাজ আছে, কখনও ভাইরূপায়। আবার কখনও, পিসতুতো বোনের বিয়ে কিংবা কোটেতে ভাল জাতের মোষ ছাগল পাওয়া যায় শুনে। এলেই সে একটা না একটা অজুহাতে রাতটা কাটিয়েই যায়। এইভাবেই, সে এক সময় লক্ষ করে, হরনামি ওকে আর যেন আমল দিতে চাইছে না। না, আতিথ্যের ত্রুটি নেই। কিন্তু, একা একেবারে ভেড়ে না! একদিন নিচু গলাতে জানিয়েও দেয়, এমন ঘনঘন আসাটা ঠিক হচ্ছে না। গাঁয়ের লোক ব্যাপারটা নিয়ে কানাঘুষো করছে। এছাড়া, ন মাস ছ মাসে, হরনামি এক আধবার হণ্ডিয়া এলেও দুল্লার সঙ্গে দেখা করে না। দুল্লাকেই আসতে হয় খবর পেয়ে। মনের দুঃখ উজাড় করে যায়। মন আনচান করলেও, সে বুঝতে পারে হরনামি তাকে বেশ এড়িয়ে চলছে।

দুল্লা একদিন কোটেতে আসে। হরনামি অর্জুনকে জানায়, তার গাঁয়ের এক জেলে ভূতের মতো তাকে তাড়া করছে। কিছুতেই তার পিছু ছাড়ছে না। অর্জুন অভয় দেয়, 'ঠিক আছে। একদম 'মেরামত' করে দেব, যাতে এই গাঁয়ে আর পা বাড়াতে না পারে!' হরনামি উত্তর দেয়, 'আমি তাহলে একটু হাঁফ ছেড়ে বাঁচি।'

দুল্লার চেহারাটা অর্জুনের চেনা ছিল। এরপর যেদিন দুল্লা কোটেতে আসে। সেইদিন অর্জুন ছিল চৌপালে বসে। দুল্লাকে দেখেই সে গলা খাঁকারি দেয়। দুল্লাও সতর্ক হয়ে তার দিকে তাকায়। অর্জুন জিজ্ঞেস করেঃ 'কোথায় থাকা হয়?'

'হণ্ডিয়ায়।'

'এখানে কোথায়?'

'যোগিন্দর সিং-এর বাড়ি।'

'কেউ হয় তোর? তুই কোন্ জাত বে?' অর্জুন বেকায়দায় ফেলে দুল্লাকে। দুল্লা একটা উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করতেই, অর্জুন গলা চড়ায়, 'শালা, মাজাকি করার জায়গা পাসনি? যোগিন্দরের সঙ্গে তোর সম্পর্ক নেই, আর—'

বলতে-বলতে অর্জুন এগোয়। দুল্লা ঘাবড়ে গিয়ে একটু পিছু হটে। অর্জুন আচমকা একটা ধাক্কা দিতেই, টাল সামলাতে না পেরে মাটিতে পড়ে যায়। কিন্তু, অর্জুনের চেয়ে তার গায়ে জোর বেশি। কুস্তির প্যাঁচ-পয়জারও তার জানা। সারা জীবন ডন বৈঠক মারার ফলে, শরীরটাও বেশ তাগড়া। সেও রুখে দাঁড়ায়। দুজনের মধ্যে ধ্বস্তাধ্বস্তি শুরু হয়ে যায়। অর্জুনের ঘাড়ের ওপর মোক্ষম এক রদ্দা মেরে সে অর্জুনকে প্রায় ছুঁড়ে ফেলে দেয়। অর্জুন চিৎ হয়ে পড়ে থাকে। নড়াচড়া করে না। দুল্লা শঙ্কিত হয়। অজানা অচেনা জায়গা। তার হয়ে কথা বলার কেউ নেই। গণধোলাই হওয়াটা প্রত্যাশিত। গিন্দর কেহর — সত্যিই তো তার কেউ নয়। হরনামির সঙ্গে যে সম্পর্ক, তাতো বলা যাবে না কাউকে। তার চেয়ে, মানে-মানে এখান থেকে কেটে পড়াই ভাল। আশপাশে কাউকে দেখা যায় না। দুল্লা এবার কোলকের পথ ধরে সেলবাড়ার দিকে দ্রুত পা চালায়। এই ঘটনার পর থেকে সে আর কোনওদিন কোটে আসেনি। এমন কী, হরনামি হণ্ডিয়াতে এলেও তার সঙ্গে দেখা করার চেষ্টা করেনি । হরনামিও বুঝেছিল, দুল্লা আর জ্বালাবে না। আর দুল্লা তাকে দেবেই বা কী? অর্জুনের মতো তরতাজা যুবক থাকতে কেন সে দুল্লাকে গ্রাহ্য করবে?

দুল্লার সঙ্গে ধ্বস্তাধ্বস্তি করে সেদিন অর্জুন অনেকক্ষণ উঠে দাঁড়াতে পারে না। মাটিতে ঘাপটি মেরে শুয়ে থাকে। দুল্লাকে চলে যেতে দেখে খুশিই হয়। ব্যাটা এ-গাঁয়ে আর পা মাড়াবে না! একটু পরেই সে যায় হরনামির কাছে। জানায়, দুল্লাকে মারতে গিয়ে তার ঘাড়ে আর কোমরে জোর চোট লেগেছে। হরনামি তাড়াতাড়ি এক গ্লাস দুধ আনে। তাতে ঘি আর ডাল ফেলে দেয়। অর্জুনের দুধ খেতে ইচ্ছে করে না। বুকের ভেরতটা যেন কেমন দপদপ করে। হরনামি পীড়াপীড়ি করে, 'দুধটা খেয়ে নাও, ব্যথা চলে যাবে। য়্যাঁ . . . তোমার মুখটার একী হাল? ব্যাটার দাড়ি উপড়ে নিতে পারলে না?'

দুধ খেয়েও অর্জুন হাঁফায়। হাঁফাতে হাঁফাতে বলে, 'শালা পালিয়ে গেল! দাঁড়িয়ে থাকলে মজা দেখাতাম। শুয়োরের বাচ্চাটাকে এ-তল্লাটে দেখলে, এবার মেরে ঠ্যাং ভেঙে দেব!'

গিন্দর তখনও খেত থেকে ফেরেনি। কেহর বারান্দায় শুয়ে। বাইরের চাতালে দাঁড়িয়ে ওরা কথা বলে যায়। কেহর টেরও পায় না। কথাবার্তার আওয়াজ শুনে তার মনে হয় হরনামি বোধহয় কোনও পাড়াপড়শি বা চাকরবাকরের সঙ্গে কথা বলছে। তবুও একটা খটকা লাগে: এতক্ষণ ধরে কী এমন কথা? হরনামি তো শ্বশুরকে মানুষ বলেই মনে করে না। শ্বশুরও ভয় পায় তাকে। যা মেয়ে, চড়চাপড় বসিয়ে দিতে পারে কিছু বললে। এই রকম বজ্জাত মেয়ের সঙ্গে এঁটে ওঠার মতো গায়ের জোর আর কেহরের নেই।

মাঝেসাঝে, বান্তি কোনও আত্মীয়ের বাড়ি, অথবা বিয়ে-বাড়িতে গেলে, অর্জুন একাই বাড়িতে থাকে। ঝান্ডাও থাকে না। এই সুযোগে শ্যামি আসে, সঙ্গে হরনামিও থাকে। তিন জনে মিলে মনের আনন্দে মদ খেয়ে যায়।

শ্যামি-হরনামি মদ খেয়ে খাটিয়া টেনে শুয়ে পড়ে। সন্ধ্যে হলে হাত মুখ ধুয়ে বেরিয়ে যায়। মুখে ডাল ফেলে চিবোয়, যাতে কেউ মদের গন্ধ না পায়। এতে অসুবিধে হতো না। ওরা দু গ্লাসের বেশি মদ খেত না। কাজেই গন্ধ লুকানো কঠিন হতো না। শ্যামির অবশ্য মাঝেমধ্যে তিন গ্লাসও চলত। মদ আর টাকা—এই দুটির ওপর শ্যামির লোভ চিরকালই একটু বেশি। এতে অর্জুনের সুবিধে হতো। বৈশাখী-মেলায় শ্যামি ফি বছর ভদৌড় যায়। সেলবাড়ার মেলা বসে পাশের গ্রামে। শ্যামি এই সময় ঠিক কাউকে না কাউকে ভিড়িয়ে নেয়। গতবার সে অর্জুন আর হরনামিকে ভিড়িয়েছিল। শ্যামি নিজে গাঁয়ে ফিরে এলেও, অর্জুন-হরনামির রাত কাটাবার ব্যবস্থা করেই এসেছিল। গাঁয়ে ফিরে, সেলবাড়া থেকে ফিরতে রাত হলো কেন, সেই গল্পও বেশ জমিয়ে বলেছিল। গ্রামটির বদমায়েশদের আড্ডায় শ্যামির ভালই যাতায়াত ছিল। সেলবাড়াতেও সে এই ধরনের এক আড্ডা খুঁজে নিয়েছিল। মাঝরাতে সেখানেই হুল্লোড় করে ফিরে এসেছিল। রাত কাটায়নি। গিন্দর কী ভাববে, শ্যামির শ্বশুর প্রতাপ কী ভাববে এইসব চিন্তা করে অর্জুন ওদের গ্রামে ফেরত নিয়ে আসে। গিন্দরের বাড়িতে শ্যামি-হরনামির যে নাটক সেদিন হলো, তার রহস্য অর্জুন ছাড়া আর কেউ জানে না।

এই ঘটনার ঠিক দু দিন পর কেহর মারা যায়। ঠিক মারা যাওয়ার মতো বয়েস কেহরের অবশ্য হয়নি। বেজায় কাশি হতো। বছর দশেক আগে আফিম ধরতে, কাশির দমক কমে আসে। কাশিতে লোক মরে না। আসলে, মনের মধ্যে গভীর দুঃখ চেপে রেখে কেহর মারা যায়। তার যে কীসের এতো দুঃখ, কাউকে সে মুখ ফুটে বলেনি। কয়েক বছর ধরেই

সে নিঃসঙ্গ। গিন্দরের কোনও সন্তান নেই। হরনামি যেদিন কেহরকে লাথি মারে, সেইদিনই তার আত্মীক মৃত্যু ঘটে। শরীরী-মৃত্যু ঘটে সেলবাড়া-ঘটনার পরই।

আট

মেয়েদের মধ্যে কানাকানি হতে-হতে কথাটা বান্তির কানেও পৌঁছে যায়। সে বাড়িতে না থাকলে, অর্জুন মহফিল জমায় শ্যামি আর হরনামিকে নিয়ে। ঝান্ডা অবশ্য জেনেও চুপচাপ থাকে। ব্যাপারটা ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা করে। আসলে, ঝান্ডার মনে যে কি ছিল, বান্তি তা ঠিক আঁচ করতে পারেনি।

সব শুনে বান্তির শরীর রাগে জ্বলতে থাকে। প্রথমে সে প্রতাপদের বাড়ি চড়াও হয়ে শ্যামিকে যা-তা বলে আসে। তারপর যায় গিন্দরের বাড়ি। ঢুকেই শুরু করে: 'কীরে হরনামি—খানকি মাগি কোথাকার! আমার ঘরে এসে লোচ্চামি? খানকিগিরি করতে হয়, নিজের বাড়িতে বসে কর—আমার বাড়িতে কেন? শ্বশুরের মানসম্মান তো খেয়েছিস এবার নিজের মা-বাপের মানসম্মান খাচ্ছিস . . .?'

হরনামি প্রথমটা শোনে, তারপরই পালটা আক্রমণ চালায়, 'আরে যা, যা—আমি খানকি, না তুই খানকি? একটা ভাতারে শানায় না, দু-দুটো ভাতার রেখেছিস! . . . যা, যা, ভাগ! বেশি বাড়াবাড়ি করলে ইট মেরে তোর মাথা ফাটিয়ে দেব!' একজন থামে তো, অন্য জন শুরু করে। আবার দুজনে একসঙ্গেই শুরু করে। গালাগালের ফোয়ারা ছোটে। আশপাশ থেকে সবাই বেরিয়ে এসে তামাশা দেখে। আশেপাশের বাড়ি থেকে কেউ-কেউ আবার সিঁড়ির ওপর উঠে। মাথা বাড়িয়ে দেখে কাজে-না-যাওয়া দু চারজন পুরুষ, রাস্তায় দাঁড়িয়েই দৃশ্যটি উপভোগ করে। ঝগড়া করে দুজনেই যখন ক্লান্ত তখন প্রীতমের মা আসে। হরনামিকে ঠেলে ঘরের মধ্যে ঢুকিয়ে বাইরে থেকে শেকল টেনে দেয়। তারপর, বান্তির হাত ধরে তাকে টেনে হিঁচড়ে বাড়ির দিকে নিয়ে যায়। সমবেত জনতা 'ছেড়ে দাও', 'ছেড়ে দাও' বলতে থাকে।

হরনামির জন্যে অর্জুন টাকা ওড়াচ্ছে, এটা ভেবে বান্তি রাগেনি। তার রাগের কারণ, হরনামির জন্যেই অর্জুন তার নাগালের বাইরে চলে গেছে। এরপর থেকে বান্তি আর বাড়ির বাইরে যেত না। আত্মীয়স্বজনদের বাড়ি যেত কদাচিৎ। গেলেও, বসার ঘরে তালা মেরে যেত। তবুও কিন্তু স্বস্তি পতে না। দরজার ওপর দুটো বাড়তি তক্তাও লাগালো সে। ঝান্ডাকে বলত: 'ধন্যি বাপু! তোমার কী কোনও হুঁশ নেই? যত ঝক্কি, সব আমাকে পোয়াতে হচ্ছে!' তারপর, 'ঘরে আছি বলেই মাগিটা আর ভিড়ছে না। অর্জুনকেও বলিহারি, হরনামি কী এমন ডানা কাটা পরী যে ...'

ঝান্ডা কিন্তু না-রাম, না-গঙ্গা। শুধু বলে, 'বয়েসের দোষ। এসব তো একটু-আধটু করবেই। এতে কী এমন মহাভারত অশুদ্ধ হয়েছে? এখনও, আমাদের অর্ধেক জমির মালিকানা অর্জুনের, দু দিন পর তোমার ছেলেই তো পুরোটার মালিক হয়ে বসবে. এটা বুঝতে পারছ না?'

অর্জুনদের বৈঠকখানায় হরনামির যাতায়াত বন্ধ হয়ে যেতে, শ্যামিদের বাড়িতে অর্জুনের সঙ্গে দু একবার দেখা সাক্ষাৎ হয়েছে। কিন্তু বিশেষ জুৎ হয়নি। বেশির ভাগ সময়েই বুড়োবুড়ি বাড়িতে থাকে। দুই ছেলের কে কখন ঘরে আসে ঠিক নেই। মেল্লাও রোজ হয় না। ভদৌড়ের বৈশাখী-মেলা, সেলবাড়ার মেলা—বছরে একবার। গাঁয়ের দু এক জায়গায় লুকিয়েচুরিয়ে দেখা হলেও, বিশেষ সুবিধে হয় না। শেষ অবধি, অর্জুন গিন্দরের বাড়িতে যাতায়াত শুরু করে দেয়। গিন্দর খেতে গেলেই, সে এক ফাঁকে ঢুকে পড়ে। বেশ কয়েকমাস ওইভাবে চলে। হরনামি বেশ মুশকিলে পড়ে। মদ একেবারে বন্ধ। শ্যামিও বিশেষ ভেড়ে না। কেননা, অর্জুনের সঙ্গে লেনদেন বন্ধ হয়ে গেছে। এরই মধ্যে গিন্দর জানতে পারে অর্জুনের গোপন অভিসারের কথা। ফলে, গিন্দর যখনই হরনামির সঙ্গে কথা বলে, বেশ রুক্ষভাবে কথা বলে। রেগে থাকে। রুটি টান মেরে ছুঁড়ে ফেলে। কারণে অকারণে অশ্রাব্য গালিগালাজ দেয়। এমনকী, দু একবার পিটিয়েও দিয়েছে। খেতে কাজ করতে-করতে আচমকা বাড়ি ফিরে আসে। অবশ্য, অর্জুনকে হাতেনাতে ঠিক ধরতে পারে না। গিন্দরের হাবভাব দেখে হরনামি বেশ ঘাবড়ে যায়।

হরনামি এরপরই একদিন পরাগদাসের ডেরায় আসে। পরাগদাস কোটেতে আছে গত দশ বছর। প্রথম আসে হাতে একটা পুরনো ধুনুচি নিয়ে। সেইটা জ্বেলেই, একটা জলচৌকির ওপর বসে থাকত। গাঁয়ের মেয়ে মদ্দ বুড়ো—সবাই ক্রমশ আসতে শুরু করে। ভক্তজনেররাও ভিড় করতে থাকে। রাতে চৌকির ওপরই পরাগদাস শুয়ে থাকত। খাওয়া-দাওয়া মিলত দেদার। চা দুধ ডাল ভাত তরকারি। লোকেরা নিজে থেকেই দিয়ে যেত। বিনিময়ে পরাগদাস বিলি করত তাগাতাবিজ মাদুলি জড়িবুটি। তার দেওয়া তাবিজে দারুণ মাহাত্ম্য। সংসারে শান্তি, কাচ্চাবাচ্চার দীর্ঘ জীবন, মৃগি রোগ নিরাময়, এমনকি, যুবতী মেয়ে-বউয়ের ঘাড়ে ভূত চাপলে—পরাগদাসের তাবিজে ভূত পর্যন্ত বাপ-বাপ করে পালায়। ফলে, আশপাশের গাঁয়ে তার নাম ছড়িয়ে পড়তে দেরি হয়নি। সব কথাই হয়ে যায় তিল থেকে তাল। পাখর সিং নম্বরদারের জমিজিরেত প্রচুর, কিন্তু কোনও ছেলে হয় না। প্রত্যেক তিন বছর অন্তর শুধু মেয়ে হয়। এরই মধ্যে পাখর সিং পাঁচ-ছ কন্যার জনক। কিন্তু, পরাগদাসের তাবিজ এমনই শক্তিশালী যে, অমাবস্যার রাতে চানটান করে এক কাপড়ে তাবিজ ধারণ করে, এক কড়াই সেদ্ধ চাল মানত দিতে, সেই বছরই পাখর নম্বরদার এক পুত্ররত্ন লাভ করে! জয়জয়কার পড়ে যায় পরাগদাসের। সারা গাঁয়ে হইচই। সাঁইত্রিশ দিনের বাচ্চাকে নিয়ে পাখর হাজির হয় পরাগদাসের ডেরায়। সন্তানটিকে ভক্তিভরে 'অর্পণ' করে পরাগদাসের শ্রীচরণে। পরাগদাস শিশুটিকে ঊর্ধ্বে তুলে আবার পাখরের ঝোলার মধ্যে তাকে ঢুকিয়ে দিয়ে আশীর্বাদ করে: 'হুঁ—মাথা দেখে মনে হচ্ছে এ বাপদাদার নাম রাখবে, শতায়ু হবে নির্ঘাৎ!' কৃতজ্ঞ পাখর সিং তখনই এক পায়ে দাঁড়িয়ে নমস্কার জানিয়ে, সাত বিঘে জমি দান করে পরাগদাসকে। ওটা হবে সাধুসন্তদের আশ্রম। সন্ত পরাগদাস সঙ্গে সঙ্গে চোখ বুজিয়ে মন্ত্র পড়ে যায়। তারপর চোখ খুলে ধুনুচি থেকে খানিকটা ছাই তুলে নম্বরদার পাখরের লোকজনের কপালে ফোঁটা দেয়। সমাগত ভক্ত মহা-আনন্দে নম্বরদারের আনা লাড্ডু গপ্‌গপ্ করে মুখে ফেলতে থাকে।

পরের দিনই, পাখরের জমিতে পরাগদাস তার ডেরা বানিয়ে ফেলে। আশ্রম করার পরিকল্পনা সবাই জানতে পারে। প্রণামী পড়তে শুরু করে হু-হু করে। আশপাশের গাঁয়েও

খরবটা ছড়িয়ে পড়ে। মাথায় ইয়া-ইয়া জটা সাধু সন্ন্যাসীদেরও একদিন আসতে দেখা যায়। সেই সঙ্গে চ্যলাচামুন্ডা বড়লোক শিষ্য। কোটের প্রত্যেক বাড়ি থেকে দুধ আসতে থাকে আশ্রমে। আশপাশের গাঁ থেকেও। ক্ষীর হালুয়া মালপোয়া—মুখের স্বাদ বদলাবার জন্যে মুগের বড়া—সবই আসে আম জনতার কাছ থেকে। পরাগদাস 'জলসত্র' বসায় আশ্রমের পাকাপোক্ত একটা বাড়ির জন্যে। কোটের জাঠ জমিদার, ব্যবসায়ী ও আরও অনেকে সামর্থ্য মতো টাকাও দেয়। টাকা গমের বস্তা গুড়ের জালা বাসনকোষন ঘিয়ের টিন—পরাগদাসের জলসত্রে কোনও কিছুরই অভাব থাকে না।

দশ বারোদিন পরেই মিস্ত্রি লেগে যায়। হরিজন মিস্ত্রি আর যোগাড়ে। রামপুরা রাজারের ঠাকরমল শেঠ একান্ন বস্তা সিমেন্ট, ফুলের লালা গুজ্জরমল তার ভাটি থেকে এগারো হাজার, আর ভাইরূপার রামরখামল সতেরো হাজার ইট পাঠায়। বারনালার এক শেঠজি, ভদৌড়ের অধিবাসী, পাঠিয়ে দেয় প্রয়োজনমতো বালি। সঙ্গে মন খানেক ছোলার ডাল। দু তিন মাসের মধ্যে, আশ্রমের যে-দিকটা সেলবাড়ামুখো সেইদিকে ছ সাতটি কামরা আর বুর্জগিল্লার দিকে মস্ত একটা পাঁচিল তৈরি হয়ে যায়। এর একদিকে দু কামরার বাড়ি, মাঝে লম্বা এক বারান্দা। এই বারান্দায় পরাগদাসের ধুনুচি থাকে। বারান্দার সামনে বিরাট এক উঠোন। ভক্তজনেরা এখানে বসে। কোটের দিকে যে অংশ, সেইদিকে এক লঙ্গরখানা আছে। লঙ্গরখানায় দুটি কামরা লাগোয়া—একটি রান্নাঘরের কাজ করে, অন্যটি ভাঁড়ার। ডেরার ঠিক মধ্যিখানে এক বিরাট কুয়ো। পানীয় জলের এক বিরাট ট্যাঙ্ক। একটু দূরেই ছাদসমেত একটি চৌবাচ্চা, সেখানে চারটি কল বসানো। ডেরায় যারা আস্তানা গেড়েছে, এখানেই তারা চানটান করে। বিরাট প্রাঙ্গণের জায়গায় জায়গায় নিম শিরীষ বট অশ্বত্থ গাছ। শান্তি আর সুখের এক নির্মল পরিবেশ। পরাগদাসের সংসার।

গ্রামের কানাঘুষো থেকে জানা যায় পরাগদাসের বাড়ি কাহানগড় গ্রামে। সেখানে সে ভাইঝিদের মানুষ করে। জাতে জাঠ। দুই ভাই। ছোটবেলায় নাম ছিল চন্দা সিং। জমিজিরেত সামান্যই, প্রায় না থাকার মতোই। কোনও ক্রমে সংসার চলত। বিশ-বাইশ বছরেও বিয়ের সম্বন্ধ আসেনি। বাড়ি থেকে পালিয়ে আম্বালায় গিয়ে ফৌজিতে নাম লেখায়। কিন্তু ফৌজিদের প্যারেড করার ধকল সহ্য হয় না। অতএব চম্পট দেয়। পুলিশ বার কয়েক কাহানগড়ে আসে খোঁজ নিতে। বেগতিক দেখে সে আত্মীয়দের বাড়ি গা-ঢাকা দেয়। এইভাবেই একদিন চলে যায় হরিদ্বার। এরপরই সে ফিরে আসে সাধু পরাগদাস হয়ে। মাথায় জটা, পরণে নেংটি, পায়ে খড়ম। ওদিকে, ছোট ভাই নরসিং-ও অনেকদিন বেপাত্তা। বহুদিন পর সে-ও ফিরে আসে। নরসিং বিয়ে করেছিল। দুই ছেলে, এক মেয়ে রেখে সে একদিন গত হলো। বউটি বেশ যুবতী, সুঠাম চেহারা। সংসার চালাতো খুবই কষ্টেসৃষ্টে। চন্দা সিং একেবারে সাক্ষাৎ ভগবানরূপে হাজির হয় তার কাছে। ভাইপো-ভাইঝিদের দেখভালের দায়িত্ব সে নিজেই নেয়। অবশ্য, এক সপ্তাহ থাকার পরই চন্দা সিং ওরফে পরাগদাস কাহানগড় থেকে বেরিয়ে পড়ে।

ছোট ভাইয়ের এই বউটির জন্যেই পরাগদাস কোটে থেকে বছরে কয়েকবার কাহানগড় যায়। ইতিমধ্যে, ভাইপোদের বিয়ে-থাও দিয়েছে। ভাইঝিরাও বড়সড় হয়ে উঠেছে। জানা যায়, পরাগদাস কাহানগড়ে আট দশ বিঘে জমিও কিনেছে।

হরনামি পরাগদাসের ডেরায় চলে আসে। তিন মুখওয়ালা এক ধুনুচির সামনে আট ন জন পুরুষ বসে। জনা দুই তিন মেয়ে-বউ। ধুনুচির হালকা ধোঁয়ার মধ্যে পরাগদাস দর্শনার্থীদের সঙ্গে গভীর আলোচনায় রত। মেয়েরা জোড় হাত করে আছে। তাদের মাথার ওপর উড়ুনি, ঘোমটার মতো দেওয়া দেখাদেখি হরনামিও মাথার ওপর উড়ুনি টেনে, পরাগদাসের পায়ের কাছে একটা টাকা রেখে, হাত জোড় করে। তারপর মেয়েদের দঙ্গলে বসে পড়ে।

নয়

প্রথমে. পুরুষদের এক একজন পরাগদাসের ধুনুচি ছোঁয়। তারপর, মেয়েবউরা। সবাই যে যার দুঃখের পাঁচালি আওড়ায়। পরাগদাসের হাতের কাছেই কৌটো ভর্তি এক গাদা তাবিজ। এক একটা তাবিজের সুতো এক এক রঙের। দুঃখের পরিমাণ হিসেব করে পরাগদাস তাবিজ দেয়। হয় একটা, নয় সাতটা। কাউকে, তাবিজের বদলে দেয় ধুনুচির ছাই ভরা পুরিয়া। এ-সব নিতে গেলে, প্রথমে বাবাজির পায়ে মাথা ঠেকাতে হয়, তারপর পাঁচ কিংবা দশের নোট প্রণামী দিতে হয়। দক্ষিণা বেশি দিলে তাবিজ আরও জোরালো অথবা সংখ্যায় বেশি।

পরাগদাসের মাথায় ইয়া জটা। কানে মস্ত এক সোনার মাকড়ি। পরনে গেরু-মাটি রঙের জবরদস্ত আলখাল্লা। পায়ে খড়ম। ধুনুচির সামনে বসলে খড়ম দুটি এক পাশে সরিয়ে রাখে। আলখাল্লার দুটি পকেট। প্রণামীর টাকা পড়লেই পরাগদাস তা ঝট করে পকেটে চালান করে দেয়। বাঁ-হাত টাকা তুললে বাঁ পকেটে, ডান হাতে ডান পকেটে। ধুনি জ্বলে সকাল থেকেই, একেবারে সেই বারোটা অবধি। বারোটার পর খাওয়াদাওয়া বিশ্রাম। পরাগদাসের খাস কামরাটি বেশ রাজকীয় হলেও, ভক্তজনের কাছে 'সন্ন্যাসীর কুটির'। তিনটের সময় ঘুম থেকে উঠে পরাগদাসের পানীয় হলো বাদামভর্তি বড় এক গ্লাস দুধ। তারপরই, পাঁচটা অবধি নানাজনের সঙ্গে কথাবার্তা বলে, বাবা পরাগদাস ধুনুচি জ্বেলে বসে পড়ে আম জনতার দুঃখ কষ্ট লাঘব করতে। দিনের কাজ শেষ হলেই, গুরুজি চ্যালাচামুণ্ডার সঙ্গে বসে পড়ে প্রণামীর টাকা গুনতে। অনেকক্ষণ ধরে চলে এই গোনাগুনির কাজ।

সন্তের প্রধান চ্যালা কোটেরই এক জাঠ। ঘরসংসার ছেলেমেয়ে সবই আছে। ছেলে খেতে কাজ করে। বাবা কিন্তু সারাদিন বসে থাকে পরাগ-বাবাজির ডেরায়। এখানে তার নাম মহান্ত চরণদাস। পরাগদাসই অবশ্য এই মিল করা নামটি রেখেছে। সন্ত পরাগদাস মহান্ত পরাগদাসকে খুবই বিশ্বাস করে। চরণদাসের পরামর্শ ছাড়া পরাগদাস এক পা-ও নড়ে না। টাকাকড়ির হিসেবও থাকে চরণদাসের কাছে।

সেদিন, মেয়েরা তাবিজ নিয়ে চলে যাওয়ার পরও হরনামি বসে থাকে। কিছু বলে না। পরাগদাসই জিজ্ঞেস করে: 'কী হয়েছে তোর?'

'আমার-আমার—' হরনামির কথা আটকে যায়।

'কাদের বাড়ির বউ তুই?'

'আমি যোগিন্দর সিং-এর বউ, কেহর সিং আমার শ্বশুর—উনি গত হয়েছেন কিছুদিন আগে।'

'আমার এখানে তুই তো আগে কখনও আসিসনি—'

'একবার এসেছিলাম। প্রতাপ সিংয়ের ছেলের বউয়ের সঙ্গে।'

'তা, তোর দুঃখুটা কী?'

'আমার শ্বশুরের মাথার দোষ ছিল। গুরুচরণ সিং তাবিজ দিয়েছিল—'

'উহুঁ!' পরাগদাস শুধরে দেয়, 'গুরুচরণ নয় মহান্ত চরণদাস, বেটি!'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, উনিই আপনার তাবিজ আর ওষুধ আমার শ্বশুরকে দিয়েছিলেন।'

পরাগদাস ব্যাপারটা আন্দাজ করার চেষ্টা করে। বলে, 'বেশ, এখন কী হয়েছে, বল।'

'শ্বশুরের মতো— আমার বরেরও মাথার গন্ডগোল হয়েছে।

'মানে? আলফাল বকে? তোর সঙ্গে—?'

'আমার সঙ্গে তো কথাই বলে না! কারণে অকারণে বাড়ির মোষটাকেও দুদ্দাড় মার দেয়। একা-একা বসে নিজের গালেই থাপ্পড় মারে! মাথা থেকে চুল ছেঁড়ে—বাসনপত্তর ছুঁড়ে ফেলে। হাতের কাছে লাঠিসোটা পেলে আমাকে দু চার ঘা দিয়ে দেয়। নিশ্চয়ই কেউ তুকতাক করেছে!'

'তুই তাহলে?'

'দোহাই বাবা, একটা জড়িবুটি দাও—যাতে ও খেতের কাজকর্ম করতে পারে—'

'রাতে তোর সঙ্গে শোয়-টোয়?'

'না। মাঝরাতে উঠে উঠোনে পায়চারি করে। বিড়বিড় করে। আমার ঘুম ভেঙে যায়, ভয় লাগে। যদি আমাকে খুন-টুন করে বসে!'

'ঠিক আছে। চরণদাসের সঙ্গে দেখা করিস। ওষুধ পাঠিয়ে দেব—তাতেই যোগিন্দর ভাল হয়ে যাবে। এখন যা।'

দুটি লোক একটি যুবতীকে ধরে ধুনুচির দিকে নিয়ে আসে। প্রণাম জানিয়ে হরনামি উঠে পড়ে। চরণদাস অভয় দেয়, 'হরনামি—তুই কাল সন্ধ্যেবেলায় একবার আসিস। আমি বাবাজির কাছ থেকে ওষুধ নিয়ে রেখে দেব। সব ঠিক হয়ে যাবে। চিন্তার কোনও কারণ নেই।'

পরাগদাসের ডেরা থেকে বেরোতেই অর্জুনের সঙ্গে দেখা হয়ে যায় হরনামির। রাস্তার এক ধারে দাঁড়িয়ে দুজনে কথা বলে। হরনামি অনুযোগ করে: 'তোমার আর কি—নাকাল হতে হচ্ছে আমাকে।'

'পরাগদাস কী বলল?'

'কি আর বলবে। সব শুনে বলল চরণদাসের সঙ্গে কাল দেখা করতে। তাবিজ টাবিজ দেবে।'

'ঠিক আছে। তুমি বাড়ি যাও। আমি দেখছি।' বলে অর্জুন পরাগদাসের আড্ডার দিকে চলে যায়। হরনামি বাড়ির রাস্তা ধরে।

'কী ব্যাপার? গিন্দরের বউকে দেখলাম এখানে। গিন্দরতো বেচারার হাড় জ্বালিয়ে খাচ্ছে একেবারে।' কথাগুলো বলতে-বলতে অর্জুন চরণদাসের দিকে আড়চোখে দেখে।

'সব ঠিক হয়ে যাবে, ভাইপো।' চরণদাস স্বয়ং অভয় দেয়।

'গুরু—আমি তো তোমার সেবা করতে চাই। সবই তো তুমি জানো—'

অর্জুন তির্যকভাবে কথা বলে। তারপর চলে যায়। বেশি রাতে সে আবার আসে। একশো টাকার একটা নোট সে চরণদাসের হাতে গুঁজে দেয়। এই টাকাটা অবিশ্যি পরাগদাস পায় না।

হরনামি-অর্জুনের কেচ্ছা কেলেংকারি চরণদাসের জানা। গাঁয়ে কোনও কথাই চাপা থাকে না। ছোট কথাও ডালপালা মেলে উড়তে থাকে। গ্রাম হলো বিরাট এক সাগরের মতো। অজস্র ঢেউ আছে। ঝড়তুফান ওঠে। তবুও শান্ত।

পরের দিন সন্ধ্যেবেলায় হরনামিকে আবার দেখা যায় পরাগদাসের ডেরায়। চরণদাস আগেভাগেই তিনটে তাবিজ আর ওষুধের পুরিয়া পরাগদাসের কাছ থেকে নিয়ে রেখেছিল। তাবিজ আর পুরিয়া সুতলি-দড়ি দিয়ে বাঁধা। একটা পুরিয়ার ওষুধ খেতে হবে খাওয়াদাওয়ার পর, রাতে দুধের সঙ্গে গুলে। পুরিয়া বাঁধা সুতলিটা বিছানার চারপাশে খাটিয়ার পায়ার সঙ্গে বাঁধতে হবে। চারদিনের দিন, তাবিজের ওষুধ দুধের সঙ্গে গুলে দিতে হবে। তাবিজী-ওষুধ সাদা সুতোয় বাঁধা। চরণ হরনামিকে বোঝায়, এসব চুপিসাড়ে করতে হবে। রোগী যেন টের না পায়।

গিন্দর রোজ রাতে রুটির পরই দুধ খায়। হরনামি দুই জাম বাটিতে দুধ তৈরি রাখে। একটা নিজের জন্যে, অন্যটি গিন্দরের। দুধ খেয়ে, গিন্দর হয় শুয়ে পড়ে, নয় মোষের গোবর পরিষ্কার করতে বসে। হরনামি চরণের নির্দেশমতো ওষুধ গুলে দেয়। তাবিজের মোড়কটা ফেলে দেয় উনুনে। তারপর, নিজের দুধ খেয়ে শুয়ে পড়ে। শোয়ার আগে, গিন্দরকেও দুধটা খেয়ে ফেলতে বলে, দেরি করলে ঠান্ডা হয়ে যাবে। বিছানা করার সময় এক ফাঁকে অবশ্য সুতোটা পায়ার সঙ্গে বেঁধে দিতে ভোলে না।

প্রথম তাবিজী-ওষুধে কিছু কাজ হয়। পরের দিন গিন্দরের মুখে কোনও কথা শোনা যায় না। চারদিনের দিন বেশ স্বাভাবিক হয়ে যায়। চুপচাপ কাজ করে, খেত দেখাশোনা করে, ঝগড়াঝাটি চিৎকার চেঁচামেচি বা রাতে উঠোনে একা-একা পায়চারি করে বিড়বিড় করা — এসব কিছুই করে না। হরনামি অবাক হয়ে যায়। পরাগদাসের ওষুধে জাদু আছে।

একদিন গিন্দরকে চৌপালে দেখা যায়। সবার সঙ্গেই সে হড়বড় করে কথা বলছে। কিন্তু, কি বলছে বা বলতে চাইছে—তা কেউ-ই ধরতে পারে না। একদমে অবিশ্রাম কথা বলে। মুখে গ্যাঁজলা ওঠে। তারপর হঠাৎ চুপ মেরে সে সোজা মাটির ওপর শুয়ে পড়ে। চোখ বুজে যায়। সেদিন চৌপালে ঝান্ডার ছেলে হরদিৎ-ও ছিল। সে তাড়াতাড়ি জল এনে গিন্দরের চোখে-মুখে ঝাপটা মারে। দুজন মিলে ধরে তাকে উঠে বসিয়ে দেয়। জলের ঝাপটায় গিন্দর চোখ খুলতে, একজন জল খাইয়ে দেয়। সে দাঁড়িয়ে উঠে 'বাহে গুরু, বাহে গুরু' বলতে থাকে। জল খাওয়ার সময় টানাটানিতে, যার হাতে গিন্দরের জামা ছিঁড়ে গিয়েছিল, সে-ই গিন্দরের হাত ধরে তাকে বাড়ি পৌঁছে দেয়।

খবর পেয়ে পাড়াপড়শিরা ছুটে আসে। হরনামি বেজায় ভক্তিভরে গিন্দরের পা টিপতে থাকে। তারপর মাথা। প্রত্যেককে জিজ্ঞেস করে, 'চা খাবে?'—তারপর নাটকীয় ঢঙে, 'কী বলব ভাই—কার নজর পড়েছে আমার সংসারে! একেবারে শনির দৃষ্টি—'

'কদিন ধরেই দেখছিলাম গিন্দর চুপচাপ—কারও সঙ্গে কথাবার্তা বলছে না,' প্রীতমের মা বলে, 'হরনামি—তুই বরং ওকে একবার বাবাজির কাছে নিয়ে যা। মহান্ত চরণদাসকেও ডেকে আনতে পারিস। ঝাড়ফুঁক করলে সব ঠিক হয়ে যাবে।'

সন্ধ্যেবেলায় প্রীতমই চরণদাসকে ডেকে আনে। চরণ এসে ঝাড়ফুঁক করে চলে যায়। বুকের ওপর হাত দুটো জড়ো করে গিন্দর একভাবেই শুয়ে থাকে। আকাশের দিকে তার চোখ। যেন, অদৃশ্য কিছু একটা দেখতে পেয়েছে।

দশ

এরপর থেকেই গিন্দর আস্তে আস্তে খেতের কাজকর্ম ছাড়তে থাকে। খেতে, একটা শিরীষ গাছের নীচে চুপচাপ বসে থাকে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা কি যেন ভাবে। খেতের লাগোয়া নালায় যারা কাজকর্ম করতে আসে, তারা গিন্দরকে দেখে হাসাহাসি করে। গিন্দর ভ্রূক্ষেপও করে না। ব্যাপারটা সবারই চোখে পড়ে। তারা গম্ভীরভাবে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে আর হাসাহাসি করে না। তবুও কথার সঙ্গে কথা জুড়ে যায়; হরনামি-প্রসঙ্গ এসে পড়ে। হরনামি থেকে অর্জুন, অর্জুন থেকে ঝান্ডা—প্রত্যেকেই আলোচিত হয়। ঝান্ডা-বাস্তি, বাস্তি-অর্জুন; কোনও কথাই বাদ যায় না।

সেই বছরই গমের ফসল ওঠে। ফসল কাটার জন্যে লোক আসে হন্ডিয়া থেকে। তার মধ্যে, হরনামির এক ভাইপোও আসে। কিছুদিন থেকে যায় সে। লোক লাগিয়ে গিন্দরের খেত থেকে গম কাটায়। নালার জলের সুবিধে আছে। যার জন্যে গম কাটাবার পর সে, কাপাসের বীজও ফেলে। কিন্তু, ভাইপো এখানে থাকুক, হরনামির একেবারে ইচ্ছে নয়। কেননা, সে থাকলে হরনামি বাইরে বেরোতে পারে না। অর্জুনও আসে না। যাক, ভাইপো একদিন চলে যায়। কিন্তু, আসে শাস্তা, হরনামির বড়দা। দ্বিতীয়বার নালায় জল পাওয়ার জন্যে সে এক বিঘে জমিতে মকাইয়ের বীজ ফেলে। শুধু তাই নয়, গিন্দরের আট বিঘে জমিতে জলসেচের ব্যবস্থাও করে শাস্তা। পরের বছর গম ফেলবে ব'লে চার বিঘে জমি খালি রাখে।

গিন্দর এখন বাড়ি ফেরে স্রেফ রুটি খাওয়ার জন্যে। মাঝে দু একবার এসে চা-ও খেয়ে যায়। খেতের দিকে যায় না। শাস্তা ওকে নিয়ে যায় পরাগদাসের ডেরায়। পরাগদাস হেসে হেসে বলে: 'আরে—এর তো মোক্ষ লাভ হয়ে গেছে দেখছি! আমার এখানে থাকুক।' কথা শুনে শাস্তার চোখ জলে ভরে যায়। ভারি গলায় প্রশ্ন করে, 'আমার বোনের

কী হবে, বাবা? ছেলেপুলে নেই—ঘর সংসার সামলাবে কে? গিন্দর এভাবে চললে—' পরাগদাসের প্রণামীটা এগিয়ে দেয় শান্তা। পরাগদাস দুটো তাবিজ এগিয়ে দেয়, অভয় দেয়: 'ঘাবড়াবার কিছু নেই। কারও ক্ষতিটতি তো করছে না। একটু উদাস ধ্যানমগ্ন থাকে, এই যা। না, না—জোর জবরদস্তি করে কিছু হবে না। তাতে আরও খারাপ হবে। মর্জিমতো থাকুক ও। ভগবানের কৃপায় ঘোর কেটে গেলে, সব ঠিক হয়ে যাবে। আজ এইটা খাইয়ে দাও—সাতদিন পর আর একটা। কুয়োর জলে ওষুধ গুলে দেবে। দুধ একেবারে বন্ধ।'

'দুধ দেব না?' শান্তা বিস্মিত হয়।

'না। তাতে খারাপ হবে।' বলে বাবাজি ধুনোর ছাই গিন্দরের কপালে লেপে দিয়ে, এক চিমটে ছাই তার জিভেও লাগিয়ে দেয়।

আরও দু দিন পর শান্তা চলে যায়। কতদিনই বা বসে থাকা যায় এইভাবে? তার নিজেরও তো ঘরসংসার আছে। বোনের জন্যে আর কী-ই বা সে করতে পারে? যাওয়ার সময় বোনকে বলে, 'সাবধানে থাকিস। ঘরদোর সামলে রাখবি। গ্রহের ফের—সব ঠিক হয়ে যাবে।'

হঠাৎ একদিন গিন্দর কোথা থেকে দু-তিনটে পুঁথি নিয়ে আসে। খদ্দরের কাপড়ে জড়িয়ে রাখে ইসকুলের পড়ুয়া ছেলেদের মতো। সারাদিনই ওগুলো নিয়ে সে ঘুরে বেড়ায়। সকালবেলায় নালার কাছে বসে জল দেখে। এক সময় উঠে যায় পরাগদাসের ডেরার দিকে। এদিক-ওদিক ঘোরে। চৌবাচ্চার কাছে রাখা পানীয় জলের কলসি থেকে জল খায়। লঙ্গরখানায় রুটি খেয়ে, আবার বেরিয়ে পড়ে।

আপন খেয়ালেই সে চলে। কেউ কিছু তাকে বলে না। চরণদাস মাঝেসাঝে তাকে ডেকে এনে তক্তপোষে বসায়। নানা কথা বোঝায়। রুটি খাওয়ায়—কিন্তু বেশিক্ষণ বসিয়ে রাখতে পারে না। গিন্দর উঠে পড়ে, কখনও পুঁথি-জড়ানো কাপড় [illegible] খোলে। তারপর চলে যায় নালার কাছে, সাঁকোর কাছে, কোনও গাছের নিচে, বা যেখানে মন চায়। গাঁয়ের ছেলেরা একদিন দেখে, গিন্দর পুঁথির সঙ্গে বালি কাগজের একটা খাতায় ছোট একটা পেনসিল দিয়ে কি যেন লিখছে। সামনে দুটো পুঁথি। গুনগুন করে গিন্দর কি যেন পড়ে, পেনসিলের শিস জিভের আগায় ভিজিয়ে, খাতার ওপরে লেখে। ছেলেরা ব্যাপার দেখে হাসে, তবে ততটা জোরে নয়।

শান্তা যাওয়ার দু-আড়াই মাস পরেই হরনামি দুটো ষাঁড় বেচে দেয়। ঘরে এখন একটিই পশু: মোষ। যে ছেলেটি মোষ চরাত, সে অবশ্য বাড়িতেই আছে আগের মতো। খেত থেকে সে চারা নিয়ে আসে। হরনামি অন্যের মেশিনেই চারা কাটিয়ে নেয়। গোবর কুড়োবার কাজ আগের মতোই করে যায়। মোষের দুধ থেকে দই বানিয়ে বিক্রি করে। ঘি বাঁচলে, তা অবশ্য চলে যায় অর্জুনের পেটে। দুধতো যায়ই। অর্জুনের যাতায়াতে এখন আর কোনও অসুবিধে নেই। পাড়াপড়শিরাও কিছু বলে না। ব্যাপারটা সবার গা-সওয়া হয়ে গেছে। প্রীতমের মা বলে, 'আমাদের আর বলার কী আছে? যে যা ভাল বুঝবে, করবে। সাতেও নেই, পাঁচেও নেই—এই বেশ আছি।'

গিন্দর ঘরে থাকলেও অর্জুনের প্রবেশ অবাধ। ভয়ের কিছু নেই। হিতাকাঙ্খীর ভূমিকা। গিন্দরের সামনাসামনি হলে সৎশ্রী আকাল জানায়। গিন্দর জবাব দেয়: 'সৎশ্রী আকাল।'

তারপরই, মাথা হেঁট করে গিন্দর পুঁথির পাতা ওল্টায়। হরনামি অর্জুন মুচকি হাসে। একদিন অর্জুন বলে:

'শালার মাথাটা গেছে!'

'তাতে আমারই কপালটা পুড়েছে।' হরনামি মন্তব্য করে।

দেখতে দেখতে গিন্দর আরও বদলে যায়। পুঁথিপত্তর কোথায় যেন ফেলে দেয়। হঠাৎ একদিন তাকে দেখা যায়, মাথায় কালো পাগড়ি, পরনে হলদে কুর্তা, শাদা পায়জামা —পায়জামাটার জায়গায়-জায়গায় ছেঁড়া-ফাটা, কোমরের দড়ি হাঁটুর কাছে ঝুলছে! কুর্তাটায় আবার রঙ-বেরঙের তালি। দুই কবজিতে লোহার বালা, রাবারের চুড়ি, দুহাতের আঙুলে পেতলের আংটি। হাতে বাঁশের লাঠি ধরার কায়দায় কাঠের একটা লম্বা টুকরো— তার ওপর আবার তামার তারের প্যাঁচ দেওয়া। প্যাঁচের ফাঁকে-ফাঁকে ময়ূরকণ্ঠী নকশা। অন্য হাতে আবার লোহার তার প্যাঁচানো একটা টিনের কৌটো। টিনটা বালি দিয়ে ঘসে চকচকে করে মাজা। কেউ চা বা লস্‌সি দিলে, সে টিনটা বাড়িয়ে দেয়। তবে কৌটোর মধ্যে জল সব সময় থাকে। চৌপাল, পরাগদাসের ডেরা কিংবা নালার কাছে যে সাঁকো—যেখানেই থাক না কেন, ওই কৌটো থেকেই জল খায় অল্প-অল্প করে।

এখন আর অতটা চুপচাপ থাকে না। দুপুরে পথ চলতে-চলতে নিজের মনেই গুনগুন করে গান গায়। কবিতার পদ বা শব্দ সাজায়। একটি পদ শুনে কেউ শাবাশ দিলে, সে পরের পদ নিজেই তাৎক্ষণিক সংযোজন করে মুখে 'জয় গোবিন্দ' বলে।

তার রকমসকম দেখে কেউ হাসে, কেউ গালাগাল দেয়: 'বোকাচোদা! ঘর সামলাতে পারিস না—আবার গান গাস্— যা যা গান্ডু—পারলে ঝান্ডার ভাইয়ের মুন্ডুটা উড়িয়ে দে—শুয়োরের বাচ্চাটাই তো তোর বউকে 'ঝেড়ে' খাল করে দিয়েছে!'

গিন্দর এসব কথার কোনও জবাব দেয় না। লজ্জাও পায় না, কেমন যেন অর্থহীন মনে হয় কথাগুলো। অবশ্য, অর্থময় হলেও কিছু করার ছিল না। কেননা, হরনামির জন্যেই তো এ-সব হয়েছে। শরীরী জ্বালায় জর্জরিত হরনামি কী বুঝবে সংসার স্বামী বা সন্তান কী জিনিস। প্রচন্ড শরীরী-ক্ষুধা ছাড়া অন্য সব কিছুই তার অজানা।

প্রথম দিকে গিন্দরের পাগলামো দেখে গাঁয়ের ছোট ছেলেরা পেছনে লাগত, রগড় করত। কিন্তু, গিন্দর যেদিন এদের একজনের হাত ধরে মুচড়ে ভেঙে দেয়—সেদিন থেকে আর কেউ পেছনে লাগে না। পাগলকে বিশ্বাস নেই। রেগে গিয়ে এর পর যদি কারও ঠ্যাং ভেঙে দেয়! কিংবা অন্য কোনও চোট দেয়? হাতে তার সব সময়েই একটা লাঠি থাকে। গিন্দর যে ছেলেটির হাত ভেঙে দেয়, তার বাবা রেগে গিয়ে প্রচন্ড পিটুনি দিয়েছিল গিন্দরকে। লোকে যে-ভাবে জানোয়ারকে মারে, সেইভাবেই মেরেছিল। কিন্তু পাগল পিটিয়ে কী হবে? এই বোধটুকু হয়নি। তবে, এতে একটা কাজ হয়েছিল। এর পর থেকে কেউ আর গিন্দরের পেছনে লাগেনি।

গ্রীষ্মকাল। বেশ গরম। চারদিকে খটখটে শুকনো। খালের জল আটকানো। সাঁকোর নিচে সামান্য জল চিকচিক করে। খালের মধ্যে একটা খাঁজে জলটা আটকে আছে। যার জন্যে খাল বন্ধ হলেও জল অদৃশ্য হয়নি। পনেরো কুড়ি দিন একভাবে থাকে। এই সময়

একদিন নাজর সাঁকো পার হতে গিয়ে দেখে, সাঁকোর ঠিক নিচে ডোবাটার কাছে গিন্দর আড়াআড়িভাবে পড়ে আছে। নড়াচড়া করছে না। নাজর কয়েকবার ডেকেও সাড়া পায় না। এবার একটি ছোট ঢিল ছোঁড়ে গিন্দরের দিকে। তবুও কোনও সাড়া আসে না। অগত্যা, নাজর নেমে আসে। গিন্দর অচৈতন্য হয়ে পড়ে আছে। নাকে হাত দিতে নাজর টের পায়, খুব ধীরে ধীরে নিঃশ্বাস পড়ছে। সে তাড়াতাড়ি এক আঁজলা জলের ঝাপটা দেয় গিন্দরের চোখেমুখে। আরও কয়েকবার ঝাপটা মারতে গিন্দরের নিঃশ্বাস স্বাভাবিক হয়। জ্ঞান ফিরতে সে উঠে বসে। নাজর জিজ্ঞেস করে, 'এখানে কি করছিলি?'

'ঘুমচ্ছিলাম।'

'বলিহারি ঘুম! একেবারে মড়ার ঘুম! চল—বাড়ি চল।' নাজর হাত ধরে ওঠায়।

'বাড়ি? কার বাড়ি?' গিন্দর পিটপিট করে তাকায় নাজরের দিকে। কেমন যেন হতবুদ্ধি হয়ে যায়।

'কার বাড়ি আবার? তোর বাড়ি। চল—তোকে হরনামির কাছে পৌঁছে দিই।' নাজর ততক্ষণে দাঁড় করিয়ে ফেলেছে গিন্দরকে।

'হরনামি?' গিন্দর নামটা শুনে যেন অবাক হয়ে যায়।

'হরনামি—তোর মাগ রে, শালা!'

কথাটা শুনে গিন্দরের ঠোঁটে একটা লাজুক হাসি দেখা দেয়।

নাজর বলে চলে, 'চল তোকে তোর মাগের কাছে পৌঁছে দিই। পা চালা দিকিন এখন।'

ওরা গ্রামে পৌঁছে যায়। নাজর গিন্দরের বাড়িতে আসে। হরনামি একাই ছিল বাড়িতে। নাজর গিন্দরকে খাটের ওপর শুইয়ে দেয়। হরনামির উদ্দেশে বলে, 'ওর ওপর একটু নজর রাখা দরকার। আজ তো মরতে বসেছিল খালের নিচে। কোনও ক্রমে তুলে এনেছি। ওইভাবে কতক্ষণ ছিল, কে জানে। আর খানিকক্ষণ থাকলে ... ভাগ্যিস, দেখতে পেয়েছিলাম। পতিদেবতার ওপর একটু নজর রাখবে তো ভাবিজি!'

হরনামি নাজরকে কথা শেষ করতে দেয় না। ঝাঁজিয়ে ওঠে: 'যাও—যাও—জ্ঞান দিতে এসো না! ঘাটের মড়াটা মরলে আমার হাড় জুড়োয়!'

নাজর হেসে ফেলে হরনামির তিতি-বিরক্ত ভাব দেখে। জবাব দেয়, 'তাহলে এই বেলা কারওর গলা ধরে ঝুলে যাও!'

'ওরে আমার পিরীতির নাগু! তাহলে তোমার গলা ধরেই ঝুলি? এতই যদি ইচ্ছে—তাহলে কাগজ নিয়ে এসো, ছাপ্‌পা মেরে দিই—তোমার বউ করে বাড়ি নিয়ে যাও আমাকে!' রসিকতা করেই হরনামি জবাব দেয়। পিঁড়ি টেনে দেয় বসতে। তারপর বলে, 'আগে একটু চা খেয়ে নাও দেবরজি—পরে ঝগড়া!'

নাজর এক বাটি চা গিন্দরের কাছে নিয়ে যায়, 'নে—চা খা।'

হরনামি বলে ওঠে, 'আগে তুমি খেয়ে নাও। আমি বরং পরে আর এক বাটি করে দেব। উনুনে আঁচ আছে।'

নাজর চা খেয়ে, হরনামির সঙ্গে আরও কিছুক্ষণ ফষ্টিনষ্টি করে চলে যায়।

এগারো

নাজর কয়েকদিন ধরে ভেবে চলে। একটা কথা কিছুতেই তার মাথায় ঢোকে না। গিন্দরের বউ কী সত্যিই নতুন করে সংসার পাততে চায়? চিন্তা করতে করতে মনটা কেমন যেন বিবাগী হয়ে পাখির মতো উড়তে থাকে খোলা আকাশে। হরনামির মতো কেউ যদি ওর সঙ্গে ঘর বাঁধে. তাহলে সারা জীবনটাই বদলে যাবে। হরনামির কথাগুলো বার বার ধাক্কা দেয় মনের মধ্যে। পর মুহূর্তে মনে হয় হরনামির মতো বদনামি মেয়েকে কতটা ভরসা করা যায়? স্রেফ, ইয়ারকি মেরেছে হয়তো। মুখে যা এসেছে বলেছে। মনের কথা বোধহয় নয়।

হরনামির ব্যক্তিগত জীবনের কথা ভেবে নাজর একটু বিষণ্ণ হয়। একটা সহমর্মিতা আসে। স্বামীটাতো আস্ত পাগল। ও রকম লোককে নিয়ে তো সংসার করা যায় না। বেচারা হরনামির দোষ কী? অন্যের কাছে আশ্রয় চাইবে, এইটাই তো স্বাভাবিক। দেহমনের একটা ধর্ম আছে, স্বামী কাকে বলে বেচারা জানে না। স্বামী সম্বন্ধে ভাবতে গিয়ে নাজর নিজের কথাও ভেবে ফেলে। হরনামির স্বামী হতে পারলে তো স্বর্গের দোলনায় দোল খাবে সে। একবার যদি হরনামি রাজি হয়ে যায়। একবার যদি !

গাঁয়ে তার পরিচিতি 'ভেড়াওয়ালা নাজর', অথবা শুধুই 'ভেড়াওয়ালা'। নাজরের বাবা মঙ্গলও ভেড়া চরাত। মঙ্গলের দুই ছেলে। বড় খাজান চাকরি করে পুলিশে। মাঝেমধ্যে গাঁয়ে আসে বুড়ো বাপকে দেখতে। নাজরই এখন ভেড়া চরাবার কাজ করে। জায়গাজমি নেই বললেই চলে। মেরে কেটে তিন চার বিঘে। জমিজমা কম ব'লে, দুই ভাইয়ের বিয়ের সম্বন্ধ আসে না। খাজানের বয়েস তিরিশের ওপর। বিশ-একুশেই জাঠ ছেলেদের বিয়ে যাওয়ার কথা। না হলে, সারা জীবনই অবিবাহিত থেকে যেতে হয়। শুধু জমি-জমা নেই বলে নয়, বিয়ের সম্বন্ধ না আসার আর একটি কারণ, ভেড়া চরাবার কাজ। খানদানি জাঠ বাড়ির ছেলেরা ভেড়া ছাগল চরাবার মতো ছোট কাজ করে না। এ কাজ ছোট জাতের লোকেদের জন্যে।

নাজরের ভেড়ার গোয়াল গাঁয়ের বাইরে। মাটির ভিতের ওপর উঁচু কাঁটা-তার লাগানো বেড়া, যাতে কোনও ভেড়া গলে বাইরে না যায়। অবশ্য গলে যাওয়ার কোনও উপায় নেই, কেননা তিন দিকেই ইট দিয়ে গাঁথা কাঁচা দেওয়াল। মজবুত তক্তা দিয়ে বানানো দরজা, তালাচাবির ব্যবস্থা। নাজর সব পাকাপোক্তভাবে করে রেখেছে।

নাজরের ইয়ারদোস্তরা এখানে বসেই মদ খায়। বড়সড় জায়গা, কোনো অসুবিধে হয় না। খাসির মাংস রান্নাবান্নাও হয়। এসব কাজ দেখাশোনা করে জগিরা। বিনা পয়সায় আকণ্ঠ মদ আর পেট ভরে মাংস খেতে পারলেই সে খুশি।

জগিরা, জাতে নাপিত হলেও, কাজ করে ঘরামির। বাবা নেই। মা বেঁচে। ঘরামির কাজ ছাড়াও জগিরা বিয়ে-থায় ম্যারাপ বাঁধার কাজকর্ম করে, মার সঙ্গে বাসনকোষনও ধোয়াধুয়ি করে। ভিন গাঁয়েও সে কাজ করতে যায়। ফাঁকে-ফাঁকে জাঠেদের খেতেও জনমজুরি করে। পারিশ্রমিক হিসেবে পায় ফসলি বীজ কিংবা চারা। বাড়িতে একটা মোষও আছে। সংসারটি বেশ গোছানো। বিয়ের কথা একবার পাকা হলেও, শেষ অবধি আর হয়নি। সন্ধ্যেবেলাতেও বাড়িতে রুটি হয়। সম্পন্ন গৃহস্থদের মতোই মক্কার কিংবা ভাল

আটার রুটি খায় গরমকালে। শীতকালে মোটা বজরার খিচুড়ি। লস্‌সি তো আছেই। তরকারিও হয় উপযুক্ত পরিমাণে। এই ধরনের খাওয়াদাওয়া হলো বড়লোকী ব্যাপার। গরিবদের খাদ্য বলতে সকালে একবারই ছোলার দানা দিয়ে বানানো রুটি।

ভাইরূপার ধীচর একদিন আসে নাজরের গোয়ালে। সঙ্গে এক বাজারি মেয়ে। মদ মাংসে আসর জমে ওঠে। ধীচর এই এলাকার নাম করা গুন্ডা। পেশা, মেয়েদের বাড়ি থেকে ফুসলিয়ে বের করে এনে বেচে দেওয়া। আশপাশের সব গাঁয়েরই অবাধ যাতায়াত আছে। সাগরেদরা ধীচরের জন্যে হন্যে হয়ে বসে থাকে।

হরনামি-অর্জুনের কথা নাজরের জানা। শুধু নাজর কেন, ওদের গোপন সম্পর্কটি সবারই জানা। অর্জুনের বউদি বান্তি বেজায় কান্নাকাটি ঝগড়াঝাটি করে রণে ভঙ্গ দিয়েছিল। অর্জুন তার হাতের বাইরে চলে গেছে। ঝান্ডা কিন্তু বিচলিত হয়নি, বরং খুশিই হয়েছে। হরনামি অর্জুনকে কব্‌জা করে একপক্ষে ঝান্ডারই উপকার করেছে। অর্জুন বাড়িতে আসে না। ভালই, তাতে বাড়ির শান্তি নষ্ট হয় না। মদ গেলে হরনামির বাড়িতে। এখানে কোনও ঝুট ঝামেলার বালাই নেই। শোনা যায়, অর্জুন হরনামিকে ভাল রকমই দাবিয়ে রেখেছে। বার দুয়েক মারধোরও করেছে। ইদানীং, হরনামিকে খেতেও দেখা যায় না। ঘরের মোষটা অবশ্য আগের মতোই আছে। সাত বিঘে জমি এখন কড়ারে দেওয়া। কড়ারী এক বিঘে জমিতে নিড়েন দেয়, দু বিঘেতে চারা পুঁতেছে, এক বিঘেতে মক্কা ফেলেছে। হরনামিকে কড়ারী যে ভূসি পাঠায়, তাতেই মোষের চলে যায়।

নাজর একদিন হরনামির কাছে আসে। শীতকাল। ভোরের দিকে বেশ কুয়াশা। নাজর আসে দুপুরে। ফসল কাটার কাজ চলছে। সবাই খেতে। বাড়িতে মেয়ে বউ বুড়োবুড়ি ছাড়া, এই সময়টায় আর কেউ থাকে না। খেত-খামারে এত কাজ যে লোক মরার ফুরসৎ অবধি পায় না। এই মৌসুমে যদি কোনও জাঠ-চাষির মা মরে, সে তাহলে মাকে কোনও লাশ ঘরে ফেলে রেখে দেবে এখন। ক্রিয়াকর্ম তো দূরের কথা!

হরনামি খাওয়াদাওয়া সেরে বাসন মাজতে বসে। তারপর, ধোয়া বাসন রোদে রেখে শুকিয়ে নেয়। গিন্দর ঘরে নেই। নাজর ঢোকে: 'সাসরিকাল! সব ভালো তো?'

'আরে তুমি! এসো, এসো—রুটি খাবে?'

'খেয়ে এসেছি।'

'পিঁড়িটা টানো। চা?'

পিঁড়ি টেনে নাজর বসে। জিজ্ঞেস করে, 'গিন্দর কোথায়?'

'বাড়ি নেই। আজ চারদিন ধরে বেপাত্তা। মরে টরে গেছে বোধ হয়।'

'উহুঁ। মরে গেলে ঠিক খবর পেতে।'

'তাহলে বাবাজির আখড়ায় বসে আছে।' হরনামি ঠোঁট ফোলায়।

'একটা কথা জিজ্ঞেস করব?' নাজর একটু কাছে সরে আসে।

'একটা কেন? দশটা কথা জিজ্ঞেস করো!'

'সেদিন আমাকে যে কথাটা বলেছিলে, ওটা কী তোমার মনের কথা?'

'কোন কথা?'

'ওই যে, 'কাগজ নিয়ে এসো, আমাকে তোমার বউ করে নিয়ে যাও—'

'হ্যাঁ। মনে পড়েছে। মনের কথাই বলেছিলাম তোমাকে। তা, হঠাৎ এ কথা?'

জবাব শুনে নাজর হতবুদ্ধি হয়ে যায়। আস্তে আস্তে জিজ্ঞেস করে, 'কিন্তু, আমার কাছে তুমি আসবে কী করে?'

'কেন?'

'অর্জুন ছাড়বে তোমাকে? রাগ কোরো না—তোমার আর অর্জুনের ব্যাপারস্যাপার সবার জানা।'

'জানা তো কী? অর্জুন তো ফালতু!'

'মানে?'

'মানে আবার কী? অর্জুন তো আমাকে ওর বাড়িতে তুলতে পারবে না। ওকে ভরসা করি কী করে?'

'কিন্তু অর্জুন তো তোমার কাছেই পড়ে থাকে চৌপহর—ভাগ্যি ভাল এখন নেই, কখন এসে পড়ে!'

'এতই যদি ভয়, তাহলে এলে কেন?'

'সত্যি বলতে কী, তোমার কথাটা আমি এই কদিন ধরে ভেবেছি—সত্যি বলেছ না ইয়রাকি করেছ, ধরতে পারিনি। আজ তাই না এসে আর পারলাম না।'

'এলেই যখন তখন হিম্মতটা একবার দেখিয়ে দাও!'

'তুমি সাহস দিচ্ছ যখন, তখন বলি—অর্জুনকে আমি ঠিক 'মেরামত' করে দেব। একটু সবুর করো।'

'আমি তো ওকে বিয়ে করতে তৈরি ছিলাম। কিন্তু শালা বলে কী, বিয়ে থা করবে না, এমনি যাতায়াত করবে। মজা আর কী!'

'অর্জুন তোমাকে বিয়ে করতে চাইছে না কেন?'

'কেন আবার —ওর দাদা-বউদির জন্যে! দশ বিঘে জমির মালিক অর্জুন। বিয়ে করলেই ছেলেপুলে হবে। জমির ভাগ দিতে হবে। যার জন্যে, ওর দাদা-বউদি অর্জুন বিয়ে করুক, এটা চায় না। অর্জুন এদিক-ওদিক করে বেড়ালে তো ওর দাদা-বউদির পোয়া বারো।'

'তাহলে, তুমি এই ধর্মের ষাঁড়কে ছাড়ছ না কেন?'

'আমি ছাড়লে কী হবে? ও শালা কী আমাকে ছাড়ান দেবে? আমাকে এখন ভয়ে -ভয়ে থাকতে হয়। অন্য কারওর ওপর নজর দিলে আমার ঠ্যাং ভেঙে দেবে বলে শাসিয়েছে। আমি যেন ওর কেনা বাঁদি!'

'তুমি যদি ঠিক থাকো, তাহলে অর্জুনকে আমি টিট করে দিই।'

'আমি ঠিক থাকব। আমাকে যে ঘরে নিয়ে যাবে, তার জন্যে আমি সব করতে রাজি। অর্জুন তো শালা কুত্তার বাচ্চা, স্রেফ হাড় মাংস চিবোতে পারে। এখন তো আমার ঘাড়ে বসে খায়। মদ খাওয়ার টাকা অবধি আমার কাছ থেকে নেয়।'

নাজর পিঁড়িতে বসে এক টুকরো কাঠ তুলে ঘোরাতে থাকে। হরনামি চা করে। দু জনে চা খাচ্ছে, এমন সময় খেত থেকে আসে ছোটে। মাথায় ভূসির বস্তা। ছোটে মোষটাকে

দেখাশোনা করে। সে বস্তাটা ঝুপ করে ফেলে নিজের ঘাড়ে-মাথায় হাত বুলোতে থাকে। পাগড়িটা খুলে ফেলে, তারপর আবার পাটে পাটে বাঁধতে থাকে। ভাবে, অর্জুনের জায়গাটা এই নতুন লোকের—নাজরের দখলে, চলে গেল কেমন করে।

হরনামি, যে চা বেঁচেছিল, তাতে একটু দুধ মিশিয়ে ছোটেকে দেয়। খেতের খবরাখরব নেয়।

নাজর উঠতে-উঠতে ছোটেকে বলে, 'এত কম ভূসিতে কিছুই হবে না রে! আর একটু বেশি তুলে আনলি না কেন?'

'এই আনতেই আমি কাৎ হয়ে গেছি, আর একটু বেশি হলে চিৎপটাং হয়ে যেতাম!'

ছোটের কথায় দুজনেই হেসে ওঠে। নাজর বেরিয়ে যায়।

বারো

নাজর হরনামির কাছে এসেছিল, খবরটা অর্জুনের কানে যায়। শোনে অনেকক্ষণ ধরে গল্পসল্পও হয়েছে। পরের দিনই সে হরনামি আর ছোটেকে পাকড়াও করে। ছোটে একটু সকাল-সকাল বেরিয়েছিল খেত থেকে ভূসি আনার জন্যে। অর্জুন তাকে দেখতে পেয়েই টেনে নিয়ে যায় শিরীষ গাছটার নিচে। কোনও ভণিতা না করেই জিজ্ঞেস করে, 'নাজর কখন এসেছিল রে?'

'জানি না। খেত থেকে গিয়ে দেখি নাজর বসে।'

'ওরা কী কথা বলছিল।'

'চা খাচ্ছিল। কথা বলছিল না।'

'উঠল কখন?'

'আমি যেতেই। আমাকে বলল, এত কম ভূসিতে কাজ হবে না, আরও বেশি করে আনলাম না কেন?'

'তুই কী জবাব দিলি?'

'এর চেয়ে বেশি হলে আমি পড়ে যেতাম!'

'এর আগে নাজরকে আসতে দেখেছিস কখনও?'

'না। তবে, একবার গিন্দরকে বাড়ি পৌঁছে দিতে এসেছিল।'

'কেন?'

'তাতো জানি না। তবে শুনেছি গিন্দর খালের নীচে মড়ার মতো পড়েছিল।'

'সেদিনও হরনামির সঙ্গে কথাবার্তা হয়েছিল?'

'দু চারটে কথা।'

'কিন্তু, ভেড়ার গু-টা আবার এলো কোন মতলবে?'

'তাতো জানি না। হরনামি জানে।'

ছোটে খেতে যাওয়ার জন্যে ব্যস্ত হয়ে ওঠে। ব্যাপারটা ঠিক ধরতে পারে না। অর্জুন আটকায়, 'শোন। একটু নজর রাখিস—শালা ফের আসে কী না একটু দেখবি। তোকে মাল খাইয়ে দেব—'

'আমি তো মদটদ খাই না। তবে, নাজর এলে তোমাকে জানিয়ে দেব, বড় ভাই।'

ছোটে খেতের দিকে হাঁটা দেয়।

অর্জুন ফিরে আসে তার ঘরে। এখনও তেমন বেলা বাড়েনি। বোতলে এখনও তলানি কিছু পড়ে আছে। অর্জুন এক ঢোকে সেটা খেয়ে ফেলে। খাটের ওপর বসে ভাবতে থাকে। কুত্তি মাগিটা তাকে খেলাচ্ছেনা তো? জিজ্ঞেস করবে ভেড়াওয়ালা কেন এসেছিল? হরনামিকে বলবে, নাজর যেন না আসে? কিন্তু, নাজরই বা হঠাৎ এলো কেন? তার আর হরনামির সম্পর্কের কথা তো সবাই জানে। নাজর তাকে টপকে হরনামির কাছে এলো কেন? শুয়োরের বাচ্চা—আমাকে চেনে না! মেরে দাঁত ভেঙে দেব!

আর একটু মদ খেয়ে নেয় অর্জুন। ভাইঝি কৌলি একটা থালায় দুটো বেসনের রুটি, মাখন আর এক গ্লাস টক লস্‌সি নিয়ে ঢোকে: 'কাকু এটা খেয়ে নাও। দেরি করলে রুটি ঠান্ডা হয়ে যাবে। মা পাঠালো—'

ভাইঝির কথায় অর্জুন একটু হাসে। কিন্তু, নাজরের ব্যাপারটা মাথায় ঘুরপাক করছে। কিছুতেই যাচ্ছে না। ভাবে: যত নষ্টের মূল হরনামি—নচ্ছার মাগি! আমি তো ওর বারোটা বাজিয়ে দিয়েছি, এখন কী নতুন ব্যাটাছেলে ধরার তালে আছে? ধরুক দেখি একবার। ঠ্যাং ভেঙে দেব একেবারে। না, হরনামিকে দোষ দিয়েই বা লাভ কী? আমার জন্যেই তো নিজের স্বামীকে ছাড়ল। পরাগদাসের জড়িবুটি দিয়ে তাকে পাগল অবধি করে দিল। কিন্তু, আমার জন্যে এত কিছু করে—শেষ অবধি অন্য ব্যাটাছেলে ধরবে? না, এ হতেই পারে না। তবে, মেয়েছেলের জাত, বিশ্বাস নেই। আর এক ঢোক মদ খেয়ে অর্জুন রুটি মাখন খেয়ে নেয়। লস্‌সিটা পড়ে থাকে। হরদিৎকে ডাকে। হরদিৎ বোধ হয় বাড়ি নেই, কেননা ডাক শুনে কৌলি আসে। কৌলিকে এক লোটা জল আনতে বলে সে। জল খেয়ে, চাদরে মুখ-মাথা ঢেকে শুয়ে পড়ে। একটু পরেই ঘুমিয়ে পড়ে।

দুপুরের রুটি আর খাওয়া হয় না। কৌলি অবশ্য ডেকেছিল, কিন্তু অর্জুনের ঘুম ভাঙেনি। সে পাশ ফিরে আবার শুয়ে পড়েছিল। যখন ঘুম ভাঙে, তখন বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যে হয়ে গেছে। অর্জুন উঠে হাত মুখ ধুয়ে, পাগড়িটা নতুন করে পরে। তারপর গায়ে একটা চাদর জড়িয়ে, হাতে একটা পাত্র নিয়ে বেরিয়ে যায়। প্রথমে, চৌপালে গিয়ে একটা তক্তার ওপর কিছুক্ষণ বসে। একটু সন্ধ্যে হতেই সে যায় ধিবরের ঠেকে। ধিবর বাড়িতেই ছিল।

'গোটা তিনেক ডিম দে। পয়সা পরে। মালপানি আছে?'

'মাল? একদম টাটকা আরজন্‌ ভাই! কালকেই এনেছি—এখনও আগুনের মতো গরম—একটু চেখে দেখো না!'

ডিম আর মদ নিয়ে অর্জুন আসে হরনামির বাড়ি। হরনামি রুটি বেলতে ব্যস্ত। একটু দূরে ছোটে দাঁড়িয়ে। ছোটের সঙ্গে কথা বলছিল হরনামি। অর্জুন দরজার কাছে দাঁড়িয়ে গলা খাঁকারি দেয়।

'ভালমান্ষের ছেলে এসে গেছে!' হরনামি হেসে কথাটা বলে ওঠে। ছোটেও হাসে।

'হাসবার কী আছে রে শালী?' অর্জুন রেগেই জবাব দেয়।

হরনামি কাছে এসে ওর মুখের গন্ধ শোঁকার ভান করে, তারপর নাটকীয় ঢঙে বলে, 'তাই বলি, ভালমান্ষের ছেলেটার এমন মূর্তি কেন! তা, আর একটু চলবে?'

হরনামি অর্জুনের হাত ধরে ওকে বসার ঘরে নিয়ে যায়। লণ্ঠন জ্বালে।

তারপর বাইরে এসে এক লোটা জল, আর দুটি খালি বাটি নিয়ে আবার ঢোকে। অর্জুন খপ করে ওর হাতটা ধরে ফেলেঃ 'একটু খেয়ে নে মাইরি! তোর সঙ্গে আমার একটা কথা আছে।'

'তার আগে আমি রুটি বানিয়ে আসি।'

'রুটি? খিচুড়ি বানাসনি কেন? আর, ওই ছোটেটাকে কাটিয়ে দে।'

অর্জুন এক বাটি মদ হরনামির দিকে এগিয়ে দেয়। অন্য বাটিটায় নিজে চুমুক দেয়। গুনগুন করে একটা গানও গায়। হরনামি ততক্ষণে উনুনের দিকে চলে গিয়ে রুটি সেঁকে। মুগের ডাল ঘোটে। তারপর, একটা থালায় তিনটি রুটি, এক বাটি ডাল ছোটেকে দেয়। চটপট করে আরও ছ-সাতটা রুটি সেঁকে ফেলে। ছোটে জল চাইতে, ডালের বাটিতেই জল দেয় হরনামি। তারপর এক বাটি দুধ দেয়, 'ছোটে— মোষটাকে খাইয়ে যাস—'

ছোটে চট করে মোষের কাছ থেকে ঘুরে এসে দুধের বালতিটা নিয়ে যায়। হরনামি এক গামলা ডালে কিছু মাখন ঢেলে ছোটেকে দিয়ে বলে, 'একটু দাঁড়া—কুকুর বেড়ালের জন্যেও একটু রেখে দিস, হ্যাঁ?'

ছোটেকে নির্দেশ দিয়ে হরনামি ফিরে আসে বসবার ঘরে। অর্জুন মদের মধ্যে ডিম ফাটায়। হরনামির দিকে মদের বাটিটা এগিয়ে দেয়। হরনামি নেয় নাঃ 'তুমি খাও। আমার এখনও অনেক কাজ পড়ে আছে। দুধ দুইতে হবে, তাছাড়া ছোটে এখও যায়নি—'

অর্জুন হরনামির হাত ধরার চেষ্টা করে। হরনামি হাওয়ার মতো সাঁ করে কেটে বেরিয়ে যায়। অর্জুন অগত্যা দু চামচ ডাল মুখে দেয়। স্বাদ পরীক্ষা করে। মদটা বেজায় কড়া। বাটির মধ্যে মদ পড়ে থাকে। ডালের বাটিটা একটু বড়। অর্জুন কি ভেবে ডালের বাটিতেই মদ ঢালে। হরনামি মোষ দুইতে থাকে। বালতিতে কাঁচা দুধ ঝরে। হরনামি দুধটা একটা হাঁড়িতে ঢেলে, হাঁড়িটা বারান্দায় ঝুলিয়ে রাখে। তারপর, জ্বাল দেওয়া দুধের হাঁড়িটা নামিয়ে, বাটিটা ছোটেকে দেয়।

দুধ ঢালার কাজ হয়ে যাওয়ার পর, হরনামি রুটিগুলোকে একটা চুপড়ির মধ্যে রেখে, চুপড়িটা ঢুকিয়ে দেয় দেওয়াল-সংলগ্ন একটা ছোট আলমারিতে। পাল্লা দুটোয় শেকল তুলে এবার ডালের বটুয়াটা রাখে উনুনের ওপর। বারান্দায় দুটো ইটের ওপর দুধের হাঁড়ি রাখে। ইট দুটো এমনভাবে রাখে যাতে হাঁড়ি গড়িয়ে না পড়ে।

ছোটে চলে যেতে হরনামি আবার বসবার ঘরে আসে। অর্জুন চুপচাপ কড়িকাঠের দিকে তাকিয়ে বসে আছে। হরনামি একটু ঘেঁষাঘেঁষি হয়ে বসে: 'হ্যাঁ, এবার বলো—কী বলবে বলছিলে?'

অর্জুন ঠিক হয়ে বসে। বাটিতে একটু মদ ঢেলে, জল মিশিয়ে হরনামিকে দেয়। অর্জুনের গায়ে মদের ভুরভুরে গন্ধ। 'খেয়ে নে—ভাল মাল।' দু চামচে ডাল মুখে ফেলে, হরনামি লাস্যময়ী ভঙ্গিতে তাকায় অর্জুনের দিকে। চোখে পিঁয়াজ-রং একটা আভা ঝিলিক দেয়। অর্জুন ততক্ষণে আর এক বাটি মদে চুমুক মারে। মদটা গলায় যেতেই একটা শুকনো কাশি আসে। ডিম শেষ হয়ে গেছে। হরনামির কাছ থেকে একটু সরে বসে সে। আচমকা প্রশ্ন করে, 'কাল এখানে নাজর এসেছিল?'

'কোন নাজর?' হরনামি নির্দোষভাবে পাল্টা প্রশ্ন করে।

'কোন নাজর আবার? মঙ্গলের ব্যাটা ভেড়াওয়ালা!'

'ও। নাজর। বুঝেছি—প্রথমটা ঠিক ঠাওর করতে পারিনি . . . হ্যাঁ, কাল এসেছিল একবার।'

'কেন?' অর্জুন হরনামির কাঁধে হাত রাখে। একটু বেঁকে বসে হাঁটু দুটো জুড়ে দেয়, মাঝেমাঝে ঘসতে থাকে।

'বেচারা হঠাৎ এলো—'

'বেচারা! শালা বহিন্‌চোদ—'

'ওর ওপর এত রাগ কেন তোমার?'

'ও শালাকে তুই চিনিস না। খানকির ছেলেটা একদম জাত-হারামি!'

'ও . . .'

'কেন এসেছিল এখানে? কী বলল তোকে?'

'কী আবার বলবে? গিন্দরের খবর নিয়ে চলে গেল।'

অর্জুন এক দৃষ্টিতে হরনামির দিকে তাকিয়ে থাকে। যেন মনের ভেতরটা দেখতে চায়। না, এভাবে কথা বেরোবে না। কথায়-কথায় আসল কথা বেরোবে।

হরনামি অর্জুনের মনোভাব বুঝতে পারে। ফলে, এমনভাবে কথা বলে যায় যেন নাজরের আসাটা কোনও ব্যাপারই নয়। আরও কিছুক্ষণ নানা কথা বলে হরনামি জিজ্ঞেস করে, 'আর মদ খাবে নাকী?'

'আর মদ কই—ডিমও শালা খতম!'

'খেতে চাইলে এনে দিতে পারি। তাছাড়া, সেদিন যে বোতলটা এনেছিলে, তাতে এখনও কিছু পড়ে আছে।'

'তাই নাকী? আমি তো ভেবেছিলাম তুই সাবড়ে দিয়েছিস!'

'আমি একা-একা কখনও খাই?' ঠোঁট ফোলায় হরনামি। তারপর বলে, 'তুমি ছাড়া আর কেউ আমার সঙ্গে মদ খাচ্ছে, দেখেছ?'

হরনামি বোতল নিয়ে আসে: 'না—আমি আর মদ খাব না—'

'এক বাটি মাইরি—' অর্জুন জোর-জবরদস্তি করে বাটি এগিয়ে দেয়।

মদ খেয়ে অর্জুন বাইরে আসে। হরনামি রুটি বের করে ডাল নিয়ে আসে। অর্জুনের নেশা বেশ জমেছে। রুটি খেতে খেতে আরও মদ খায় সে। হরনামিকে আবার বলে, 'নে একটু মাল খা—'

'না-না-আমি আর পারব না। আমার পা টলছে।'

রুটি খেয়ে হরনামি বসে থাকে। অর্জুন জিজ্ঞেস করে, 'বাসন মাজাটাজা হয়ে গেছে?'

'একটু বাকি আছে। এখন বলো তো বাপু, এখানেই থুম মেরে বসে থাকবে, না বাড়ি যাবে?'

'কাটাবার তাল করছিস? আমার আসার ছিল, এসেছি। কখন যাব না যাব, তা নিয়ে তোর এত মাথা ব্যথা কীসের?'

হরনামি আর কোনও জবাব না দিয়ে খাটিয়া পাতে। অর্জুন উঠে দাঁড়ায়। নেশায় একেবারে টং। হরনামি একটু রসিকতার চেষ্টা করতেই অর্জুন রেগে যায়, 'খজড়া মাগি! এখন আবার নতুন করে নাঙ জোটাচ্ছিস—'

হরনামি টিটকিরি করেই জবাব দেয় সমানে-সমানে, 'জোটাব না তো কী করব? তুই আমাকে কিনে রেখেছিস নাকী?'

'আলবৎ! কেউ তোর গায়ে হাত দিলে আমি তাকে কেলিয়ে ছাড়ব!'

'ব্বাঃ বাঃ! এত রাগ?'

'তবে?'

'কিনে রেখেছিস তো আমাকে তোর বাড়িতে নিয়ে চল। লোককে বল আমি তোর বউ।'

'য়্যাঁ! তোকে বাড়ি নিয়ে যাব কী রে খানকি মাগি! তোকে বিশ্বাস কী? আগে কজনের সঙ্গে শুয়েছিস, কে জানে! এখন কোন ধান্দায় আছিস, আমি বুঝি না মনে করিস?'

এই জাতীয় মন্তব্য কোনও মেয়েই সহ্য করতে পারে না, তা সে যতই বদ হোক না কেন। হরনামি তাই সঙ্গে-সঙ্গে জবাব দেয়, 'এইজন্যেই তোর নাজরকে এত ভয়?'

অর্জুন সঙ্গে- সঙ্গে কান খাড়া করে: 'এই তো পেটের কথা বেরিয়ে পড়েছে! তুই তাহলে এখন নাজরের সঙ্গে ভিড়েছিস?'

'ভিড়েছি তো বেশ করেছি। আমি তোর কেনা বাঁদি নই!' মুখ ফস্‌কে কথাটা বেরিয়ে যায়।

অর্জুন সঙ্গে সঙ্গে প্রচন্ড এক থাপ্‌পড় কশিয়ে দেয় হরনামির কানের ওপর। শাসানি দেয়, 'খানকি মাগি কোথাকার! আমাকে চিনিস না। জান নিয়ে নেব, চোখ উপড়ে দেব তোর—' বলেই একটা ঘুষি বসিয়ে দেয় হরনামির কোমরে। হরনামি ঘুরে পড়ে যায়। কিছুক্ষণ কোমরটা ধরে থাকে, কিন্তু কাঁদে না। অর্জুন এক ঝটকায় ওকে মেজে থেকে টেনে খাটিয়ার ওপর ছুঁড়ে ফেলে। লণ্ঠনটা নামিয়ে দিয়ে বলে, 'দরজার শেকলটা টেনেছিলি?'

তেরো

একটু পরেই অর্জুন চলে যায়। সে যাওয়ার পরই হরনামি উঠে পড়ে। জলের লোটাটা হাতে নিয়ে বেরিয়ে যায়। দরজার শেকলটা টেনে দেয়। তারপর সোজা চলে আসে নাজরের কাছে। নাজর একাই ছিল। হরনামির কাছ থেকে সব খুঁটিয়ে জেনে নেয় সে। হরনামি ফুঁপিয়ে ওঠে: 'আমার পেছনে একেবারে ছিনে জোঁকের মতো লেগে আছে। আজ আমার প্রাণটাই যেতে বসেছিল। জিজ্ঞেস করে নাজর এসেছিল কেন। আমাকে মেরেছে অবধি, এই দেখো—'

নাজর সান্ত্বনা দেয়: 'ঠিক আছে। আমি এর ব্যবস্থা করব। কেঁদ না। চা খাও, ঠিক হয়ে বসো—ঈস্, শীতে একেবারে কুঁকড়ে গেছ দেখছি। চাদরটা নাও ওখান থেকে। ইচ্ছে করলে শুয়ে পড়তে পার—'

মাটির উনুনে আঁচ দিয়ে নাজর কেটলি চাপায়। ঘরের একদিকে সরু ছপ্‌টি, তুলো ধোনার ধুনুচি, পাচন, খেঁটে লাঠি ইত্যাদি জড়ো করা। উনুনের আগুনটা খুঁচিয়ে, জল ফুটলে, তাতে এক মুঠো চা ঢালে। কেৎলির ওপর ঢাকনাটা বসিয়ে দেয়। তারপর, লোটা নিয়ে উঠোনের দিকে যায়। একটা ছাগীর বোঁটার ওপর জল মারে, দুধ দোয়। ফিরে এসে দুধটুকু চায়ের মধ্যে ঢেলে দেয়। দু বাটি চা করে সে। হরনামিও পায়ে-পায়ে খাটিয়া থেকে উঠে আসে। চা খেতে খেতে দুজনে তাকায় পরস্পরের দিকে। উনুনের আগুনে হরনামির চোখে তখন অশনি সংকেত।

নাজর আস্তে আস্তে বলে, 'তুমি অর্জুনকে আর একদিন ঘরে ডেকে আনাও। রাতের দিকে খুব করে মদ গিলিয়ে, মাঝরাতে কোনও একটা ছুতোয় বের করে দেবে। তারপর যা করার আমি করব, তুমি শুধু দেখবে ও-যেন নেশায় চুর থাকে। আর কোনও দিন যাতে তোমাকে বিরক্ত করতে না পারে, সে ব্যবস্থা আমি পাকা করে দেব,' তারপর হরনামির হাত ধরে বলে, 'ধর্ম সাক্ষী— আমি তোমাকে আমার বউ করব।'

'কিন্তু এই ঝামেলা মিটলে, তবে তো?'

'ঝামেলা মেটাবার ভার আমার।'

হরনামি নাজরের গোয়ালঘর থেকে বেরিয়ে পড়ে। এদিক-ওদিক এক ঝলক দেখে নেয়। আশপাশে দু চারজনকে যাতায়াত করতে দেখা যায়। মুখে কাপড় আড়াল দিয়ে হরনামি অন্ধকারের মধ্যে গা-ঢাকা দেয়।

সেদিন নাজর তার ভেড়ার দঙ্গল চরিয়ে নিয়ে যায় ভাইরূপার দিকে। পথের ধারে, একটা ফাঁকা মাঠে ভেড়া ছেড়ে দেয়। বুড়ো এক বটগাছের নিচে বসে সে ভাবতে থাকে। মুঙ্গিয়ার ছেলেও নাজরের সঙ্গে কাজ করে। দুপুরের রুটি চা গুড়— সে সঙ্গে করেই আনে। একটা গাভিন ছাগীর দুধ দুয়ে নিলেই হলো। ভেড়ার সঙ্গে একটা কুকুরও আছে। বাঘের মতো মুখ। দুপুরের দিকে, লোকের ফাঁকা খেতে ভেড়া-ছাগল চরাতে চরাতে নাজর তাদের বসিয়ে দিত বিশ্রামের জন্যে। বিকেলে বেলা পড়লে, চা খেয়ে ওদের নিয়ে ফিরে আসত। কোনও কোনও জমির মালিক, দু তিন রাত ফাঁকা খেত ছেড়ে দিত ভেড়া ছাগল চরাবার জন্যে। ভেড়ার মলে ভাল সার হয়, চমৎকার ফসল ফলে। তবে, রাতে এইভাবে ভেড়া

চারানো ঠিক নিরাপদ নয়। একজনকে অন্তত জেগে পাহারা দিতে হয়। বাঘের ভয়তো আছেই। আর আছে চোরের ভয়। রাতে ভেড়া-ছাগল চুরি করতে এসে মারদাঙ্গা খুনখারাপি হয়েছে, এমন ঘটনাও ঘটেছে। জমির মালিককে অবশ্য ভেড়ার জন্যে টাকা দিতে হয়।

সেদিন দুপুরে চা খাওয়ার পর নাজর ভেড়াছাগল মাঠেই রেখে দেয়। মুঙ্গিয়ার ছেলেকে নজর রাখতে বলে জানায়, 'আমি একটা কাজে যাচ্ছি। ঘন্টাখানেকের মধ্যেই ফিরব।'

ভাইরূপা ওখান থেকে এক কোশের পথ। নাজর সোজা চলে আসে ধীচরের বাড়িতে। সে বাড়িতেই ছিল। ওকে বাড়িতে পাওয়া অবশ্য শক্ত ব্যাপার। সব সময়ে কোথাও-না-কোথাও যায়। গাঁয়ে এলে দু এক রাতের বেশি থাকে না। থাকেও এদিক-ওদিক। ভিন গাঁয়ে হরদম যাতায়াত করে। মেয়ে পটিয়ে চালান করে দেওয়া— ওর বাঁ হাতের খেলা। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বনিবনা না থাকলে, সেই স্ত্রীকে ভাগিয়ে আনা ধীচরের পক্ষে সব চেয়ে সোজা কাজ। এমনভাবে মেলামেশা করে যে, তার মতলব টের পাওয়া যায় না। এতে অবশ্য অনেক বেশি সাহায্য করে ওর সুশ্রী সুদর্শন চেহারাটা। লাঠিখেলা খুব ভাল জানে। সঙ্গে একটা ছোট লাঠি সব সময়েই থাকে। নাজরের ডাকে সে বেরিয়ে আসে। বৈঠকখানায় নিয়ে গিয়ে তাকে বসায়। সব কথা শুনে অভয় দেয়। নাজর অনুরোধ করে, 'তুমি আমার বড় ভাই— একটু কৃপা করো।'

ধীচর জবাবে বলে, 'ঘাবড়াবার কিছু নেই। আমি আমার সাগরেদকে নিয়ে যাব। অর্জুন শালার হাতপা ভেঙে ছেড়ে দেব— শালা যাতে তোর ওপর হামলা করতে না পারে। একদম খোঁড়া করে দেব!'

নাজর আশ্বস্ত হয়ে বলে, 'বড়ভাই— তুমি যা বলবে, আমি তাই করব।'

কথা বলে নাজর ফিরে আসে সেই বুড়ো বটগাছের নিচে। মুঙ্গিয়ার ছেলে অপেক্ষা করছিল। সে একা কোনও ক্রমে ভেড়ার দঙ্গল সামলে রেখেছিল। নাজর আসতে সে হাঁফ ছেড়ে বাঁচে।

গাঁয়ে ফিরে এসে নাজর এবার জগিরার সঙ্গে পরামর্শ করতে বসে। ঘাবড়ে গেলেও জগিরা মুখে সাহস দেখায়: 'তোমার জন্যে জান দিয়ে দেব ওস্তাদ।'

নাজর আর অর্জুন কোনও দিনই মুখোমুখি হয়নি। অর্জুনকে দেখতে পেলে নাজর অন্য পথ ধরে। অর্জুনও নিজের সম্পর্কে গর্বিত। ওর মতো গায়ের জোর, এ তল্লাটে আর কারও নেই। নাজরকে চোখের দাবড়ানিতে সিধে করে দেবে, এই রকম একটা ধারণা তার আছে। হরনামিকে তো আচ্ছা শিক্ষাই দিয়েছে। নাজরের দিকে হরনামি আর টলবে না, বা টলতে সাহস করবে না — অর্জুন এটাই ধরে নিয়েছিল। মাঝে আর একদিন সে হরনামিকে শাসিয়ে এসেছে: 'কী গো— তোমার নাজর আর আসছে না কেন? একবার আসুক— শালাকে মজাটা বোঝাই . . . '

অর্জুন জানে হরনামি তাকে যমের মতো ভয় পায়। অর্জুনের ভাব ভঙ্গিমা সব সময়েই উগ্র উদ্ধত। সোজাসুজি সে বলে দিয়েছে, হরনামির কাছে নাজর যদি আবার আসে, তাহলে তার প্রাণ যাওয়ার আশঙ্কা আছে।

অর্জুন একদিন গ্রামের চৌপালে ফৌজি মিলখার কথাবার্তা শুনছে। সকাল বেলা — রোদের তাত এখনও বাড়েনি। নাজর সেদিন কাজে বেরোয়নি, গ্রামেই কাজকর্ম আছে হয়তো। অর্জুন নাজরকে এদিকেই আসতে দেখে। কাছে আসতে অর্জুন তার দিকে একবার কড়া চোখে তাকিয়ে, আবার মিলখার সঙ্গে কথাবার্তা শুরু করে দেয়। ফৌজি মিলখা একজন ইংরেজ অফিসারের গল্প করে। সায়েব-মেম তাকে নাকী দারুণ পছন্দ করত। নাজরকে দেখে অর্জুন গলা খাঁকারি দিলেও, নাজর আর পেছন ফিরে তাকায় না। আপনমনেই এগোতে থাকে। অর্জুন এবার আওয়াজ দেয়: 'শালা— আশিক!'

ফৌজি মিলখা কথা বলতে-বলতে থেমে যায়। অর্জুন কথা ঘোরায়: 'হ্যাঁ— মেম তোমাকে কি বলল?'

'মেম তো আমার ওপর খুব খুশি। সায়েবের কাছে সুপারিশ করে আমার পাঁচ টাকা মাইনে বাড়িয়ে দিল। প্যারেড করা থেকেও ছাড়ান পেলাম।'

'আরে ফৌজি ভাই — তোমার তো জবাব নেই!' বলেই অর্জুন উঠে পড়ে। অর্জুন যাওয়ার পর আর একজন আসতে, ফৌজি নতুন একটা গল্প শুরু করে দেয়।

চোদ্দ

পৌষের অন্ধকার রাত। পুরো গ্রাম গভীর ঘুমে নিঝুম। অনেক দূর থেকে মাঝে মাঝে কুকুরের ডাক ভেসে আসে। তারপরই নিশুতি। রোজকার কাজ শেষ করে, রুটি খেয়ে ছোটে বাড়ি চলে যায়। ছোটে যেতেই, অর্জুন নিঃশব্দে ঢোকে। হরনামি ডেকে পাঠিয়েছে। বৈঠকখানায় বসে সে চুপচাপ মদ খায়। সামনে একটা থালার ওপর রুটি সাজানো। পাশে দুধ আর দইয়ের বাটি। অর্জুন নিঃশঙ্ক, মনে কোনও ভয় বা খটকা নেই। এমনভাবে খেয়ে যায়, যেন জামাই শ্বশুরবাড়িতে এসেছে। হরনামি যেন বউ। সে মদ খেয়ে যায় এক নাগাড়ে। হরনামি কিন্তু খায় না। মদ শেষ করে অর্জুন রুটি খায়। হরনামি আগে থেকেই মদের বোতল মজুত রেখেছিল। পয়লা চোলাইয়ের কল্‌জে-চেরা মদ। পেটে গেলে মাথাটা ঝাঁকিয়ে দেয়। রুটি খেয়ে আড় হয়ে শুয়ে পড়ে অর্জুন। হরনামি উস্‌কে দেয় অর্জুনকে: 'ফালতু মাল! একদম জলের মতো, তোমাকে দেখে তো মনেই হয় না কিছু খেয়েছ—'

অর্জুনের জেদ চাপে: 'বটে! যা, তোর কাছে যত মাল আছে— সব নিয়ে আয়। মাল খাওয়া কাকে বলে দেখিয়ে দিচ্ছি!'

লণ্ঠনের আলোটা উঁচিয়ে ধরে হরনামি বোতল বের করে; সঙ্গে জলভরা লোটা আর বাটি। অর্জুন প্রথমেই এক বাটি মদ ঢকঢক করে খেয়ে নেয়। হরনামি এবার সামান্য মদ নিয়ে, তাতে জল বেশি দিয়ে নিজে খায়। ভাব দেখায়, খুব নেশা হয়েছে। তারপরই উঠে

যায় গোয়ালের দিকে। মোষটা ঠিক আছে। হরনামি ফিরে এসে আবার একটু মদ খায় আস্তে আস্তে। জলের পরিমাণ অবশ্যই বেশি। অর্জুন একটু অবাক হয়, 'য়্যা— কত খাচ্ছিস রে তুই!'

হরনামি এবার বাটি-ভর্তি মদ অর্জুনের দিকে এগিয়ে দেয়· 'খেয়ে নাও—'

'খাব বই কি— কিন্তু এত তাড়া কেন?'

'তাড়া কই? এইটা খেয়ে কেটে পড়ো বাপু!'

'কোথায় কাটব? য়্যা?' অর্জুন জিজ্ঞেস করে।

'বাড়ি যাও। উঠোনে গিয়েছিলাম না, একটু আগে? আশপাশে সব জেগে আছে। একটু আগে দরজায় খটখট করেছে। তাছাড়া, তোমার নেশা চড়ে গেছে। চুপচাপ বাড়ি যাও, নইলে এখানে হাঙ্গামা হবে।'

'আমি থাকতে হাঙ্গামা হবে? কোন শালার এতো মাজাল আছে? তোর পাশের বাড়ি বলতে তো প্রীতম— ও শালা পারবে আমার সঙ্গে?'

'আজ এখানে একটা ঝামেলা হয়ে গেছে। প্রীতমের মার সঙ্গে আমার ঝগড়া হয়েছে। বলে কীনা, আমি ওর ছেলের মাথা খেয়েছি।' হরনামি ইনিয়ে-বিনিয়ে প্রীতমের মার বিরুদ্ধে কাল্পনিক অনেক কিছু ব'লে হঠাৎ অর্জুনকে সাক্ষী মানে, 'তুমিই তো প্রীতমের মাকে আসল কথাটা বলে দিতে পারো। যাক, আজ যাও— নইলে বদনাম হবে।'

'বদনাম? কে দেবে? সবই তো শালা বহিন্‌চোদ। আমি অর্জুন সিং সর্দার, দেখে নেব শালা— ' বলতে বলতে অর্জুন উঠে দাঁড়ায়। এখনও বোতলে মদ আছে। হরনামি বোতলটা দিয়ে বলে, 'এটা নিয়ে যাও।'

'নিয়ে গিয়ে কী হবে, য়্যা?' অর্জুন বোতল ধরেই চুমুক দেয়। তারপর টলতে টলতে বেরিয়ে পড়ে। সামনের একটা দেওয়ালে বোতলটা ছুড়ে মারে। বেসুরো গলায় গান গাইতে-গাইতে, টলতে-টলতে সে সামনের পথ ধরে এগোয়।

ওইদিন নাজর পাঁঠা কাটে। রান্না হয় গোয়ালঘরে। জগিরাই সব যোগাড়যন্ত্র করে। উনুন ধরানো থেকে মাংস রাঁধা, মদের ব্যবস্থা সবই জগিরা করেছে। এই এলাকায় দুর্দান্ত মদ বানায় সর্বন টুন্ডা। পুলিশের সঙ্গে তার লেনদেন ভালই। দু চার মাস অন্তর পুলিশ আসে হঠাৎ হানা দিতে। লোক দেখানো দু চার ঘা লাথি মারে, কিংবা জুতো পেটা করে। মদ নিয়ে চলে যায় ফুলেতে। তারপর ঘুষ খেয়ে আবার ছেড়ে দেয় টুন্ডাকে। দু একবার কয়েদও খেটেছে মাস তিনেকের মেয়াদে। জরিমানাও দিয়েছে। এসব টুন্ডার কাছে সাধারণ ব্যাপার। শুধু ভয় জেলকে। জুতো-লাথি কোনও ব্যাপারই নয়, কিন্তু জেলে আটকে গেলেই রোজগার বন্ধ। যার জন্যে পুলিশের সঙ্গে তার 'মাসোহারার' বন্দোবস্ত আছে। 'মাসোহারা' সময়মতো না পেলেই পুলিশ ঝামেলা পাকায়। নতুন কোনও 'থানেদার' এলেই টুন্ডা তাকে

বাড়িতে এনে 'খাতির যত্ন' করে। মাসোহারার বন্দোবস্ত পাকা করে নেয়। রীতি অনুযায়ী, নতুন 'থানেদার' এলেই পাঁচ টাকা মাসোহারা বাড়িয়ে দিতে হয়। গ্রামে আরও অনেকে চোলাই বেচে। তবে, সর্বন টুন্ডার ব্যবসাবুদ্ধিটা খুবই প্রখর। ধারে সে মদ বেচে না। দামও একটু বেশি, কিন্তু তার মতো মদ এই এলাকায় আর কেউ বানাতে পারে না। ঝিরঝিরে জলের মতো স্বচ্ছ, নেশা হয় দুর্দান্ত অথচ পচাটে দুর্গন্ধ নেই। বোতল নাড়লে মদের মধ্যে কেমন যেন ঢেউ খেলে যায়। আঙুল দিলে মনে হয় আগুন। সরকারি মদের দোকান ওই এলাকায় নেই। ভাইরূপা যেতে হয় সরকারি মদ কিনতে গেলে। তবে, আশপাশে দারোগাকে পয়সা খাইয়ে জাল ছাপ দিয়ে, 'সরকারি মদ' দিব্যি চলে। পুলিশের সঙ্গে 'বন্দোবস্ত' থাকার জন্যে, পুলিশি-হানার আগেই চোলাই কারবারিরা গাঁ থেকে হাওয়া হয়ে যায়। চোলাই বানাবার যন্ত্রপাতি মাটির নিচে লুকিয়ে ফেলে।

ধীচর আর ধীচরের সাগরেদ কৈলু, নাজরের গোয়াল-লাগোয়া ভেতরের একটা ঘরে জমিয়ে বসেছিল। রাত একটু গভীর হতেই বাইরের ঘরে আসে। সেখানে বসে চারজনেই মদ টানে। মাংস চিবোয়। রান্নাটা দুর্দান্ত হয়েছিল। ধীচর বলে ওঠে, 'ডাল চাই না। মাংসের হাড় অবধি ফেলতে ইচ্ছে করছে না আমার!'

'তাহলে, আর দুটো রুটি নাও, বড় ভাই', জগিরা খুশি হয়ে বলে, 'মাংস ভাল না হলে মদ খেয়ে মজা হয় না।'

ধীচর ঘড়ি দেখে। এগারোটা বাজে। নাজরকে বলে, 'লোক পাঠিয়ে খবর নে, শালা কী করছে।' নাজর তার বারোমাসিয়া মুঙ্গিয়ার ছেলেকে পাঠায় গিন্দরের খিড়কির দিকে নজর রাখবার জন্যে, বলে দেয়, 'কোথাও ঘাপটি মেরে সেঁটে থাকিস, অর্জুন বেরোলেই এখানে এসে খবর দিবি।

মুঙ্গিয়ার ছেলে খাকি রঙের একটা চাদর গায়ে জড়িয়ে বেরিয়ে পড়ে। গিন্দরদের উঠোনের দিকে যে দরজাটা — সেই দরজাটার দিকে নজর রাখতে শুরু করে। কাছেই কোমর-সমান একটা পাঁচিল থাকার জন্যে লুকিয়ে থাকতে অসুবিধে হয় না। গলিতে হঠাৎ কেউ এলে তাকে দেখতে পাবে না। দরজা খোলার আওয়াজ পেতেই সে দাঁড়িয়ে পড়ে। অর্জুন বেরোচ্ছে টলতে-টলতে। মুঙ্গিয়ার ছেলে দৌড়ে চলে যায় নাজরের গোয়ালে।

নাজরের হাতে টাঙ্গি, জগিরার হাতে গাঁটওয়ালা একটা লাঠি আর ধীচরের হাতে একটা ধারালো হেঁসো, কৈলুর হাতে কৃপাণ— চারজনেই বেরিয়ে আসে একসঙ্গে। মুঙ্গিয়ার ছেলে গোয়ালেই থেকে যায়। একটু পরেই ওদের দেখা যায় খালের কাছে একটা কুঁড়ে-ঘরের পেছনে লুকিয়ে পড়তে। অর্জুনের অপেক্ষায় ওৎ পেতে থাকে।

নাজর অবশ্য একটা কথা বার বার বলে দিয়েছে, 'অর্জুনের গায়ে বেজায় জোর। দু চারজনের সঙ্গে এঁটে ওঠা ওরা কাছে কিছুই নয়— ঠিক ঘায়েল করে দেবে।' জগিরাও সায় দিয়েছে নাজরের কথায়। জবাবে ধীচর শুধু অবজ্ঞার হাসি হেসেছে: 'তোদের অর্জুন কী হাতি নাকী? এক হাতে আমি যদি ওকে পটকাতে না পারি, তাহলে আমি বাপের ব্যাটা নই!' নাজর আর একটা কথা বলেছিল, 'ওকে জানে মের না। স্রেফ ঠ্যাং ভেঙে দিয়ো। তাতেই কাজ হবে বাড়ির বাইরে বেরোতে পারবে না।'

ঝান্ডাদের বাড়ির, খালের দিক থেকে ভেতরে ঢোকার দরজায় মোষ আটকাবার জন্যে যে কাঠের তক্তা লাগানো ছিল, অর্জুন তা অনেকদিন আগেই উপড়ে ফেলেছে। ফলে, দরজাটা খোলাই থাকে। বাস্তিও আজকাল এসব দিকে নজর রাখে না। হরনামিও আসে না। আসার দরকার হয় না, কেননা অর্জুন সোজাসুজি এখন হরনামির কাছে যায়।

খালের মুখে এসে অর্জুন দাঁড়ায়। হাতের লাঠিটা কাঁধের ওপর রাখে। আপন মনে খিস্তি করে। মাথাটা খালি ঝুঁকে পড়ে নেশায়। নিঃশ্বাস টেনে সে টানটান হয়ে দাঁড়াবার চেষ্টা করে। তারপর, এলোমেলো পা ফেলে এগোতে থাকে। খালের মাঝ-বরাবর কোনও রকমে আসে।

আর পা চলে না যেন। এবার সে লাঠিটাকে কাঁধ থেকে নামিয়ে, মাটির ওপর ঠকঠক করতে-করতে এগোয়। আশপাশে যত রাজ্যের বালি। বালির মধ্যে লাঠিটা গিঁথে যায় মাঝে-মাঝে।

অর্জুন খাল থেকে তাদের বাড়ির দিকে মুখ ফেরাতেই, ওই চারজন তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। মুহূর্তের মধ্যে অর্জুন লুটিয়ে পড়ে মাটির ওপর। মুখ দিয়ে একটা আওয়াজও বেরোয় না। কৈলু তার খোলা কৃপাণ শরীরের একদিকে ঢুকিয়ে টেনে নেয়। জগিরা মাথার ওপর লাঠির ঘা বসায় গোটা দুয়েক। ধীচর হেঁসো দিয়ে একটা কোপ বসায়। আর নাজর, ভুট্টাদানা পেটার কায়দায় টাঙ্গি দিয়ে হাঁটুটার ওপর ঘা বসিয়ে যায়।

ধীচর নির্দেশ দেয় ঝান্ডার বাড়িতে, দরজার ওপর কয়েকটা ঢিল মারতে। যাতে বাড়ির লোকজন জেগে উঠে অর্জুনকে তুলে নিয়ে যেতে পারে।

পনেরো

পরের দিন সকালে সারা গাঁয়ে হইচই। জনে জনে এসে সব অর্জুনের লাশ দেখে। রাতে নাজররা ঢিল ফেলে আওয়াজ করলেও, কেউ ওঠেনি। এমনিই শীতের রাত। সব ঘরের ভেতর ঘুমিয়ে ছিল। ঝান্ডা বা বাস্তি জেগে উঠলেও তেমন গা করেনি। ধরে নিয়েছিল অর্জুন এসেছে। রোজই তো অর্জুন মাঝরাতে এই রকম আওয়াজ করতে করতে ঘরে ঢোকে। দরজা খটখট, উঠোনে কোনও কিছুর ওপর ঢিল ছোঁড়া— এটা তো নৈমিত্তিক ব্যাপার। যার জন্যে গত রাতের আওয়াজ কানে গেলেও, কেউ আর ওঠেনি।

সকালে উনুন ধরাবার সময় বাস্তিই প্রথম চেঁচামেচি শোনে। উঁচু গলায় কথাবার্তার আওয়াজ। কেৎলি চাপিয়ে সে ঝান্ডাকে ডেকে তোলে: 'দেখো তো কী হয়েছে — খালের ওদিকটায় খুব চেঁচামেচি হচ্ছে।'

ঝান্ডা উঠে পড়ে, গায়ে মাথয় চাদর জড়িয়ে বেরিয়ে আসে। অর্জুন ঘরে নেই। মানে, রাতে ফেরেনি। কারও-র বাড়িতে শুয়ে আছে বোধহয়। হরনামির বাড়িতে থাকার সম্ভাবনাই বেশি। দরজাটার বাইরে থেকে ছিটকিনি তোলা। একটু ধাক্কা দিতেই ছিটকিনিটা খুলে যায়।

বাইরে লোজনের ভিড়। কাটাকাটা সংলাপ: 'অর্জুনের লাশ?' 'না, না— অর্জুনকে এ-রকম দেখতে নয়।' 'পোশাক?' 'আরে, অর্জুন তো রোজ পোশাক বদলায়।' 'লাঠিটা?' 'অর্জুন তো লাঠিও পালটায় রোজ।'— লাঠিটা একটু দূরে পড়ে আছে।

অর্জুনের লাঠিটা অনেকেরই চেনা। দু হাতে লোকের ভিড় ঠেলে ঝান্ডা দৌড়ে যায়। মৃতদেহের ওপর ঝুঁকে পড়ে। খুঁটিয়ে দেখে প্রতিটি অঙ্গপ্রত্যঙ্গ। অর্জুনই! সারা শরীরে চাপ-চাপ রক্ত। মাথা ফেটে গেছে। জামাটা রক্তে লাল। হাঁটুর হাড় ভেঙে চুরচুর হয়ে গেছে। ঝান্ডা আছড়ে পড়ে ভাইয়ের বুকের ওপর। যারা দেখে, তাদেরও চোখ ভিজে যায়। একটু ভীতু প্রকৃতির যারা, তারা অনেক আগেই চলে গেছে। সাত আটজন আছে এখনও। এদের মধ্যে দুজন এগিয়ে এসে ঝান্ডাকে টেনে তোলে। বসার ঘরে নিয়ে যায়। সান্ত্বনা দেয়: 'ঝান্ডা ভাই — ভেঙে পড়লে চলবে না। কে ওকে এ-ভাবে মারল, খুঁজে বের করতে হবে। এছাড়া, ফুলে বডি পাঠাতে হবে, পুলিশের ঝক্কি সামলাতে হবে, ক্রিয়াকর্ম আছে।

ওদিকে ধীচর আর কৈলু রাতেই ভাইরূপায় ফিরে যায়। নাজরের গোয়ালে নিজের জিনিসপত্র গুছিয়ে বেঁধে ছেদে, আপাদমস্তক চাদর মুড়ি দিয়ে তারা বেরিয়ে যায়। নাজরকে বলে যায়, 'নে—তোর কাজ করে দিলাম। অর্জুনকে এখন সারা জীবন খাটে শুয়ে কাটাতে হবে। হাগ্‌তে-মুত্‌তে হবে ওই খাটেই!'

নাজর জোড় হাতে কৃতজ্ঞতা জানায়, 'তোমার ঋণ আমি জীবনে ভুলব না, বড়ভাই। তবে যতটা পারব শোধ করে দেব।

ধীচর চলে যাওয়ার পর, নাজর ও জগিরা আরও খানিকটা করে মদ খেয়ে শুয়ে পড়ে। জগিরাকে নাজিরই বাড়ি যেতে দেয়নি: 'এখন যাসনি। কেন বুড়িমার ঘুম ভাঙাবি? তার চেয়ে, ভোর হলে চলে যাস। . . . কাজ তো হলো, আমার মনটা কিন্তু কেমন খচখচ করছে। একটা খটকা লাগছে। তুই থাকলে একটু ভরসা পাই।'

বারোমাসিয়া মুঙ্গিয়ার ছেলে আগেই শুয়ে পড়েছিল। গভীর ঘুমে অচেতন সে জানতেও পারেনি এরা কোথায় গিয়েছিল। মুঙ্গিয়ার ছেলে গোয়ালেই থাকে। নজর গ্রামেই চক্কর মারে। কেউ ওর নাম উল্লেখ করছে কীনা শোনার চেষ্টা করে।

থানার লোক আসে দুপুরের দিকে। নম্বরদার পাখর চৌকিদারকে পাঠিয়েছিল ফুল থানায়। ছয় সেপাই সঙ্গে নিয়ে বড়বাবু হাজির হলেন। মৃতদেহের পাশে একটা চেয়ার টেনে বসলেন। গাঁয়ের লোকজনকে ডেকে পাঠালেন। সেপাইরা গাঁয়ের বাড়ি-বাড়ি ঢুকে, অকথ্য গালিগালাজ আর যাকে পারে তাকেই চড়-থাপ্‌পড় কশিয়ে টেনে আনে। পরিচিত দাগি অপরাধীদের আরও বেশি মারধোর করে টেনে হিঁচড়ে এনে দাঁড় করিয়ে দেয় বড়বাবুর সামনে। এদের মধ্যে পাঁচজন ছিল বেশ কুখ্যাত। বড়বাবু তাদের উদ্দেশে বলেন, 'বল্‌ — তোদের মধ্যে কে একাজ করেছে? এখন বললে বেঁচে যাবি, ফাঁসি হবে না। পরে বললে ফাঁসি হবেই।' পাঁচজনই চুপ করে বসে বড়বাবুর কথা শোনে। আন্দাজ করার চেষ্টা করে কে তাদের মধ্যে একাজ করতে পারে।

হরনামি-অর্জুনের ব্যাপারস্যাপার পাখর এক ফাঁকে বডবাবুকে কানে-কানে জানিয়ে দেয়। একজন সেপাই পাঠিয়ে হরনামিকেও ডেকে আনা হয়। হরনামি একটানা কেঁদে চলে।

কোনও কথা বলে না। গাঁয়ের এত লোকের সামনে বড় লজ্জা করে। এসেই সে পাখরের পা জড়িয়ে ধরে, 'বাবা! আমি এর কিছুই জানি না— অর্জুন আমার কাছে এসেছিল ঠিকই— কিন্তু আপনি আমাকে বাঁচান--'

পাখর একটু বিব্রত ভাব দেখায়, 'মেয়ে — তুই কেন আমাকে জড়িয়ে দিচ্ছিস — তুই বরং বড়বাবু যা জানতে চায়, বল্।'

বড়বাবু জেরা করেন, 'হরনাম কৌর — তোমার কাছে কাল রাতে অর্জুন এসেছিল?'

হরনামি নিশ্চুপ হয়ে দাড়িয়ে থাকে। ওড়না দিয়ে মুখ ঢাকে।

'গাঁয়ের আর কার সঙ্গে তোমার কথাবার্তা হয়?'

'আর কারওর সঙ্গে নয়, হুজুর।'

বড়বাবু হরনামিকে বসিয়ে রাখেন। ফুলে থানায় নিয়ে গিয়ে সত্যি মিথ্যে যাচাই হবে। দাগিদের উদ্দেশে বলেন, 'তোরা কেউ একে চিনিস?'

পাঁচজনই কানে হাত দেয়: 'তোবা! তোবা! আপনি তো জানেন হুজুর আমরা ওই লাইনের নই।

বড়বাবু উঠে পড়েন: 'পাখরজি— লাশ গাড়িতে তোলার ব্যবস্থা করুন। এই বদমায়েশগুলো আমার সঙ্গে যাবে। হারামজাদারা মুখ খুলছে না এখানে। পেটাই পড়লে কথা বেরোবে। হ্যাঁ, হরনামিও যাবে— '

গাঁয়ের মেয়েমদ্দ ছেলেবুড়ো দূর থেকে ঝুলুর-ঝুলুর করে দেখে। গাঁ থেকে পুলিশ আগে কোনও মেয়েকে তোলেনি; এই প্রথম। মনে মনে শঙ্কিত হয়ে ওঠে সবাই।

ঝান্ডাই গাড়ি জুতে দেয়। লাশের ওপরে ফেলা শাদা চাদরটা সরিয়ে গাড়িতে তোলা হয়। তারপর আবার চাদরটা জড়িয়ে দেওয়া হয়। গাড়ির মধ্যে ঝান্ডার এক বন্ধু বসে। ঝান্ডা বসে লাশের মাথার কাছে। আরও যারা গাড়িতে ওঠে, তারা নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করে পাখরকে কথাটা বলতে বলে। পাখর বড়বাবুকে বলে, 'হুজুর— হরনামিকে নিয়ে যাওয়ার দরকার কী? ও তো আর পালাবে না। দরকার হলে আমাকে জানিয়ে দেবেন, আমিই ওকে আপনার কাছে নিয়ে যাব। মামলা তো চলবে ....'

বড়বাবু পাখরের কথায় রাজি হয়ে যান। হরনামি পড়ি-মরি করে বাড়ির দিকে ছুট দেয়। বড়বাবু ওঠেন ঘোড়ায়, গোরুর গাড়িতে অর্জুনের লাশ ও লোকজন। গাড়ির পেছনে-পেছনে আসেন বড়বাবু, আর তাঁর ঘোড়ার পেছনে পাঁচজন দাগি ও ছ জন সেপাই। কলোকে এসে বড়বাবু আরও দুজন বুড়ো সেপাইকে গাড়িতে তুলে নেন। কলোকের পথে, ছাদের ওপর থেকে মেয়েরা অর্জুনের লাশ দেখে। লোকেরা রাস্তার দুধারে সারি বেঁধে দাঁড়িয়ে থাকে। কেউ কোনও কথা বলে না। বড়বাবুর উদ্দেশে কেউ কেউ সেলাম ঠোকে। সাধনিয়ার সাঁকোয় উঠে গাড়িটা থামে। টাঙ্গাওয়ালা ও ছড়িয়ে-ছিটিয়ে দাঁড়ানো লোকেরা লাশটি দেখে। দূরে দাড়িয়ে নীচু গলায় আলোচনা করে। কেউ কাছে আসে না, কিন্তু ব্যাপারটা আন্দাজ করার চেষ্টা করে।

পুলিশ ঝান্ডার জবানবন্দি লেখার পর, হাসপাতালে লাশ পাঠিয়ে দেয় পোস্টমর্টেমের জন্যে।

মাঝ রাতে ঝান্ডারা অর্জুনের লাশ নিয়ে কোটেতে ফিরে আসে। পাঁচ গুন্ডাকে পুলিশ অবশ্য ছাড়েনি। তাদের হাজতে পুরে দিয়েছে। ভোরের দিকে অর্জুনের দাহ-সৎকার হয়ে যায়। মেয়েরা উঁচু গলায় বিলাপ করে। বাস্তি মনমরা হয়ে থাকে। ঝান্ডা থেকে থেকে ডুকরে কেঁদে ওঠে। বসার ঘরে একটা টানা ফরাস পাতা থাকে। উঠোনে রোদ আটকাবার জন্যে কাপড় ঝোলানো। দাওয়ার ওপরও চাদর বিছোনো। মেয়েরা ওখানে বসে শোক প্রকাশ করে। পুরুষরা উঠোনে, কিংবা বসার ঘরে। উনুনে চায়ের কেৎলি ফোটে। যেই আসুক, তাকে চা দেওয়া হয়।

অর্জুনের মৃত্যুর খবর পেয়েই নাজর পালায়। ধীচরকে খুঁজে বেড়ায়। কিন্তু, ধীচর কৈলু, দুজনেই গ্রাম থেকে বেপাত্তা। তাদের বাড়িতে গিয়েও কোনও খোঁজ পায়না। নাজর চলে যায় দয়ালপুরায়। ধীচর মাঝে মাঝেই দয়ালপুরার কথা বলত। ওখানে তেজি নামে এক জেলে মেয়ের সঙ্গে ধীচরের ভাব খাতির আছে। দয়ালপুরায় তেজির কাছে আসতেই ধীচর ও কৈলুর দেখা মেলে। এখানেই ওরা আপাতত গা-ঢাকা দিয়ে আছে। অর্জুন-ঘটনার পর থেকেই ওরা এই সব আস্তানায় গা-ঢাকা দিয়ে আছে। চট করে বেরোয় না। তবে, তেজিকে বলা ছিল, কোটে থেকে নাজির বা জগিরা এলে যেন ঘরে ঢুকতে দেওয়া হয়।

নাজর পৌঁছেই কান্না জুড়ে দেয়। খবর শুনে ধীচর-কৈলু থ!

'য়্যাঁ — মরে গেছে!' ওরা খাট থেকে উঠে দাঁড়ায়।

তারপর দেড় দু ঘন্টা ধরে চাপা গলায় শলা পরামর্শ চলে। তেজি, দরজার কাছ থেকে একটু দূরে কুয়োতলায় বসে কাপড় কাচে। গ্রামের কেউ এলে, হেসে হেসে কথা বলে তাকে কাটিয়ে দেয়। ধীচর নাজরকে পরামর্শ দেয় জগিরার ওপর চাপ দিয়ে খুনের অপরাধ 'কবুল' করাতে। দু একটা সাক্ষীও সেইমতো যোগাড় করতে হবে। মামলা চালাতে গেলে বিস্তর খরচ। নাজরকে সেই টাকা যোগাড় করতে হবে, দরকার হলে বাড়িঘরদোর জমিজমা বেচে। হরনামিকে ভয় দেখিয়েও কিছু টাকা আদায় করতে হবে। শুধু দেখতে হবে, জগিরার যেন ফাঁসি না হয়। সঙ্গে-সঙ্গে ধীচর এটাও জানিয়ে দিতে ভোলে না, ওকে কিংবা কৈলুকে যেন জড়ানো না হয়; তাহলে কেউ নিস্তার পাবে না। শাসানিটা একটু কড়াভাবেই দেয় সে।

ষোলো

পুলিশ যে-দিন অর্জুনের লাশ তুলে নিয়ে যায়, সেইদিনই সন্ধ্যেবেলায় হরনামি ছোটেকে পাঠায় নাজরকে ডেকে আনার জন্যে । ভাইরূপা থেকে নাজর তখনও ফেরেনি। ছোটে মুঙ্গিয়ার ছেলেকে খবরটা দিয়ে চলে আসে। নাজর ফিরলেই যেন হরনামির সঙ্গে দেখা করে। জরুরি কাজ আছে। মুঙ্গিয়ার ছেলে এমনিতেই একটু ভয়ে ভয়ে আছে। কোন ঝামেলায় জড়িয়ে পড়বে, কে জানে। এখন তার সবই জানা হয়ে গেছে। ভেবে পায় না, পাগলা জাঠ নাজর, অর্জুনকে খুন করতে গেল কেন। ঠ্যাং ভেঙে দেবে, এই রকম একটা কথা তো সে শুনছিল। কিন্তু, সব হঠাৎ খেপে গিয়ে এটা কী করে বসল?

রাত হতেই নাজর ফেরে। অবসাদে ভেঙে-পড়া অবসন্ন চেহারা। মুঙ্গিয়ার ছেলে ভেতরে রুটি খেতে গেছে নাজরের বুড়ো মা বাবার সঙ্গে। সে ফিরে আসতে নাজর জিজ্ঞেস করে, 'গ্রামে আমাদের নিয়ে কেউ কোনও কথা বলছে?'

'না। তবে, আমি এখনও গ্রামে যাইনি — সারা দিন এখানেই। ছোটে এসেছিল তোমার খোঁজে। হরমামি তোমাকে ডেকেছে।' নাজর ভেতরের ঘরে চলে যায় রুটি খেতে। বুড়োবুড়ি ছেলের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। তারা মুঙ্গিয়ার ছেলের কাছ থেকে সব শুনে নিয়েছে। শুনেও নির্বিকার থেকেছে। রুটি খেয়ে নাজর বেরোবার জন্যে পা বাড়াবে, এমন সময় মঙ্গল বলে ওঠে, 'আমরা সব শুনেছি। এই সব ছোটখাট ঝক্কি সবাইকেই পোয়াতে হয়। ঘাবড়ে গেলে চলে না। এখটু বুঝেশুনে চলবি। টাকাপয়সার জন্যে ভাবিস না। ভগবান সব ঠিক করে দেবেন।'

মা-ও অভয় দেয়, 'ভগবান সবাইকে দেখেন। ঘাবড়াবি না।'

বাড়ি থেকে বেরিয়ে নাজর গোয়ালে আসে। মুঙ্গিয়ার ছেলেকে বলে, 'কেউ এলে বলিস আমি একটা কাজে গেছি।' তারপর চলে যায় হরনামির কাছে।

বেশ রাত হয়েছে। প্রীতমদের বাড়ি থেকে একটু খিচুড়ি এনেছিল হরনামি। দুধের সঙ্গে খাচ্ছে। খাওয়ার ইচ্ছে নেই, কোনও রকমে খেয়ে যায়। নাজরকে দেখে সে আর সামলাতে পারেনা নিজেকে: 'এ তুমি কী করলে? প্রাণে মারার কী দরকার ছিল? এখন কী হবে?'

নাজর বোঝায়, 'এমন হবে কে জানত? ভাইরূপা থেকে যারা এসেছিল তাদের পই-পই করে বলেছিলাম, আর যাই করো — জানে মেরো না। কিন্তু ওদের মাথায় ভূত চেপেছিল— আমি ভাবতেই পারিনি—'

'এখন কী করবে?'

নাজর মেজের দিকে তাকিয়ে থাকে কিছুক্ষণ। তারপর জবাব দেয়, 'করার আর কী আছে, এখন সবই টাকার খেলা। মুঠোমুঠো টাকা ছাড়াতে হবে, নইলে আমরা সবাই মরব। এমনকী তুমিও। বাঁচার অন্য পথ এখন আর খোলা নেই।'

'আমি তাহলে কী করতে পারি?'

'অনেক কিছুই করতে পারো। তোমার জায়গাজমি আছে — ভাববার কিছু নেই। ভাবতে হবে আমাকে।'

কানের দুল দুটো বাদ দিয়ে, হরনামি সিন্দুকের ভেতর থেকে সমস্ত গয়না বের করে আনে। নাজর ওগুলো একটা পুঁটলিতে বেঁধে ফেলে। হরনামি বলে, 'বিক্রি করে টাকাটা কাজে লাগিয়ে দিও। আরও লাগলে বলবে। কোনো খুঁত রাখবে না।'

'না, না। আমি আমার ভেড়া-ছাগল বেচে দেব। ভাইরূপার গুন্ডারা আমাদের ফাঁসিয়ে দিয়েছে।' আর কথা না বাড়িয়ে সে উঠে পড়ে। গয়নার পুঁটলি মার কাছে রেখে চলে যায় জগিরার সঙ্গে দেখা করতে। জগিরা বারান্দাতে শুয়ে ছিল। মা উনুনের কাছে বসে বাসন মাজছে। নাজরের গলার আওয়াজে সে উঠে পড়ে। নাজর বলে, 'ভেতরে চল। কথা আছে।'

ওরা দুজনে ভেতরের ঘরের খাটিয়ায় বসে আলোচনা করে। যেন নিজেদেরই ওরা

কিছু বোঝাবার চেষ্টা করে। নাজর বলে, 'জগিরা, শেষ অবধি ধরা আমাদের পড়তে হবেই। হয় আজ নয় কাল। এখান থেকে কেউ না কেউ পুলিশকে ঠিক খবর দেবে। আমাদের তিন জনকে, তুই আমি হরনামি — ঠিক পুলিশে ধরবে। কার ফাঁসি হবে বা অন্য কোনও সাজা হবে তার ঠিক নেই। তবে, একটা রাস্তা খোলা আছে—

'কোন রাস্তা?' উদগ্রীব হয়ে ওঠে জগিরা।

'তুই পারবি?'

'বলোই না।'

'তুই 'ইক্‌বাল' কর পুলিশের কাছে। টাকা যা লাগে আমি দেব। ভাইরূপাওয়ালাদের জড়াসনি। তবে, ওরা আমাদের মদত করবে।'

'আমি দোষ কবুল করব?' জগিরা স্তম্ভিত।

'হ্যাঁ'

'তুমি করছ না কেন?'

'আমি করতে পারি। তাহলে টাকার দায়িত্ব তুই নে। কেননা, টাকাতো জলের মতো খরচ হবে। এখন বল, তুই 'ইক্‌বাল' করবি, না আমি? ভাইরূপাওয়ালাদের তো কোনও ব্যাপার নেই। আমাদের ঘাড়েই সব এসে পড়েছ এখন।'

'হরনামি টাকা দেবে?'

'হ্যাঁ। চল আমার সঙ্গে — তোকে দেখাই। আরে হরনামি হলো শের কি বাচ্চি— একদম বাঘিনী — যত গয়না ছিল সব দিয়ে দিয়েছে। বলেছে, লাগলে আরও দেবে। আমার জন্যে হরনামি জান দিতেও রাজি। বড় দিলখোলা জাঠনি রে— আমরা ষাটটা ভেড়া কালই বেচে দেব।'

জগিরা রাজি হয়ে যায়, 'ঠিক আছে। কিন্তু, দেখো আমার যেন ফাঁসি না হয়। আমি বুড়ির এক ছেলে।'

'বলছি তো। তোর যদি একদিনেরও সাজা হয়, তাহলে আমার মুখে থুতু দিস। দুটো এমন সাক্ষী দাঁড় করাবো যে মামলা একদম ভেস্তে যাবে। টাকা খাইয়ে পুলিশের চোখ কানা করিয়ে দেব, হ্যাঁ।'

জগিরা দোষ কবুল করার জন্য তৈরি হয়। মানসিক কোনও প্রস্তুতির দরকার হয় না আর।

পরের দিন সন্ধ্যে পর্যন্ত নাজরকে দেখা যায় না। রাতে তাকে দেখা যায় নম্বরদার পাখরের বাড়িতে। পাখর বলে ওঠে, 'কীরে ফেঁসে গেছিস তো? খুলে বলতো ব্যাপারটা কী? নানা কথা কানে আসছে।'

'তুমি তো সবই জান চাচা। তোমার কাছে লুকোবার কী আছে?'

নাজর সব কথাই বলে। এমনকী, জগিরা কবুল করবে, এ কথাও। আর টাকা যা লাগে, ঘরবাড়ি বেচেও নাজর তা দেবে। পাখর জিজ্ঞেস করে, 'তোর হাতেই অর্জুন মরেছে?'

'তা কী করে বলি? কার হাতে মরেছে এটা তো তখন বোঝা যায়নি। মারা যাবে, এটাও বুঝিনি।' ধীচর-কৈলুর নাম উল্লেখ করে না নাজর। অবশ্য, মুঙ্গিয়ার ছেলে ছাড়া এ-খবর আর কেউ জানেও না।

নম্বরদার বলে, 'মাগিটা তাহলে তোর সঙ্গে আছে?'

'আরে চাচা— ওই জন্যেই তো তোমার কাছে এলাম। টাকা যা লাগে, ও দেবে বলেছে।'

'আজ সন্ধ্যের খবর, কাল পুলিশ আসবে তোদের তুলতে।'

'তাহলে কী করা যায়?'

'ভোর হওয়ার আগেই গাঁ থেকে কেটে পড়। হরনামিকে বল কারওর বাড়ি গিয়ে বসে থাকতে। পরে, একটা কায়দা-টায়দা করে জগিরাকে হাজির করা যাবে।'

'কিন্তু পুলিশকে কে খবর দিল, চাচা?'

'কে আবার! ঝান্ডা। একটু আগে এসেছিল আমার কাছে। পুলিশ এখন সব জেনে গেছে।'

পকেট থেকে একশো টাকার দুটি নোট বের করে নাজর।

'এটা রেখে দাও কালকের জন্যে। পরে দেখা করব—'

'না। আমিই দেখা করব। যেখানেই যা, মাকে বলে যাস— তাহলেই হবে।'

পরের দিন দুপুরবেলায়, পুলিশ যাদের হাজতে রেখেছিল, তারা গাঁয়ে ফেরে । সমস্ত ঘটনাই লোকে জেনে যায় তাদের মুখ থেকে। ওই পাঁচজনকে পুলিশ বেজায় মেরেছে। জুতো পেটা, লাথি — কিছুই বাদ যায়নি। তাদেরই একজন পাখর সিংহের বাড়িতে হাজির হয়ে চেঁচামেচি শুরু করে পাঁচজনের সামনে: 'কী নম্বরদার চাচা? মঙ্গলের ব্যাটা সেই বহিন্‌চোদ কোথায়? একটা ফালতু মাগির জন্যে শালা এইসব করেছে— আর পুলিশ আমাদের মেরে গাঁড় ফাটাচ্ছে!'

নম্বরদার হেসে ওঠে, 'শালা পুলিশদের কারবার! চোর ধরতে না পেরে সাধুকে ধরে ঠ্যাঙায়।'

'সাধু' শব্দটির প্রয়োগে সবাই হেসে ওঠে।

'বাপ তো কোনও দিন একটা ইঁদুর অবধি মারেনি, কিন্তু ব্যাটা এমন হলো কী করে?'

'আরে বাবা, দিনকাল পাল্টাচ্ছে। সওদাগর সিং (পাঁচ দাগির একজন) একাই বাজার মাৎ করছিল — এখন? বাসনকোষন গোরুমোষ চুরি নয়, এতে হিম্মত আছে—'

'ওদের মতো হয়ে কাজ নেই আমাদের,' সওদাগর উত্তেজিত হয়ে জবাব দেয়, 'ওই সব মাগিবাজি আমরা করি না। করলেও, গাঁয়ের বাইরে। এই শালারা গাঁয়ের মধ্যেই গু খায়— বলিহারি!' সওদাগর বকবক করতে করতে নিষ্ক্রান্ত হয়। বাকিরাও কথা বলে যায়। পাখর ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে দু-নলা বন্দুকটা পরিষ্কার করতে বসে। একটু পরেই বুর্জ গিল্লার দিক থেকে চার অশ্বারোহী সিপাহি আসে। কাঁধে রাইফেল।

ওরা প্রথমে যায় নাজরের বাড়ি। তন্নতন্ন করে সব খুঁজে দেখে। সিন্দুক, খাটের নিচ, ভূসির পাত্র। দু এক জায়গায় খেঁটে লাঠি দিয়ে ঘা-ও মারে। মঙ্গলের গালে এক প্রচন্ড

চড় কষায়। চড়ের ধাক্কায় মঙ্গলের পাগড়ি খুলে পড়ে। বুড়ির হাতের চুড়ি ভেঙে দেয়। এরপর, দুজন যায় জগিরার বাড়ি, দু জন হরনামির। হরনামি নেই— সদর দরজা হাপাট খোলা। গোবরের মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকা মোষটা পুলিশের লাল-নীল পাগড়ি দেখে হাম্বা-হাম্বা করতে শুরু করে দেয়।

নাজরের মা-বাপের অবস্থা কাহিল। জগিরার মা গুম হয়ে বসে থাকে। পুলিশ তিন জনকে ধরে নিয়ে আসে গ্রামের চৌপালে। বড়বাবু থেকে-থেকে অশ্রাব্য মুখ খিস্তি করেন। বুটের ঠোক্কর মারেন ওদের। সবাই তটস্থ হয়ে থাকে। নম্বরদার পাখর বড়বাবুকে আড়ালে নিয়ে গিয়ে একশো টাকার একটা নোট গুঁজে দেয়: 'আপনি যান হুজুর— আমি আসামীকে কাল আপনার কাছে নিয়ে যাব।'

বড়বাবু নরম হলেন। চৌপালে এসে মঙ্গল ও দুই বুড়িকে বাড়ি পাঠিয়ে দিলেন। পুলিশ ওই পাঁচ দাগিদের সঙ্গে কথা বলে। একটু পরেই এর-ওর বাড়ি থেকে গরম দুধের জাগ, খাবার আসতে থাকে। যেন জামাই আদর! এমনকী, ঘোড়ার ভূসি-ও এসে যায়!

সতেরো

ভোরের আলো ফোটার আগেই নম্বরদার পাখর জগিরাকে নিয়ে গ্রাম থেকে বেরিয়ে পড়ে। সাধনিয়ার সাঁকোতে এসে ওরা থামে। একটু পরেই ফুলের দিক থেকে একটা খালি টাঙ্গা আসে। চাদরে আপাদমস্তক ঢাকা জগিরার চোখ দুটো শুধু দেখা যায়। পাখরের কাঁধে একটা দো-নলা বন্দুক। পাখর পুরো টাঙ্গাটাই ভাড়া করে, যাতে আর কেউ না ওঠে।

ফুলে একটা চায়ের দোকানে ঢোকে ওরা। দু-মগ চা আর ডবল রুটি খেতে খেতে কথা চলে ওদের। দোকানদার বোঝে এরা কাছারিতে যাবে। অর্থাৎ দশটার আগে উঠবে না। তা বসুক— শুধু মুখে তো আর বসবে না। চা খাবেই— মানে, দু চার টাকা রোজগার হয়ে যাবে। দোকানদার ঘুণাক্ষরেও টের পায় না এরা কোন মামলার আসামী। অথবা এদের কেউ নাজিম বা ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে আত্মসমর্পণ করবে। পুলিশ অনেক সময় এই জাতীয় আসামীর খোঁজে দোকানেও হামলা চালায়।

ন'টার সময়ে ওরা উঠে পড়ে। মুখ ঢেকে সোজা চলে যায় উকিলের বাড়ি। শাদা পায়জামা, বিসকিট-রঙ আচকান, কানে কম শুনলে কি হবে, তুখোড় এই উকিল আইনের ফাঁক বের করতে ওস্তাদ। সব শুনে উকিল ঝটপট কাগজ তৈরি করে ফেলেন। এক ফাঁকে নিজের দক্ষিণাও পকেটস্থ করে, পাগড়িটা গুছিয়ে বেঁধে নেন। ঠিক দশটার সময় উকিল কাছারিতে ঢোকেন। মুন্সি আগেই বইপত্র ফাইল নিয়ে এসে গেছে। পুলিশ টেরও পায়নি, পাখর জগিরাকে কখন আদালতে পেশ করছে। পাখরের সাক্ষ্যসহ নাজিম, উকিল ও জগিরার বক্তব্য লিখে নিলেন। সরকারিভাবে জগিরাকে গ্রেফতার করা হলো। জগিরা তার আবেদনে জানিয়েছে, তার হাতের টাঙ্গিতে অর্জুনের মৃত্যু হয়েছে। ঝান্ডাও দুই সাক্ষী পেশ করে, একজন পাখর, অন্যজন প্রীতম। অবশ্য ঝান্ডার অবেদনে নাজরকেও হত্যাকারী হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। কারণ, যোগিন্দার সিংহের স্ত্রী হরনাম কৌরের সঙ্গে নাজর

ও অর্জুনের অবৈধ প্রণয়। নাজিম, নাজর ও হরনামির নামেও গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করলেন।

হরনামির গয়নার পুঁটুলি, মঙ্গল ও তার স্ত্রীর কাছে ছিল। ভাইরূপায় স্যাকরা সোনা পরীক্ষা করে এক সাহুকরকে ডকে। সাহুকর সব গয়নাই কেনে। স্যাকরার দাম শোনার পর গয়না ওজন হয়। চোদ্দ তোলা। প্রতি তোলায় তিন চার রতির দাম কমিয়ে, সাহুকর থোক টাকাটা দিয়ে দেয়। মঙ্গল টাকাটা চাদরে বেঁধে কোমর বরাবর একটি কাপড়ের পটি বেঁধে নেয়। দুপুরের দিকে গ্রামে ফেরে।

নাজরও তার ভেড়া-ছাগল বেচে দেয়। গোয়াল একেবারে ফাঁকা। গাঁয়ের চন্দন সিং আর মুঙ্গিয়া, যার ছেলে নাজরের বারোমাসিয়া, দু জনে মিলে কিনে নেয়। প্রথম দিন চন্দন নিজের বাড়িতেই ভেড়া নিয়ে যায়, কিন্তু দেখে ওগুলো বাড়িতে রাখা সম্ভব নয়। পরের দিনই মঙ্গলের সঙ্গে কথা বলে নাজরের গোয়ালটা ছ মাসের জন্য ভাড়া নেয়। গোয়ালের লাগোয়া ঘরটাও এখন নাজরের কাজে লাগবে না। মঙ্গল গোয়াল ভাড়া বাবদ টাকাটা চন্দনের কাছ থেকে সঙ্গে সঙ্গে নেয় না। পরে দরকার হলে নেবে, বলে দেয়।

ফলে, ভেড়া আগের মতোই নাজরের গোয়ালে থেকে যায়। বারোমাসিয়াও বদলায় না। মুঙ্গিয়া এখন গোয়ালের লাগোয়া ঘরটায় রাতে শোয়। বাপ-ব্যাটা দুজনেই ভেড়া দেখভাল করে। প্রাপ্য টাকার তৃতীয়াংশ চন্দন দিলেও, মালপত্র থাকে তার অংশীদার ধুক্করের জিম্মায়। নাজরের কথামতো মঙ্গল টাকা জমা রাখে মুকুন্দমল শেঠের কাছে। বলে, 'শেঠ, এগুলো রেখে তাও তোমার কাছে। যখন যেমন দরকার হবে, এসে নিয়ে যাব।'

'নিশ্চয়, নিশ্চয়ই। এ তো তোমারই টাকা। ভেবো, ব্যাংকে আছে। ফুরিয়ে গেলে আরও নিও। জমির মালিক— তোমার ভাবনা কী?' মুকুন্দ অভয় দেয়।

নাজিমের আদালতে পুরো দমে মামলা চলে। সাক্ষী প্রমাণের কাজ শেষ। ঝান্ডা প্রাণপণ খেটে যায়। তবুও, পুলিশ ঝান্ডাকে সমানে দাঁত খিঁচিয়ে চলে। শালা একদম মালকড়ি ছাড়তে চায় না! মামলার জন্যে লোকজন এলে, তাদের চা-পানে আপ্যায়িত করতে গেলেও ঝান্ডার মেজাজ খিঁচড়ে যায়। ঝান্ডা শুধু পাখর সিংকেই সজ্জন ও দরদী বলে মনে করে। প্রীতমকে নানা কথা বলে হাতে রাখে; যাতে প্রীতম কেটে না পড়ে। প্রীতমকে ঝান্ডা বোঝায়, গিন্দরের সংসার ভেসে গেলে প্রীতমেরই লাভ, গিন্দরের আট বিঘে জমি হাতে এসে যাবে। গিন্দরের জমিতে প্রীতমের এমনিই একটা হক আছে। হরনামি তো জেলেই পচে মরবে। গিন্দরের কোনও খোঁজ নেই এতদিন ধরে। নিশ্চয়ই পটল তুলেছে। ব্যাস, প্রীতম এমন মওকা আর কোথায় পাবে?

মঙ্গলের মুরুব্বি-ও পাখর সিং। আদালতে দারুণ খাতির পাখরের। পুলিশের সঙ্গে দহরম-মহরম আছে। পাখর যত টাকাই চাক, মঙ্গল দ্বিরুক্তি না করে মুকুন্দর কাছ থেকে এনে দেয়। শুধু বলে, 'নম্বরদার আমার ছেলেটার যেন জেল না হয়, জগিরার যেন ফাঁসি না হয় — এইটুকুই তুমি দেখো।' — পাখর, পুলিশ আদালত আর হাসপাতালে কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা ঢালে। হরনামিকে এক ফাঁকে জামিনে ছাড়িয়েও ফেলে।

শুনানির দিন পড়লে সবাইকে হাজির হতে হয়। গ্রাম থেকে সব দঙ্গল বেঁধে আসে। অবশ্যই দু দলে ভাগ হয়ে থাকে। সাধনিয়ার সাঁকোয় এসে দুটো আলাদা টাঙ্গা করে।

একটিতে ঝান্ডার দল, অন্যটিতে মঙ্গলের। দু দলেরই সঙ্গে আত্মীয়স্বজন হিতৈষী থাকে। হরনামি মাঝে মাঝে জগিরার মাকে নিয়ে যায়, যাতে ছেলের সঙ্গে দেখা হয়। রামপুরায় পৌঁছে সব ছটার গাড়ি ধরে। ট্রেনের কামরায়, বাদী-বিবাদী দুই দলই গল্প করে নিজেদের মধ্যে। মামলায় দুটো দল হলে কি হবে, আসলে তারা তো এক গাঁয়েরই মানুষ।

খুনের খুঁটিনাটি খবরও পুলিশ জেনে গেছে। হরনামি কী করে প্রচুর মদ খাইয়ে অর্জুনকে মাঝ রাতে বের করে দিয়েছিল, নাজর আর তার চার সঙ্গী কীভাবে মদমাংস খেয়ে অর্জুনকে মারার জন্য তৈরি হচ্ছিল, কার হাতে কোন অস্ত্র ছিল — এ-সব খবর এখন পুলিশের নখদর্পণে। এরই মধ্যে, ধীচর ফুলে থানার বড়বাবুকে মোটা একটা টাকা ধরিয়ে গেছে। পুলিশের রিপোর্টে তাই ধীচর আর কৈলুর নাম নেই।

সাধনিয়ার সাঁকোর ওপর একদিন গুরু-শিষ্যে কথা হয় এই রকম:

— এই মামলার আমাদের কী লাভ হলো? সত্যি বলতে কি অর্জুনের সঙ্গে তো আমাদের কোনও শত্রুতা ছিল না।

— দেখ কৈলু, বন্ধুত্বের খাতিরে এমন অনেক কিছু করতে হয়। নাজরের সঙ্গে দোস্তি আছে বলেই তো এইসব করা। যারা নিজেদের বউ আমাদের কাছে বেচে দেয়, তাতেই বা আমাদের কী লাভ হয়? টাকাপয়সা তো খেয়েদেয়েই শেষ হয়ে যায়। না করেছি জায়গা, না জমি!

— কিন্তু নাজর কী করবে শেষ অবধি?

— বলা শক্ত। তবে ছাড়া পেলে ঘরসংসার পাততে পারে।

— ছাড়া পাবে? ফাঁসিও হতে পারে।

— নাজরের ফাঁসি হবে না। জেল হতে পারে। তবে, জগিরার কথা বলা যায় না।

হঠাৎ ধীচর বলে, 'চল, হরনামির সঙ্গে আজ দেখা করে আসি।'

'যেতে মন করেছে যখন, চলো', কৈলু সায় দেয়, 'শুনেছি, খুবই দিলদরিয়া জাঠানি। গেলেই মালের বোতল সামনে রেখে দেবে।'

ওরা অতঃপর কোটে যায়। একে-ওকে জিজ্ঞেস করে গিন্দরের বাড়ি খুঁজে পেতে অসুবিধে হয় না। উঠোনে এসে হাঁক দেয়: 'সৎশ্রী আকাল!' হরনামি উঠোনে বসে এক মনে কি যেন ভাবছিল। ধীচর-কৈলুর সে নাম শুনেছে, নাজরের বন্ধু— এইটুকু জানে। খুনের ব্যাপারে এরা ছিল, এটাও তার জানা। পরিচয় পেতেই হরনামি উঠে দাঁড়ায়, খাটিয়া পেতে বসতে দেয়। চায়ের কেৎলি চাপায়, নাজরের খোঁজখবর নেয়।

একই আলোচনা চলে গাঁয়ের চৌপালে। নাজর জগিরার বাঁচার পথ নেই। ফৌজি মিলখা রানা প্রতাপ সিংহের ন্যায়বিচারের তুলনা সহযোগে মন্তব্য করে: 'মহারাজ হীরা সিং ছিলেন তাঁর জামানার জাহাঙ্গীর। ন্যায় বিচারের পাল্লা তাঁর হতে এক নিক্তি এদিক-ওদিক হতো না। হাজার হোক প্রতাপ সিং-এর রক্তমাংস —'

'আরে ফৌজি ভাই— আমি বলি কি ওই মাগিটার ফাঁসি হওয়া উচিত। একদম ডাইনি, প্রথমে অর্জুনকে খেল, এখন আরও দুটোকে খাবে!'

'সবার আগে খেয়েছে গিন্দরকে। বেচারা কোথায় আছে কে জানে।'

এবার এক যোগে গিন্দরের আলোচনা চলে। গিন্দরের বাবা কেহর— বড় খাঁটি লোক ছিল। মনে কত আশা ছিল। যেদিন ছেলের বউ আনল হ্ন্ডিয়া থেকে, সেদিনই ওর সর্বনাশ হলো। গিন্দরটা অবধি পাগল হয়ে গেল। ওই বাঞ্চৎ মাগিটাই ওকে পাগল করে ছাড়ল।

আঠারো

নাভার হাইকোর্টে নম্বরদার পাখর সিং তার বয়ান একেবারে বদলে দেয়। দাবি করে, জগিরা ভয় পেয়ে অপরাধ কবুল করেছে। নয়তো কেউ ওকে টাকার লোভ দেখিয়ে অপরাধ কবুল করিয়েছে। খুন জগিরা করতেই পারে না।

প্রীতম তার সাক্ষ্যে সমর্থন জানায়: 'অন্ধকার ছিল হুজুর। আমি দেখি কি অর্জুনের ওপর বেশ কয়েকজন ঝাঁপিয়ে পড়েছে। কিন্তু ক জন, ঠিক বুঝতে পারিনি, চিনতেও পারিনি তারা কারা। অর্জুনও খুব তাকতদার লোক ছিল, ওকে মারা জগিরার একার সাধ্যিতে কুলোত না, হুজুর!'

হরনামি বলে: 'রাতে আমার ঘরে বসে অর্জুন মদ খেয়ে বেরিয়ে যায়। তারপর কি হয়— আমার জানা নেই। নাজরের সঙ্গেও আমর কোনও সম্পর্ক নেই, হুজুর। আমার স্বামী যোগিন্দরের মাথা খারাপ, না বলে কয়ে বাড়ি থেকে চলে গেছে। আমার স্বামী সুস্থ থাকলে কী আমি এই ঝামেলায় পড়তাম, হুজুর?'

খুনের অপরাধ স্বীকার করলেও, জগিরা বিচারকের সামনে কেঁদে ফেলে। বিচারক জিজ্ঞেস করেন, 'খুন তুমি করেছ?'

'হুঁ।' মাথা হেঁট করে জগিরা জবাব দেয়।

'তোমার সঙ্গে আর কে ছিল?'

জগিরা নিরুত্তর থাকে। মাথা তোলে না। ঝান্ডা বলে, 'হুজুর— আমার ভাই অর্জুনের সঙ্গে হরনামির অবৈধ সম্পর্ক ছিল। এরপর সে নাজরের সঙ্গে ভিড়ে যায়। ওরাই আমার ভাইকে খুন করেছে। কে খুন করেছে তা জগিরার কথায় আমরা জেনেছি। আসলে, এই খুন করিয়েছে নাজর আর ওই নচ্ছার মেয়েটা!'

ঝান্ডা তার উকিলকে টাকা দিতে বড় বেশি কিপ্‌টেমি করে। যার জন্যে উকিল দায়সারা কাজ করে। ফুলের পুলিশও ঝান্ডার কাছ থেকে টাকা খেতে পারেনি। কোর্টে খড়ক সিং থেকে যারা আসে, ঝান্ডা তাদের গাড়ি-ভাড়া খাইখরচ দেয় ঠিকই, তবে অনেক হিসেবনিকেশ করে। বাড়ি থেকেই রুটি আচার ইত্যাদি নিয়ে আসে। নাভাতে এলে শুধু চা

আনায় একবার। মুন্সি-চাপরাশিকে একটা পয়সাও না। অন্যদিকে, নাজরের তরফে হাত একেবারে খোলা। ঝানু উকিল যা চায়, তাই পায়। নম্বরদার পাখর দরাজ হাতে টাকা ছড়িয়ে দেয়। মুন্সি-চাপরাশির দল খুশি থাকে। কোর্টে পুলিশ এলে, সে চর্বচোষ্য খানা তো পায়ই, উপরন্তু, পাখর তার পকেটে পাঁচ-দশ গুঁজে দেয়।

বিচারক বিব্রত বোধ করেন। ফুলের নাজিম এ কী মামলা পাঠালেন যে, নাভায় এসে সব ওলটপালট হয়ে গেল! তবুও, তিনি রায় দিলেন: জগিরার চোদ্দ বছর সশ্রম, নাজিরের সাত আর হরনামির দুই। তিনজনকেই জেলে পাঠানো হয়। বাকিরা বিকেলে নাভা থেকে আসে রামপুরায়, তারপর দুটো টাঙ্গায় সাধনিয়ার সাঁকো, সেখান থেকে হাঁটা পথে কলোকের রাস্তা। কেউ কারও সঙ্গে কথা বলে না। একটু জোরে পা চালায়। রাতে ঠিক খাওয়াদাওয়ার সময় সবাই কোটে খড়ক সিং পৌঁছে যায়।

পরের দিনই গ্রামে লোক আলোচনায় মশগুল হয়ে ওঠে। দুই তরফই বেশ নিরাশ। ঝান্ডার দল বলে, 'এ কী বিচার হলো একটা? ঠিকমতো বিচার হলে নাজর আর জগিরার ফাঁসি হতো।' মঙ্গলের দল বলে, 'জোর মামলা হয়েছে, বাপ! হরনামির সব গয়না গেছে, নাজর সব ভেড়া বেচেছে, চার বিঘে জমি— তাও বাঁধা দিয়েছে। কিন্তু এত করেও কিছু হলো না। নাজির জগিরা ছাড়া পেলে তবেই না ফায়দা হতো?'

হরনামি সম্পর্কেও নানা অভিমত শোনা যায়: 'মাগিটাই যত নষ্টের মূল!' 'ফাঁসি হলে ভাল হতো।' 'আরে, হরনামি তো আমাদের শ্যামিকেও টেক্কা মেরেছে! শ্যামি তো হরনামির তুলনায় ধোয়া তুলসি পাতা!'

আরও কিছুদিন পর দু পক্ষেরই মন কষাকষি বন্ধ হয়ে যায়। ঝান্ডার পক্ষ বলতে থাকে, 'জগিরার চোদ্দ বছর জেল, আর কী চাই? ফাঁসি দিয়ে কী লাভ হতো? কাজ গোছাল পাখর আর প্রীতম, হ্যাঁ! হরনামি তো এখন জেলের হাওয়া খাক।' মঙ্গলের পক্ষ পালটা জাবাব দেয়, 'তবু তো ছেলে দুটোর জান বেঁচে গেল। চোদ্দ বছর জগিরা থাকবে নাকী? ঠিক সাত-আট বছর বাদে ছাড়া পাবে, আর নাজির? তিন, মেরে-কেটে সাড়ে তিন বছরের মধ্যে ছাড়া পাবে!'

লোকে মঙ্গলকে 'আপিল' করতে মানা করে, 'রাজাদের মন বোঝা বড় শক্ত। আমরা জেলের কথা ভাবছি, আপিলে, রাজা বিচার করলে হয়তো ফাঁসি হয়ে যাবে। সবার ওপরে রাজা, সাজা ঠিক-ঠিক দেবেন। রানা প্রতাপ সিং, যার বাবা হীরা সিং—'

ঝান্ডা অবশ্য আপিলের কথা ভাবে না, 'মহারাজ প্রতাপ সিংকে কোনও বিশ্বাস নেই। তিনি হয়তো জেল খাটার মেয়াদও মকুব করে দেবেন!'

দু দলই একদিন চলে আসে পরাগদাসের ডেরায় বা আশ্রমে। পরাগদাস দু দলকেই সান্ত্বনা দেয়। রায় বেরোবার পরের দিনই ঝান্ডা সপরিবারে হাজির হয়েছিল। ওই দিনই সন্ধ্যেবেলা আসে মঙ্গল, নাজরের মা ও আরও কয়েকজন। তারা পরাগদাসকে 'খুশি' করে চলে যায়। নম্বরদার পাখর ও প্রীতমও সেই দলে ছিল। দুই দলই সেলবাড়ার গুরুদ্বারে প্রসাদ বিলিয়ে ভাইরূপার লঙ্গরখানায় যায়।

মাঝে-মধ্যে গাঁয়ে ফিসফিস আলোচনা চলে: 'ঝান্ডার তো পোয়া বারো! অর্জুনের জমিটা পেয়ে গেল ফোকটে। নাজির-জগিরার ফাঁসি হলেই বা কী, আর হরনামি জেলে থাকলেই বা কী। বিশ বিঘে জমি— চাট্টিখানি কথা!'

পাড়াপড়শিরা বলে, 'অর্জুন যেদিন মরে, সেদিন ঝান্ডা গিয়েছিল ফুলে। বাত্তি গুলগুলা বানিয়ে 'কালেকুত্তে'তে তুক্ করে এসেছিল— কল্লরিতে যে গাছটা তার তলায় গুলগুলা আর বাতাসা রেখে . . .'

হরনামি যখন বাড়ির বাইরে যেত, ফুল বা নাভায়, চাবি রেখে যেত প্রীতমদের বাড়িতে। প্রীতম মোষ দেখত, চারা ও ভূসি দিত, দুধ দুইতো। বারামাসিয়া ছোটেকে খেতে দিত। হরনামি জেলে যেতে সে মোষটাকে নিজের বাড়িতে এনে রাখে। বাড়ির বাইরের ও ভেতরের ঘরের দরজায় তালা দিয়ে দেয়। জিনিসপত্র যেমনটি ছিল, তেমনটি রেখে দেয়। কিছু নাড়াচাড়া করে না। কাপড়চোপড় থেকে বাসনকোষন সিন্দুক খাট পিঁড়ি অবিকল থাকে। বাইরের ঘরটা প্রীতমই পরিষ্কার করে রাখে।

হন্ডিয়ার আত্মীয়স্বজনদের সঙ্গে হরনামির বিশেষ বনিবনা ছিল না। গিন্দর নিরুদ্দিষ্ট হওয়ার পর, অর্জুন যখন হরনামির কাছে যাতায়াত করত, তখন শান্তা, হরনামির বড়দা, একবার কোটেতে আসে এবং, সব খবর জানতে পায়। হরনামিকে সে ভর্ৎসনা করে বলে, শ্বশুরের ইজ্জত ধুলোয় লুটিয়ে দিয়েছে। হরনামির মা-বাবা যদি এই কেচ্ছার খবর পায়, তাহলে তাদেরও মুখ দেখাবার জায়গা থাকবে না।

হরনামি দাদার কথায় রেগে যায়, জবাব দেয়, 'ওদের খেয়েদেয়ে কাজ নেই, তাই তোমাকে ভুজুং-ভাজুং দিচ্ছে। কারওর মুরদ থাকে তো আমার সামনে এসে বলুক! তোমাকেও বলিহারি, পরের মুখে ঝাল খেয়ে আমাকে বকতে এসেছ!'

শান্তা তবুও বোনকে বোঝাবার চেষ্টা করে: 'নামি — রেগে যাসনি। যা রটে তা তো কতক বটে। নিশ্চয়ই কেউ কিছু দেখেছে বা শুনেছে, নইলে এমন সাংঘাতিক কথা বলবে কেন?'

দাদাকে চা-রুটি দিয়ে অপ্যায়ন করা তো দূরে থাক, হরনামি খ্যাপা কুকুরীর মতো তার দিকে তেড়ে যায়। মুখে যা আসে, তাই বলে: 'তোমার লজ্জা করে না আমাকে এ সব বলতে? নিজের মেয়ে নেই তোমার? যাও, যাও — তাকে সামলাওগে — আমাকে জ্ঞান দিতে এসো না!' এইসব বলেই হরনামি কান্না জুড়ে দেয়।

শান্তা আর কিছু বলে না। চাদরের কোণে চোখের জল মোছে। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে বলে, 'বেশ — আর কিছু বলার নেই। জানব, আমার বোন আজ থেকে মরে গেছে।'

পেছন থেকে হরনামিও চেঁচিয়ে জবাব দেয়, 'ঠিক আছে। ঠিক আছে। আমার বাড়িতে আর কোনও দিন এসো না, এমনকী আমি মরলেও না!' বলেই সে আর এক প্রস্থ কাঁদে।

তারপর থেকে শান্তা আর কোটেতে আসেনি। এমনকী অন্য আত্মীয়স্বজনও না। হরনামি বেঁচে আছে না মারা গেছে এ নিয়ে আর কেউ কোনও খোঁজখবর নেয়নি।

হরনামির জেল হয়েছে খবর পেয়েও হন্ডিয়া থেকে কেউ আসেনি। কোটেতে কেউ এলে, কাজ সেরে চলে যায়। এমনকি, গিন্দরের কি হলো না হলো, সে খবরও কেউ রাখা দরকার মনে করে না। ওরা ধরেই নেয়, হরনামি নামে কেউ তাদের পরিবারে জন্মায়নি।

হরনামির জেল হওয়ার দু মাস পরেই প্রীতম নাভায় যায় তার সঙ্গে দেখা করতে। জগিরা ও নাজরের জন্যে ছোটখাট কিছু জিনিসপত্র নিয়ে যায়। হরনামির জন্যে গুড় ছোলা

মটরদানা সাবান তেল ইত্যাদি। আসল উদ্দেশ্য ছিল, হরনামির সঙ্গে দেখা করে জেনে নেওয়া তার জমি সামনের বছরে জমা রাখবে, না ভাগে কাজ করাবে।

হরনামি জবাব দেয়, 'ওইসব ভাগ জমার দরকার কী? তুমিই বরং চাষটাষ করো। তুমি তো আমার পর নও, প্রীতম ভাই!'

মনে মনে খুশি হয় প্রীতম। ভেবেছিল, হরনামির সঙ্গে হয়তো জমিসংক্রান্ত দরদাম করতে হবে। কিন্তু হলো ঠিক উলটো। আট বিঘে জমির নিঃশর্ত চাষ। এত জমি এইভাবে কে দেবে?

উনিশ

হরনামির জেল খাটার মেয়াদ শেষ হয়ে আসে। দিন পনেরো আগে প্রীতম নতুন সালোয়ার কুর্তা দুপাট্টা জুতো ইত্যাদি দিয়ে যায়। হরনামি যে-দিন ছাড়া পাবে, সে-দিন নিতেও আসবে বলে। হরনামি আপত্তি জানয়: 'কী দরকার ভাই? আমি এখান থেকে গাড়িতে রামপুরা গিয়ে নামব, তারপর সাধনিয়া থেকে একটা টাঙ্গা নেব। তুমি এলে বরং সাধনিয়ার সাঁকোতে অপেক্ষা কোরো। ওখানে যেতে এমনিই রাত হয়ে যাবে।'

'সাধনিয়া কেন? আমি বরং রামপুরায় আসব। ওখান থেকে উটের পিঠে আমরা কোটেতে চলে আসব।'

'বেশ তাই হবে।' হরনামি রাজি হয়ে যায়।

'কবে ছাড়া পাবে?'

'দোসরা চোত। বুধবার। দপ্তর থেকে অবশ্য পাকাপাকি জেনে নিতে হবে।'

প্রীতমকে সঙ্গে নিয়ে হরনামি জেল-দপ্তরে আসে। হ্যাঁ, দোসরা চৈত্র।

দোসরা চৈত্র এসে পড়ে। প্রীতম উট নিয়ে সকালেই রামপুরা স্টেশনে পৌছে যায়। আন্দাজ করে, হরনামি বারোটার গাড়িতে আসবে। এক আড়তদারের গুদামের কাছে, বটগাছের নিচে সে উট বাঁধে। উটটাকে ভূসি খেতে দেয়। আড়তদার লালা ব্যাপারটা লক্ষ করে বলে, 'এখনই এত খেতে দিও না, সর্দারজি। দাঁড় করিয়ে রাখো ব্যাটাকে। তুমি বরং জলপানিটা সেরে নাও। চা আনবো?'

'না, শেঠজি— চা আমি গাঁ থেকেই খেয়ে বেরিয়েছি। স্টেশনে যাবার আছে . . .'

'কেউ আসবে নাকী? সর্দারনি?'

'না। হরনামি — আমাদের গিন্দর সিংহের বউ। আজ ছাড়া পাবে।'

'আচ্ছা। আচ্ছা। তাই উট এনেছ?'

প্রীতম স্টেশনে আসে। এদিক ওদিক ছড়ানো-ছেটানো যাত্রী। গাড়ি আসার সময় হয়নি বোধহয়। নইলে, এত কম যাত্রী? গাড়ির সময় হলেই যাত্রীর সংখ্যা বাড়বে। নাকী,

গাড়ি চলে গেছে? এক বুড়ির পাশে বসে সে উদ্বিগ্ন হয়ে জিজ্ঞেস করে, 'বারোটার গাড়ি চলে গেছে?'

'এখনও আসেনি। দেরি হবে— টিকিটঘরের জানালা খোলেনি এখনও।'

'ওদের ব্যাপার! বাবু তো হেলেদুলে এসে জানালা খুলবে, আর আমাদের দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পায়ে খিল্ ধরে যাবে।' পাশ থেকে আর এক বুড়ি ফোড়ন কাটে।

প্রীতম বুড়িদের সঙ্গেই গল্প করে যায়। একটু পরেই ঘন্টা বাজে। টিকিটঘরের জানালা খুলে যায়। লোকে টিকিট কিনতে এগোয়। যাত্রীর সংখ্যা ক্রমশ বাড়ে। বুড়িরাও টিকিট কাটতে উঠে যায়। প্রীতম বসে বসে হরনামির কথা ভাবে। হরনামি নিশ্চয়ই এখন বুঝেসুঝে চলবে। ঝামেলা এড়িয়ে, বাড়িতেই থাকবে। নাজরও ছাড়া পাবে কয়েক বছরের মধ্যে। প্রীতম ভেবে চলে: হরনামিকে আর কাছ-ছাড়া করে রাখবে না। সেবা শুশ্রুষা যত্ন আত্তি করবে, যাতে হরনামিও ওকে কাছ-ছাড়া না করতে পারে। সারা জীবন সে যদি হরনামির সেবা করে যায়, তাহালে জমি হাতছাড়া হবে না। আট বিঘে জমি বলে কথা, ষাঁড়ের মাথার মতো মজবুত জমি। এত চমৎকার জমি কী সহজে পাওয়া যায়? গিন্দর আর ফিরবে না। হরনামির কাচ্চাবাচ্চাও নেই। উত্তরাধিকারের কোনও ব্যাপার নেই। হরনামিকে আদরযত্নে বেঁধে রাখতে হবে । ভাল খাওয়াদাওয়া, আয়েস, মৌজ। হরনামি ওর শরীরী ক্ষুধাও মেটাতে পারবে প্রীতমকে দিয়ে। ব্যাপারটা যে-দিকেই গড়াক, আট বিঘে জমি হাতছাড়া করবে না। প্রীতম আরও দূরের কথা ভাবে, গিন্দরের যাবতীয় স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তির মালিক হরনামি। সবই প্রীতমের দখলে থাকবে। হরনামি যতদিন বেঁচে থাকবে, ততদিন ভাবনা নেই। মারা গেলে হন্ডিয়ার আত্মীয়স্বজন যদি ভাগ চায়? তাহলে, প্রীতম একটু ভেবে পড়ে: ঠিক আছে, তখন একটা পথ ভেবে বের করতে হবে। কিন্তু হরনামির কেউ এসে যদি এখানে আস্তানা গাড়ে? লোক স্বার্থ সিদ্ধির জন্যে অনেক কিছু করে। লোভের শেষ নেই। তবে, হন্ডিয়ার কেউ আসবে বলে মনে হয় না। শান্তা তো সব সম্পর্ক ছিন্ন করে চলে গেছে। আর কেউ আসবে বলে মনে হয় না। জমি তো শরিকানি জমি হয়ে যাবে। শরিকের দাবি তো সবার আগে।

প্রীতমের মনে নানা চিন্তা পাক খায়। স্বপ্নের মতো দেখতে পায়, নন্দ, হরনামির ছাড়া কাপড় ধোয়ার জন্যে নিতে এসেছে, হরনামির ঘরে গেরু-মাটি লেপার কাজ করছে, ঘর পরিষ্কার ছাদ ইত্যাদি লেপা-মোছা করছে, উনুনে রুটি সেঁকে দিচ্ছে। প্রীতম এইসব ভাবতে ভাবতেই গাড়ি এসে পড়ে। যাত্রীদের মধ্যে তাড়াহুড়ো পড়ে যায়। কেউ ওঠে, কেউ নামে। ট্রেনের এক মাথা থেকে আর এক মাথা অবধি লোকজনের দৌড়ঝাঁপ, বাচ্চাদের চিৎকার। মেয়েদের উঁচু গলার হাঁক-ডাক। পুরুষদের গালিগালাজ। মালপত্র সামলানো।

কিন্তু, হরনামিকে দেখা যায় না। প্রীতম ওয়েটিংরুমে ঢোকে। হরনামি নেই। বাইরে এসে সে এদিক-ওদিক তাকায়, গেটের দিকে যায়— কোন্ দিক থেকে কোথায় দাঁড়িয়ে আছে, কে জানে — কিন্তু, না, ওকে কোথাও দেখা যায় না। শেঠজির আড়তে ফিরে আসে প্রীতম, 'হরনামি কী এখানে এসেছিল লালা?'

'না তো! বোধহয় গাড়ি থেকেই নামেনি। সন্ধ্যের গাড়িটা দেখে যাও বরং। রুটি খাবে? বাড়ি থেকে আনাই তাহলে?'

'ন্‌ না, লালা — খিদে নেই। আজই তো দোসরা চোত?'

'হ্যাঁ। আরে, প্রীতম ভাই—মিছিমিছি উতলা হচ্ছ। সন্ধ্যের গাড়িটা দেখে যাও। এখন লম্বা দাও ওই গদিতে— উটটাকে দানাপানি দিয়েছ?'

উট ছোলার ভূসি আগেই সাবাড় করে দিয়েছে। এখন আড়াআড়ি শুয়ে আছে। প্রীতম লালার কাছ থেকে এক বালতি জল নিয়ে উটটাকে দেয়। পুঁটুলি খুলে চারটে তন্দুরি রুটি বের করে তড়কার সঙ্গে খায়। তারপর, পেট ভরে জল খেয়ে, লালার কাছ থেকে একটা খাটিয়া এনে, উটটার পাশেই শুয়ে পড়ে।

সন্ধ্যের গাড়ি সাতটায় আসে। আশপাশটা অন্ধকার হয়ে আসছে। দুপুরের মতোই সন্ধ্যের গাড়িটাও প্রীতম আতিপাতি করে খোঁজে। না, হরনামি আসেনি। সে ভেবে পড়ে: গেল কোথায় হরনামি? তারপর, আড়তের সামনে বট গাছটার কাছে চলে আসে। উটের মুখ গাঁয়ের দিকে ফেরায়। হরনামিকে আজ বোধহয় জেল থেকে ছাড়েনি।

ধীচর কীভাবে যেন জেনে যায় হরনামি দোসরা চোত ছাড়া পাবে। কৈলুকে সঙ্গে নিয়ে সকালেই সে চলে আসে বারনালা স্টেশনে। সে জানে বারোটার গাড়িতে হরনামি আসবে নাভা থেকে। না হলে সন্ধ্যের গাড়ি। গাড়ি আসার সঙ্গে সঙ্গে ওরা প্রত্যেকটা জানালায় উকি দেয়। গাড়ি অনেকক্ষণ দাঁড়ায় বারনালায়। কিন্তু, হরনামি কই? সন্ধ্যের গাড়িটা দেখে যেতে হবে। কৈলু বলে, 'হয়তো গা-ঢাকা দিয়ে বসেছিল, আমাদের নজর এড়িয়ে গেছে।'

'কখ্‌খনো না! আরে, গা-ঢাকা দিয়ে বসার মেয়ে হরনামি নয়!' ধীচর জোর দিয়ে বলে, 'জানালার ধারে বসে এদিক-ওদিক তাকাবার মেয়ে, বাবা! সন্ধ্যের গাড়িতে ঠিক আসবে।'

বারোটার গাড়ি চলে যাওয়ার পর ওরা আর ওয়েটিংরুমে ঢোকে না। রাস্তায় নেমে সোজা চলে যায়, কৈলুর সম্পর্কে এক পিসিমার বাড়ি। নিঃসন্তান বিধবা বুড়ি ওদের রুটি দিতে দিতে ভাইরূপার খবর নেয়। সবার কুশল জিজ্ঞেস করে। ছটা আন্দাজ ওরা আবার ফিরে আসে স্টেশনে। পিসির বাড়ি থেকে বেরিয়েছিল বিকেল পাঁচটায়। ধীচরের কবজিতে ওয়েস্টএন্ড ওয়াচ কোম্পানির কলাই-করা ঘড়ি। স্টেশনে ঢুকে একটা বেঞ্চে বসে পড়ে। কয়েকজন যাত্রী ঘোরাফেরা করে। ধীচর হঠাৎ পকেট থেকে বারোটার গাড়ির টিকিট বের করে ছিঁড়ে ফেলে। কৈলু বিস্মিত হয়, 'ছিঁড়লে কেন ওস্তাদ? কোনও কাজে লেগে যেত!'

'নতুন দুটো টিকিট কাট। তপা যাব।'

'ফালতু ও-দুটো ছিঁড়লে! ওতেই হয়ে যেত।'

'ছিঁড়ে ফেলেছি যখন আর কি হবে— নতুন দুটো কাট।'

কথা বলতে-বলতে সময় কাটে। যাত্রীদের ভিড় বাড়ে। টিকিট ঘরের জানালা খুলতে ওরা টিকিট কাটে। ততক্ষণে গাড়ি এসে পড়ে। সামনেরই এক কামরায় হরনামি বসে! জানালার ধারের একটা আসনে বসে এদিক-ওদিক তাকাচ্ছে। ধীচর-কৈলুকে দেখে হাত নেড়ে ডাকে।

ধীচর খুশির চোটে দৌড়ে আসে: 'আরে, হরনামি!'

'আজ দুপুরে ছাড়া পেলাম।'

'মানে, মেয়াদ খতম?' একটু অবাক হওয়ার ভান করে ধীচর-কৈলু মৃদু হাসে।

'হ্যাঁ। তা, তোমরা এখানে?।

'বারনালায় একটা কাজে এসেছিলাম। তপায় যাব।

'তাহলে উঠে পড়ো। দাঁড়িয়ে কেন? গাড়ি তো ছাড়ল বলে।'

ওরা চট করে গাড়িতে উঠে পড়ে। হরনামির পাশেই বসে।

প্রাথমিক কুশল বিনিময়ের পর ধীচর মন্তব্য করে, 'বেশ রোগা হয়ে গেছ। মুখচোখ বসে গেছে একেবারে। অসুখবিসুখ?'

'জেলে আর কজন ভাল থাকে? আধপোড়া রুটি, জলের মতো প্যানপেনে ডাল, মাছি সর্দিকাশি, বিছানায় ছারপোকা — এসবের মধ্যে কী আর ভাল থাকা যায়? কুত্তার বাচ্চারা একটু ভাল খাবার জল অবধি দেয় না!'

'ওসব আর ভেব না। দুধ ঘি খেয়ে আবার তাগড়া হয়ে যাবে। সব কষ্ট ভুলে যাবে—' কৈলু কথা বলতে বলতে ঊরুর ওপর হাত রাখতে, হরনামি একটু চনমন করে ওঠে। পা দুটো নিচে নামিয়েই রাখে, তোলার চেষ্টা করে না।

'কোথায় নামবে?' জিজ্ঞেস করে ধীচর।

'রামপুরায়। প্রীতম স্টেশনে থাকবে। গাড়িঘোড়ার ব্যবস্থা রাখবে।'

'রামপুরা পৌঁছতে-পৌঁছতে তো রাত হয়ে যাবে। প্রীতম কী অতক্ষণ থাকবে? বারোটার গাড়ি দেখেই হয়তো চলে গেছে। আমি বলি কি, আমাদের সঙ্গে তপায় চলো। খাওয়াদাওয়া করে বিশ্রাম নাও। আমরা বরং তোমাকে কোটে পৌঁছে দেব। ভাইরূপাতে আমাদের একটা কাজও আছে।' খুব আন্তরিক সুরে ধীচর কথাগুলো বলে।

হরনামি কৈলুর চেহারাটা তারিয়ে-তারিয়ে দেখে। এতদিন জেলের নরকযন্ত্রণায় শরীরটা এমনিই ঝিম ধরে আছে। কৈলুর শরীরটা হঠাৎ বেশ লোভনীয় মনে হয় তার। কথাটা ভেবেই সে উত্তেজনায় টান-টান হয়ে ওঠে, পারলে যেন এখনই সে খেয়ে ফেলে কৈলুকে ধীচরের কথায় সে তৎক্ষণাৎ রাজি হয়ে যায়। তপায় নেমে ওরা ডিলমি যাওয়ার রাস্তা ধরে। বেশ রাত হয়ে গেছে তখন।

কুড়ি

লোক প্রীতমকে জিজ্ঞেস করে, 'হরনামির কী হলো? জেল থেকে ছাড়া পায়নি?' কেউ বলে, 'নাভায় গিয়ে একটু খোঁজখবর নাও। এখনও ছাড়া পেল না কেন—'

চারদিন হয়ে গেছে। প্রীতম ব্যাপারটা আঁচ করতে পারে না। ভাবে, হরনামির সাজা বোধ হয় আরও পনেরো বিশ দিন বেড়ে গেছে। জেলে হয়তো কোন গণ্ডগোল করেছিল।

দোসরা চৈত্র তারিখটা হয়তো ভুল বলা হয়েছে । কেরানি বোধ হয় তারিখটা গোলমাল করে ফেলেছে। নিশ্চয়ই কোথাও কিছু একটা উলটো-পালটা হয়ে গেছে। একটু দুশ্চিন্তাও হয়। রাস্তায় কিছু ঘটে যায়নি তো? কেউ কিছু করে থাকলে, সে হরনামির আট বিঘে জমিও প্রীতমের কাছে থেকে হাতিয়ে নিতে পারে। না, তেমন সাংঘাতিক কিছু হয়নি। হলে, জানতে পারা যেত। প্রীতম আবার তার পুরনো স্বপ্নে বুঁদ হয়ে যায়। এইভাবে দিন দশেক কাটার পর সে আর স্থির থাকতে পারে না। নম্বরদার পাখরের সঙ্গে পরামর্শের পর, দু জনেই ভোরের ট্রেনে নাভা জেলে আসে। জানতে পারে, দোসরা চৈত্রই বারোটার সময় হরনামিকে ছাড়া হয়েছে। জেলের লোকজনও এদের কথা শুনে বিস্মিত। প্রীতম ও পাখর আবার অনুরোধ জানায় নাজর ও জগিরার সঙ্গে দেখা করার অনুমতি চেয়ে। কিছু টাকা হাতবদল হতেই অনুমতি মেলে। সব শুনে জগিরা নির্বিকার। একটু আফসোস করে শুধু: 'ওই হতচ্ছাড়ির জন্যে আমার এই নরকবাস! নাজরের সঙ্গে থেকে আমার ভবিষ্যৎ মাটি হয়েছে। পাঁচ জনের আশীর্বাদ ছিল বলে প্রাণে বেঁচে গেছি, কাজেই ওই মাগিটার কথা আমি শুনতে চাই না।' নম্বরদারের কাছ থেকে মায়ের কুশল জানার পর মিনতি জানায়, গ্রামের লোকজন যেন ওর মাকে একটু দেখে। পাড়াপড়শি ছাড়া তার আপনার জন আর কে আছে? ছাড়া পেয়ে সে আবার সামলে নেবে সব কিছু।

নাজর অবশ্য খবর শুনেই বিমর্ষ হয়ে পড়ে। চিন্তিতভাবে বলে, 'রাস্তা থেকে কেউ তুলে নেয়নি তো? মেয়েদের মন গুড়ের মতো, যে মুখে দেয়, তারই হয়ে যায়।' তারপরই প্রীতমের ওপর রেগে যায়, 'তোমারই দোষ! দোসরা চোত তুমি নিজে এলে না কেন?'

প্রীতম প্রতিবাদ জানায়, 'আমি তো আসতে চেয়েছিলাম, কিন্তু হরনামি আমাকে বারণ করে। আমাকে রামপুরায় অপেক্ষা করতে বলে। পুরোদিন আমি ওখানে উট নিয়ে অপেক্ষা করেছি। সকালের গাড়ি, সন্ধ্যের গাড়ি— দুটোই দেখি। কাজেই, আমাকে দোষ দিতে পারো না। এমন হবে আমি জানব কেমন করে? কথা পাকাপাকি করে গেলাম ওর সঙ্গে, তারপর এই ব্যাপার!'

কোর্টে খড়ক সিং-এ খবরটা পৌঁছে যায়। খুনের মামলায় জেল থেকে ছাড়া পেয়েও হরনামি গ্রামে ফেরেনি। মুখে-মুখে কথাটা ছড়িয়ে পড়তে, জটলা শুরু হয়ে যায়। মাসখানেক পরেই একটা উড়ো খবর আসে: সঙ্গতমন্ডির কাছে ডুমবালি গাঁয়ে হরনামিকে দেখা গেছে। এক অবসরপ্রাপ্ত ফৌজির ঘরনী হয়ে আছে। ফৌজির বয়েস সাতচল্লিশ-আটচল্লিশ। গাঁয়ের লোক খবর শুনে তাজ্জব। এত জায়গা থাকতে শেষ অবধি ফৌজির কাছে কোন দুঃখে হরনামি থাকতে গেল? বুড়োরা বলে, 'একেই বলে মতিচ্ছন্ন! নইলে নিজের জায়গাজমি থাকতে—? এক জায়গায় কী আর এসব ছুঁড়িদের ভাল লাগে? যেটুকু বুদ্ধিসুদ্ধি ছিল, নাভায় থেকে তার বারোটা বেজেছে!' বুড়িরা বলে, 'নিজের জায়গা কখনও ছাড়তে আছে?'

ছবিটা আস্তে আস্তে স্পষ্ট হতে থাকে। ধীচরের কারসাজি। জনমত তৈরি হয়ে যায়: 'ধীচর কাজটা খুব খারাপ করল। নিজের গাঁয়ে এই অপকর্ম? অন্য গাঁয়ে হলে, তারা বুঝত। কিন্তু, নিজেদের গাঁয়ে, না, না— এটা খুব বাজে কাজ হয়েছে। হরনামি নষ্ট-মেয়ে হতে পারে। কিন্তু আমাদের গাঁয়েরই তো বউ—'

কেউ কেউ মন্তব্য করে, 'মেয়েদের মনের কথা বোঝে কার সাধ্যি? জোয়ান ছেলে দেখে কৈলুর ওপর হামলে পড়ল একেবারে! ধীচরও তক্‌কে-তক্‌কে ছিল। মেয়ে বেচা যাদের ব্যবসা, মওকা পেলে কী তারা ছাড়ে?'

আর এক দল বলে, 'রাখো তোমার গাঁয়ের বউ! আমরা কী সারাক্ষণ তাকে আগলে-আগলে রাখব?'

প্রীতম ধীচরের সঙ্গে দেখা করতে ভাইরূপা যায়। ধীচর কিছু স্বীকার করে না। প্রীতম মনের কথাটা জানাতে, ধীচর তখন সব খুলে জানায়। প্রীতম জিজ্ঞেস করে, 'কাজ পাকা— না হরনামি ফিরতে পারে?'

'সুযোগ নেই। দেখা যাচ্ছে, আমি তো তোমার এক মস্ত বড় উপকার করে বসে আছি। মালটাল আনাও, তাহলে?'

'আরে মাল খাবে— এ আর বড় কথা কী? আগে আমার কাজটা হোক, তুমি যত খেতে চাও— খাওয়াবো। তবে, আজ যখন কথাটা হলো, দাঁড়াও — ঠেক্ থেকে একটা বত্‌লি আনি!'

প্রীতম খানিক পরেই একটা বোতল নিয়ে আসে। ধীচর মদ খেতে থাকে। প্রীতম একটা কথাই বারবার জিজ্ঞেস করে, 'ঠিক বলছ তো? হরনামি আর আসবে না?'

ধীচর বিরক্ত হয়ে জবাব দেয়, 'কী একই কথা ঘ্যানরঘ্যানর করছ? ফৌজির কাছ থেকে কেটে পড়া সোজা কথা? শালার কাছে এগারো ছররার পাকা রাইফেল আছে। ঝামেলা করলে এগারোটাই ভেতরে ঢুকিয়ে দেবে। রাতে একটু আওয়াজ পেলেই রাইফেল হাতে ঝট করে উঠে পড়ে। সারা গাঁয়ের লোক চমকায় ওকে দেখলে, তোমার হরনামি নাকী ওখান থেকে কাটবে, কী যে বলো প্রীতম!'

প্রীতম বেশ রাতেই গ্রামে ফেরে। চলে যায় নম্বরদার পাখরের কাছে। অনুরোধ জানায়, 'নম্বরদার— আমার এই কাজটা করে দাও, ভাই। সারাজীবন তোমার পা ধুয়ে দেব।'

নম্বরদার চট করে রাজি হয় না, 'এটা বড় কঠিন কাজ। আট বিঘে জমি হড়প! বাপরে! তাছাড়া, গিন্দর বেঁচে আছে কী না জানা নেই।'

'ওখানেই তো কোপটা মারতে হবে। তুমি সাক্ষী দেবে, গিন্দর আট বছর গাঁয়ে ফেরেনি। মারা গেছে।'

'আট বছর? কী করে? আট বছর তো ওদের বিয়েই হয়নি।'

'আট বছরের বেশি হয়েছে। আমি হিসেব করে দেখেছি।'

'হুঁ। বিয়ের পর দু তিন বছর তো ভালই ছিল। মাথা খারাপ ছিল দু বছর— চার বছর হলো গিয়ে বেপাত্তা . . . '

প্রীতম পারামর্শ দেয়: 'এ-সব তো আর লেখাজোখা নেই। তুমি বলবে বিয়ের সময় থেকেই গিন্দরের মাথা খারাপ। কয়েকদিন পরই গ্রাম থেকে চলে যায়, এতদিন ফেরেনি, বেঁচে থাকলে নিশ্চয়ই ফিরত।'

পাখর আর প্রীতম এবার আসে পরাগদাসের কাছে। পরাগদাস যথারীতি আশীর্বাদ জানিয়ে বলে, 'প্রীতম— তোর বরাত খুলে যাবে রে। অনেক সম্পত্তির মালিক হবি। আমার আশ্রমে কত দান করবি বল, তোর কার্যসিদ্ধি হবে। রাহু কেটে গেছে—'

'দু বিঘে দেব মহারাজ! আরও কিছু বলুন।'

'বলার আর কী আছে? চরণদাসকে সঙ্গে নিয়ে যেয়ো হে নম্বরদার। ওর সাক্ষীতে অনেক কাজ দেবে। তোমার সাক্ষীতো থাকবেই। যোগিন্দরের নিশ্চয়ই 'দেহান্ত' হয়েছে। আট বছর হতে চলল— সবই তাঁর ইচ্ছা!' পরাগদাস রাস্তা বাতলে দেয়।

'ঠিক বলেছেন, মহারাজ। হরনামির খবর তো জানেন', নম্বরদার ব্যাখ্যা করে, 'ডুমবালিতে এক ফৌজির সঙ্গে আছে। আর আসবে বলে মনে হয় না।'

'হরনামি কৌর তোর ঠিকানায় পৌঁছে গেছে। এখানকার জায়গাজমির আর কোনও ভাগ নেই ওর।' পরাগদাস সুচিন্তিত অভিমত ব্যক্ত করে।

প্রীতম তার দু বিঘে জমি দু হাজার টাকায় বাঁধা দেয় ঝান্ডার কাছে। ইতিমধ্যে পাখরের সঙ্গে গিয়ে লেখাপড়ার কাজ পাকাপোক্ত করে ফেলে। তহসিলদার হাজার, পাঁচশো পাটোয়ারি, পাঁচশো কানুনগো, আর থানার বড়বাবু কিছু। ফুলেতেই কাজ পাকা হয়ে যায়। সাক্ষী থাকে নম্বরদার পাখর আর চরণদাস বাবাজি ওরফে গুরুচরণ সিং। প্রীতম এইভাবে আট বিঘে জমি হাতিয়ে ফেলে। নম্বরদারের 'পেট' ভরে যায়। দলিল দস্তাবেজ যেদিন পাকা হয়, প্রীতমের বাড়িতে সেদিন মদ-মাংসের মচ্ছব হয়। আকণ্ঠ মদ গেলে নম্বরদার পাথর, ঝাণ্ডা আর ভাইরূপার মানিকজোড়, ধীচর ও কৈলু। গাঁয়ের প্রত্যেক বাড়িতে হালুয়া পাঠানো হয়। কয়েক দিন পরই, পরাগদাসও প্রতিশ্রুত দু বিঘা পেয়ে যায়।

সময়ের রঙ বড় অদ্ভুতভাবে বদলায়। ঝান্ডা ভুলে যায় দু বছর আগে অর্জুনের খুনের মামলায় এই প্রীতম, এই পাখরই তার বিরুদ্ধে ছিল। নাভায় সব ওলটপালট হয়ে গিয়েছিল উৎপটাং সাক্ষ্যপ্রমাণে। না হলে, নাজর আর জগিরার নির্ঘাৎ ফাঁসি হতো। কিন্তু, সময় বড় তাড়াতাড়ি বদলে যায়। যার জন্যে, পাখর প্রীতম ঝান্ডা আজ এক গ্লাসের ইয়ার। ঝান্ডা খুব খুশি— দু হাজার টাকায় প্রীতম জমি বাঁধা দিয়েছে। এইভাবেই তো জমিজমা বাড়ে। অর্জুনকে এখন আর মনেই পড়ে না।

একুশ

জেল থেকে ছাড়া পেয়ে নাজর গাঁয়ে আসে। কোটে খড়ক সিং বেশ পালটে গেছে। মা বাবার যে কায়ক্লেশে দিন কাটে, বুঝতে অসুবিধে হয় না। কোনও ক্রমে নিঃশ্বাস ফেলে যায় মঙ্গল আর মঙ্গলের স্ত্রী। গোয়াল এখন বেদখল। তিন চার বিঘে — তাও বাঁধা। মকদ্দমা চালাতে গিয়ে এ-সব হয়েছে। উপায় ছিল না। জগিরার বুড়ি মা ছেলের খবর নেয়। মিটমিট করে তাকিয়ে থাকে। মরার আগে ছেলের হাতে একটু জল— এ-ছাড়া বুড়ি আর কিছু চায় না। লোকের বাড়িতে কাজ করার ক্ষমতা আর নেই। বয়েসের ভারে বুড়ি নুয়ে পড়েছে। পরিচিত বাড়িতে গেলে কিছু পায়। তাই দিয়েই চলে যায়। গ্রামের চৌপালটাও কেমন যেন বদলে গেছে। শুধু মিলখা সিং-ই কাগজ পড়ে যায় আগের মতো। কিন্তু, শ্রোতারা কেমন যেন অনাগ্রহী। নিজেদের মধ্যে কথাবার্তা বলে চলে। আগের মতো খবর শুনে অভিমত বিনিময় করে না। মিলখা-ও আর ইংরেজদের গুণগান করে না। মাসটা আষাঢ়। ভরাট খেত হাওয়ায় দোল খায়, গাছের পাতা নড়াচড়া করে। সারা দিনের গুমোট গরমে জমি তেতে ওঠে। বটগাছের নিচে লোকের জটলা। বিদ্যুৎ চমকালেই এক যোগে সব বলে ওঠে: আয় বৃষ্টি ঝেঁপে!

দিন শেষ হলেই সূর্য দৌড় দেয় তার রাতের বাসায়। চমৎকার হাওয়া বয়। উঠোনে জল ছিটিয়ে লোকে গল্পগুজব করতে বসে। চৌপালে আলোচিত গাঁয়ের খবর এক মুখ থেকে অন্য মুখে ছড়িয়ে পড়ে।

সেদিন নাজরও চৌপালে আসে। প্রথমটা সবাই উদাস চোখে তার দিকে তাকায়। একজন একটু আলগোছে জিজ্ঞেস করে: 'আরে— নাজর যে, কখন এলি?'

'রাতে।' নাজর বসে পড়ে। তাকিয়ে-তাকিয়ে দেখে সবাইকে।

মিলখা কাগজের ওপর থেকে চোখ তোলে, 'নাজর? একটু মুটিয়ে গেছিস দেখছি। খবর ভাল তো?'

'এই এক রকম। আপনাদের খবর কী? লড়াই কেমন চলছে?'

'লড়াই তো খতম হয়ে গেছে। হিটলার মরেছে বিষ খেয়ে। নতুন সরকার। এটলি গদিতে বসেছে।'

'এটলি সাহেবের জন্যে হিন্দুস্থানের কিছু উপকার হবে?' নাজর জিজ্ঞেস করে।

নাজরের প্রশ্নে সবাই যেন একটু বিস্মিত। একজন বৃদ্ধ বলে ওঠেন, 'জেলে থেকে তো তোর জ্ঞানবুদ্ধি বেড়ে গেছে রে নাজর — লেখাপড়াজানা লোকেদের মতো কথা বলছিস!'

বৃদ্ধের প্রশংসায় নাজর লজ্জিতভাবে হাসে। মিলখা জবাব দেয়, 'জেলও তো এক ধরনের ইসকুল। কত রকমের লোক। ওদের মধ্যে থাকলে মানুষের জ্ঞান এমনিই বেড়ে যায়। আমাদের ফৌজেও এই রকম হয়। যারা আনপড়— তারাও পাড়াশোনা শিখে ফেলে। মানুষ হয়ে যায়।'

নাজর কিছুক্ষণ বসে থেকে উঠে পড়ে। ভাল লাগে না। তার পুরনো গোয়ালঘরের দিকে হাঁটা দেয়। ধুক্কর নাজরকে দেখে সোল্লাসে স্বাগত জানায়, 'নাজর ভাই! একী হাল হয়েছে তোমার? তুমি এসেছ শুনেছিলাম, কিন্তু এখানে কখন আসবে আঁচ করতে পারিনি।'

'সব ঠিক আছে তো? চন্দনের সঙ্গে গোলমাল-টোলমাল হয়নি তো?'

'আরে না, না! ওর স্বভাবটা বড় ভাল। আমিও কাজের দিক থেকে কোনও খুঁত রাখি না। চন্দনের যাতে লোকসান না হয়, সেদিকে নজর রাখি। সবই তোমার দয়া— নাজর ভাই।'

নাজর ধুক্‌করের ছেলেকে টাকা দিয়ে সার্বনের ঠেক্ থেকে মদ আনতে বলে। নাজরের নাম করলেই ভাল মদ পাওয়া যাবে।

ছেলেটি মদ আনতে গেলে, দু জনে বসে গ্রামের নানা বিষয় আলোচনা করে। ছেলেটি ফিরে এসে বলে, সর্বন টাকা নেয়নি। নাজর ফিরেছে — এই খুশিতেই সে মদ দিয়েছে। নাজর খুশি হয় কথাটা শুনে।

ধুক্‌কর আর নাজর মদ খেতে বসে। ধুককরের কাছে অ্যালুমিনিয়ামের একটা মগ আছে। পাশের বাড়ি থেকে পেতলের একটা মগ আনিয়ে নেয় ওরা। জলের ছোট বালতিতে একটা ঘটি রাখে। দু এক চুমুকের পরেই ওদের কথাবার্তা শুরু হয়ে যায়। হরনামি সম্পর্কে সব খবরই ধুক্‌করের জানা। গাঁয়ের কারও কাছেই অগোচর নয়, হরনামির জন্যে নাজর কী না করেছে। একটি মেয়ের জন্যেই তো সারা জীবন বরবাদ করেছে সে। নাজর আফসোস করে, 'যার জন্যে এত করলাম, সে আমাকে ছেড়ে চলে গেল গু-মুতের মতো!'

ধুক্‌কর সান্ত্বনা দেয়, 'ছেড়ে দাও ওসব কথা!'

নাজর বলে যায়, 'মরলাম আমরা আর মজা লোটে অন্য লোক। তা দিয়ে মরে হাঁস, ডিম খায় দারোগাবাবু! সব শালা সর্দার বনে গেছে এখন। ঝান্ডা জমি বাড়িয়েছে। প্রীতম আট বিঘে হড়প করে নিয়েছে। পুরনো কথা সব বেমালুম ভুলে গেছে।'

ধুক্‌কর জবাব দেয়, 'জায়গাজমির লোভ বড় ভীষণ লোভ। মানুষকে জানোয়ার বানিয়ে দেয়। এই যে ঝান্ডা — ভাই মরেছে বলে কোনও দুঃখু আছে? দশ বিঘে জমি পেয়ে গেছে — আর কী? কে জেল খাটল, কার ফাঁসি হলো— তাতে ওর কী? প্রীতমকে দেখো — হরনামিকে জেল থেকে ছাড়িয়ে এনে ঘরছাড়া করে দিল! গিন্দর বেঁচে আছে না মরে গেছে কেউ জানে না— কিন্তু প্রীতম ওকে স্রেফ মরে গেছে সাব্যস্ত করে জমিটা বাগিয়ে নিল দুটো সাক্ষী খাড়া করে। গু-খেকোর ব্যাটারা সব! সরকার কানা, কিছু দেখে না। তহসিলদার থেকে পুলিশ, সব শালা চোর! আর ওই হারামি পরাগদাস— শালার ভুঁড়ি ফাঁসিয়ে দেওয়া উচিত। আস্ত বহিন্‌চোদ একেবারে!'

নাজরের চোখমুখে আগুন ঝলসায়। কয়েকদিনের মধ্যেই অবশ্য সে সামলে নেয় নিজেকে। চন্দনের সঙ্গে একটা রফা করে আগের মতোই ভেড়া চরাতে বেরিয়ে পড়ে। পুরনো জীবনটা আস্তে আস্তে ফেরত আসে। ধুক্‌কর ভেড়া চরানো ছেড়ে আর একটা কাজে ব্যস্ত হয়ে ওঠে। নাজরের সব রাগ গিয়ে পড়ে তার দাদা খাজানের ওপর। পুলিশে চাকরি করলেও, খাজান কোনও দিন থানা বা জেলে গিয়ে তার খোঁজখবর নেয়নি। মামলা চলার সময় একদিনের জন্যেও আসেনি। নাজর ভাবে, সংসারে রক্তের রঙ-ও ফ্যাকাশে হয়ে আসে। ভাই ভাইকে চিনতে চায় না। ঝান্ডা বা প্রীতমকে দেখলে এখন আর অতটা রাগ হয় না। মনে মনে হাসিও পায় একটা বিষয় লক্ষ করে। ঝান্ডাকে তার ভয় পাওয়ার কথা, কিন্তু ঝান্ডাই যেন তাকে দেখে ভয় পায়। ঝান্ডা নাজরকে দেখতে পেলেই অন্য পথে হাঁটা

দেয়। ভাইয়ের মৃত্যুর প্রতিশোধ, ঝান্ডা ভাবতেই পারে না। দশ বিঘে জমির কাছে এসব ফালতু ব্যাপার।

তবে, প্রীতম যেন একটু ভাব জমাবার চেষ্টা করছে। মুখোমুখি হলেই বেশ খাতির করে কথা বলে। প্রীতমের চালাকি বুঝতে নাজরের অসুবিধে হয় না। আট বিঘে হাতে রাখার জন্যেই এই মিষ্টি ব্যবহার!

নম্বরদার পাখরও নাজরকে ডেকে পাঠায়। খাতির জমাবার চেষ্টা করে কিন্তু সুবিধে করতে পারে না। মকদ্দমা চলার সময় শালা লুটেপুটে খেয়েছে। পাখরকে চিনতে বাকি নেই নাজরের। শুয়োরের বাচ্চা একেবারে! কুতকুতে চোখ। ইঁদুরেরর মতো মুখ, হাসলে মনে হয় কোনও ইঁদুর বুঝি ভেংচি কাটছে! পরের বছর ধুক্কর হিস্যামতো ভেড়া ভাগ করে নেয়। ধুক্করের ছেলে সেগুলো চরাবে। চন্দনের অংশীদার হয়ে যায় নাজর। গোয়াল আর ভেড়ার পুরনো কর্তৃত্ব আবার ফিরে পায় সে।

দৃশ্যপট দ্রুত বদল হয়। পনেরো-কুড়ি দিনের মধ্যে দুই বুড়ি পরপর মারা যায়। প্রথমে জগিরার মা, তারপর নাজরের। নাজর ফুলে গিয়ে খাজানকে খবর দিয়ে আসে। ক্রিয়াকর্মের দিন চলে আসে। খাজান এখন ধনৌলা থানায়। শ্রাদ্ধের দুদিন আগে সে এসে পড়ে। সঙ্গে এক পশ্চিমা-বউ। ভাঙা-ভাঙা পাঞ্জাবি বলে। সালোয়ার কামিজ দোপাত্তা, সব ঠিক আছে— তবে দোপাত্তা ব্যবহারে যে অনভ্যস্ত— বেশ বোঝা যায়। দু বছর ওরা বিবাহিত।

সবে দেশ ভাগ হয়েছে। এদিকের পাঞ্জাবি মুসলমান চলে যাচ্ছে পাকিস্তানে। অনেকে আবার এদিকেই মরেছে। ঘরবাড়ি সম্পত্তি লুট হয়ে গেছে। নারীরা ধর্ষিত হয়েছে। কেউ-কেউ আবার হিন্দু ঘরে ঘরনী হয়ে গেছে। পাকিস্তানী-পাঞ্জাবের সিং ও অন্যান্য হিন্দুরা এদিকে চলে এসেছে। গ্রাম শহর গঞ্জ— যেখানেই সুবিধে পেয়েছে, জায়গা করে নিয়েছে। বিশৃঙ্খলা হিসেবহীন। কে কখন চলে যাচ্ছে, মারা যাচ্ছে, ফিরে আসেছে না— কিছুই জানা যায় না। লোকে গাঁয়ের বাইরে পা বাড়ায় না। লুটপাট-করা-লোক দেখলেই তাকে মেরে ফেলা হয়। অজানা অচেনা কাউকে দেখলেই লোক সন্দিগ্ধ হয়ে ওঠে। কে সাধু, কে চোর— বাছবিচারের সময় নেই। মায়া মমতা মানবিকতা— সবই অদৃশ্য; মানুষ ভাগ হয়ে গেছে হিন্দু-মুসলিম নামে। এপারের পাঞ্জাবে, অসহায় মুসলমান মেয়ে পথ-হারানো গোরু-মোষ হয়ে গেছে। এ-সব দেখে নাজরের খারাপ লাগত। ভাবত, এদের কাউকে ঘরের বউ করে আনে। সে রুটি বানাবে, সংসার করবে। জীবনটা সুস্থির, সুগম হয়ে যাবে। তারপরই ভাবত, এইসব ঘরছাড়া মেয়েরা আর কী ঘরে থাকবে শেষ অবধি?

মেয়েদের কথা ভাবলেই, তার মনে হরনামির ছবি ভেসে ওঠে। হরনামি তার জীবনে এসেছিল পূর্ণাঙ্গ এক নারী হিসেবে। হঠাৎ তার মনে হয়, হরনামি স্বেচ্ছায় ডুমবালি যায়নি। নিশ্চয়ই কেউ তাকে যেতে বাধ্য করেছে। ধীচর? লোকটাকে বিশ্বাস নেই। পাক্কা কসাই। টাকার লোভে হরনামিকে জবাই করে ওখানে ফেলে এসেছে। এই মুহূর্তে ইচ্ছে হয় ভাইরূপা গিয়ে ধীচর আর কৈলুকে খুন করে আসে। এমনিতেই চারদিকেই এখন খুন জখম হচ্ছে। ভাইরূপার লোক ভাববে ধীচর-কৈলু খুন হয়েছে ওদেরই দলের হাতে। লুটের মাল ভাগ বাটোয়ারার জের। নাজর দাঁতে দাঁত ঘসে। ওদের জন্যেই হরনামি আজ ডুমবালিতে। কিন্তু, ধীচর-কৈলুকে খুন করলে কী হরনামিকে পাওয়া যাবে? ওদের মারতে গিয়ে আর একটা

খুনের মামলা জড়িয়ে পড়লে তো কেলেংকারি! অর্জুনকে শিক্ষা দিতে গিয়ে, কী ভীষণ কাণ্ডটাই না হলো। মাঝখান থেকে কিছু লোক লুটেপুটে খেল। কত দিন হরনামির সঙ্গে দেখা হয়নি। মনটা তাকে দেখার জন্যে ছটফট করে। না, হরনামির সঙ্গে একবার দেখা করতে হবে। দুঃখের কোন্ কাঙ্গলে হরনামির দিন কাটছে? তার পায়ে কীসের বেড়ি লাগানো? বেড়িটার কী ভাঙা যাবে না?

বাইশ

নাজর রাতেই কুর্তা-চাদর ধুয়ে শুকিয়ে নেয়। নৌকোর কায়দায় বানানো নাগরা জুতো সর্ষের ভেতরে চুবিয়ে রেখে, তারপর মুছে সরিয়ে রাখে। পাগড়িটাও ঠিকঠাক করে রাখে। হাতে একটা বাঁশের লাঠি। চা খেয়ে খুব ভোরেই সে বেরিয়ে পড়ে। সাধনিয়ায় এসে একটা টাঙ্গা ধরে। টাঙ্গা এখন কমে গেছে। মুসলমান টাঙ্গাওয়ালারা কেউ নেই। দু একজন হিন্দু-শিখ এখন টাঙ্গা চালায়। খুবই ভয়ে-ভয়ে থাকে। কখন কী ঘটে, কে জানে। দিনকাল বড় খারাপ। যাত্রীর সংখ্যাও কম। কেউ বাইরে বেরোয় না আজকাল।

নাজর রামপুরাফুল স্টেশনে এসে ভাটিন্ডার টিকিট কাটে। গাড়ি বারোটায়, এখনও দু আড়াই ঘন্টা অপেক্ষা করতে হবে। নাজর ইচ্ছে করেই একটু আগে এসেছে। স্টেশনের কাছেই গাঁয়ের এক ব্যবসায়ীর দোকান আছে। নাজর সেখানে গিয়ে একটা খাটিয়া টেনে শুয়ে পড়ে। মাথায় নানা রকম চিন্তার জট। এক একটা সামাধান মনে মনে খুঁজে পায়। আবার, পরমুহূর্তেই তা বাতিল করে দেয়। মনের ভেতরটা যেন মরুভূমির মতো খাঁ খাঁ, তার মধ্যে হরনামি যেন ওয়েসিস। হরনামির জন্যে সে নরকে যেতেও রাজি। কথাটা ভেবেই ভয় লাগে, তারপরই সাহসী হয়ে ওঠে। দোকানি লালা জিজ্ঞেস করে সে কিছু খাবে কী না। নাজর জবাব দেয়, না— গাঁ থেকেই সে খেয়ে বেরিয়েছে। লালা আবার জিজ্ঞেস করে, 'কোনও কাজে যাচ্ছ নাকী?'

'কাজ? তা বলতে পারে। ভাটিন্ডায় কিছু ভেড়া দেখব। সস্তায় পেলে . . .'

লালা দাঁত বের করে হাসে, 'কেন ফালতু টাকা খরচ করবে? মুসলমান কারও-র ভেড়া লুট করে নাও না, এই তো মওকা—'

নাজরও হাসে, ভাবে, লুটের মাল কী আর তার কপালে সইবে? সে একটু জোরেই জবাব দেয়, 'লালা— লুটের লাইন আমার নয়। সস্তায় একটা ভেড়া পেলেই আমি খুশি।'

কথায়-কথায় সময় কাটে। এক ফাঁকে সে উঠে একটা ধাবায় এক কাপ চা খেয়ে, ভাটিন্ডার টিকিট কেটে স্টেশনে ঢুকে পড়ে।

ভাটিন্ডা স্টেশনে নেমে সে ডুমবালা গ্রামের খোঁজ খবর নেয়। কেউ কিছু বলতে পারে না। একজনের কাছ থেকে জানতে পারে, পরের স্টেশন পথরালে নামলে গ্রামটা

কাছাকাছি পড়বে। নাজর এদিকে আগে আসেনি। পথঘাট অচেনা। সঙ্গতমন্ডি থেকে আসা একটা ট্রেন প্ল্যাটফর্মে সবে এসেছে। চটপট একটা টিকিট কেটে নাজর উঠে পড়ে। এখানে এসে সে শোনে ডুমবালি বেশ দূরে। স্টেশনের বাইরেই একটা চায়ের দোকান। দোকানদার মহা-উল্লাসে চা ঢাল-উপুড় করে যাচ্ছে। আশপাশে কয়েকজন খদ্দের। পেতলের গ্লাসে দোকানদার চা এগিয়ে দেয় নাজরের দিকে। নাজর তার কাছে ডুমবালির খোঁজখবর নেয়।

আশ্বিন-কার্তিক মাস। তিনটে বাজে। চোখের ওপর দিয়ে দিন গড়িয়ে যায়। চাদরটাকে কাঁধের ওপর ফেলে নাজর হাঁটতে থাকে জোর কদমে। ডুমবালি পৌঁছতে সন্ধ্যে হয়ে যায়। খেতে কাজ করা লোক, গবাদি পশু— সব বাড়ি ফেরে। গাঁয়ে একটা উটও আছে। নাজর একজনকে জিজ্ঞেস করে, 'এখানে কারও কাছে ভেড়া পাওয়া যাবে?'

'হ্যাঁ। ওইদিকে— মঙ্গিয়া পাড়ায় ঘিতু ভেড়া বেচে।'

নাজর ঘিতুদের বাড়ি এসে ডাকাডাকি করতে এক বুড়ি, হাতে ছড়ি, ধীরে-ধীরে দরজার কাছে এসে দাঁড়ায়, 'ঘিতু তো বাড়ি নেই। গোয়ালে আছে— এখনই বোধহয় ভেড়া নিয়ে ফিরেছে। তুই কে বাবা?'

'আমি পাশের গাঁ থেকে আসছি, মা। ঘিতুর সঙ্গে ভেড়ার ব্যাপারে একটু কথা বলতে এসেছি। আমার সঙ্গে কাউকে দিতে পারেন— গোয়ালটা ঠিক চিনি না।'

'ওই তো, সামনেই। সোজা গিয়ে ডান দিকে— একটু এগোলেই বুঝে যাবি।' বুড়ি ছড়ি ঠকঠক করে চলে যায়। গোয়ালে খুঁজে পেতে নাজরের অসুবিধে হয় না। ভেতরে ষোলো-সতেরো বছর বয়েসের একটি স্বাস্থ্যবান ছেলে বয়স্ক এক যুবককে সাহায্য করছে। নাজর বুঝতে পারে যুবকটিই ঘিতু। ঘিতুর কাছে এসে নাজর বলে, 'ভাই সাহেব!'

ঘিতু হাতের কাজ থামায়, নাজরের মুখের দিকে তাকিয়ে চেনা না অচেনা আন্দাজ করার চেষ্টা করে। তারপর প্রশ্ন করে, 'কোন্ গাঁয়ের?'

নাজর উত্তরটা একটু এড়িয়ে গিয়ে জবাব দেয়, 'আরে ভাই, এখানে ঘুরতে-ঘুরতে এসে পড়লাম। শুনলাম তুমি ভেড়া বেচো—'

'বেচি। ওই খাটিয়ায় বসে পড়ো, ভাই সাহেব— হাতের কাজটা সেরে নি। বাড়ি কোন্ গাঁয়ে?'

'ভাগু। ফুলমণ্ডি স্টেশন পেরিয়ে ভাটিন্ডার পর। আমার কিছু ভেড়া আছে। আর কিছু পেলে গোয়ালটা ভর্তি হয়ে যায়।' নাজর জমিয়ে কথা বলে।

ঘিতু হাতের কাজ সেরে নিতে-নিতে ছেলেটিকে মাঝে-মাঝে ধমক দেয়। গালাগাল করে। দুধ দুইবার তোড়জোড় করে। তারপর নাজরকে খাওয়াদাওয়ার কথা বলে, 'তুমি কোন্ জাতের?'

'রাজা।'

'তাহলে তো আমার বাড়িতে তোমার খাওয়া চলবে না। ঠিক আছে, তোমার জাতের বাড়িতেই ব্যবস্থা করছি। এখন ওঠো — তোমার খাওয়াদাওয়া থাকার ব্যবস্থা করে বাকি কথা হবে।' নাজরকে নিয়ে সে এক বাড়িতে যায়, 'ঘরামিদের এই একঘরই আছে এই গাঁয়ে। তবে, এখানে তো থাকতে পারবে না। সে জন্যে—' কথাটা শেষ না করে ঘিতু বলে, 'মদটদ চলে তো?'

'মানে, একটা বোতল নিয়ে নেব?'

নাজর একটু নিচু স্বরে বলে, 'ঘিতু ভাই— ঘরামি জাঠ-ফাঠ— আমার কাছে সব এক। তোমার ওখানেই থাকতে পারি। কে জানছে আমি কোন জাত?' নাজরের ইচ্ছেটা ঘিতুর কাছে থেকে কথায়-কথায় হরনামির খোঁজখবর নেওয়া। কিন্তু, ঘিতু নাজরের কোনও কথা শোনার আগেই বলে, 'এখানে এক ফৌজি হাবিলদার আছে। দশোধা সিং, ব্যাটা বুড়ো হলে কি হবে— জোয়ান এক ছুঁড়ি কিনে রেখেছে। দু জনেই মাল টানে। একটা বোতল দিলেই তোমার ওখানে থাকার ব্যবস্থা হয়ে যাবে।'

'ছুঁড়ি কিনে রেখেছে' কথাটা শুনে নাজরের বুকটা ধ্বক করে ওঠে। হরনামি?

কথা না বাড়িয়ে নাজর ঘিতুর কথায় রাজি হয়ে যায়। ঘিতু নাজরকে সঙ্গে নিয়ে ফৌজির বাড়ি পৌঁছয়: 'সৎশ্রী আকাল, হাবিলদার! আমার এক জুড়িদার এসেছে পাশের গাঁ থেকে। আজ রাতটা যদি তোমার এখানে থাকতে দাও—' বলতে বলতে ঘিতু মদের বোতলটা ফৌজির সামনে লোহার চেয়ারে রাখে। হাবিলদার পুলকিত হয়ে অভ্যর্থনা জানায়, 'এই কথা! খাটিয়া টেনে বসে পড়ো জোয়ান!' ঘিতু নাজরের উদ্দেশে বলে, 'বসে যাও ভাই সাহেব, আমি তো মদটদ খাইনা। তোমরা মৌজ করো— আমি বরং আসি।' যাওয়ার সময় নাজরের কাঁধে ঈষৎ চাপ দিয়ে যায়। উনুনের কাছে কে যেন কাজ করছে। ফৌজি চেঁচিয়ে বলে, 'হরনাম— লণ্ঠন নিয়ে আয়। সঙ্গে জল আর বাটি।'

হরনামির নাম শুনেই নাজর যেন বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়। কোনও ক্রমে নিজেকে সংযত রেখে, মাথা নিচু করে, ঘাড় হেঁট করে বসে থাকে। মাথা না তুললেও বুঝতে পারে, হরনামি তাকে খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে দেখছে। লণ্ঠনটা রেখে হরনামি বেরিয়ে যায়। একটু পরে আবার ফিরে আসে জল বাটি আর ছোলার চাট, সঙ্গে দুটো চামচ নিয়ে।

নাজর মদ ঢালে। হাবিলদারকে একটু বেশি করে দেয়। একটু খাওয়ার পরই ফৌজি বলে, 'হরনামিকেও এক বাটি দাও, ভাই!'

নাজর একটু বিব্রত হয়। তবুও, এক বাটি মদ নিয়ে সে উনুনের কাছে এগিয়ে যায়। হরনামি মদের বাটিতে চুমুক দিতে যাবে, নাজর আচমকা তার গায়ের চাদরটা খুলে ফেলে। হরনামি চমকে ওঠে। হাতের কুপিটা পড়ে যায়। শরীরটা কাঁপতে থাকে। নাজর হাতটা ধরে, নিচু গলায় বলে, 'ঘাবড়ে যেয়ো না। তোমার জন্যেই আমি এসেছি।' নাজর অপলক চোখে তাকিয়ে থাকে হরনামির দিকে। মদ দেয় না। হরনামি নিঃশব্দে কাঁদে। নাজর এবার, ঘিতু যেমনটি বলেছিল, হাবিলদারকে এত মদ খাইয়ে দেয় যে, সে রুটিও খেতে পারে না। নাজর তার রুটি খেয়ে নেয়। হাবিলদারকে বারান্দায় বিছানা পেতে শুইয়ে রেখে হরনামি নাজরকে নিয়ে উঠোনে আসে। তারপরই কান্নায় ভেঙে পড়ে: 'এই বুড়ো ভাম আমাকে বেশ্যারও অধম করে রেখেছে! এখানে আর ক-জনকে এনেছে কে জানে। দোহাই, তোমার পায়ে পড়ি— আমাকে এই নরক থেকে বের করে নিয়ে যাও! আমি সারা জীবন তোমার দাসীগিরি করতেও রাজি।'

'কিন্তু কোর্টেতে গিয়ে যদি পালটি খাও?'

হরনামি হাত জোড় করে, 'বিশ্বাস করো— আর কিছু কবব না। আমার আচ্ছা শিক্ষা হয়েছে। দোহাই — কতবার ভেবেছি কুয়োতে ঝাঁপ দেব। কিন্তু পারিনি। ভগবান তোমাকে পাঠিয়ে দিয়েছে। আমাকে নিয়ে চলো।'

'ফৌজি যদি ঝামেলা করে?'

'পারবে না। ওর কথা কে শুনবে?'

বারান্দায় হাবিলদার নিঃসাড়ে ঘুমিয়ে আছে। সেইদিনই একটা ঘোড়া বেচেছে সে। কুর্তার পকেটে টাকাটা আছে। বারান্দার একটা পেরেকে কুর্তাটা ঝোলানো। হরনামি নিঃশব্দে সিন্দুক খুলে নিজের গয়নাগাটি জিনিসপত্র বের করে নেয়। হাবিলদার বেশ কিছু গয়না দিয়েছিল। বারান্দায় ঝোলানো কুর্তার মধ্যে রাখা বটুয়ায় ঘোড়া বেচার টাকা ও তিন মাসের পেনশনের টাকাও ছিল। হরনামি সেটাও বের করে নেয়।

রাস্তায় কুকুর ডেকে ওঠে। হাওয়ার মতো ছুটতে থাকে ওরা। গ্রাম পার হয়ে পথরাল স্টেশনে এসে পৌঁছয়। সূর্য ওঠার আগেই গাড়ি এসে পড়ে। ওরা রামপুরাফুলে এসে পৌঁছয়। ভাটিন্ডা থেকে গাড়ি বদল করে। সন্ধ্যে হতেই কোটে পৌঁছে যায়। ওদের দেখে সারা গাঁয়ে হইচই পড়ে যায়। হরনামি নাজরদের বাড়িতেই ওঠে। ভোরবেলা মাঠে গিয়ে প্রাতঃকৃত্যাদি সারার পর আর ঘর থেকে বেরোয় না। মঙ্গল হরনামিকে দেখাশোনা করে। গাঁয়ের মেয়েবউরা এসে দেখা করে যায় হরনামির সঙ্গে। কেউ কেউ বলে, 'বোন, এবার তোর একটা গতি হয়েছে। সোজা পথে চল। বিপদে পড়বি না।'

খবর ডুমবালিতে পৌঁছে যায়। মাস দুয়েক পরেই হাবিলদার দশোধা সিং ডুমবালির পঞ্চায়েতসহ কোটেতে হাজির হয়। পঞ্চায়েতে সৎ লোক একটিও ছিল না। সবই হাবিলদারের এক গ্লাসের ইয়ার। কোটের পঞ্চায়েত এগিয়ে আসে। হরনামি কোটের পঞ্চায়েতের সামনে গড় হয়ে কেঁদে পড়ে: 'আমি আপনাদের মেয়ে। আমাকে মারুন ধরুন, যে শাস্তি দিতে চান দিন। — কিন্তু, ওই জানোয়ারটার হাতে আমাকে ছেড়ে দেবেন না। আমার হাজার দোষ আছে, মানছি। কিন্তু, আমি এবার থেকে নাজরের কাছে থাকব। আর যদি কোনও অন্যায় করি, আপনারা আমরা মাথা মুড়িয়ে দেবেন— কিন্তু দোহাই, এই জানোয়ারটার কাছে আমাকে ছেড়ে দেবেন না।'

কোটের পঞ্চায়েত হরনামির আবেদনে বিচলিত হয়: 'হাজার হোক হরনামি আমাদের গাঁয়ের বউ। নাজর এই গাঁয়ের ছেলে। দোষ গুণ সবার থাকতে পারে। তাই বলে তো আমরা তাদের ফেলে দিতে পারি না।' ডুমবালির উদ্দেশে কোটের পঞ্চায়েত বলে, 'দেখুন ভাই— আমাদের মেয়ে আমাদের কাছেই ফিরে এসেছে। শুধু ফিরেই আসেনি, আশ্রয়ও চেয়েছে। কাজেই আমরা ওকে ফেরত দিতে পারি না। ওর মান ইজ্জত রাখার ভার এখন আমাদের ওপর। . . . আপনারা আসুন, ভাই!'

পঞ্চায়েতের বক্তব্যে বুড়ো হাবিলদার কাঁদো-কাঁদো, করুণভাবে বলে, 'কিন্তু, আমার কী হবে? অতি কষ্টে ওকে যোগাড় করেছিলাম— আমাকে কে দেখবে এখন? আমি তো আর ওকে বিক্রি করতে যাচ্ছি না!'

জাবাব দেয় হরনামি, 'তুই আবার কী করবি? ঘাটের মড়া, তোর কথা বলতে লজ্জা করে না? আমাকে দিয়ে তো বেশ্যাবৃত্তি করাতিস! আমার গতর বেচে টাকা রোজগার করতিস। আবার বলছিস 'আমি তো ওকে বিক্রি করতে যাচ্ছি না!' তুই তো রোজ রাতে আমাকে বিক্রি করতিস! যা যা — বাড়ি যা। মেয়েমানুষের গতর-বেচা পয়সায় অনেক করেছিস—' হরনামি উত্তেজনায় বাঘিনীর মতো রুখে দাঁড়ায়।

হাবিলদার হরনামির মূর্তি দেখে চুপ। অস্ফুটভাবে বলে, 'আমি যে গয়নাগাটি দিয়েছি—'

জবাব দেয় কোটের পঞ্চায়েত, 'তাতে তোমার কোনও হক নেই। এতদিন ওকে দিয়ে যে-ভাবে কাজ করিয়েছ, তাতে তুমি গয়নাগটি ফেরত পাবে না। ওর খাটুনির দাম কে দেবে হে, ভালমানুষের ছেলে?'

কোটের পঞ্চায়েত অতঃপর ডুমবালির পঞ্চায়েতকে চা-পানে অপ্যায়িত করার চেষ্টা করতে, জবাব আসে, 'চা খেয়ে আর কী হবে?' নিরাশ হয়ে তারা চলে যায়। উপায় ছিল না, কেননা গাঁয়ের সমস্ত মেয়ে-বউ একজোটে হরনামির পক্ষে দাঁড়িয়ে গেছে। ডুমবালির পঞ্চায়েত চলে গেলে, কোটের পঞ্চায়েত নাজরকে অভয় দেয়: 'তোর কোনো ভয় নেই। আমরা তোর সঙ্গে আছি। হরনামি, তুইও সিধে পথে চলবি। শিক্ষা হয়েছে তো?'

নাজর হরনামিকে সেলবাড়ার গুরুদ্বারে ধর্ম সাক্ষী করে সহধর্মিনী করে নেয়। হরনামির গয়না বেচা টাকায় বাঁধা-জমি ছাড়িয়ে নেয়, তারপর ভেড়া বেচে সেই টাকায় ভাগচাষে মন দিয়ে, খেতের কাজে পুরোপুরি লেগে পড়ে।

এর ঠিক দেড় দু বছর পর গিন্দর একদিন ফিরে আসে। পরনে ধপধপে শাদা কুর্তা পায়জামা। মাথায় বাদামি পাগড়ি। এক সাধু তাকে গ্রামে পৌঁছে দিয়ে চলে গেছেন। এই সাধুই গিন্দরের চিকিৎসা করে তাকে সারিয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু সাধু যে গিন্দরকে কোথায় নিয়ে গিয়েছিলেন, গ্রামে তাকে পৌঁছে কোথায় চলে গেলেন— কেউ তা জানল না। এমনকী গিন্দরও না।

কয়েকদিন পর গিন্দর নাজরদের বাড়িতেই থাকতে শুরু করে। নাজর আর হরনামি গিন্দরকে শুধুই অবাক চোখে দেখে। কিছু জিজ্ঞেস করে না। গিন্দরও কিছু জানতে চায় না। গিন্দরকে কোনও কাজ-ও তারা করতে দেয় না।

মাঝে মাঝে হরনামি একা-একা কাঁদে। শরীরের স্বাদ তার কী সর্বনাশই না করেছে। রাজপ্রাসাদ ছেড়ে . . .

দ্বিতীয় খণ্ড

আশ্বিনের নতুন ঝকঝকে আকাশ। ভোরে তারা ফোটার সঙ্গে সঙ্গে মল্লণ উঠে পড়ে। উনুনের ওপর গত রাতের জ্বাল দেওয়া দুধ ঢাকা। তাই থেকে আধ লোটা দুধ নিয়ে আবার ঢাকনিটা চাপিয়ে দেয়। পাশের একটা ডেকচিতে জল গুড় আর চা ঢালা থাকে। সারা রাত ধরেই সেটা ফোটে। খেতে যাওয়ার আগে, সে শুধু তাতে দুধ ঢেলে দেয়। এই হলো মল্লণের চা। চায়ের জল গরম হওয়ার বা গুড় ঢালার অপেক্ষা করতে সে নারাজ। উনুন ধরিয়েই আটা মাখতে বসে। মোটা-মোটা খান চারেক রুটি বানিয়ে একটা বাটিতে ঢুকিয়ে ফেলে। তাতে একটু আচার, আর গোটা দুয়েক পিঁয়াজও রাখে। ডাল তরকারির বালাই নেই। শীতকালে, ইচ্ছে হলে, একটু জমাট ঘি রুটির সঙ্গে খায়।

রুটির পুঁটলিটা কাপড়ের ফেট্টিতে বেঁধে একটা খুঁটির সঙ্গে ঝুলিয়ে দেয়। চা খায় তারপর। গোবর পরিষ্কার করতে এসে সে দেখে ষাঁড় দুটো পুরো ভুসি খায়নি। একটি ষাঁড়ের থুতনি ধরে সে আদর করতেই ষাঁড় ভুসি খেতে শুরু করে। দ্বিতীয় ষাঁড়টি কালো রঙের। মল্লণ তার উদ্দেশে গাল পাড়ে। এই ষাঁড়টার আবার মাথা নাড়ার বাতিক আছে। তার মাথা নাড়ার রকম দেখে কুকুর বেরাল, এমনকি, কাক পাখি অবধি ঘাবড়ে যায়। কেউ এগোতে সাহস করে না। শাদা ষাঁড়টা আবার একটু শান্ত, নিরীহ প্রকৃতির। কালোর চেয়ে কাঁধ চওড়া। জোরও বেশি। বাচ্চারা অবধি শাদা ষাঁড়ের সঙ্গে মজা করে। আর একবার চা খেয়ে মল্লণ রুটির পুঁটলিটা কাঁধে ঝুলিয়ে নেয়। ষাঁড় খুলে, তাদের ঘাড়ে জোয়াল রেখে

হাল বাঁধে। তারপরই হাঁটা দেয় খেতের দিকে। ভোরের আলো তখনও ফোটে নি। যেতে যেতে খালের কাছে এসে, মল্লণ ঠিক করে নেয়— হাল টানতে বাকি থাকা জমিটা দুপুরের মধ্যেই শেষ করে দেবে। এর আগে, সার ফেলে, বার তিনেক হাল টানা হয়েছে। নিড়েন দেওয়ার পর জমিতে যে ঘাস আর আগাছা ওঠে, তা সাফ করেছিল তার দুই জোয়ান মেয়ে আর ছোট ছেলে। পরের বার হাল টানতে বিশেষ অসুবিধে হয়নি, এবং তৃতীয় হাল টানার সময় জমি একেবারে চিনির দানার মতো মোলায়েম হয়ে যায়। মল্লণ ভেবে নেয়, এবার সার ফেললেই হলো। ওপরের বালি-মাটি নিড়েন করে, তার ওপর গমের বীজ ফেলা যাবে। এবারে অবিশ্যি গমের বীজ ওর কাছে নেই। ঝান্ডার কাছ থেকে আনতে হবে। আগেই অবশ্য ঝান্ডাকে বলে রেখেছে সে। ঝান্ডা লোকটা বড় কাজের। তাছাড়া, মল্লণের সঙ্গে তার সম্পর্কটাও বেশ ভাল। প্রায় আপনজনের মতো। ঝান্ডার খেতে গম ভাল ফলে। মল্লণ অবশ্য জানে না ঝান্ডার খেতে সব গমই মোটা দানার কলমী-গম। ফসল কাটার সময়ে ঝান্ডাকে গম ফেরত দিলেই হবে। দশ বিঘে জমিতে গমের পাহাড় বানিয়ে ফেলবে মল্লণ।

মল্লণ চটপট পা চালায়। খেতে তাড়াতাড়ি পৌঁছতে হবে। ওর দ্বিতীয় খেত গাঁয়ের লাগোয়া ভাইরূপা-খেত। আকারে আয়তনে বড় ছোট। এটা যদি বিঘে দশেক হতো, তাহলে মল্লণ হাতে স্বর্গ পেত — পাক্কা ষোলো বিঘে হতো। টাহলির খেত, এখান থেকে একটু দূরে। ভাইরূপা-খেত থেকে টাহলি খেতের জমি মাটি অনেক ভাল। ভাইরূপার খেতে বালিমাটির পরিমাণ বেশি। কার্পাসের ফসল সুবিধে হয় না। গমও সুবিধে হয় না। একটাই সুবিধে, খেতটা গ্রামের মধ্যে। দুটো খেতেই জল আসে একই খালের নালা থেকে।

টাহলির খেতে যেতে যেতে মল্লণ ঠিক করে নেয়, এবার গম উঠলে মুকুন্দমল্লের ঋণ শোধ করতে হবে। বড় মেয়ে লক্ষ্মীর বিয়ের সময় টাকা ধার করতে হয়েছিল। সুদে আসলে মুকুন্দ এখনও দু হাজার পাবে। নালার সাঁকো পার হয়েই মল্লণ বলদ দুটোর উদ্দেশে হাঁক দেয়। হাঁক শুনেই বলদ দাঁড়িয়ে পড়ে। মল্লণ সাঁকোর নিচে গিয়ে পেচ্ছাপ করে আসে। তিন বছর বড় কষ্টে কেটেছে। এখনও ধার শোধ হয়নি। তবে, বিয়েটা হয়েছিল খুব জাঁকজমকে। আত্মীয়স্বজনদের মধ্যে হইচই পড়ে গিয়েছিল। কেউ রা কাড়তে পারেনি। পাড়াপড়শিরাও অবাক হয়ে গিয়েছিল। ঘোড়া, জোড়ের গয়না, কাপড়চোপড়— সবার চক্ষু একেবারে ছানাবড়া হয়ে গিয়েছিল। দুধের জন্যে দুটো মোষও দিয়েছিল। কোন শালা এত কিছু দেয় মেয়ের বিয়েতে! এরপরই, মল্লণের নাম-ডাক বেড়ে যায়।

মল্লণের বাবা বুড়ো রিসালদার করম সিং এখনও বেঁচে। বয়েস আশির ওপর। ফৌজি চাকরিতে কৃচ্ছসাধন করে তিল তিল করে টাকা জমিয়েছিল। অবসর গ্রহণের পর, সেই টাকায় টাহলির খেত কেনে। কী হাল ছিল জায়গাটার! আগাছা ঘাস কাঁকর— এবড়ো-খেবড়ো জমি। করম কিন্তু ওই জমিতেই তার দেহমন সমর্পণ করে মাটির সঙ্গে মাটি হয়ে মিশে যায়। আহার নেই, নিদ্রা নেই — শেষ অবধি করম ওই জমিকে হালের নিচে নিয়ে এসে ছাড়ে। লোক দেখত, রিসালদার করম ভূত-প্রেতের মতোই জমি আঁকড়ে পড়ে আছে। তার খেয়ালই থাকে না রাত দিনের কথা। মাটির সঙ্গে থাকতে থাকতে সেও যেন মাটি বনে গেছে। প্রথম বছর চোখ-জুড়োনো ছোলার ফসল ওঠে। ফৌজি-লোক, দৌড়ঝাঁপ করে খাল থেকে জল সরবরাহের ব্যবস্থাটা তখনই পাকা করে নেয়। রিসালদারের কাজকর্ম এই

গাঁয়ের লোককে অবাক করে দেয়। সারা জীবন ধরেই করম শরীরটা ভেঙে মুচড়ে এই খেতের পেছনে দিয়েছে। বাবা নিক্কা সিং-এর ধারদেনাও কড়ায় গণ্ডায় শোধ করেছে ফসলের রোজগার থেকে।

করম পোশাকি সামাজিকতাকে আমল দিত না। বলত, ও-সব লোকদেখানো ফালতু খরচের ব্যাপার। তার চেয়ে গতরের খাটুনিতে মোটা রুটি খাওয়ার মধ্যে অনেক ইজ্জত আছে। নিক্কা মারা যেতে রিসলদার করম, খুব অল্প খরচেই শ্রাদ্ধশান্তির কাজ করে। আত্মীয়রা প্রথমে বাঁকা-ট্যারা মন্তব্য করলেও শেষ অবধি করমের নির্লিপ্ত মনোভাবের কাছে হার মেনে চুপ করে যায়। মল্লণ আবার করমের ঠিক বিপরীত। সে ঠিকই করে নেয়, বাবা মারা গেলে এলাহি কাণ্ড করে শ্রাদ্ধশান্তি করবে। ঠাকুর্দা নিক্কা যখন মরে, তখন মল্লণ অবশ্য খুবই ছোট। ঠাকুর্দা মারা গেছে, সে টেরই পায়নি। না লাড্ডু, না দানধ্যান— এসব কিছুই হয়নি।

খেতে পৌঁছতে দিনটা ঝিলিক দিয়ে ওঠে। বলদ থামিয়ে, রুটির পুটলি এক জায়গায় রেখে, জোয়াল থেকে হালটা খুলে সে ঠিকঠাক করে নেয়। হালের 'পিন' দেখে, বলদ দুটির পিঠ চাপড়ে সোৎসাহে তাদের ছেড়ে দেয় খেতে। খেতের কাছাকাছি পাকদণ্ডির রাস্তায় এক নবদম্পতি দেখা যায়। ঘণ্টাবান্না থেকে বউ নিয়ে যাচ্ছে ভাইরূপায়। ছোকরা কোটের বলে মনে হয় না। ভাইরূপারও নয়। তবে, বউটা নির্ঘাৎ ঘন্টাবান্নার। ছোকরার মাথার ওপর একটা গাঁটরি। বউ দৌড়য় পেছন-পেছন! মল্লণের মনটা কেমন যেন উদাস হয়ে ওঠে। সে একটা ছড়া কাটে। মল্লণের ছড়া শুনে, মেয়েটির পায়ে যেন আগুনের ছোঁয়া লাগে। সে চটপট পা চালায়, কিন্তু কান খাড়া করে রাখে। তার পায়ের ছোঁয়ায় মাটি যেন দ্রিম দ্রিম করে। মল্লণ সকৌতুকে তাকিয়ে থাকে।

সূয্যি এখন মাথার ওপর। মল্লণ বলদ থামিয়ে জোয়াল আলগা করে হাল, নাকের দড়ি ইত্যাদি বের করে তাদের চরতে ছেড়ে দেয়। পাশের খেতের কুয়ো থেকে ঠাণ্ডা জল আনে। পিঁয়াজের আচার দিয়ে রুটি খেতে শুরু করে। একটা গাছের ছায়ায় বসে অকর্ষিত এক খেতের দিকে তাকিয়ে থাকে। ঠিক করেছিল, আজ খেতের সব কাজ শেষ করবে। হাতে সময় থাকবে; গাঁয়ে ফিরে মাথায় জল ঢেলে চান করবে। চান না করলে মাথা চুলকায়। দিন পনেরো আগে মাথায় জল দিয়েছিল। হঠাৎ খেয়াল হয়, এতক্ষণ আবোলতাবোল ভেবে সময় কেটে গেছে! গাছতলার নিচে শুয়ে পড়তে ইচ্ছে করে তার। বলদ দুটো এখনও চরছে। সামনেই জোয়াল আর হাল পড়ে আছে। এক শালা কুকুর এসে দড়িটা কেটে দিয়ে চলে গেছে। আর একদিনও এই রকম হয়েছিল। মল্লণ গা-ঝাড়া দিয়ে উঠে পড়ে। হাল আর জোয়াল বরাবর চামড়ার পট্টি থেকে দড়ির গিঁট খোলে। দড়ির ফাঁস একটা খোঁটার সঙ্গে ঝুলিয়ে দেয়। পুঁটলি থেকে গুড়-চায়ের কৌটোটা বের করে। এতেই চলে যাবে আজ। গাছতলায় গামছা বিছিয়ে সে শুয়ে পড়ে। চোখের পাতা ভারি হয়ে আসে। সে ঘুমিয়ে পড়ে।

কিছুক্ষণ ঘুমোবার পরই সে জেগে ওঠে: বলদ দুটো যদি দূরে চলে যায়? উঠে দাঁড়ায় সে। শাদাটা খালের কাছে দাঁড়িয়ে, আর কালোটা একটা গাছের নিচে বসে।

সূয্যি এখন তেরছা। মল্লণ ভাবে, আর এখানে থেকে কী হবে। সে মাটির মধ্যে গর্ত করে খড়কুটো জ্বালে। অ্যালুমিনিয়ামের একটা বাটিতে গুড়-চা ঢেলে আগুনে বসিয়ে দেয়। কাছেই একটা মাঠে ছাগল চরছে। একটি ছোট ছেলে, কোকর, সেখানে এক্কা দোক্কা খেলছে। মল্লণ গেলাস হতে আসেঃ 'কোনটা থেকে দুইব রে?'

'যেটা তোমার খুশি!' ছেলেটি জবাব দেয়।

'চল্— তুইও আমার সঙ্গে একটু চা খাবি।'

বলতে বলতে মল্লণ একটি ছাগল ধরে দুইতে শুরু করে। আধ গেলাসের মতো দুয়ে ছাগলটাকে ছেড়ে দেয়। কোকরকে আবার সে চা খেতে বলে। কোকর সবিনয়ে বলে, 'না মামা— তুমি খাও। আমি বাড়ি গিয়ে খাব। বেলা পড়ে গেছে, আমাকে ফিরতে হবে।' কোকরের বাড়ি ঘন্টাবান্নায়। কোটেতে আত্মীয়স্বজন আছে। চা খেয়েই মল্লণ বলদ দুটি জুতে নেয়। মুখে বোল কাটে, 'চল রে কেলো, চলরে ধলা — জবাব নেই তোদের— কোথায় লাগে রেলগাড়ি হুর-র-র-হুট!' ধুলো ওড়াতে-ওড়াতে ঘন্টাবান্নার খেত থেকে মল্লণ ফেরে গাঁয়ের পথে। পঞ্চাশ-ষাট গজ দূরত্বে আর একটা ষাঁড় দেখা যায়। কৃষ্ণকায় গাঁট্টা গোট্টা শরীর। একটা শাদা গোরুর পেছন ধরেছে সে। তাদের পেছনে হুঁকো হাতে একজন লোক, হো হো করে যাচ্ছে। মল্লণের বলদ দুটো এদের দেখে একটু থামে, দুলকি চাল ধরে। মল্লন পাঁচন দিয়ে এক ঘা করে দিতেই তারা আবার দৌড় দেয় তেজে, মল্লণ তাদের ল্যাজে মোচড় দিয়ে আওয়াজ দেয়ঃ হু-র-র! ফেরার পথে তার মনে একটিই চিন্তা, দিন থাকতে থাকতে চুল ধুয়ে চান করে নিতে হবে।

দুই

বাড়ি ফিরে মল্লণ হাল আর জোয়াল দেওয়ালের ওপর খাড়া করে রাখে। জোয়াল খুলতেই বলদ দৌড় দেয় গোয়ালের দিকে। মহা আনন্দে শুকনো ভূসি খেতে থাকে। খুঁটিতে বলদের দড়ি গলাতে গলাতে মল্লণ হাঁক দেয়, 'মোতি! উনুনে জল চাপা, মাথা ধোব। একটু লস্‌সিও দিবি সেই সঙ্গে — না থাকলে কারওর কাছ থেকে চেয়ে আনিস।'

মল্লণের মেয়ে মোতি এক ডেকচি জল উনুনে চাপিয়ে আগুনটা বাড়িয়ে দেয়। মল্লণ ততক্ষণে গোয়ালের গামলা পরিষ্কার করে নতুন ভূসি ঢালে। কালো-ধলা আগেই চৌবাচ্চা থেকে জল খেয়ে নিয়েছে। মল্লণ পিঁড়ি নিয়ে উঠোনে বসে। মেয়েকে জিজ্ঞেস করে, 'তোর মাকে দেখছি না যে!'

'গিল্লোদের বাড়ি গেছে। কে নাকি এসেছে— মাকে ডেকে নিয়ে গেছে।'

মল্লণ মনে মনে শঙ্কিত হয়। গিল্লোর মেয়ের বিয়ে হয়েছে মারাঝে। এক ছেলে, এক মেয়ে। জামাই প্রায়ই কোটেতে আসে। চালু ছোকরা। বড়দার বিয়ে হয়েছে ধুরকিটে। এই বড়দার শালার ছেলের সঙ্গে মোতির বিয়ের কথাবার্তা প্রায় পাকা। ধুরকিটের এই জাঠ

পরিবার খুবই নামি-দামি হাঁকডাকওয়ালা কিষান। মল্লণের বড় মেয়ে লক্ষ্মী — মৌনিবাধে বিয়ে হয়েছে — তার বিয়ের সময় গিল্লোর মারাঝি কুটুমেরা এসেছিল। লক্ষ্মীর যৌতুকের বহর দেখে তাদের চোখ ট্যারা হয়ে যায়। মল্লণ সগর্বে ঘোষণা করেছিল, 'তিন মেয়ে আমার, তিনজনেরই বিয়েতে, ভিখিরি হয়ে গেলেও — আমি এই রকম দেব!' এই সময়েই ধুরকিটের ছেলেটিকে মল্লণ বাছাই করে। তাছাড়া, গিল্লো পরিবারের সঙ্গে মল্লণদের বেশ ভাব-খাতির আাছে। খেতখামারের ব্যাপার হোক, ঘরোয়া সুখ-দুঃখ হোক — ওরা পরস্পরের কাছাকাছি। যার জন্যে বিয়ের প্রস্তাব আসতে মল্লণ সঙ্গে সঙ্গে রাজি হয়ে যায়: 'এ আর বেশি কথা কী! বিশ বছর ধরে আমরা পরস্পরকে চিনি জানি। ছেলে দেখার দরকার নেই।'

এরপর একদিন মল্লণ, গিল্লোর যে আত্মীয় মারাঝে থাকে, গুরদেবের সঙ্গে ধুরকিট যায়। বিরাট রাজপ্রাসাদের মতো বাড়ি। বড় বড় দরজা। তিনটে বিশাল শিরীষ ডালের কাঠামোর ওপর টালি লাগানো ছাদ। লম্বা চওড়া উঠোন। চারটে প্রমাণ মাপের ঘর— একদিকে লম্বা টানা গোয়াল। চারটে বলদ একটা উট দুটো মোষ। তিন ভাই মা বাবা নিয়ে একান্নবর্তী পরিবার। সীমাহীন জায়গাজমি। ছেলেটি নরম স্বভাবের, স্বাস্থ্যটি ভাল। তাছাড়া, মোতির সঙ্গে মানাবে। মল্লণ সেদিন ধুরকিটেই থেকে যায়। কিছু ওদের কথা শোনে, কিছু নিজের কথা বলে। লেনদেনের কথাটিও হয়ে যায় গুরদেবের মাধ্যমে। দশ দিনের মধ্যে সম্বন্ধ পাকা হয়ে যায়।

পাকা দেখার পর মল্লণ ওপর-ওপর খুশির ভাব দেখালেও, মনে মনে এক দুর্ভাবনায় মুষড়ে পড়ে। লক্ষ্মীর বিয়ের সময় হাতে সব কিছু মজুত ছিল। মন খুলে সুদে টাকা ধার করেছে। লোকের কাছে বাহবা পেলেও, এই তিনটি বছর কত কষ্টেসৃষ্টে কেটেছে কেউ জানে না। সুদ ও সুদের ওপর সুদ— এর বেড়াজাল কাটা বড়ই কঠিন। মুকুন্দমল এখনও দু হাজার পাবে। গম বেচে টাকা শোধ করবে— মল্লণ এইরকম ভেবে রেখেছিল। এখন, বউ গিল্লোদের বাড়ি গেছে শুনে মল্লণের বুকটা ধ্বক করে ওঠে। ওরা বিয়ের দিন ঠিক করতে এসেছে নাকী?

যা ভেবেছিল মল্লণ তাই হয়েছে। খালের জলে চুল ধুয়ে মল্লণ বাড়ির দরজায় চুল ঝাড়ছে, এমন সময় মোতির মা ফেরে। মাটির ওপর জলের ফোঁটা। ঘাড়ে ঝটকা মেরে মল্লণ চুলগুলো পিঠের ওপর ফেলে। মোতির মা গজগজ করে, 'এটা কী চুল ধোয়ার সময়? চান করার ইচ্ছে ছিল তো, তাড়াতাড়ি এলে না কেন? এখন চুল শুকোবে কেমন করে?'

'ও ঠিক শুকিয়ে যাবে। গিল্লোরা কী বলল? গুরদেব এসেছিল?'

'হ্যাঁ। ধুরকিটে কথা বলে এসেছে। খেয়ে দেয়ে এখানে এসে তোমার সঙ্গে কথা বলবে। ওর কাছ থেকেই সব শুনবে।'

'তুমিই বলো না।'

'আমি আর কী বলব?' চাঁদ কৌর, অর্থাৎ মোতির মা আটা মাখতে বসে যায়, 'বিয়ের কথা আর কি।' মার কথায় মোতি লজ্জায় রাঙা হয়ে যায়। ঠোঁট চেপে মাথা হেঁট করে রুটি বেলতে থাকে। মল্লণ পিঁড়ি টেনে বসে। চাঁদ নিজের মনেই বলে যায়, 'বড় মেয়ের

বিয়ের সময় যেমনটি করেছিলে, এবারেও যেন ঠিক তেমনটি হয়। তারপর, জ্যোতিটাকে পার করতে পারলেই বাবা নিশ্চিন্তি!' চাঁদ বেশ খুশি।

জ্যোতি বারান্দার একদিকে কাঠ সাজাচ্ছিল। বলকার, তার ভাই, পুরনো একটা গাছের গুঁড়িতে কুড়ুল চালিয়ে কাঠ কেটে চেলা করে দিচ্ছিল। বলকার, কাঠে মোটা গাঁট পেলে, হয় তা চেঁচে দিচ্ছিল, নয় ভেঙে দিচ্ছিল। ছোট কাঠগুলো একটা বান্ডিল করে বেঁধে জ্যোতি রান্নাঘরের দিকে এলো। মাকে বলল, 'এই কাঠগুলো একবার উনুনে ফেলো, দেখবে কেমন দাউদাউ করে জ্বলছে! খুব গন্ধ বেরোচ্ছে— উঁ— কী রাঁধছ?'

কথাটা বলেই জ্যোতি ডাল ঘুঁটতে বসে যায়। ফিকফিক করে হাসে। বলকার জিজ্ঞেস করে, 'কীরে— তখন থেকে অমন ফিকফিক করে হাসছিস যে?'

জ্যোতি এবার সব কাটা দাঁত বের করে হেসে ফেলে: 'মারাঝ থেকে দিদির না—দিদির না—'

মোতি এবার বোনের পিঠে একটা কিল বসিয়ে দেয়, 'লক্ষ্মীছাড়ি! মুখের একদম আগল নেই!'

'এই ব্যাপার!' বলকার ব্যাপারটা বুঝে ফেলে। তারপর সোজা বাবার কাছে গিয়ে নতুন জামা সেলাই করাবার আর্জি পেশ করে। মল্লণ ছেলের কান ধরে, 'বাঁদর কোথাকার! আমি প্রাণের জ্বালায় হরি হরি করছি, আর তুই কীনা জামার বায়না করছিস — !'

বলকার মুহূর্তের মধ্যে বাবার হাত থেকে কান ছাড়িয়ে এক দৌড়ে উঠোন পার হয়ে যায়। তারপর, পাড়ার ছেলেদের সঙ্গে খেলায় মেতে ওঠে। চাঁদ জ্যোতিকে বলে, 'রুটি গরম আছে— ঠাকুর্দাকে দিয়ে আয়— ঠান্ডা রুটি একদম চিবোতে পারে না— ডালের বাটি — জল—সব এখানে আছে।'

রিসলদর করম এখন বেশ বুড়ো। দাঁত পড়েনি এখনও। চোখেও মোটামুটি দেখতে পায়। হাঁটুর ব্যথাটা একটু কাহিল করে দেয়। মালাইচাকিটা কেমন যেন বেঁকে থাকে। ছড়ি ছাড়া চালাফেরা করতে পারে না। আগে প্রাতঃকৃত্যের জন্যে খেতে যেত, এখন আর পারে না। উঠোনের এক কোণে মল্লণ আলাদা ব্যবস্থা করে দিয়েছে বাবার জন্যে। করম ওখানেই 'কাজ' সারে। চাঁদ কিংবা নাতনিদের কেউ ফাবড়াজাতীয় কিছুতে করে তা ফেলে দেয় বাইরের জঞ্জাল ফেলার জায়গাটাতে। করম সারাদিনই শুয়ে থাকে। কেউ এলে উঠে বসে, কথাবার্তা বলে। মিলখা প্রায়ই আসে। করম তার কাছ থেকে যুদ্ধের নানা খবর শোনে। ফৌজিদের কাহিনী শুনতে সে স্বভাবতই আগ্রহী। তবে, করম এখন আর কথাবার্তা বিশেষ মনে রাখতে পারে না। অল্পতেই ক্লান্ত হয়ে পড়ে। কানে ঠিকমতো শুনতে পায় না। কানের কাছে মুখ এনে কথা বলতে হয়।

টিনের কুপিতে আলোটা বেশ উজ্জ্বল। মল্লণ ঢোকে, দেখে বাবা চাদরের এক কোনা কুপিটার গায়ে রেখে, সেটা গরম করে মুখে সেঁক দিচ্ছে। মল্লণ জিজ্ঞেস করে, 'বাপু — আর রুটি চাই?'

করম কাশে, মাথা নাড়ে: 'না'।

'খিদে কমে গেছে মনে হচ্ছে। আগে তো তিনটে রুটি খেতে—'

'এখন দুটোই বেশি মনে হয়। শরীর আর নিচ্ছে না।' করম জল খায়।

'বাপু . . .' মল্লণ বাবার পাশে বসে। একটু বিব্রত বোধ করে কথাটা পাড়তে। জ্যোতি থালার ওপর ডাল রুটি রাখে। মল্লণ তাকে কি একটা বলতে গিয়ে থেমে যায়। চাঁদের উদ্দেশে বলে, 'গুরদেব এখনও এলো না। কখন আসবে বলেছিল?'

চাঁদ জবাব দেয়, 'রুটি খেয়ে আসবে বলেছিল—'

'বলকারকে একবার পাঠাও না গুরদেবকে ডেকে আনতে। এখানেই না হয় রুটি খাবে।'

বলকার গুরদেবকে ডাকতে যায়। ফিরে এসে জানায় গুরদেব খেতে বসেছে, একটু পরেই আসবে। খবরটা দিয়েই সে খেলতে চলে যায়। জ্যোতি তাকে ডাকে খেয়ে নেওয়ার জন্যে। মল্লণ খেতে বসবে ঠিক করছে, এমন সময় গুরদেব ডাক দেয়।

তিন

বারান্দার চারপায়াটা টেনে গুরদেব বসে পড়ে। চাঁদ তাতে একটা শতরঞ্চি বিছিয়ে বুটিদার চাদর পেতে দেয়। একটা তাকিয়াও রাখে। গুরদেব বলে, 'আরে, আমার জন্যে এত কিছু লাগবে না— এসব লাগবে তোমার নতুন আত্মীয়দের জন্যে!'

চাঁদ হেসে জবাব দেয়, 'আত্মীয় নতুন হোক, পুরনো হোক— আত্মীয়ই থাকে। আর ভাই— ভাই-ই! তুমি আমার কাছে ভাই-ই থাকবে চাঁদ-সুয্যির মতো।'

গুরদেব জবাবে হাসে, 'বিয়ে-থা চুকে গেলে কী আর ভাইয়ের কদর থাকবে?'

'দেখে নিয়ো।'

ওদের কথাবার্তা মল্লণের ঠিক ভাল লাগে না। বিয়ের দিনক্ষণ নিয়েই যে এইসব ভূমিকা, তা মল্লণ বোঝে। চাষবাস সংক্রান্ত কিছু খেঁজুরে আলাপের পরই গুরদেব কথাটা পাড়ে এইভাবে: 'তোমার তো প্রচুর গম হবে এবার। ধুরকিটের ওরাও তোমার মতো সারা খেত রুয়েছে। পাক্কা তিরিশ বিঘে!'

ধুরকিটের তিরিশ বিঘের তুলনায় মল্লণের দশ বিঘে টাহলি খেত কিছুই নয়। হাতির শেকল তো আর স্যাকরাকে দিয়ে বানানো যায় না। মল্লণ মনে-মনে ভাবে, ওর আর্থিক সমতার সঙ্গে মানানসই ঘর পেলেই ভাল হতো। খরচের বহর আন্দাজ করে মল্লণ মনে মনে কুঁকড়ে যায়। ধুরকিটওয়ালাদের যাই দেওয়া হোক, মন পাওয়া ভার হবে। এত বড় পেট ভরানো কী সোজা কথা? মৌনিবাধার লোক তো এখনও মুখ গুমরে আছে। যতই দাও, এরা খুশি হয় না। নিজের চিন্তাতেই মল্লণ ডুবে যায়। গুরদেব অনেক কিছু বলে যায়। মাঝে মাঝে হাঁ-হুঁ বলে সায় দিতে থাকে মল্লণ। হঠাৎ তার কানে আসে:

'আরে ঘুমিয়ে পড়লে নাকী? . . . বলছিলাম কি ধুরকিটের বুড়ি খুব অসুস্থ। কখন পটল তোলে ঠিক নেই। কিন্তু, বায়না ধরেছে ছেলের বিয়ে দেখে মরবে। তিন ছেলেই তো ঘর-সংসারী — এখন ছোটটার হলেই বুড়ির শান্তি!'

'ঠিকই তো। বড় ছেলের এক মেয়ে, মেজোর দুই। ছোটর এক ছেলে, এক মেয়ে। মেয়ের বিয়ে হয়েছে পারসালে। এখন এই ছোট ছেলে—' মল্লণ ধুরকিটের খবর এক নাগাড়ে বলতে থাকে।

'আরে ব্বাস্! তোমার তো দেখছি সব মুখস্থ! একটার পর একটা পটাপট বলে যাচ্ছ।' গুরদেব হাসতে থাকে।

চাঁদ দু গ্লাস গরম দুধ নিয়ে আসে। বলে, 'খেয়ে নাও, ঠাণ্ডা করেই এনেছি।'

গুরদেব জবাব দেয়, 'সর্বনাশ! আমার পেটে ঢুকবে কী করে, রুটিই নামেনি এখনও।'

'এইটুকু দুধ— এটাতো রুটির নিচে যাবে— নাও, খেয়ে নাও।'

দুধে চুমুক দিয়ে গুরদেব জানায়, 'যেটা বলতে এসেছিলাম। ধুরকিটের বুড়ো আমার কাছে এসেছিল মারাঝে। মোদ্দা কথাটা হলো, দিনক্ষণ কিছু ঠিক করেছ?'

'দিনক্ষণ আবার কি, বললে কালই হতে পারে। বারাত বাজনা ব্যান্ডপার্টি নিয়ে এসো!' মল্লণ ওপর-ওপর রসিকতা করে।

'ধুৎ! কাল বললেই হয় নাকী? দেওয়ালির পর মাঘ ফাগুনে বিয়ের তারিখ আছে। এখন ঠিক করো—' গুরদেব বেশ উৎসাহী হয়ে পরামর্শ দিতে থাকে।

মল্লণ বলে, 'দাঁড়াও চাঁদকে একটু জিজ্ঞেস করি।' চাঁদ এলে জিজ্ঞেস করে, 'কী হলো?'

'হলো মানে? হয়ে গেল বলো— তা তারিখটা কবে ঠিক করবে?'

'ওমা! ও-সবতো তুমি ঠিক করবে।'

মল্লণ হিসেব করতে করতে জবাব দেয়, 'শুভস্য শীঘ্রম! তবে, জিনিসপত্তর কেনা কাটার ব্যাপার আছে। পোষ প্রায় শেষ, তারপর হলো গিয়ে মাঘ— তা ফাগুন মাসের একটা দিন—'

গুরদেবও সায় দেয়, 'হ্যাঁ— ফাগুনটাই ভাল হবে। কাজকর্ম কম থাকে। বিয়ের কাজকর্ম বেশ আরামে, গুছিয়ে করা যাবে।'

চাঁদ বলে ওঠে, 'মাঘ ফাগুন চোত — এই তিন মাসের মধ্যে একটা দিন। গৌদি বামুনকে একবার জিজ্ঞেস করতে হবে।'

মল্লণ কিন্তু আবার মিইয়ে যায়। পুরনো ভাবনাটা ভাবে। ব্যাংকে টাকা নেই। ফসল উঠলে হাতে টাকা আসবে। সুদে টাকা ধার ছাড়া অন্য কোনও উপায় নেই। তা আজই হোক, আর কালই হোক। হয়তো, জমি বাঁধা রাখতে হবে। হাসি-হাসি মুখ করে মল্লণ আবার কথার খেই ধরে, 'গৌদিকে জিজ্ঞেস করে কী হবে? একটা দিন ঠিক করে ওকে ডাকলেই হবে। আমি বরং ধুরকিটে একটা চিঠি দিই — গুরদেব নিয়ে যাবে।'

পরের দিন মল্লণ খেতের কাজে যায় না। গৌদি বামুনের বাড়ি হাজির হয় সাত সকালে। গুরদেব সেখানে আগেই হাজির। চোখে ডাণ্ডি-ভাঙা চশমা এঁটে গৌদি দড়ি-বাঁধা

গোবিন্দবল্লভের পাতা ওলটাতে বসে যায় বিয়ের লগ্ন বের করতে। তেসরা ফাগুন, দিন বুধবার। মল্লণের হয়ে গৌদিই গুরুমুখি ভাষায় ধুরকিটওয়ালাদের উদ্দেশে চিঠিটা লিখে দেয়। সামান্য হলুদ ঘষে একটু জলের ছিটেও দেয় চিঠিটা মাথায়।

এরপরই, গুরদেব মল্লণ কথাবার্তা বলে।

: বরযাত্রী কত আনব?

: যত খুশি। ধুরকিটের সবাই।

: কাচ্চাবাচ্চা নিয়ে পঞ্চাশ?

: ঠিক আছে। আরও গোটা দশেক বাড়লে অসুবিধে হবে না।

গুরদেব চিঠি নিয়ে চলে যায়। গুরদেব যাওয়ার পর, দুপুরের খাওয়া সেরে মল্লণ শুয়ে পড়ে। চাঁদ বোঝে মল্লণ ভেঙে পড়েছে। সে চুপচাপ ঘরের এদিক ওদিক ঘোরে। মেয়েরা হেসে উঠলেই দাবড়ানি দেয়, 'চুপ কর বলছি! তোদের বাবার মন ঠিক নেই।' মা সরে গেলেই জ্যোতি মোতির কোমরে চিমটি কাটে। খুনসুটি করে। মোতি কপট রাগ দেখায়। বলকার স্কুল থেকে আসতেই জ্যোতি তাকে কোলে তুলে নেয়, 'জানিস— দিদির বিয়ে?'

'কোথায় বিয়ে?' বলকার কিছু না বুঝেই জবাব দেয়। 'ওরে মুখ্যু! কোথায় আবার? ফাগুনের তিন তারিখে।' বলকারকে কোল থেকে নামিয়ে জ্যোতি নাচতে শুরু করে।

বলকার মাকে জিজ্ঞেস করে, 'লাড্ডু-টাড্ডু হবে না বিয়েতে?'

'শুধু লাড্ডু?' চাঁদ জবাব দেয়, 'জিলিপি পকৌড়া বরফি বালুশাহি — বিয়েতে সব কিছু হয় রে বোকা!'

যেন আজই মোতির বিয়ে হচ্ছে! দোপাট্টাটা ঘোমটার মতো টেনে চাঁদ এবার বৈঠকখানায় ঢোকে। গলা উঁচিয়ে শ্বশুরকে বলে, 'বাবা— মোতির বিয়ে ঠিক হয়ে গেছে।'

'তাই নাকী? তা আমার সঙ্গে তো কেউ দেখা করে গেল না!'

'রাতে এসেছিল। আজ চলে গেছে।'

'ভাল। খুব ভাল। মেয়ে যত তাড়াতাড়ি পার করা যায়, ততই ভাল।'

বিকেলে চা খাওয়ার পর চাঁদ ও মল্লণ আলোচনা করে। দু-জনেই একটা উপায় বের করার চেষ্টা করে। চার মাস দেখতে দেখতে কেটে যাবে। সোনাদানা কিনতে হবে। গয়না বিছানাপত্তর। বিছানাপত্তর না হয় চাঁদই বানিয়ে ফেলবে। গাঁয়ে একটি ফেরিওয়ালা আসে, তার কাছ থেকে লুকিয়ে স্যুটের কাপড় কিনতে হবে। বাজার থেকে জিনিসপত্র কেনাকাটা আছে— হাজার কয়েক টাকার ধাক্কা। এরপর বরযাত্রীদের আদর আপ্যায়ন খাওয়াদাওয়া ঠিক মতো না হলে, সারা জীবন বদনাম। রিসালদার করম সিং-এর মান ইজ্জত বলে কথা। গ্রামের ইজ্জতও জড়িয়ে আছে এর সঙ্গে। স্বামী-স্ত্রী দুজনে মিলে এক সিদ্ধান্তে আসে: টাকা-পয়সা তো হাতের ময়লা, আসে যায়, কিন্তু বিয়েটা ঠিকমতো সারতে হবে। টাকা ধার করলে চক্রবৃদ্ধিহারে সুদ বাড়বে। বাড়ুক— ফসল ভাল হলে প্রত্যেক বছর ঋণ শোধ করা যাবে। হাতে যখন জমি আছে, তখন পরোয়া কী? জাঠের কাছে দু সের মাটি থাকলেই হলো, তাই দিয়েই সে টাকশাল বানাতে পারে। জমি থেকে সোনা ওঠে, শুধু জমিটা সবুজ থাকলেই হলো।

চার

মল্লণের হেলো-চাষি তেজু আজ চারদিন কাজে আসেনি। শালির ছেলের বিয়ে, তাই টাবর গিয়েছিল। পাঁচ দিনের দিন সে সকালবেলায় চলে আসে। পেতলের বাটিটা নিয়ে দাওয়ায় বসতে জ্যোতি চা দেয়। মল্লণ কুশল জিজ্ঞেস করতে তেজু বিয়ে বাড়ির বর্ণনা দিতে লাগে। চা খেয়ে মাটি রগড়ে বাটিটা পরিষ্কার করে তেজু জানতে চায়, 'এখন কী কাজ?'

'টাহলির মাটি নিড়েন হয়ে গেছে। কাল বীজ ফেলব। ঝান্ডার ওখানে একটু যেতে হবে বীজ আনার জন্যে। সকাল-সকাল যাই চল, বেলা হলে হয়তো বাড়িতে পাব না।' দুটো পুরনো বস্তা সঙ্গে নিয়ে ওরা বেরিয়ে পড়ে।

ঝাণ্ডা বাড়িতেই ছিল। দাঁড়িপাল্লা ধরে বীজ ওজন করে দেয়। এক একটা বস্তায় দু-মন করে গমের বীজ পুরে, মল্লণ বস্তার মুখ বাঁধে। তেজু পিঠের ওপর একটা বস্তা নিয়ে চলে যায়। আরও দু-মন ওজন করে ঝান্ডা মাটির ওপর রাখে। পরিষ্কার মেজে, একটুও মাটি লাগার ভয় নেই। তেজু খালি বস্তা নিয়ে ফিরে আসতে, তাতে ওই গম পুরে দিল মল্লণ। ঝান্ডা বলে, 'ছ-মন হলো। আর লাগবে?'

'না এতেই হয়ে যাবে। দশ বিঘে জমিতে এর চেয়ে বেশি লাগবে না।'

মল্লণ পিঠেতে একটি বস্তা তোলে। তেজু অন্যটি। ঝান্ডা বলে, 'সন্ধ্যেবেলা মুকুন্দর দোকানেই তাহলে লেখাজোখার কাজটা হয়ে যাবে।'

'হ্যঁা। আমি বাড়িতেই আছি। কাউকে দিয়ে ডেকে পাঠিও।'

বাড়িতে এসে বারান্দায় ছ-মন গম ঢেলে, মল্লণ চাঁদের উদ্দেশে জানায়, সন্ধ্যের মধ্যে যেন এক মন গম ঝাড়াই হয়ে যায়। কাল লাগবে। জ্যোতি-মোতিও যেন সাহায্য করে। ঝাড়াইটা যেন ভাল হয়, কোনও জঞ্জাল-টঞ্জাল না থাকে।

বেলা পড়তেই একটি ছেলে এসে মল্লণকে মুকুন্দর দোকানে ডেকে নিয়ে যায়। মুকুন্দই লেখে সব, মল্লণ বুড়ো আঙুলের ছাপ মারে: আষাঢ় মাসে সাড়ে সাত মন গম ঝান্ডাকে দিতে হবে। যথারীতি রাম-রাম জানিয়ে মল্লণ ঘরে ফেরে। জীবনে এই প্রথম তাকে গমের বীজ ধার করতে হলো। নতুন গম উঠতে এখনও সাত মাস দেরি। এই সাত মাস পেট চালাতে হবেতো। রাতের খাওয়া সেরে সে বাবার ঘরে যায়। প্রথমে টুকটাক কিছু কথা হয়, লম্ফটা জ্বেলে দেয়। জ্যোতি রুটি নিয়ে ঢোকে। বাবার দিকে একবার তাকায়। ঠাকুর্দার জন্যে রুটি রেখে বেরিয়ে যায়। মাকে জিজ্ঞেস করে, 'বাবাকে এমন মনমরা লাগছে কেন?' চাঁদ নিরুত্তর থাকে। মল্লণের মনে যে কী ঝড় বইছে, তা সে জানে। মোতিও চাঁদের নিশ্চুপ চেহারাটা দেখে। তার ঠোঁটের ফিকে হাসিটা কোথায় যেন মিলিয়ে যায়। লোকের খাওয়াদাওয়ার সময়টা পার হলেই মল্লণ বেরিয়ে পড়ে। জনে জনে জিজ্ঞেস করে, কবে তারা বীজ ফেলবে। বেশির ভাগই জবাব দেয়, কাল। আসলে, মল্লণের দুটো বাড়তি হাল দরকার। দশ বিঘে জমিতে হাল চালাতে হলে কম করে তিনটি হাল লাগে। একটু ঘোরাফেরার পর মল্লণ, প্রীতম আর নাজরের কাছ থেকে দুটো হাল যোগাড় করে। নাজরের আবার হেলো নেই, অল্প জমি, সে নিজেই হাল মারে। তার বীজ ফেলার কাজ শেষ হয়ে গেছে।

সকাল হতেই তিনটি হাল নিয়ে মল্লণ হাজির হয় খেতে। হাল চালাতে মহা ওস্তাদ তেজু। প্রচণ্ড পরিশ্রম করতে পারে। প্রথম খেপের কাজটা সে সেরে ফেলতে, পরের দুই তিন খেপ করে প্রীতম আর নাজর। মল্লণ বীজ ফেলে যায়। হালীদের যোগান দেওয়া, চা ইত্যাদি সরবরাহের জন্যে এই সময় সারাক্ষণ থাকাটা খুবই জরুরি। দুপুরে চাঁদ আর জ্যোতি রুটি নিয়ে আসে। সন্ধ্যের আগেই বীজ ফেলার অর্ধেক কাজ শেষ হয়। পরের দিন বাকিটা হবে। প্রীতম ও নাজর তাতে রাজি।

ভাইরূপার দু বিঘে জমিতে কাপাস জড়ো করা ছিল। মল্লণ এবার এখানে খাবলা খাবলা চারা ফেলে। ছিটে-বেড়া দিয়ে খেতটা ঘেরা। বলকারও সেদিন খেতে আসে। স্কুলে ছুটি, তেজুর দুই ছেলে তার সঙ্গী। তারা ইসকুল-টিসকুল যায় না। চামার বাড়ির ছেলেরা এমনিতে ইসকুলে বড় একটা যায় না। একটু বড় হলেই মোষ কিংবা ছাগল ভেড়া চরাতে লেগে পড়ে। বলকার পড়ে ক্লাশ টুয়ে। তবে, তেজুর ছেলেদের সঙ্গে তার খুব ভাব। একসঙ্গে খেলাধুলো করে, পরস্পরের বাড়িতে যাতায়াত করে। বলকারের খাতা পেনসিল চক স্লেট বই— সবই ওরা ঘাঁটাঘাঁটি করে। স্কুল সম্বন্ধে নানা কথা জানতে চায়। একদিন বলকার ওদের 'মোরগ' সেজে দেখায়। তেজুর ছেলে বাড়ি গিয়ে, কান ধরে, ঠিক বলকারের মতো 'মোরগ' সাজছে দেখে, তেজুর বউ হেসে কুটিকুটিঃ ছেলে নতুন বিদ্যে শিখে এসেছে!

ছিটে-বেড়ার খেতে যখন কাজ চালু, ওরা মহা আনন্দে দাপাদাপি করে বেড়ায়। মল্লণ ধমক দেয়, তেজু কান মুলে দেয় এক ছেলের— কিন্তু কে কার কথা শোনে! বলকারের পকেট ভর্তি কড়ি। কিছুতেই সে ওগুলো তেজুর ছেলেকে দেবে না। এমনকি, খেলতেও রাজি হয় না, পাছে তেজুর ছেলে কড়ি জিতে নেয়। অতএব বলকার দৌড় দেয়, পেছনে তেজুর ছেলে তাড়া করে। বলকার দৌড়য়, আর তার পকেট থেকে কড়ি পড়তে থাকে। তেজুর ছেলে আবার সেগুলো কুড়োতে-কুড়োতেই দৌড়ে চলে! এইভাবে বলকারের পকেট থেকে সব কড়ি পড়ে যায়। ক্লান্ত হয়ে বসে সে হাঁফাতে থাকে। পকেটে মাত্র কয়েকটা কড়ি! য়্যাঁ, কী হলো? বলকার একটু বোকা বনে যায়। তেজুর ছেলে হাসে।

'মল্লণ ভাই— এই কাপাসি-জমিটা তো ঘাঁটছে না একেবারে। এই চারায় জান আসবে কী?' তেজু জিজ্ঞেস করে।

'কাপাসও যেমন, চারার আর দোষ কী?' মল্লণ জবাব দেয়।

'তাহলে কাপাস না দিয়ে এখানে অন্য কিছু ফেলো।'

'এই শেষ। এরপর আর কাপাস দেব না।'

ভাইরূপার এই খেতে দু বিঘে মকাইও ছিল। বাকি দু বিঘের এক বিঘেতে আখ, আর এক বিঘেতে ছোলা। সামান্য উঁচু এই জমিতে জল দেওয়াটা এক মস্ত ফ্যাচাং। যার জন্যে মল্লণ এখানে হয় সর্ষে, নয় ছোলা দেয়। ছোলা আর সর্ষে সব চাষিরাই রাখে। ডাল আর সর্ষের তেল ছাড়া রান্নাবান্না হয় না।

খেতের কাজ চুকিয়ে মল্লণ মেয়ের বিয়ের কথা ভাবতে বসে। এখনও কিছু বানানো বা কেনাকাটা হয়নি। দিনও কাছাকাছি এসে পড়ছে। কালীপুজো কবে শেষ হয়ে গেছে। লোহড়ির দিন এসে পড়ে। সেদিন সে মুকুন্দর দোকানে যায়। মুকুন্দ সকৌতূহলে জিজ্ঞেস

করে, 'কী ব্যাপার মল্লণ— আজ এত সকল-সকাল? লোহড়ির দিন, সর্দারনি মকাইয়ের লাড্ডু-টাড্ডু বানায়নি?'

'বানিয়েছে তো সব কিছুই। মকাইয়ের লাড্ডু তিলের বড়া বজরা জোয়ারের লটপটি— কিন্তু আমার তো খাবার ইচ্ছে নেই!'

'সে কী কথা! তোমার তাহালে মনের ব্যামো হয়েছে—'

'সে তো হয়েছে। আর, কেন হয়েছে তাতো বুঝতেই পারছ।'

'না, ভাই— আমি বুঝব কেমন করে? সবই পরমাত্মার ব্যাপার। তিনি ওপর থেকে যাই করবেন, তাই হয়।' মুকুন্দ হুঁকোয় তামাক পুরে ভুড়ুক-ভুড়ুক টানে আর তীক্ষ্ণ চোখে তাকায়। মল্লণ নিজে থেকেই বলে:

'মোতির বিয়ে গলায় কাঁটার মতো আটকে আছে। বিয়ে তো নয় যেন গলায় ফাঁস টেনে দম বন্ধ করা। দিনটাও কাছে এসে পড়েছে—'

'আরে, এতে এত ভাবনার কী আছে? হাতে তোমার জায়গাজমি আছে। ষোলো বিঘে— একী কম কথা!'

'সেই জন্যেই তো তোমার কাছে আসা। হাজার ছয়েক টাকা চাই—'

'ছ হাজার? য়্যাঁ! কিন্তু, এত টাকা একসঙ্গে কোথা থেকে পাই? কম হলে চলবে না?'

'না। হিসেবনিকেশ করে দেখেছি। ছ হাজার শুধু সোনা কিনতেই যাবে। তারপর অন্য খরচ আছে। তুমি ছয় দাও— আমি বাকিটা অন্য জায়গা থেকে যোগাড় করব।'

মুকুন্দ চুপ করে হাঁসের মতো চোখ বুজিয়ে বসে থাকে। মনে মনে হিসেব করে। তারপর জিজ্ঞেস করে, 'কবে চাই?'

'কাল পরশুর মধ্যে। সোনা তো আর ধারে পাওয়া যায় না। অন্য জিনিস না হয় ধারবাকি করে হয়ে যায়।'

'সোনা — দু হাজার করে দর যাচ্ছিল না?'

'আরে — ওতো কাটা-দুধের মতো। কেটে কেটে কত দাঁড়ায়, কে জানে! তবে, আমার কাছে গম আছে। দশ বিঘেতে গমের ঢল নামিয়ে দেব, কিন্তু বিয়েটা তো শিরে সংক্রান্তি—'

মুকুন্দ চোখ পিটপিট করে, 'গয়না গড়াচ্ছ কোথায়?'

'ভাইরূপায়। কথাও বলে এসেছি। স্যাকরা লোক ভাল। সৎ।'

'স্যাকরা আবার সৎ! শালারা মায়ের কানের সোনাও চুরি করে। যাক— কাল হলো গিয়ে মাঘী, রোববার চলো তাহলে। ওখানেই লেখাপড়ার কাজটা সারা যাবে। আগের দু হাজার কিন্তু এর সঙ্গে জুড়ে দেব, কেমন? ভাইরূপায় আমারও একটা কাজ আছে। আমরা না হয় একসঙ্গেই যাব। আমার লোক আছে ওখানে— ' তারপর, কানের কাছে মুখ এনে, 'আমি কাছে টাকাকড়ি রাখি না। দিনকাল বোঝই তো? হেঁ হেঁ—' একটু দাঁত বের করে, 'দুটো সাক্ষী সঙ্গে এনো ভাই। কাজ পাকা হয়ে যাবে।'

কাজ অনেকটা এগোল ভেবে মল্লণ উঠে পড়ে। গ্রামের চৌপালে লোহড়ির উট বাঁধা। জুতো খুলে মল্লণ নমস্কার করে। বাড়ির দরজার কাছে এসে মনে হয়, চিৎকার করে সে চাঁদকে খবরটা জানায়।

পাঁচ

ঝান্ডার দুই মেয়ে, ছেলে হরদিতেরও বিয়ে হয়ে গিয়েছিল। হরদিতের বয়েস যখন সতেরো আঠারো, তখনই বিয়েটা হয়ে যায়। হরদিতের এক ছেলেও আছে। হরদিতের বিয়েতে ঝান্ডা এত যৌতুক আদায় করে যে হরদিতের শ্বশুর প্রায় ফোঁপরা হয়ে গিয়েছিল। চন্দনবালে অবশ্য বেশি বরযাত্রী যায়নি। আত্মীয়স্বজন শরিক নিয়ে জনা পাঁচ সাত। আঙুল গুনে বরযাত্রীর সংখ্যা ঠিক করেছিল ঝান্ডা। বরযাত্রী কম হলে, অন্য জিনিস বেশি আদায় করা যায়। জাঠেদের মধ্যে চালু কথাই হলো, লোক কম হলে খাতির বেশি, বরযাত্রী কম হলে মাল বেশি। ঝান্ডা নিজেও কারও-র বরযাত্রী হয়ে, বা বিয়েবাড়িতে যেত না। ফলে, বেশি লোক নেমন্তন্ন করার প্রশ্নই ওঠে না। হরদিতকেও কারওর বিয়েতে দেখা যেত না। বাপ ছেলে— দু জনেরই কেউই মদটদ খায় না।

ঝান্ডার সঙ্গে এক বারোমাসিয়া মজুর সব সময়েই থাকে। যেদিন থেকে হরদিত হাল ধরে, সেদিন থেকেই এই বারোমাসিয়া আছে। ঝান্ডা আর খেতের কাজকর্ম করে না বলেই একে রাখা। গাঁয়ে ঝান্ডার এখন অফুরন্ত কাজ। এতে হরদিৎ খুশিই। কয়েক বছর আগে দশ বিঘে জমি জমা নিয়ে দু বিঘে সে হরদিৎকে দিয়েছিল। ঝান্ডার আড্ডা এখন মুকুন্দর দোকান। গাঁয়ের সবাই এই দোকানে আসে। ফলে, কোনও বাড়িরই হাঁড়ির খবর লুকোছাপা থাকে না। এতে মুকুন্দ ও ঝান্ডার 'ধান্দা' ভালই চলে। গরিব জাঠ চাষিরা মুকুন্দর কাছ থেকে সুদে টাকা নেয়। ছোটজাতের লোকও মুকুন্দর কাছ থেকে টাকা ধার নেয়। তবে একশো টাকার বেশি নয়। ঝান্ডা এই সুযোগে ওই অভাবি জাঠেদের জমি বাঁধা রাখে। ঝান্ডার টাকাকড়ি থাকে মুকুন্দর কাছে। লেখালিখির কাজটাও মুকুন্দ করে। কাকা অর্জুন খুন হওয়ার পর হরদিতের হাতে এখন বিশ বিঘে জমি। দশ বিঘে জমা নেওয়া আছে। অর্থাৎ, তিরিশ বিঘে। এছাড়া আছে, চারটি বলদ, একটি উট। দুজন হালী। যাতায়াতের কাজে উট লাগে। ঘরে দুটো মোষ থাকার জন্যে দুধ সব সময়েই পাওয়া যায়। একটির বাচ্চা হলে, অন্যটি গর্ভিণী হয়। ঝান্ডা আর বাপ্তি শুধু সর্দারি করে।

খেত-মজুর দেবু চামার কয়েক বছর ধরে ঝান্ডাদের সঙ্গে আছে। সিঁড়ির দ্বিতীয় ধাপের মাঝখানে বসে সে গজগজ করছিল: 'শালা, খেতে দিলে শুতে চায়! কঞ্জুষ কোথাকার— আমাকে দিয়ে এত কাজ করিয়ে আমাকেই ঠকায়!' দেবুর সঙ্গে ঝান্ডার প্রায়ই ঝগড়া হয়। দিন রাত, নাকে দড়ি দিয়ে সে দেবুকে খাটায়, কিন্তু পাওনা টাকা দিতেই গেলই মুঠো শক্ত হয়ে যায়। ঝান্ডার স্বভাবটা জানোয়ারের মতো। ছেলেকেও মানুষ করেছে সেইভাবে।

ঝান্ডার মাথায় কে যেন কথাটা ঢুকিয়ে দিয়েছিল। ভারতে প্রথম সাধারণ নির্বাচন হতে যাচ্ছে। ঝান্ডাকে এক কংগ্রেসি প্রার্থীর নির্বাচনী কাজকর্মে নেমে পড়তে দেখা যায়। দেশ সবে স্বাধীন হয়েছে। কংগ্রেস ইংরেজদের ভারত থেকে খেদিয়ে দিয়েছে। এই রকম একটা কথা আজকাল সবাই বলাবলি করে। আর গোলামি নয়, এবার আজাদি। ইংরেজদের জায়গায় এখন কংগ্রেসিরা রাজত্ব করবে। অবশ্য অন্য পার্টিও আড়ামোড়া ভাঙছে ক্ষমতা দখলের জন্যে। রাজকাজে তাদেরও অধিকার আছে! ঝান্ডার প্রার্থী এই এলাকায় খুবই

পরিচিত। সবাই নিশ্চিত ইনি নির্বাচিত হয়েই মন্ত্রী হয়ে যাবেন। লেখাপড়া জানা লোক, বক্তৃতা দেন সুন্দর, ইংরেজ আর মহারাজের জেলে অনেক কাল কাটিয়েছেন। বৃদ্ধ এই প্রার্থীর সমর্থনে গাঁয়ের মানুষ একজোট। ঝান্ডার ছেলে হরদিৎ সারা দিন এই প্রার্থীকে জিপে নিয়ে পরিক্রমা করে। আত্মীয়স্বজন সবাইকে বাপ-ব্যাটা অনুরোধ করেছে এই প্রার্থীকে জিতিয়ে দেওয়ার জন্যে। ঝান্ডা-হরদিৎ, দুজনেই এখন খাদির শাদা পাগড়ি পরে। নির্বাচনী তহবিলের টাকা সরিয়ে, তাই থেকেই একশো টাকার পাঁচটা নোট সে প্রার্থী 'বাবা'-কে দেয় লোক দেখিয়ে। প্রতিদ্বন্দ্বিতায় কমিউনিস্ট ও অকালি দলের প্রার্থীও আছে। এদের অবিশ্যি তেমন লোক পরিচিতি নেই। শেষ অবধি, 'বাবা'-ই জিতে গেলেন। সবাই খুশি, কিন্তু পেপসুর মন্ত্রিসভায় আর বাবার নাম পাওয়া গেল না। এক যুবক কংগ্রেসি এম এল এ মন্ত্রী হয়েছেন। এই যুবক মন্ত্রী আবার গ্রাম পঞ্চায়েতের সামনে বাবার পায়ে পাগড়ি রেখে শ্রদ্ধাট্রদ্ধা জানালেন। বাবা মন্ত্রীকে আশীর্বাদ করলেন, মায় তাঁর সঙ্গে দিল্লি অবধি গেলেন। নির্বাচনের পরেও ঝান্ডার বাড়ির ছাদে তেরঙা কংগ্রেসি পতাকা উড়তে থাকে লটপট করে।

যুবক হরদিল মন্ত্রী হয়েই গ্রামে এলেন। গাঁয়ের সবাইকে কৃতজ্ঞতা জানালেন। পরাজিত প্রার্থী বাবাও তার সঙ্গে সঙ্গে রইলেন। জোর গলায় হরদিলের সুখ্যাতি করলেন। হরদিলও পাল্টা সুখ্যাতি করে বললেন, 'বাবা কৃপা না করলে' এত বড়ো পদ তাঁর জুটত না। কোটেতে ঝান্ডা মহা আপ্যায়ন করল হরদিলকে পঞ্চাশ জন লোক খাইয়ে, বাড়িটা মনে হলো যেন বিয়েবাড়ি! খবর ছড়াল, মন্ত্রীর কাছ থেকে কোনও কাজ আদায় করতে হলে ঝান্ডাই ভরসা। মন্ত্রীকে তোয়াজ করার জন্যে ঝান্ডা এত কিছু করেছে, তা কী ফালতু? না। সরকারি কাজ-কারবারে নিজের প্রতিষ্ঠা স্থাপনের জন্যেই এত কিছু। মন্ত্রীরাই এখন রাজা মহারাজার জায়গা নেবে। ওদের হাত করতে পারলে, মারে কোন শালা? মন্ত্রীমশাই হরদিলের বাড়িতে আতিথ্য গ্রহণ করেছেন— এই ইঙ্গিতই যথেষ্ট। মন্ত্রীর আমাত্য পারিষদ শাদা ধোপদুরস্ত খদ্দরে এমনভাবে জাজ্বল্যমান, যেন প্রত্যেকেই মন্ত্রী! কত নরম-গরম বুলির ফোয়ারা। ওদের মধ্যে বাবা যেন হংসমধ্যে বকোযথা! শান্ত শিষ্ট নির্বিকার, কেউ যেন ওকে জোর করে ধরে এই মহফিলে বসিয়ে দিয়েছে।

ঝান্ডা এর মধ্যে একদিন পাতিয়ালাতেও ঢুঁ মেরে আসে। হরদিলের অনুরোধে তাঁর বাড়িতে রাতটা থেকে যায়। হরদিলের বাড়িতে শহুরে ব্যাপারস্যাপার নেই। গাঁয়ের লোকেদেরই বেশি যাতায়াত। পনেরো বিশজন সব সময়েই থাকে। খাওয়াদাওয়া অঢেল, যারা মদ খায় তাদের জন্যে অফুরন্ত মদ। ঝান্ডা করজোড়ে জানায় 'হুজুর— আমি তো মদ ছুঁইনা। আপনার কাছে এসেছি একটি অনুরোধ নিয়ে, আমার ছেলের এক বন্দুকের লাইসেন্স করে দিন . . '

'এ আর এমনকী বড় কথা?' হরদিল আশ্বস্ত করেন, 'আমি দিন দশেকের মধ্যে রামপুরায় যাচ্ছি। তোমার ছেলেকে পঠিয়ে দিও। ডি এস পি-কে বলে দেব। হ্যাঁ, একটু খবর নিয়ো আমি কবে যাব।'

সন্ধ্যের গাড়িতেই ঝান্ডা রামপুরা আসে। রাতটা কাটায় গাঁয়ের আড়তদারের দোকানে। ধাবা থেকে আগেই খেয়ে নিয়েছিল। খাটিয়া টেনে দোকানের বাইরে শুয়ে পড়ে।

জ্যৈষ্ঠ আষাঢ় মাস। গায়ে চাদর লাগে না। সকালে উঠেই সে চলে যায় স্থানীয় কংগ্রেস অফিসে। জানায়, হরদিল রামপুরা যেদিন আসবেন, তার আগের দিন কেউ যেন ঝান্ডাকে খবরটা জানায়। তরুণ কংগ্রেসি ঝান্ডাকে চা-পানে আপ্যায়িত করে একটা নোট বইয়ে ঝান্ডার নাম ঠিকানা টুকে নেয়। জানায়, আড়তদারই খবরটা ঝান্ডাকে পৌঁছে দেবে। কেননা, কোর্টের লোক হরদম আড়তদারের দোকানে যাতায়াত করে।

যথারীতি হরদিল যেদিন রামপুরা এলেন, তার আগেই ঝান্ডার কাছে খবর পৌঁছে গেল। হরদিল ঝান্ডাকে নিয়ে গেলেন ডি এস পি-র কাছে। ডি এস পি একটু ভুরু কুঁচকলেন, 'ঝান্ডা সিং নামে কেউ তো আবেদন করেনি বন্দুকের জন্যে। তাছাড়া, বন্দুকের দরকার কী সর্দারজির? কাকে এত ভয়?'

'ফালতু কথা ছাড়ো ডি এস পি! ঝান্ডার ছেলে হরদিতকে বারো বোর দু-নলা বন্দুকের একটা লাইসেন্স দাও, ব্যাস!'

হরদিলের কড়া চোখ আর ধমকে বিব্রত ডি এস পি স্যালুট ঠুকলেন, 'ইয়েস স্যার।'

হরদিল মোলায়েম স্বরে এবার বললেন, 'আরে ডি এস পি, কথাটা বুঝলে না? জাঠেদের কী শত্রুর অভাব আছে?'

কোর্টেতে হরদিৎকে নিয়ে হইচই পড়ে যায়। একেই বলে হাত। মন্ত্রীর সঙ্গে খাতির আছে বলেই না লাইসেন্সটা পাওয়া গেল!

এরপরই হরদিৎকে দেখা যায় বন্দুক নিয়ে ঘোরাফেরা করতে। এমনকি, রামপুরা বাজরে গেলেও তার কাঁধে বন্দুকটা মোতায়েন থাকে। পকেটে কার্তুজ। শুধু খেতে কাজ করার সময়ই বন্দুকটা থাকে না। গাঁয়ের লোক বলাবলি করেঃ 'ব্যাপারটা কী? কারওর সঙ্গে ঝগড়াঝাটি নেই, রেষারেষি নেই — অথচ শালা সর্দারদের মতো বন্দুক নিয়ে ঘুরছে। বন্দুক বোধ হয় চালাতেও পারে না। শালা— মাথায় চুল নেই, বগলে বাবরি!'

ছয়

মুকুন্দের কাছ থেকে নেওয়া ছ হাজার টাকায় গয়নাগাটি হয়ে যায়। লেখাপড়ার দিন, মুকুন্দ মল্লণের সঙ্গে ভাইরূপা যায়। স্যাকরাকে গুনে গুনে টাকা দেয় চার হাজার, ঠিক হয় বাকি দু হাজার দেবে দশ দিন পরে। ওই টাকায় গয়না বানাবার মজুরি হয়ে যাবে। গয়না নেওয়ার দিনেও ওরা দুজন ভাইরূপা যায়। গুনে গুনে গয়না ওজনের পর হিসেবনিকেশ করে দেখা যায়, মজুরি দাঁড়িয়েছে দু হাজার একশো ষাট টাকা। মুকুন্দ দর কষাকষি করতে ষাট টাকা কমে। কোনও লেখাজোখায় না গিয়ে মুকুন্দ একশো টাকা দিয়ে দেয়। এক ফাঁকে মল্লণ টাকাটা দিয়ে দিলেই হবে। রঙিন বেগুনি কাগজে মোড়া গয়নাগুলো একটা ছোট বাকসে রাখার পর, মল্লণ কোমরে ফেট্টি দিয়ে সেটি বাঁধে। গয়না কেনার পর মল্লণ গাঁয়ে ফেরে

। দরজা এঁটে সপরিবারে রঙিন কাগজের মোড়ক খুলে গয়নাগুলো খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে বসে। আলো লেগে চিকমিক করে গয়না। চাঁদ সযত্নে গয়নার বাকসো সিন্দুকে রেখে দেয়। সিন্দুকে তালা দিয়ে, তালাটা টেনেটুনে পরখ করে, চাবিটা সালোয়ারের দড়িতে বেঁধে রাখে। এখন বাকি জামাইয়ের স্যুটের কাপড়, একটা বড় পেটি, আর ঘোড়া ভাড়া করার টাকা।

বাড়িতে খাওয়ার যে গম, তার বীজ ফেলা শেষ। দু বস্তাতেই হয়ে গেছে। কাপাস বেচে মল্লণ টাকা যোগাড় করেছিল। এই বাবদ যে টাকা পাওয়া যায়, তার কিছুটা সংসারে খরচ হয়ে যায়। মল্লণ হিসেব করেঃ দু হাজার টাকা বরযাত্রীদের খাওয়াদাওয়া ও আনুষঙ্গিক খরচ ধরলে, হাতে যে টাকা আছে তাতে চলে যাবে। পাঁচ হাজার লাগবে জিনিসপত্র কিনতে। এদিক-ওদিক করে হাজার আষ্টেক টাকার ধাক্কা কিন্তু, টাকাটা যোগাড় হবে কী করে? মল্লণের ইচ্ছে হয় বিষ খেয়ে মরতে। তাহলেই নিষ্কৃতি পাওয়া যাবে। পরে, হাতে টাকা এলে জমি ছাড়িয়ে নেবে। আষাঢ়ের ফসল উঠলে দু মন পাওয়া যাবে, কিন্তু তাতে তো পুরো দেনা মিটবে না। মুকুন্দর কিছু দেনা মিটবে। সংসারেও বিশেষ টান পড়বে বলে মনে হয় না।

মনের দুঃখ মনে চেপে মল্লণ আসে ঝান্ডার কাছে। বেলা পড়ে এসেছে। চৌপালে ধুনো দেওয়া হয়েছে। পাঁচ সাতজন— দু একজন অল্পবয়েসী— ধুনোর আগুনে হাতে তাপ লাগায়। নিজেদের মধ্যে গল্পগুজব করে। মল্লণ চট করে হেঁটে যায় তাদের সামনে দিয়ে, যাতে কেউ তাকে লক্ষ না করে। একটু এগিয়ে আবার পেছন ফেরে। না, কেউ তাকে লক্ষ করছে না। মনে মনে স্বস্তি পায় সে।

ঝান্ডা বাড়ি নেই। হরদিৎ তার বারেমেসেকে নিয়ে বন্দুক পরিষ্কারে ব্যস্ত। বন্দুকের নলে চোখ রেখেই, হরদিৎ মুখ ফেরায় মল্লণকে দেখে, 'আরে কাকা — কী খবর?'

'বন্দুকটা এত মন দিয়ে পরিষ্কার করছ, কিন্তু চালাতে তো দেখি না!' মল্লণ হালকাভাবে কথার উত্তর দেয়।

'চালাই না চালাই — এটাকে তো সাফ রাখতে হবে, কাকা। লোহার জিনিস, সাফ না করলে জঙ ধরে যাবে যে।' হরদিৎ হেসে জবাব দেয়।

'ঝান্ডা কোথায়? আশপাশে দেখছি না?'

'বাবা? বৈঠকখানায় বসে আছে বোধহয়। কেন কাকা, কোনও কাজটাজ আছে নাকী?' একটু অর্থময় ভঙ্গি করে হরদিৎ।

'কাজ তো আছেই একটু।'

'তাহলে সোজা বৈঠকখানায় চলে যাও। বাবা একাই আছে।'

মল্লণ বৈঠকখানায় আসে। ঝান্ডা চাদর জড়িয়ে বসে আছে। কি যেন ভাবছে একমনে। মল্লণকে দেখে পাগড়িটা ঠিক করে নেয়। কুশল জিজ্ঞেস করে। পাশের খাটিয়ায় মল্লণ বসে। তারপর বলেঃ

'মেয়ের বিয়ে এগিয়ে আসছে। এদিকে আমার ট্যাঁক ফাঁকা। মান ইজ্জত থাকলে হয়!'

'ধ্যুৎ! এসব কী আবোলতাবোল বকছ? এত জমি তোমার — ভাবনা কী?' ঝান্ডা পাগড়িটা মাথা থেকে খোলে।

'ওই জন্যেই তো তোমার কাছে আসা। হাজার আষ্টেক টাকা চাই।'

'বাপস্! এত টাকা! একসঙ্গে যোগাড় করি কী করে?'

'পিয়াঁজ দিয়ে —'

'পিঁয়াজে তো আমি কোনও দিন টাকা দিইনি ভাই।'

'তাহলে?'

'জমি বাঁধা। যদি তোমার আপত্তি না থাকে।'

'বন্ধক?'

'হ্যাঁ'

জমি বাঁধা দিতে হবে, মনে মনে মল্লণ তৈরিই ছিল। কিন্তু ঝান্ডার মুখে 'বাঁধা' শব্দটা শুনে গা রি-রি করে ওঠে। দেহের শিরা উপশিরা যেন বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে যায়। জুড়িদারের কাছে জমি বন্ধকী! চোখে সব কিছু ঝাপসা দেখে মল্লণ। কিন্তু, কোন উপায় নেই। ঝান্ডা খাটের নিচে পা ঝুলিয়ে বসে এবার। তারপর বলে, 'পিয়াঁজের ওপর টাকা দেয় বেনিয়ারা। বেনিয়াদের সঙ্গে কথা বলো তাহলে। আমরা জাঠ; জাঠেদের কী পিয়াঁজে টাকা দেওয়া মানায়, ভাই? তাছাড়া, তোমাকে একসঙ্গে এই টাকাটা দিতে গেলে আমাকেও এদিক-ওদিক থেকে নিতে হবে। পিয়াঁজ দিয়েই আমি কোনও বেনিয়ার কাছ থেকে — যাক, তোমার ঠিক কত চাই?'

'বললাম তো — আট হাজার।'

'ঠিক আছে। দু বিঘে জমি — টাকাটা আমি তোমাকে যোগাড় করে দেব।'

'কিন্তু একটা কথা— '

'বলে ফেলো।'

'ওই টাকাতেও যদি না কুলোয়, তাহলে অন্য জমিতে তো হাত দিতে পারব না। টাহলির জমি আমি দেব, কিন্তু কাজকর্ম আমিই করে যাব, শুধু ফসল থেকে তোমাকে হিস্যা দেব।'

'তাই হবে। আষাঢ়ে তোমার যে-গম উঠবে, তাই থেকেই না হয় দেবে। পরের বছরও তাই। বছর দশেক এভাবে রেখে দিতে পার।'

মল্লণের মাথায় মেয়ের বিয়ের কথা ঘুরছে। ফলে সে আর কথা বাড়ায় না, 'চার পাঁচ দিনের মধ্যে টাকাটা দিয়ে দাও। লেখাপড়া যখন খুশি কোরো। এখন আমার দু-বিঘে তোমার হলো।'

ঝান্ডাও রাজি। বলল, 'কালই গমের গাড়ি নিয়ে রামপুরা যাব। ওখানে আড়তদারের কাছে টাকার কথাটাও বলে আসব। পরশু কিংবা তার পরের দিন টাকাটা পেয়ে যাবে।'

মনে মনে মল্লণ একটু খুশি হয়। মনের মধ্যে আঁকা ছবিটা যেন চেহারা পাচ্ছে। খাটিয়া থেকে সে উঠে পড়ে। ঝান্ডা তখনও বলে যাচ্ছে: 'আমরা কাছে আট হাজার নেই, বেনিয়াকে গম দিয়ে, পিঁয়াজ দিয়ে— টাকাটা নেব। তবে, আগেই বলে রাখি, সুদ কিন্তু শতকরা দশ — পরে আমাকে দোষটোষ দিও না, কিন্তু!'

ঝান্ডার অসহ্য ন্যাকামিতে গা জ্বালা করে। মনে মনে বিদ্রোহী হয়ে ওঠে মল্লণ। কিন্তু, এ বিদ্রোহ নপুংসকের বিদ্রোহ। ইচ্ছে হয় একবার বলে, 'দু-বিঘে জমির এক কণা ফসলও

তোকে দেব না।' কিন্তু, বলে কোনও লাভ হবে না। মাঝখান থেকে আট হাজার টাকা পাওয়ার সুবিধেটা চলে যাবে। মেয়ের বিয়েতে টাকাটা খুব দরকার। মল্লণ চৌকাঠে দাঁড়িয়ে জবাব দেয়, 'ঠিক আছে, ঝান্ডা ভাই। বেশি নিতে হলে নেবে— কিন্তু কথার হেরফের কোরো না। তা পরশু, না— ?'

'পরশুদিন সন্ধ্যের দিকে খবর নিয়ো। নইলে, আমিই তোমাকে খবর পাঠাব।'

মল্লণ চৌকাঠ থেকে নামবে, এমন সময় বান্তি আসে। হাতে এক ভাঁড় দুধ আর গেলাস, 'মল্লণ ভাই— দুধটা খেয়ে যাও।'

মল্লণ একটু অপ্রস্তুত হয়ে পড়ে, 'আমার তো পেট ভর্তি—'

'তা বললে কী হয়?' বান্তি ভাঁড় থেকে গ্লাসে দুধ ঢালে। দুটি গেলাস এগিয়ে দেয় ওদের দিক। দুধ দিয়ে বান্তি চলে যায়। ঝান্ডা আর মল্লণ গেলাসে চুমুক দেয়। কেউ কারও দিকে তাকায় না।

বাড়ি ফিরতে-ফিরতে মল্লণের মনে হয়, ঝান্ডাদের বাড়ির দুধ খেয়ে তার হৃৎপিন্ড যেন স্পন্দনহীন হয়ে গেছে। চৌপালে আগের মতোই জটলা। ধুনির চারপাশে কিছু অল্পবয়সীর ভিড়। তার মধ্যে অনেকেই চাদর মুড়ি দিয়ে বসে আছে। এবারেও মল্লণের দিকে কেউ তাকায় না। অন্ধকারের মধ্যে অবশ্য লক্ষ করাও যায় না।

বাড়ি পৌঁছতে সে দেখে উনুনের চার পাশে সব বসে। মোতি রুটি বেলে চলেছে। জ্যোতি আর বলকার তর্কাতর্কি জুড়ে দিয়েছে। চাঁদ বাসন মাজছে। মল্লণের পায়ের আওয়াজ কানে আসতেই সে ছেলেমেয়েদের সতর্ক করে: 'চুপ। বাবা আসছে।'

সবাই ফিরে তাকায়। নির্জীব অবশ ভঙ্গিতে মল্লণ একটি পিঁড়ি টেনে নেয়। অনেকক্ষণ চুপচাপ বসে থাকে। চাঁদ জিজ্ঞেস করে, 'রুটি?'

'এরা খেয়েছে?'

'হ্যাঁ।' চাঁদ একটা থালায় শাক আর কলাইডাল রাখে। মোতি দুটো রুটি চার টুকরো করে থালায় সাজিয়ে দেয়। একহাতে থালা ধরে, অন্য হাতে মল্লণ রুটি মুখে ফেলে। থালাটা গরম লাগতে মাটিতে রেখে দেয়। চাঁদ শাকের ওপর একটু ঘি ঢেলে দেয়। জ্যোতি আর বলকার বাবার গম্ভীর চেহারাটা এক নজর দেখে। তারপর, একটু দূরে সরে যায়। নিজেদের মধ্যে কথা বলে নিচু গলায়।

সাত

তৃতীয় দিন সন্ধ্যেবেলাতেই ঝান্ডা মল্লণদের বাড়ি এসে খবরটা দেয়। পরের দিনই মুকুন্দর দোকানে লেখাপড়ার কাজ সারা হবে। দুজন সাক্ষীও থাকবে।

রাতে চাঁদ আর মল্লণ আলোচনা করে। জমি বাঁধা পড়েছে জানলে লোকে ছি ছি করবে। এখন কথাটা চাপা থাকলেও, একদিন-না-একদিন লোকে ঠিক জেনে যাবে।

আঁকাবাঁকা কথা চালাচালি হবে: রিসালদার করমের ছেলে বাপের মান ইজ্জত খেল। বাবা করে গেল, ছেলে উড়িয়ে দিল। চাঁদ স্বামীকে বোঝায়, পয়সা হাতের ধুলো। 'বাহেগুরু' যা করেন, ভালর জন্যেই করেন। ফসল উঠলে দু বিঘে জমি ছাড়িয়ে নিতে কতক্ষণ? সবই ভগবানের ইচ্ছে। রাজামহারাজকেও ভগবানের ইচ্ছেয় চলতে হয়। জাঠের কাছে মাটি সোনা, মাটি মা। মাটি যতই যন্ত্রণা দিক, মাটি ঠিক মায়ের মতোই; ছেলেকে কাছে ডাকে। আশীর্বাদ করে। একটাই কথা, মাটি বিক্রি কোরো না শুধু। আর যা-খুশি করো। না হলে, জমির দরকার কী? কাজের সময় যদি কাজে না লাগে? মাটি, বিপদের সময় সব চেয়ে বড় আশ্রয়। জমি হলো জাঠের মাথার মণি!

চাঁদের কথায় মল্লণ মনে বল পায়। লক্ষ্মীর বিয়েতে অত খরচের পর মোতির বিয়েতে হাত টান দেখালে ইজ্জত মাটি। লোকে, আত্মীয়স্বজনে, বদনাম করবে। বলবে, 'হাওয়া বেরিয়ে গেছে' — না, না, খাই না খাই, মাথা হেঁট করব না। দু বিঘে জমি — সে তো তিন-চার বছর খাটলেই ছাড়ানো যাবে। কেউ টেরও পাবে না, জমি বাঁধা ছিল। জমির দেখভাল তো তার হাতেই থাকবে। ভাল ফসলের ভাগ পেলে, ঝান্ডা কাউকে কথাটা বলতে যাবে না। মল্লণ আর একটা কথাও বলে, মেয়ের বিয়েতে খরচ না করলে, বলকারের বিয়েতে কোনও জাঠ পরিবারই বা অত খরচ করবে কেন? মেয়ের বিয়েতে যাই খরচ হোক, ছেলের বিয়েতে ঠিক উঠে আসবে।

পরের দিন সকালে ঘুম থেকে উঠেই মল্লণ মুকুন্দর দোকানে হাজির হয়। মুকুন্দ ঝান্ডা আর দুজন সাক্ষীকে ডেকে পাড়ায়। মুকুন্দ বলে, 'তোমরা ওপরে গিয়ে বসো। আমি কাগজকলম নিয়ে যাচ্ছি।'

ওরা ওপরে ওঠার সিঁড়িতে পা দিতে, মুকুন্দ দোকানের কাজ করা ছেলেটিকে তামাক সাজতে বলে। হুঁকোতে নতুন একটা টিকে ধরিয়ে, সে-ও ওদের সঙ্গে ওঠে। ঝান্ডা পাশে পাশেই থাকে। শুনিয়ে শুনিয়ে বলে, 'আমি তিন এনেছি। তুমি পাঁচ যোগাড় করেছ?'

মুকুন্দ জবাব দেয়: 'হ্যাঁ।' একটু পরেই কাগজপত্রে লেখাজোখা হয়ে যায়। মল্লণ ঘাড় গুঁজে চারপাইয়ের ওপর বসে থাকে। সাক্ষী দুজন আড়চোখে তাকায়। ঝান্ডা খদ্দরের পাঞ্জাবির ভেতরে পরা বেনিয়ানের পকেট থেকে টাকা বের করে। দাড়ি চুলকোয়— মল্লণকে দেখে। মুকুন্দ লেখে, দশ টাকা হারে সুদ জুড়ে টাকার পরিমাণ আট হাজার আটশো। 'এতদ্দ্বারা ঝান্ডার নিকট মল্লণ কৌর তাহার দুই বিঘা জমি — টাহলির জমি বন্ধক দিতেছে' ইত্যাদি ইত্যাদি, মুকুন্দ লিখেছে। তারপরই সব টিপসই মেরে দেয়। 'লিপিকার' হিসেবে মুকুন্দ নিজের নাম আগেই লিখে রেখেছিল। ঝান্ডার কাছ থেকে তিন হাজার নিয়ে, তার সঙ্গে পাঁচ হাজার দিয়ে মুকুন্দ টাকা গুনে গেঁথে মল্লণের হাতে তুলে দেয়। মুকুন্দর দেওয়া মোটা সুতলি দিয়ে মল্লণ নোটের বান্ডিল বেঁধে ফেলে। চাদরটা ভাল করে জড়িয়ে নেয়, তারপর সাক্ষী দুজনের সঙ্গে বেরিয়ে যায়। ঝান্ডা আর মুকুন্দ পরস্পরের দিকে তাকিয়ে হাসে। অর্থব্যঞ্জক হাসি।

বাড়ি ফিরে মল্লণ নোটের বান্ডিল চাঁদকে রেখে দিতে বলে। সিন্দুকে টাকা রাখতে রাখতে চাঁদ বলে, 'যাক, এবার নিশ্চিন্ত হয়ে কাজ করা যাবে।'

মল্লণ হাসে। প্রাণহীন শুকনো হাসি। জবাব দেয়, 'এখন ভগবানের কৃপায় কাজটা ভালোয় ভালোয় হলে বাঁচি। পরে যা হবার হবে।' সেদিন আর মল্লণ খেত দেখতে যায়

না। টাহলির খেতে জলসেচের কাজ চলছে। একজনের কাজ। একজন মজুর আছে অবশ্য। দুপুরের দিকে মল্লণ আসে ভাইরূপার খেতে। কিছু চারা কেটে মাথায় তুলে নেয়। সঙ্গে তেজুর দুই ছেলেও থাকে। ছোট চারার বোঝা ওরাই বয়ে দেয়। বাড়ি ফিরে মল্লণ উঠোনে অস্থিরভাবে পায়চারি করে। এক সময় বাবার ঘরে ঢুকে পড়ে। বিয়ের কথা করম আগেই শুনেছে। ছেলেকে জিজ্ঞেস করে, 'কীরে, আর কতদিন বাকি?'

'এক মাসেরও কম।' চারপাইয়ে বসতে বসতে মল্লণ জবাব দেয়।

'তা বেশ। খরচখরচা ঠিক মতো করিস। জাঁকজমকেরও দরকার আছে।' রিসালদার ছেলেকে উৎসাহী করে।

'সে তুমি ভেব না। আমি ঠিক সামাল দেব।'

'কেনাকাটা হয়ে গেছে?'

'সোনাদানা হয়ে গেছে। কাপড়চোপড় বাকি আছে।'

'কোথা থেকে আনবি? রামপুরা? তা বেশ। তবে পাগলের মতো খরচ করবি না। দেখে শুনে বুঝেসুঝে খরচ করিস। লোকের কথায় কান দিসনি — ওদের মন কোনও দিনই পাবি না।'

'টাকা তো বুঝেসুঝেই খরচ করতে হবে। কোনও রকমে টাকার যোগাড় করেছি।'

'কীভাবে করলি?'

মল্লণ উত্তরটা এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। করম আপন মনে বলে, 'তেমন বুঝলে পিঁয়াজ দিয়ে বেনিয়াদের কাছ থেকে টাকা নিস। ওরা এসব বলাবলি করে না। কিন্তু জমি বাঁধা দিসনি—'

'কী যে বলো! জমি থাকলেই বাঁধা পড়ে। জমি কে বাঁধা দেয় না, শুনি?'

মল্লণ বলেই ফেলে, 'পিঁয়াজে ছ হাজার নিয়েছি মুকুন্দর কাছ থেকে। আট হাজার নিয়েছি ঝান্ডার কাছ থেকে দু বিঘে জমি বাঁধা দিয়ে। . . . তবে, তুমি কিছু ভেবোনা, দু বছরের মধ্যে আমি জমি ছাড়িয়ে নেব।'

'কোনটা দিলি? ভাইরূপার না— '

'টাহলির।'

এরপর মল্লণ বিয়ে সম্পর্কে আরও অনেক কথা বলে যায়। করম হ্যাঁ হুঁ জবাব দিয়ে যায়। গুম মেরে বসে থাকে। জ্যোতি ঠাকুর্দাকে রুটি দিয়ে যায়। কিন্তু, অর্ধেক রুটি খাওয়ার পর করম আর খায় না। আলু কপির তরকারি করমের খুব প্রিয়। পুত্রবধূ ও নাতনিদের আলাদা করে বানাতে বলত। আজ সেই তরকারিও পড়ে থাকে। লোটার জলে হাত ধুয়ে, মুখে কুলি করে, গামছায় হাতে মুছে করম অস্ফুটভাবে বলতে থাকে, 'বাহেগুরু, বাহেগুরু।' খাটিয়ার ওপর শুয়ে পড়ে সে। পুরনো দিনের কথা মনে পড়ে। পেনশন পেয়েই দশ বিঘে জমি কিনতে কত ঝঞ্ঝাটই না পোয়াতে হয়েছে। ফৌজি চাকরির সব টাকা জমিতে ঢেলেছিল। ঘরের জিনিসপত্র সব বাঁধা রাখতে হয়েছিল। জঙ্গল-আগাছাভর্তি এবড়ো-খেবড়ো জমি — ড্যালা ড্যালা পাথর কাঁকর। দু বছর মেহনত করতে হয় জমিটাকে বশে আনতে। টাহলির খেত যেন তার নিজের শরীর থেকে জন্ম নিয়েছে। সেই খেতের জমি

বাঁধা দিয়ে মল্লণ রিসালদারের একটি অঙ্গ যেন ছেদন করেছে। সারা জীবন এই জমির সঙ্গে তার মনপ্রাণদেহ জড়িয়ে আছে। জমি বাঁধা পড়লে আর ফেরত আসে না। জাঠের প্রয়োজন শেষ, জমিও শেষ। শুধু সুদ বেড়ে যাবে— এমনকী লাগোয়া জমিও হাত ছাড়া হয়ে যাবে বন্ধকী জমির সঙ্গে। এইভাবেই পুরো খেত একদিন হাতছাড়া হয়ে যায়। রিসালদার ছবিটা যেন পরিষ্কার দেখতে পায়। টাহলির দশ বিঘেই মল্লণের হাত থেকে চলে যাবে; ভাইরূপার ছ বিঘের মালিকানা হয়তো টিকে থাকবে। অদৃশ্য এক শয়তান যেন রিসালদারের শরীরটা কুরে-কুরে খায়। পরের দিন সে আর বিছানা ছেড়ে ওঠে না। জ্যোতি অনেক ডাকাডাকি করায় একটু চোখ খোলে। এমনিতে সবার আগে তার ঘুম ভাঙে। প্রাতঃকৃত্যাদি সেরে দাঁতন করে। ততক্ষণে চা হয়ে যায়। আজ কিন্তু সে চোখ বুজিয়ে, নির্জীব অসাড় হয়ে বিছানায় পড়ে থাকে।

আট

প্রত্যেক দিনই একটা লরি যায় রামপুরার দিকে। সাধারণত সকল ছটায় ছাড়ে দয়ালপুরা থেকে। ভাইরূপা কোটে বুর্জগিল্লা হুকুমসিং সাধনিয়া হয়ে যায় ফুলে। ফুল থেকে রামপুরামন্ডি বারোটার আগেই পৌঁছে যায়। আবার বিকেল চারটেয় রামপুরা থেকে ছেড়ে রাতের দিকে ফিরে আসে দয়ালপুরা। লোকের বেজায় কাজ দেয় লরিটা। ঘর সংসারের জরুরি জিনিসপত্র কেনার জন্য, সব গাঁ থেকেই এই লরিতে লোক ওঠে। সকালে বেরিয়ে রামপুরায় গস্ত করে রাতে ফিরে আসে। মেয়েরা একা-একাই যায়। জিনিসপত্রে লরি বোঝাই হয়ে যায়। নিজের নিজের গ্রামে এসে যে-যার মালপত্র নিয়ে নেমে যায়। ড্রাইভারের পেছনে একটা ছোট কেবিন— দুটো ফালি বেঞ্চ পাতা। এটা শুধু মেয়েদের বসার জন্যে। লরির পেছন দিকেও দুটো লম্বাটে বেঞ্চ আড়াআড়ি করে পাতা পুরুষদের জন্যে। বেঞ্চের নিচেও লোক গাদাগাদি করে বসে। দয়ালপুরা থেকে লরিটা ঠিক সময়ে ছাড়লেও, রামপুরা থেকে দয়ালপুরায় কখন ফেরে তার ঠিক থাকে না। কেননা, লরি ঠেসে ভর্তি না হওয়া অবধি ড্রাইভার লরি ছাড়ে না। সাধনিয়া থেকে দয়ালপুরার রাস্তাটা বালিভর্তি কাঁচা রাস্তা। গ্রামের আশপাশ কাটিয়ে লরিটার চাকা মাঝে-মাঝেই বালিতে আটকে যায়। যাত্রীরা নেমে ঠেলাঠেলি করে।

মল্লণ আর চাঁদ দিন দুই পরেই কাপড়চোপড় কিনতে যাবে। এখন কিনবে চিনি আর ঘি। কন্ট্রোলের যুগ— বাজার থেকে কখন কোনটা উধাও হয় আন্দাজ করা যায় না। লরিটা সকাল সাতটায় কোটেতে আসে। হাজার দুয়েক টাকা নিয়ে ওরা লরিতে উঠে বসে। প্রীতমের গাড়িও সেদিন রামপুরা যাচ্ছে দুই তিন পরিবারের গম নিয়ে। চার বস্তা অবশ্য প্রীতমের। মল্লণের সঙ্গে প্রীতমের কথা হয়, ফেরার পথে প্রীতম ঘিয়ের টিন আর দু বস্তা চিনি নিয়ে আসবে।

রামপুরায় এসে মল্লণ প্রথমে যায় গ্রামের সেই আড়তদারের কাছে। গমের বস্তা তার দোকানে থরে-থরে সাজানো। আর এক জায়গায় ছোলার বস্তা। অনেকে আবার এ-সময়ে

আনাজও বেচে। বড়লোক জাঠেরা ঝড়তিপড়তি গম অভাবী জাঠেদের কাছে বেচে দেয়। তারা আবার সেই গম চড়া দামে 'ছোট' জাতের লোকের কাছে বেচে। মধ্যবিত্ত জাঠেদের অল্পবিস্তর গম বাঁচলেই তারা বাজারে ছোটে বেচতে। আনাজ বিক্রির ঝামেলায় যায় না। বেনিয়ারা ওই সময় যার কাছ থেকে যা পায়, লুটেপুটে নেয়। নগদ টাকার লেনদেনে এই সুবিধেটা বিরাট।

খোলা বাজারে ঘি চিনি নেই। কালোবাজারের ঘাঁতঘোত বেনিয়াদেরই হাতে। আড়তদার বিরস মুখে বলে, 'মাল নেই— কোথায় পাব?' মল্লণ আর চাঁদ অনুরোধ জানাতে, সে মুখ কাঁচুমাচু করে জবাব দেয়, 'আচ্ছা, দেখি।' একটু বাইরে থেকে ঘুরে এসে বলে, 'কাজ হয়ে গেছে। গাড়ি নিয়ে এসো।'

মল্লণ প্রীতমকে খুঁজে আনে। দোকানের পেছনে এসে গাড়িটা দাঁড়ায়। ঘিয়ের টিন ওঠে। আড়তদার বলে, 'একটা কাপড় বিছিয়ে দাও মালের ওপর। এখানে আর দাঁড়িয়ে থেক না।' চিনির বস্তাও উঠে গেছে। যোগানি আড়তদার টাকা গুণে নেয়।

প্রীতম আগেই তার জিনিসপত্র কিনে রেখেছিল। কেননা, লরির আগেই তার গাড়ি রামপুরা পৌঁছে যায়। গমের বস্তা দিতে দোকানিদের বিশেষ সময় যায়নি। মল্লণ — চাঁদও এবার প্রীতমের গাড়িতে উঠে পড়ে। বেকার লরি ভাড়া গুনে লাভ কী? আড়তদারের কথাবার্তা চালচলন স্বামী-স্ত্রী নকল করতে করতে এগোয়। সবাই হেসে ওঠে।

গোরুর গাড়ি সন্ধ্যের দিকে গ্রামে পৌঁছয়। ওরা এসেই শোনে করমের অবস্থা খুব খারাপ। সকালে একটু চা খেলেও, দুপুরে বিছানা থেকে একেবারে উঠতে পারেনি। জ্যোতি রুটির থালা যেমন এনেছিল, তেমনই আছে। বিকেলের চা-ও খায়নি। জ্যোতি-মোতি ঠাকুর্দার হাত-পা ধরে নাড়িয়ে ডাকাডাকি করেছে — হয়তো সামান্য চোখ খুলে তাকিয়েছে কিন্তু হাত অবশ হয়ে পড়ে গেছে। মল্লণ আর চাঁদ আস্তে আস্তে করমের কামরায় ঢোকে। করম খুবই ধীরে নিঃশ্বাস নিচ্ছে। চোখ খোলা কিন্তু শূন্যদৃষ্টি। 'বাবা!' মল্লণ ডাক দেয়। সাড়া মেলে না। মল্লণ ছুটে গিয়ে গাঁয়ের কবিরাজকে ডেকে আনে। কবিরাজ বাতাসাসহ 'অমৃতধারা' ওষুধ দিলেন, সুগন্ধি ধূপ জ্বালাতে বললেন। দু জন পায়ে দিশি ঘি মালিশ করতে বসে গেল। বুকেও ঘি মালিশ হলো। একটু যেন স্বাভাবিক ছন্দে নিঃশ্বাস পড়ে।

সেদিন রাতে আর রান্না হয় না। পাড়াপড়শিরা জেগে বসে থাকে। বুড়োবুড়িরাও সমানে জেগে থাকে। রিসালদারের স্বভাব কত ভাল— এই নিয়ে আলোচনা চলে। এইভাবেই রিসালদার করম সিংহ শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে। মেয়ে বউরা বিলাপ করে ওঠে। মল্লণের পায়ের নিচে জমি টলমল করে কেঁপে ওঠে। জ্যোতি-মোতি কান্না জুড়ে দেয়। তারপরই সব চুপ। মৃতদেহটি খাট থেকে নামিয়ে জমির ওপর রাখা হয়। কাঠ আসে। দরজার কাছে দু জন কাঠ চেরাই করে। আত্মীয়স্বজনের কাছে লোক চলে যায় খবর দিতে। দুপুরে সবাই এসে পড়ে। দাহ শেষ হয়।

খবর পেয়ে মারাঝের গুরুদেবও আসে। মল্লণ জানিয়ে দেয় বিয়েটা অন্তত দু মাস স্থগিত রাখতে। গুরুদেবও আসলে ওই একই কথা বলতে এসেছিল। এই অবস্থায় বিয়েটা সম্ভব নয়, দু পক্ষেরই এটা জানা। কয়েকদিন পর ধুরকিটে গিয়ে গুরুদেব তারিখটা পিছিয়ে দেয়। তেসরা ফাল্গুনের বদলে দশই আষাঢ়। মল্লণ বিশেষ চিন্তা না করেই তারিখ পিছোবার কথা জানিয়েছিল।

কিন্তু গুরদেব খতিয়ে দেখে দু মাস পিছিয়ে বৈশাখ বেজায় ব্যস্ত মাস। আষাঢ়ী-ফসল কাটার সময়। জৈষ্ঠ্য মাসে সময়ের টানাটানি, গম তোলার কাজে সব ব্যস্ত থাকে। তাছাড়া, কাপাস চাষেরও তোড়জোড় চলে ওই মাসে। ধুরকিটের কুটুম এটাও অবশ্য বোঝে, বাবার ক্রিয়াকর্ম সারার পর মেয়ের বিয়েতে খরচ করার মতো টাকা মল্লণের পক্ষে যোগাড় করা সহজ হবে না। একটু ফাঁক পেলে, মল্লণ খোলা হাতে খরচ করবে। ধুরকিটওয়ালাদের লাভই হবে তাতে। যার জন্যে দশই আষাঢ় অবধি বিয়েটা মুলতুবি রাখা হলো।

গুরু গ্রন্থসাহেব-এর আনুষ্ঠানিক পাঠ আরম্ভ হয়। চুনকামে ঝকঝকে ঘরের দেওয়াল। ফরাসে বসে শ্রোতারা 'পাঠ' শোনে। গাঁয়ের লোকজন সারাদিন ধরেই আনাগোনা করে। প্রত্যেকেই চা-পানে আপ্যায়িত হয়। শ্রাদ্ধের দিন যেন বিয়ে বাড়ির আবহাওয়া। গরিবগুরবোদের জন্যে ভাতের ঢালাও বন্দোবস্ত। হালুইকর ডেকে বানানো লাড্ডু পকৌড়া থেকে কোনও মুখরোচক খাদ্য বাদ নেই। গ্রন্থসাহেব-এর ভোগ দেওয়ার আগে গ্রামের সমস্ত ব্রাহ্মণকে ডেকে ব্রাহ্মণভোজন, প্রত্যেক বাড়িতে আটটি করে লাড্ডু, মুগের ডাল, আলু-ছোলার তরকারি, চারটি করে রুটি পাঠানো হয়। গাঁয়ে বামুন ছিল চল্লিশ ঘর। ওরা রোজই শ্রাদ্ধবাড়িতে এসে থলি ভর্তি করে ফিরত। ব্রাহ্মণ একাই নয়, তার বাড়ির সব ছেলেমেয়ে বুড়োবুড়ি মেয়েবউ কাচ্চাবাচ্চা— সবাই জন্যে হতো প্রাত্যহিক মাগনা ভোজে। প্রত্যেক বাড়িতে চারটি করে লাড্ডু— অর্থাৎ চারশোর বেশি লাড্ডু বিতরিত হয়। ভোগের দিন সারা গাঁ ঝেঁটিয়ে লোক আসে। প্রসাদ-লাড্ডুর প্যাকেটে নিয়ে যায় জনে জনে। আত্মীয়স্বজনদের লাড্ডু দিতে হয়েছে দাঁড়িপাল্লায় ওজন করে-করে। কোটের চৌহদ্দি পার হয়ে করমের শ্রাদ্ধ শ্রদ্ধাসহকারে আলোচিত হতে থাকে। 'মল্লণও ধর্মাত্মা পুণ্যাত্মা; সঙ্গে তো কেউ কিছু নিয়ে যাবে না পুণ্যি ছাড়া! ছেলেমেয়ে কেউ সঙ্গে যাবে না, হেঁ হেঁ। . . .' 'সব মালকড়ির ব্যাপার। এসব কী আর ছাঁপোষা গরিবগুরবোদের ব্যাপার রে, ভাই?' এর মধ্যে অন্য কথাও চালাচালি হয় : 'মল্লণ সাদাসিধে লোক। ওই শালা ঝান্ডাকে দেখ, পরের মাথায় কাঁঠাল ভেঙে দিব্যি চালাচ্ছে। চোরের হদ্দ একেবারে!'

কথায় কথা বাড়ে : 'আরে বাবা নাক বাঁচিয়ে আর কদ্দিন? একদিন নাকটাই ভেঙে যাবে! মেয়ের বিয়ে তো শিরে সংক্রান্তি, তারপর ছোটটা আছে। দম ফুরিয়ে যাবে, দেখো!'

মল্লণের কাছে যে আট হাজার টাকা ছিল, বাবার কাজকর্মে তা শেষ হয়ে যায়। মেয়ের বিয়ের কথা নতুন করে ভাবতে হয়। খেতমজুর তেজুকে নিয়ে মল্লণ যায় টাহলির খেতে। চুপচাপ গমের চারার তদারক করে। মাঝে-মাঝে দু একটা কথা হয়। তেজু ভাবে : জমি থেকেও লোকের সুখ নেই। জমিজমার সুখ সব ওপর-ওপর। ভেতরে সব ফাঁকা। এই যে রিসালদার — কী হলো শেষ অবধি? খেতের দফা রফা। সামনের বছর হয়তো অন্য কারওর সঙ্গে কাজ করতে হবে। তেজু মনে মনে আন্দাজ করার চেষ্টা করে, আষাঢ়ী ফসলের কতটা তার ভাগে আসবে। মল্লণও একই কথা ভাবে : 'তেজু—কত গম আসবে — মনে হয়?' তেজুর খেতের সব দিকে নজর চালিয়ে জবাব দেয়, 'এখনই কিছু বলা যায় না।' তেজু দশ বিঘে জমির হিসেব করে। ওর ভাগ আসবে দশ বিঘে থেকে। মল্লণ করে আট বিঘে জমির হিসেব। একটা অন্তর্জ্বালা অনুভব করে। বাবা মারা না গেলে আষাঢ়ী-ফসল বেচে দু বিঘে ছাড়িয়ে নিত। পিঁয়াজ দিয়ে মুকুন্দর কাছ থেকে কিছু টাকা নিত। তাতে এই বছরটাতেই যা একটু কষ্ট হতো। বাবার শ্রাদ্ধে যে আট হাজর খরচ হয়েছে, তাতো

মোতির বিয়ের জন্যেই রাখা ছিল। পাখি উড়ে যায় একবারেই। আষাঢ়ী ফসলে দু-বিঘে না ছাড়ালেও, মুকুন্দকে আধা টাকা দিয়ে অন্তত ভারমুক্ত হতো কিছুটা। কিন্তু এখন, না এস্‌পার, না ওস্‌পার। ছুঁচো গেলা অবস্থা!

তেজু অনেক কিছু বলে চলে। মল্লণ তার কিছু শোনে, কিছু শোনে না। মনের মধ্যে আগুন জ্বলে। হঠাৎ বলে বসে, 'আরে পয়সায় কী হয়? পয়সা তো খরচের জন্যে। তবে হ্যাঁ, খরচ করতে গেলে বুকের পাটা চাই! জমি বাঁধা দিয়েছি কী করতে? জমি থাকতে কেন আমি ন্যাংটা ঘুরব? বাবার শ্রাদ্ধে এই-যে খরচ করলাম, কোন শালার মাজাল আছে তার বিরুদ্ধে কিছু বলে, য়্যাঁ! আমি মল্লণ সিং, দুটো বাবা মরলেও মেয়ের বিয়ে কীভাবে হয়, দেখিয়ে ছাড়ব! পয়সা তো শালা হাতে ময়লা—'

মুখে যতই সাহস দেখাক, মল্লণের মনের মধ্যে কিন্তু অস্বস্তি থেকেই যায়।

নয়

রিসালদার মারা গেছে খবর পেয়ে ঝান্ডা সঙ্গে-সঙ্গে ছুটে এসেছিল। দাহ-সৎকারের কাজ না হওয়া অবধি সর্বক্ষণ হাজির ছিল। ছোটখাট কাজে হাত লাগানো, ফাঁকে-ফাঁকে পরামর্শ, লোকজনকে আদর আপ্যায়ন— সবই অল্পস্বল্প করে গেছে। শ্রাদ্ধের আগের দিন মল্লণকে নিভৃতে বলে, 'মল্লণ, মন ছোটো কোরো না। বাড়ির ইজ্জত সবার আগে। আমি আছি — টাকাকড়ির দরকার হলে বলবে। যেখান থেকে পারি আমি টাকা এনে দেব। তোমার কাজ আটকাবে না।'

মল্লণ জবাবে বলে, 'না, ভাই। টাকা এখন আমার হাতে আছে। কিছু বেঁচেও যাবে হয়তো। কিন্তু সামনে মেয়ের বিয়ে, তখন—'

'সে-সব ভেব না। এত আমাদের ঘরের ব্যাপার। যত চাইবে, তত এনে দেব।'

ফাল্গুন কাটতেই মেয়ের বিয়ের চিন্তায় মল্লণ অস্থির হয়ে ওঠে। টাহলির খেত গমে ভরপুর। প্রাচুর্য দেখে মন ভরে যায়, আবার মন খারাপ হয়ে যায়। সবই তো দিয়ে দিতে হবে। না দিলে, সারা বছরটা সুন্দরভাবে কাটত। ঘরে এখন পয়সা খরচ হচ্ছে জলের মতো। বাবা মরেই সব মাটি করে দিয়েছে, নইলে কোন্ শালা এমন দেনদার থাকত? মল্লণ মনে মনে হিসেব কষে। আষাঢ়ে বিয়ে —কিছু গম রেখে, বাকিটা বেচে দেবে। তাতে বিয়ের খরচ উঠে আসবে। মেয়ের কাপড়চোপড় কেনার জন্যে লাগবে হাজার চারেক। কার কাছ থেকে নেবে? এক বিঘে আবার বাঁধা? মুকুন্দকে পিঁয়াজ গছিয়ে? ও শালা তো পিঁয়াজে টাকা দেয়। আগের আট হাজার মুকুন্দ পিঁয়াজের বিনিময়ে দিয়েছে। আরও চার হাজার নিলে, ব্যাটা তো শেকড়শুদ্ধু পিঁয়াজ তুলে নেবে! উঁহু, তার চেয়ে এক বিঘে জমি বাঁধা রাখাটাই ভাল। ছোটটা— জ্যোতির বিয়ে কবে হবে, ঠিক নেই। ওর বিয়ের আগেই বরং তিন বিঘে ছাড়িয়ে নেবে। সোজাসুজি রোজগার যা হবে, তাতেই জ্যোতির বিয়েটা সেরে ফেলতে হবে। বাস্তুভিটে বেচছি না— পরোয়া কী?

চৈত্রমাস। না-গরম না-ঠাণ্ডা আবহাওয়া। গম বেড়ে উঠছে, বালির মধ্যে মুক্তোর মতো দানা পাকছে। বাড়িতে বউঝিরা দরজা দেওয়াল লেপেমুছে নিকিয়ে রাখে। ভোরের হাওয়াটা চমৎকার ঝিরঝিরে। গমের রঙ দেখে চাষির চোখ জুড়োয়। বছরটা ভাল যাবে। গোলা ভরে যাবে গমে। মল্লণ কিন্তু বিমর্ষ: বুকটা যেন ফেটে যায়। ঝান্ডার বাড়ি গিয়ে দেখে, গৌদি বামুন আগেই এসে গেছে। গৌদি এখানে কেন? কাঁধে লাল গামছা, কপালে তিলক, পরনে কোরা ধুতি। পৈতেটা ছুঁয়ে কী যেন বলছিল ঝান্ডাকে। মল্লণকে দেখে চুপ করে যায়। ঝান্ডা সহর্ষে আহ্বান জানায়, 'মল্লণ যে, এসো, এসো।'

'তোমরা কথা বলে নাও — আমি আসছি।' মল্লণ রান্নাঘরের দাওয়ায় বাস্তির কাছে গিয়ে বসে। বাস্তি হরদিতের মেয়েকে গল্প শুনিয়ে-শুনিয়ে খেলাচ্ছিল। হরদিতের বউ দয়ালি সকালের খাওয়া বানিয়ে রেখেছে। বাস্তি মল্লণকে কুশল জিজ্ঞেস করে। বাড়ির খবর নিয়ে বলে, 'তা আজ এত সকালে?'

'ঝান্ডার সঙ্গে একটু কথা ছিল। গৌদি—'

'গৌদিতো সক্‌কাল থেকে বকবক করে যাচ্ছে! বীজের ব্যপারে এসেছে। কালী পুজোর সময় দু-বোরা নিয়েছিল। এখন বোধহয় আরও চায়।'

গৌদি কখন উঠবে ধরা যাচ্ছে না। মল্লণ উঠে পড়ে। দুপরে আসা যাবে বরং।

দুপুরে আসতে ঝান্ডকে একা পাওয়া যায়। হরদিৎ বাড়ি নেই। মল্লণ কথাটা পাড়ে, 'বিয়েটা তো দশই আষাঢ়। হাতে সময় বিশেষ নেই। খাওয়াদাওয়ার খরচা আমি সামলে নেব। কেননা তার আগেই গম উঠছে। বিয়ের কাপড়চোপড়ের জন্যে হাজার পাঁচেক লাগবে। আমি বলি কি, পিঁয়াজ কিংবা এক বিঘে জমি—'

'তোমাকে তো আগেই বলেছি ভাই, পিঁয়াজ-টিয়াজ বেনিয়াদের ব্যাপার। তুমি বরং জমির কথা বলো।'

'এক বিঘে—'

'একটা কথা ভাই। তুমি বোঝদার লোক, নিশ্চয়ই বোঝো এক বিঘেতে পাঁচ হাজার হয় না। প্রথমবার তোমাকে দু বিঘেতে আট — একটু বেশিই দিয়েছিলাম। স্পষ্ট করে বলিনি তখন, কিন্তু এবারে তো তা হবে না, ভাই! . . . আমি বলি কি এখন দুই, আরে আগের দুই অর্থাৎ চার বিঘে এক কাট্টা করে পাঁচ নাও।'

'দু বিঘে পাঁচ হাজার!'

'আগে তো আট নিয়েছ দু-বিঘেতে। এখন পাঁচ নাও— এতে এমনকী আর উনিশ বিশ হচ্ছে?'

মল্লণ আর কিছু বলে না। বুকটা হু হু করে ওঠে। টাহলির খেতের অর্ধেকটা চলে গেল। ভেবে লাভ নেই, মেয়ের বিয়ে তো ভাঙা যায় না। আবার, এই পাঁচ হাজারই বা পায় কোথায়? এখন ভেঙে পড়লে চলবে না। যা হবার তাই হবে। মল্লণ মনে সাহস আনার চেষ্টা করে। ঝান্ডাকে জবাব দেয়, 'তাই সই। দু বিঘেই লিখে দেব।'

'একটা কথা— একটু খারাপ শোনাবে। টাকাটা তো আমার কাছে নেই। কোনও বেনিয়াকে পিঁয়াজ গছিয়ে, মুকুন্দ কিংবা কোনও আড়তদারের কাছ থেকে, কিংবা কালী

চোরের কাছ থেকেও আমি টাকাটা নিতে পারি। সুদ কিন্তু ভাই শতকরা দশ আর বাটা দিতে হবে। বীজ ফেলার সময় তুমি যে ছ মন গম নিয়েছিলে, ওটার দামও আমি এর মধ্যে জুড়ে দিচ্ছি—'

'টাকাটা কবে পাব?'

'পরশু। কালই আমি রামপুরা যাচ্ছি।'

তিন দিনের মধ্যে লেখাপড়া হয়ে যায়। টাহলি খেতের চার বিঘে ঝান্ডা কবজা করে নেয়। প্রথম খেপের আট হাজার আট শ, এখন পাঁচ হাজার পাঁচশ, গমের বীজ বাবদ দুশো— সব মিলে সাড়ে চোদ্দ হাজার। দু বিঘে জমির বন্ধকী কাগজ খারিজ করে, চার বিঘের নতুন বন্ধকী-দলিল হয়ে যায়। পঞ্চাশটা নীলচে করকরে নোট মল্লণ খুঁটে বেঁধে বাড়ি ফেরে। তারপর চাঁদের সঙ্গে আলোচনার বসে কেনাকাটা নিয়ে। বন্ধকী জমির দাম গাঁয়ে বিশেষ নেই। চার বিঘের জন্যে ঝান্ডা একটু বেশিই দিয়েছে, ইচ্ছে করেই দিয়েছে কেননা সে জানে মল্লণ কিছুতেই এটা একসঙ্গে শোধ করতে পারবে না। জমি বাঁধা পড়লে, সে জমি জীবনেও কেউ ছাড়াতে পারে না। বন্ধকীর শর্ত কড়া হলে তো কথাই নেই। টাহলির খেত এমনিতেই বেশ ভাল। সরেস মোলায়েম জমি, সেচের জলও পাওয়া যায়। ফসল হয় সোনার মতো। ঝান্ডার ফন্দিফিকির একই। টাকা তার কাছে প্রচুর আছে। তবে বাড়িতে রাখে না। রাখে মুকুন্দ বেনিয়ার কাছে। মুকুন্দ টাকাটা খাটায়, আর ঝান্ডার দরকার হলেই টাকা বের করে দেয়। আশপাশের লোকের ধারণা, ঝান্ডা নিশ্চয়ই মাটির নিচে টাকা পুঁতে রাখে! নইলে এত জমি কেমন করে বাঁধা নেয় ফটাফট টাকা বের করে? — কেউ বলে, টাকায় টাকা বাড়ে। ভাইয়ের জমিটা পেয়েছে মাগনায়— দশ বিঘে হয়ে গেছে বিশ বিঘে। তার ওপর একন কাঁড়ি-কাড়ি জমি বাঁধা নিচ্ছে। সারা খেতের ফসল বাড়িতে ওঠে, খাওয়ার লোক নেই!

আর একজন বলে, ফততুর সোনাদানা সব ঝান্ডার কাছে আছে। ফততু ছিল গন্ধের কারবারি। মা, চার বউ দুই ছেলে— একজন পাটোয়ারি, অন্যজন দারোগা। দাঙ্গার সময় তিন মেয়েই খুন হয়ে যায়। মেয়েদের সব গয়না ফততু ঝান্ডার কাছে রেখেছিল। বলেছিল, 'বেঁচে থাকলে নেব — না-হলে ওগুলো তুমিই রেখে দিও।' ঝান্ডা জবাব দিয়েছিল, 'ফতেউদ্দিন তোমার আমানত আমি রেখে দিচ্ছি— যেদিন খুশি নিয়ে যেও।' সেই দিনই মাঝরাত্তিরে ফততু গাঁ ছেড়ে চলে যায়। ঝান্ডা আগে থেকেই লোকজন ঠিক করে রেখেছিল। ভাইরূপার হাট অবধি ফততু পেরোতে পারেনি, তার আগেই তাকে সব কুপিয়ে শেষ করে দেয়। সেই থেকে ফততুর সব সোনাদানা ঝান্ডার কাছেই আছে।

দশ

গৌদি শেষ অবধি আড়াই মনের দুটো বস্তা নিয়ে ওঠে। পাঁচ মন নিয়েছিল দেওয়ালির সময়। এখন আরও পাঁচ মন। নতুন গম দু-মাস অবধি রাখা যায়। পেটের কথাটা ভাবতে হয়। ঝাণ্ডার পরামর্শেই গৌদি দু-বিঘে বাঁধা দিয়েছিল ফৌজি মিলখার কাছে। বীজের দানা তাই সে ঝান্ডার কাছেই চাইতে এসেছে। যার কাছে জমি বাঁধা, তাকেই বীজ দিতে হচ্ছে। মিলখা জাঠ হিসেবে খুবই নিরীহ লোক। অল্প-স্বল্প পয়সা জমিয়ে চার হাজারে দু বিঘে জমি বাঁধা নিয়ে, সে জমিটা দেয় ছেলে কর্নেলকে। দানা কেনার সামর্থ্য মিলখার নেই। মিলখার নিজের জমির পরিমাণও খুব অল্প। হাল চালায় ছেলে কর্নেল। ফৌজি পরিবার— তাই নিয়মশৃঙ্খলা ব্যাপারটা আছে। দু চার বিঘে ভাগ চাষ করায় সংসারের খরচ চলে যায়। বিশেষ অসুবিধে হয় না। অন্য কারও কাছ থেকে আনাজ-টানাজ নিতে হয় না। কারও কাছে কিছু চাইতে গেলে মিলখার একটু সঙ্কোচ হয়। বউ বেশ ভয়ের চোখে দেখে, ছেলের-ও বউয়ের সঙ্গে বনিবনা নেই। কর্নেলের স্বভাবটাও বাপের মতো।

গৌদির ছিল বারো বিঘে জমি। বাবা করত খেতমজুরি। ভালই দিন কাটত। গাঁয়ে জাঠ বেশি, ব্রাহ্মণ কম। গৌদির বাবার ব্রাহ্মণ হতে একটুও ইচ্ছে ছিল না। জাঠেদের কাছ থেকে হাত পেতে নিতে হবে, এটা সে ভাবতেই পারত না। যার জন্যে খেতের কাজে আগ্রহ ছিল বেশি। দুটো বলদ, একটা মোষ, নিজের শরীরটাও ছিল বেশ তাকতদার, যার জন্যে জমি সে কোনও দিন শক্ত হতে দেয় নি। নরম জমিতে ফসলও হতো ভাল। সবাই গৌদির বাবাকে বলত 'জাঠ ব্রাহ্মণ'। পৈতে লাগানো, কপালে তিলক— এ-সবের বালাই ছিল না। পায়ে মোটা চামড়ার জবরদস্ত জুতো, পরনে মোটা খদ্দর, মাথায় ফিনফিনে মলমলের সাফা— এই ছিল তার পোশাক। রাতে খাওয়ার পর গুড় মেশানো দুধের স্বাদ তার কাছে মনে হতো অমৃত। ঘি খেত প্রচুর, হাত দুটো ছিল লোহার মাতো মজবুত। নীরা গোষ্ঠীর ব্রাহ্মণ, গৌদি ছিল বাবার ঠিক বিপরীত। ফর্সা ধুতি, পপলিনের জামা, এক মুখ গোঁফদাড়ি, গেরুয়া পাগড়ি, পায়ে চটি, কপালে চন্দনের তিলক। পকেটে বিড়ির বান্ডিল আর দেশলাই। বসলেই বিড়ি ধরায়। কাঁধে লাল উড়ুনি, বগলে 'গোবিন্দবল্লভ'-এর জীর্ণ পুঁথি। এই হলো গৌদি। গৌদির বাবা ছেলেকে পাঠিয়েছিল বারনালার ঋষিকুল স্কুলে। ছেলে যাতে সংস্কৃত ভাষাটা শেখে। লেখাপড়া শিখে ছেলে পণ্ডিত হবে, এইটাই ছিল বাবার আশা। খেতমজুরি করলেও গৌদির বাবার মনে বোধহয় একটা চাপা দুঃখ ছিল। যার জন্য ছেলেকে পাঠায় ঋষিকুলে। বুঝে উঠতে পারেনি যে, তার সবে ধন নীলমণি গোবিন্দরাম ওরফে গৌদি দু কূলই ভাসাবে! পণ্ডিতও হতে পারবে না, চাষিও না। গোবিন্দরাম আগেই বুঝে নিয়েছিল, রামায়ণ-মহাভারত থেকে দু চর কথা বলতে পারলে, অনায়াসেই নিজেকে পণ্ডিত বলে জাহির করা যায়। মালকড়িও কামানো যায়। যার জন্যে, কোটেতে সে আজীবন 'ভিখিরি বামুন' থেকে গেল। বগলে পুঁথি নিয়ে, জাঠেদের বাড়িতে কিছু উঁকিঝুঁকি, তারপর মুষ্টিভিক্ষার বিনিময়ে দেদার অশীর্বাদ দান— এই ছিল তার কাজ। জমি থাকলেও ভিখিরি পেশা নিতে তার আত্মসম্মানে আটকায়নি।

গৌদির চার মেয়ে, এক ছেলে। বড় মেয়ের পরই ছেলে। তারপর, তিন মেয়ে। একটি মেয়ে, একটি ছেলে হলে ঝামেলা হতো না। আসলে, গৌদি পুত্রকামনায় এই দুর্ধর্ষ

পরীক্ষা চালিয়েছিল। ফল উলটো হতে সে ভগবানের ওপরই সব দায়িত্ব চাপিয়ে দিল। তিনি যা করেন নিশ্চয়ই ভালোর জন্যে করেন। ছেলে মেয়ে কাকে কী দেবেন— সবই তাঁর ইচ্ছে! তিনি তো আর অন্যের ইচ্ছেয় চলেন না। ছেলে মেয়ে — সবই তাঁর সৃষ্টি। কাজেই ওসব নিয়ে মাথা না ঘামানোই ভাল!

যথাসময়ে গৌদি চেয়েচিন্তে গয়নাগাটি যোগাড় করে চার মেয়েকে পার করে দেয়। গরিব ঘরেই অবশ্য। মেয়েরা বাপের বাড়ি এলে কিছু না কিছু নিয়ে আসে। প্রত্যেক বছরই কোনও-না-কোনও মেয়ে সন্তানের জন্ম দেয়, আর এক ফাঁকে কোটে আসে। এই সময় মেয়ে যাতে একটু বেশি উপহার-টুপহার পায়, সেদিকে গৌদির স্ত্রী নজর রাখত বিশেষভাবে। ব্রাহ্মণীর সময়টাও ভাল কাটত। গৌদি হঠাৎ একদিন ঠিক করে বসে, খেতের কাজ কিংবা পণ্ডিতি — দুটোই ফালতু; তার চেয়ে ছেলেকে লেখাপড়া শেখানো যাক। দশ ক্লাস ডিঙোতে পারলে নিদেনপক্ষে একটা 'অফিসারি' জুটে যাবে! চোখ বুজে লোকের গাঁট কেটে লুটেপুটে খাবে! ফলে, ব্রাহ্মণ পিতা গৌদির উৎসাহে শ্রীমান বদ্রিনারায়ণ গাঁয়ের পাঠশালায় তৃতীয়-চতুর্থ শ্রেণী, অষ্টম শ্রেণী ভাইরূপায় ও দশম শ্রেণীর পাঠ শেষ করে ফুলের হাইস্কুলে। গৌদি ছেলেকে একটা সাইকেল কিনে দেয়। সেই সাইকেলে করেই বদ্রি ফুলের স্কুলে যেত। সাধনিয়ার কাঁচা রাস্তায় সাইকেল কখনও সচল, কখনও অচল— সাঁকো পার হলেই পাকা রাস্তা। ক্লাস টেন পাশ করার পর বদ্রির ভীষণ ইচ্ছে হয় ভাটিন্ডা কিংবা মৌগার কোনও কলেজে ভর্তি হতে। কিন্তু, গৌদি ছেলেকে এখনই 'অফিসার' বানাতে চায়। ছেলেকে বলে, 'কলেজে পড়ে কী হবে? তোকে একটা চাকরি জুটিয়ে দিচ্ছি— দিব্যি আয়েসে থাকবি, য়্যাঁ'!

পায়ে চটি, কাঁধে উড়ুনি, কপালে তিলক— গৌদি এবার ছেলেকে নিয়ে নানা জায়গায় টুঁ মারতে শুরু করে। পকেটে সুগন্ধি এলাচ রেখে দেয়। তালেবর কোনও অফিসারের সঙ্গে দেখা হলেই হাত জোড় করে দাঁড়ায়। অফিসার সকৌতুকে তাকান, চেহারাটি নিরীক্ষণ করেন। খাঁটি ব্রাহ্মণ! অফিসার মৃদু হেসে জিজ্ঞেস করেন, 'বলুন, পণ্ডিত মশাই— আমি আপনার জন্যে কী করতে পারি?' গৌদি আশাবাদী হয়ে ওঠে, বিনয়ে বিগলিত হয়ে এলাচ এগিয়ে দেয়, 'হুজুর— এ আমার ছেলে বদ্রিনারায়ণ— যদি একটা চাকরি দেন— '

অফিসার এলাচ মুখে ফেলে এবার বদ্রিকে দেখেন, 'কদ্দূর লেখাপড়া?'

'আজ্ঞে, ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করেছি।'

অফিসার এবার ব্যস্ততার ভান করে কাগজপত্রে চোখ রাখেন। নেতিবাচক দু এক কথা বলেন। গৌদির অনুনয়-বিনয়ে কান দেন না। ক্রমাগত এই রকম হওয়ার ফলে বদ্রি বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। আমলাদের ওপর যত না রাগ হয়, তার চেয়ে বেশি রাগ হয় বাবার ওপর। কেন, এই জঘন্য অপমানজনক উমেদারি?

ক্ষুব্ধ বদ্রি এবার নিজে থেকেই ফরিদকোটের টিচার্স ট্রেনিং-এ ঢুকে পড়ে। মাস ছয়েক ভাটিন্ডার নানা জায়গায় ঘোরাফেরার পর জুতোর শুকতলা যখন ক্ষয়ে যায়, তখনই আচমকা একটা চাকরি পায় ভূনিরের কাছাকাছি ঘুড্ডু গ্রামে। বদ্রি প্রত্যেক শনিবার করে গ্রামে আসত। সোমবার ফিরে যেত ঘুড্ডুতে। সারা সপ্তাহ ওখানেই থাকত। গ্রামের

ধর্মশালার মধ্যে স্কুল। দুটি কামরা, লোহার গেট, খোলা উঠোন। উঠোনে বসেই ছেলেমেয়েরা পড়ে। গরমের দিনে বারান্দায় একটা কামরায় স্কুলের জিনিসপত্র, অন্যটিতে একটি টেবিল দুটি চেয়ার ব্ল্যাকবোর্ড গোটা চার পাঁচ বেঞ্চ। আলমারির মধ্যে স্কুল রেজিস্টার। বদ্রির খাট বিছানা এই প্রথম কামরায়। আলমারির মধ্যে চা বানাবার সরঞ্জাম। চিনির কৌটো চায়ের প্যাকেট দেশলাই কেরোসিনের বোতল স্টোভ। রুটি বানাতে হয় না। ছাত্র-ছাত্রীদের বাড়ি থেকে সকাল-সন্ধ্যে রুটি আসে। ক্লাস থ্রির ছেলেমেয়েদের এই দায়িত্ব। পালা করে রুটি দিয়ে যায়। সোমবার, ভোরের আলো ফোটার আগেই বদ্রি সাধনিয়ার সাঁকোয় পৌঁছে যেত; ওখান থেকে টাঙ্গায় রামপুরা, তারপর ট্রেন ধরে মানসায়। সাইকেল রাখা থাকত মানসায়। মানসা থেকে ভূনির-শার্দূলগড়ের রাস্তা ধারে চলে আসত ঘুড্ডুতে। এতটা পথ, দেরি হতো। মনিটার ক্লাস চালিয়ে নিত। গোলমাল করা ছেলেমেয়েদের নাম টুকে রাখত। মাস্টারমশাই এলেই কানমলা দেবে অবাধ্য সতীর্থদের! গোড়ার দিকে, সোমবার ক্লাস হবে না মনে করে টু-এর ছাত্ররা বাইরে বেরিয়ে আসত, তারপর বদ্রিকে দেখেই স্কুলে ফের ঢুকে পড়ত। সোমবার বদ্রির আসতে দেরি হলেও, ঠিক আসবে— এটা এখন সবাই জেনে গেছে। শনিবার ঘণ্টা দুয়েক ক্লাস চলার পর ছুটি হয়ে যেত। পাঁচ ছ মাস এইভাবে কাটার পর, বদ্রি পনেরো দিন অন্তর গাঁয়ে আসত। শেষে, মাসে একবার। মাইনে পেলে বাড়িতে কিছু দিয়ে, কিছু নিজের কাছে রাখত।

ঘুড্ডুতে তার প্রচুর অবসর। চার পাঁচটা ক্লাসের পরই ছুটি। বদ্রি ধর্মশালাতেই পড়ে থাকত। আশপাশে যেত না। বরং, গাঁয়ের লোকই আসত তার কাছে। বৃদ্ধ যুবক নিরক্ষর ছেলেছোকরা। তবুও সময় কাটত না। যার জন্যে বদ্রি প্রথমে 'জ্ঞানী' পরীক্ষার জন্যে তৈরি হয়। তারপর, ইংরিজিতে এফ এ ও বি এ পরীক্ষার বসার প্রস্তুতি নেয়। এই পরীক্ষার জন্যে ইংরিজি ছাড়া তাকে অর্থনীতি পড়তে হয়। বিষয়টি তার ভীষণ ভাল লেগে যায়। গরিব বড়লোকের ফারাক, গরিব কেন গরিব, এইসব বিষয় সে যত পড়ে, ততই জানার জন্যে উন্মুখ হয়ে ওঠে। ফলে, সে নির্দিষ্ট পাঠক্রমের বাইরে পড়াশোনা করতে শুরু করে। এই ভাবেই একদিন, মানসার এক কমিউনিস্টের সঙ্গে তার আলাপ হয়। সে নতুন কিছু তাকে শুনিয়ে, দুটি বই পড়তে দেয়। পাঞ্জাবিতে অনূদিত রাশিয়ার বই। বই দুটি পড়ার পর বদ্রি যেন এক নতুন পৃথিবী খুঁজে পায়। সে আরও রুশ বইয়ের অনুবাদ পড়ে চলে। কমরেডের সঙ্গে দেখা করার জন্যে মালসায় যাতায়াত শুরু করে। দু বছরের মধ্যে বদ্রি রাশিয়ার সমাজবাদী সাহিত্যের প্রায় সবই পড়ে ফেলে। ইংরিজি অর্থনীতিতে বি এ পড়ার ইচ্ছেটা মাঝপথেই থমকে দাঁড়ায়। তার মনে হয়, চিন্তা জাগতে কার্ল মার্কস গুরুর গুরু। গোর্কি চেকফ তুর্গেনিভ দস্তয়েভস্কি — এঁরা যেন এদেশেরই গল্প লিখেছেন। এলাকার পার্টি কর্মীরা এবার বদ্রির ধর্মশালায় এসে রাতের আশ্রয় নিতে থাকে। মাঝরাত অবধি আলোচনা চলে রাজনীতি মার্কসবাদ নিয়ে। গ্রামবাসীরাও জানে মাস্টারমশায়ের রাতের অতিথি কারা। তারাও এইসব বিষয়ে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে, কিন্তু বদ্রিকে কিছু বলে না। বলার কিছু নেইও, কেননা তারা তো জানে বদ্রি ছেলেমেয়েদের কত আন্তরিকভাবে, কত দরদ দিয়ে পড়ায়, কত পরিশ্রম করে।

এগারো

গৌদি জমি বাঁধা দেয় ভাগ-চাষের শর্তে। বুর্জগিল্লার দিকে এক টানা জমি বারো বিঘে। মা-বাবা মারা যাওয়ার পর একটা গোরু পোষে। মা-বাবা জীবিতকালে ছিল মোষ। বাবা বুড়োর হয়ে খেতের কাজ ছেড়ে দেয়। সংসার চালাবার দায়িত্ব পড়ে গৌদির ওপর। তখন থেকেই এই কৃষক পরিবার বদলে যায় ভিক্ষাপ্রত্যাশী ব্রাহ্মণ পরিবারে। প্রথমে বলদ বিক্রি হলো, তারপর খামার। বাবা বেঁচে থাকতেই এ-সব হতে লাগল। সবার আগে বিক্রি হয় গোরুর গাড়ি, তারপর হাল জোয়াল ও অন্যান্য জিনিসপত্র। গৌদির বাবা প্রচন্ড আঘাত পেল। মনে হলো যেন বুকের পাঁজরা যেন গুঁড়িয়ে যাচ্ছে। চুপচাপ রইল সে, ভাবল তার শরীরটাকেই কেউ যেন টুকরো টুকরো করে কেটে বেচে দিচ্ছে।

গৌদি কখনওই এক নাগাড়ে তিন বছরের বেশি কারও কাছে জমি রাখে না। তিন বছরের বেশি থাকলে দখলী-স্বত্ব বর্তায়, এই আইনটা সে বোধহয় কোনও ভাবে জেনে গিয়েছিল। এই জাতীয় আইন থাকুক আর নাই থাকুক, গৌদির কিন্তু মনে মনে ভয় ছিল। জাঠেদের বিশ্বাস নেই, কখন কী করে বসে, কে জানে!

ভাগে জমি নেওয়ার জন্যে অন্য জাঠেরাও গৌদির পেছনে পড়ে থাকত। যে বেশি দিত, গৌদি তাকেই জমি দিত। কিছু কিছু জাঠ পরামর্শ দিত: 'পণ্ডিত — খেতে গিয়ে কাজকম্ম দেখো, নইলে লাভের গুড় পিঁপড়েতে খাবে। হিস্যার জমি শালা ইঁদুরেও কুরে-কুরে খায়। কেন নিজের ধন পরকে দাও?' কিন্তু, যে যাই বলুক, গৌদি ফসলের দিকে ফিরেও তাকায় না। শুধু আষাঢ়ী-কাটাইয়ের সময়ে বউকে খেতে পাঠায়, 'দেখে এসো তো — কেমন ফসল হয়েছে।' বউ খেতে গিয়ে চাষি-মজুরের সঙ্গে গল্প করে চলে আসে। কত গম হলো আন্দাজও করতে পারে না। গমের ডাঁই যেদিন সাজানো দেখে, সেদিনই শুধু বুঝতে পারে এবার আটা পাওয়া যাবে। বউ এসে কিছু একটা জানালে, গৌদি ব্যাপারটা নিয়ে হয়তো একটু নাড়াচাড়া করত, কিন্তু তাকে কেউ-না-কেউ ঠিক উলটোপালটা বুঝিয়ে দিত। গৌদির জীবনদর্শন এই সব ব্যাপারে: আমি না দেখলে কী হবে, ভগবান সব দেখবে। যা করার তিনিই করবেন। অবিচার হলেও তিনিই বুঝবেন। সরল ও ঈশ্বরবিশ্বাসী গৌদি বেচারা জানতেও পারে না, রাতারাতি তার গমের ভাগ অন্য ডাঁইয়ের সঙ্গে এক হয়ে কীভাবে পাচার হয়ে যাচ্ছে! ফসলের হাত-ফের কমবেশি সব খেতেই হয়। পাঁচ-সাত বোরা গমের ডাঁই বেমালুম গায়েব হয়ে যায়। দৃশ্যত গমের ডাঁই গাড়িতে উঠিয়ে জাঠ চাষি নিজেই গম পিষিয়ে আটা দিয়ে আসে গৌদিকে। মজার ব্যাপারটা হলো, যে-লোক গমের ডাঁই আত্মসাৎ করে, সেই লোকই আবার আষাঢ়ী-ফসল থেকে নিজেই এক মন বা দু মন গৌদিকে এমনি দিয়ে আসে। গৌদি নিজের ফসলে যত না খুশি হয়, তার চেয়ে দ্বিগুণ খুশি হয় উপহারের ফসল পেয়ে: 'লোকটা আমাকে কী ভক্তিই না করে!'

গৌদির জমি তদারক করে প্রীতম আর মিলখা ফৌজির ছেলে কর্নেল। প্রীতমের মা মাঝেমাঝেই গৌদিদের বাড়িতে আসে। গৌদির বউ কৌশল্যা চা দিতে গেলে বলে, 'না, না, পণ্ডিতের বড়ি চা খেয়ে আমি পাপী হব না। আমারই তো উচিত তোমাদের খাওয়ানো।'

কৌশল্যা এ-সব কথা কানে তোলে না। চা খাইয়ে ছাড়ে। 'আরে— তোমার জন্যে চা করলাম। এখন তো খেয়ে নাও'। প্রীতমের মা অগত্যা চা খেয়ে নেয়, এবং বাড়ি ফিরেই এক ঘটি গরম দুধ পাঠিয়ে দেয়, ব্রাহ্মণীর ঘরে চা খাওয়ার 'দোষ' স্খালনের জন্যে। গত বছর প্রীতমের হাতে যখন গৌদির জমি ছিল, তাতে দু চার বিঘে মকাই হয়। এই সময় গৌদিও একটা গোরু কেনে। গোরুর জন্যে প্রীতম কোনও মকাই পাঠায়নি। কিন্তু, প্রীতমের মা গোপনে নিত্য মকাই দিয়ে যেত। প্রীতমের ছেলের আবার মকাই ভাজা সকাল সন্ধ্যে চাই-ই। নাতির ভাগ থেকেই প্রীতমের মা মকাই সরিয়ে ফেলত। ব্রাহ্মণের জন্যে অল্পস্বল্প চুরি করলে পাপ হয় না। এ-সবের ফলে গৌদির মনে বদ্ধমূল ধারণা হয়ে যায়, কেউ তাকে ঠকায় না। পণ্ডিত হিসেবে তাকে শ্রদ্ধাভক্তি করে।

আষাঢ়ী-ফসল গৌদি বেচে দেয়। সংসার খরচ তাতেই চলে যায়। বাড়িতে কোনও না কোনও না মেয়ে সব সময়েই থাকে। ঘরের মজুত গম ফুরিয়ে যায় তাড়াতাড়ি। গম ধার করতে হয়। গৌদির জীবিকায় অর্থাৎ পুজোপাঠে, এই খরচ চলে না। লোকে ব্যাপারটা বোঝে, তখনই বলে, 'জমি বাঁধা দিলেও হিস্যা আলাদা করে নাও না কেন, পণ্ডিত? হিস্যায় আর কত পাবে — বেচে দাও সোজাসুজি, অনেক পাবে।' 'পণ্ডিত খেতে যাও দেখি, নিজের ভাগ বুঝে নাও না কেন? কী, লোকের বাড়ি-বাড়ি ঘোরো বগলে পুঁথিপত্তর নিয়ে?' গৌদি এসব শুনলে অন্য পথে হাঁটা দেয়।

গ্রামের চৌপালে লোকজন বলাবলি করে: 'পণ্ডিতের এত জমি, নিজে যদি কাজ করে তাহলে খেয়ে কূল পাবে না!' আর একজন টিপ্পনি কাটে: 'তাহলেই হয়েছে। ভিক্ষে করে চেয়ে-চিন্তে খাওয়ার যে একবার স্বাদ পেয়েছে, সে নাকী খেতে কাজ করবে! তারপর, এখন বয়েস হয়েছে, কাজের ধকল সহ্য করতেই পারবে না।' এর ফাঁকে একজন স্মৃতিচারী হয়ে বলে ওঠে, 'দেখেছিলাম বটে গৌদির বাপকে! বামুন হলে কী হবে, চাষের কাজে ছিল এক নম্বর। ওকে দেখলে মাটি কথা বলত, ও রকম হালী আমি এখনও দেখিনি। ফালতু খরচ করতে অবধি তাকে দেখিনি কখনও। বলত কী, চাষির কাজ সব সেরা, 'ভল্লে ভল্লে'!' গৌদির বাবার স্মৃতিচারী-ভক্ত শ্রদ্ধা জানায়। তবে এর মধ্যে আর একজন মন্তব্য করে, 'জমির কদর জানি আমরা জাঠেরা! বামুন ধোপা নাপিত জেলে জমির কদর কী বুঝবে?'

চতুর্থ মেয়ের যখন বিয়ে হয়, গৌদি তখন দু বিঘে জমি চার হাজারে বাঁধা রেখেছিল মিলখা ফৌজির কাছে। বদ্রি জানত না। বিয়ের পর জানতে পেরে বেজায় রেগে যায়, বলে: 'তিন মেয়ের বিয়েতে জমি বাঁধা রাখতে হলো না, এবার কেন রাখতে হলো তাহলে? তোমার বারো বিঘের ফসল, মাসে মাসে আমার দুশো তিনশো করে টাকা— এসব যায় কোথায়?

বদ্রির কথা শুনে গৌদি একটু অপ্রতিভ হয়ে পড়লেও জবাব দিতে ছাড়ে না: 'তোর পয়সার মণ্ডামিঠাই খাই না কী? নেশাভাঙ করি না, নানা জায়গা থেকে বিদ্যে খরচা করে—'

বাপের কথায় বদ্রি তেলেবেগুনে জ্বলে ওঠে, 'বলিহারি! খুব বিদ্যে খরচা করতে শিখেছ! করো তো ভিখিরিগিরি— লজ্জা করে না— এই ভাবেই যখন থাকবে ঠিক করেছিল, তখন এতোগুলো কাচ্চাবাচ্চা পয়দা করতে গেলে কেন?'

'বটে! এত বড় অস্পদ্দার কথা! বলি আমি তোর বাপ, না তুই আমার বাপ? চোদ্দ ক্লাস পড়ে একেবারে বিদ্যেদিগগ্‌জ হয়ে গেছিস! চালা দেখি সংসারটা, তোর ক্ষ্যামতা বুঝব!' খুবই সংযত হয়ে গৌদি জবাব দেয়।

অতঃপর দু জনেই চুপ হয়ে যায়। তর্কাতর্কির আওয়াজে বদ্রির মা ছুটে আসে। সবিস্ময়ে জিজ্ঞেস করে, 'কীরে — বাপ-ব্যাটা ঝগড়া করছিস কেন?'

মাকে দেখে বদ্রি একটু নরম হয়। প্রসঙ্গ বদলায়, 'তুমি বলেছিলে অমরা নাকী সেরা জাত। এই কী তার নমুনা? কোনও জাঠের বাড়িতে বিয়ে হলে, ছেলেমেয়ের জাত কী পালটে যেত? ধোপা নাপিত জেলে মেথর সবই তো এক রকমের দেখতে। তাহলে সেরা জাতের নমুনা কী?'

কৌশল্যা ছেলেকে ভর্ৎসনা করে, 'তোর মাথাটা একেবারে গেছে! সবই, যাকে বলে, কর্মফল। শাস্ত্রে বলে ব্রাহ্মণের কাজই হলো দান গ্রহণ। সেরা জাত না হলে শাস্ত্রে এটা লিখত?'

বদ্রি হেসে ফেলে, 'এটা আবার কোন শাস্ত্র, মা?'

'সব শাস্ত্রেই এটা আছে', গৌদি কৌশল্যাকে সমর্থন জানায়, 'ব্রাহ্মণের কর্তব্য ছটি: শিক্ষা দেওয়া-নেওয়া; যজ্ঞ করা-করানো; দান নেওয়া-দেওয়া।'

'ছাড়ো ওসব কথা! এখন ওসব চলে না। এ যুগটা হলো গায়েগতরে খাটার যুগ। খাটো খাও—ব্যাস। তোমার ওসব বুজরুকি সবাই এখন জানে।' বদ্রি একটু ঝাঁজালোভাবে কথাগুলো বলে।

'বেশ তো— ভাল না লাগলে তুই এ পেশায় আসিসনি।'

'এই পেশার মুখে আমি জুতো মারি!'

'এই হলো আজকালকার শিক্ষা!' কৌশল্যা প্রতিবাদ না করে পারে না। বলে, 'যজমানি না থাকলে, এসব কথা বেরোতো তোর মুখ দিয়ে?'

'যজমানি ব্রাহ্মণদের মূলধন। ওটাই ব্রাহ্মণদের সব।' গৌদি গম্ভীরভাবে মতামত জানায়।

'যজমানি করতে গিয়ে জায়গাজমির বারোটা বাজিয়ে ছেড়েছ! জবাব নেই তোমার ন্যায়শাস্ত্রের!' বদ্রি ব্যঙ্গ করে।

'তাতে কী? যজমান-পুরোহিতের সম্পর্কটাই এই রকম। যজমান যুগ-যুগ ধরে পুরোহিতদের খাইয়ে আসছে। এই সম্পর্ক কোনও দিন নষ্ট হয় না। এই সম্পর্ক বাজারে বিক্রি হবার জিনিস নয়। যদ্দিন চাঁদসূয্যি আছে, তদ্দিনই এই সম্পর্ক একরকম থাকবে।' গৌদি নাটকীয় ভঙ্গিতে বুকের ওপর হাত রাখে।

বদ্রি হাসে: 'শাবাশ! শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে উপদেশ দিচ্ছে আত্মা অমর!'

দুপুরে বদ্রি ঘুড্ডুতে যাওয়ার তোড়জোড় করে। কৌশল্যা চা নিয়ে আসে। তিনজনে বসে চা খায়। বদ্রির অনেকদিনের অভ্যেস খাদির দোপাট্টা ব্যবহার করা। সর্বদাই তার কাছে দুটি দোপাট্টা থাকে। একটা কেচে রাখে, অন্যটা পরে থাকে। কাচেও খুব পরিষ্কার করে। নীল দিয়ে ঝকঝকে করে রাখে। সেদিন কৌশল্যা চার গজের মতো একটা খাদির টুকরো দেয়। বদ্রি একটু অবাক হয়ে বলে, 'এই খদ্দর তুমি পেলে কোথা থেকে?'

কৌশল্যা জবাব দেয়, 'বুড়ো ঈশ্বর মারা গেল, না? — তার শ্রাদ্ধে পেয়েছি।'

বদ্রি সঙ্গে সঙ্গে খাদির টুকরো ফিরিয়ে দেয়, 'তোমাদের নিজেদের কিছু থাকলে দাও। যজমানদের জিনিস নেব না।'

'আগে তো নিতিস। এখন ওগুলোর প্লেগ হয়েছে নাকী?'

'হ্যাঁ। প্লেগই হয়েছে! ওগুলো তোমার সিন্দুকে পুরে রাখো!'

কৌশল্যা গজরাতে থাকে। বদ্রি ততক্ষণে বাড়ির বাইরে চলে গেছে। গৌদি ভাবে, ছেলেটার নির্ঘাৎ মাথা খারাপ হয়ে যাচ্ছে!

বারো

সময় বড় তাড়াতাড়ি বদলে যায়। জমিজমার সরকারি মাপজোখ চালু হয়। সব গাঁয়েই জমি নবীকরণে দপ্তর খোলা হয়েছে। পাটোয়ারির লোক বসে গেছে স্কেল ফিতে নিয়ে। জমির নকশা বানানো হয়। জাবদা খাতায় বিবরণ লেখা হয়। জমির দাম কমে গেছে। জাঠেদের অনেকই দুধের লোটা নিয়ে পাটোয়ারির সঙ্গে দেখা করতে আসে। গুজুরগুজুর চলে কিছুক্ষণ। শহরের 'সিং' পদবীধারী একটু জোর গলায় কিছু বলে, তারপর দুপক্ষই একটা 'রফা'য় আসে— অর্থাৎ 'বন্দোবস্ত' হয়ে যায়। রাতে মদ আর মাংসের উপঢৌকন যায়। পাটোয়ারির সঙ্গে যাদের 'বন্দোবস্ত,' তারা তো খুশিই। বাকিরা অখুশি হলেও মুখে কিছু বলে না। সবই ভাগ্য! পাটোয়ারির হিসেবটা খুবই সহজ: ফেলো কড়ি, মাখো তেল! কোটের লোক গোটা ধর্মশালাটাই ছেড়ে দিয়েছে পাটোয়ারিকে। কেউ আসুক না আসুক— ঝান্ডা কিন্তু নিয়মিত আসে। সঙ্গে আনে প্রচুর কাঁচা দুধ, নানারকম খাবারাদাবার। ভাবখাতির বেশ জমে ওঠে। পাটোয়ারি ঝান্ডার কাছ থেকেই গাঁয়ে কার কত জমি — খুঁটিয়ে জেনে নেয়। ভোরবেলা হরদিৎ আসে দইয়ের হাঁড়ি নিয়ে। গৌদিও মাঝেমাঝে 'জয় হোক' হাঁক দিয়ে ঢোকে। বগলে যথারীতি পুঁথিপত্র, কাঁধে লাল উড়নি। প্রথম আলাপেই গৌদি নিজের জমিজমার কথা পাটোয়ারিকে জানিয়ে দিয়েছিল। পাটোয়ারি এখন গৌদিকে দেখলেই মুচকি হাসে, 'পণ্ডিতজি' বলে সমাদরে ডাকে। গৌদি এতে আহ্লাদে আটখানা। জমিজমা চুলোয় যাক, পাটোয়ারি যে তাকে শ্রদ্ধা করে এটাই যথেষ্ট! জমির মালিকেরা খেত থেকে গাছপালা কেটে ফেলে। দু একটা বটগাছ থেকে যায়। সবারই মনে মনে ভয়, কার জমির ফালি কার সঙ্গে ঢুকে যায়, কে জানে! গ্রামে ব্লক উন্নয়নের কাজও চলে। 'সফেদা' নামে এক ধরনের গাছ বসায় ব্লকের কর্মীরা। ওই গাছ-নাকী প্রত্যেক খেতে বসবে। প্রথম দিকে লোক গা করেনি। হঠাৎ একদিন তারা দেখে স্কুলের মাঠ, জলসেচের কাছে যে পুকুর, সেই পুকুরের ধারেও ওই গাছ বসে গেছে। গাঁয়ের লোক তির্যক মন্তব্য করে: 'কী ঢ্যামনা গাছ রে ভাই! না দেয় ফল, না দেয় ছায়া— শালা বড় হয়ে ওঠে তরতর করে, ষ্ঁ্যা!'

সবচেয়ে বেশি ওলোট-পালোট হয়েছে রাস্তা। আগে যেখানে শিয়াল ডাকত, লোক ভয়ে যেত না— সেখানকার ঝোপজঙ্গল কেটে এখন পাকা সড়ক হয়ে গেছে। বারনালা থেকে পাকা সড়ক মানসা হয়ে সোজা চলে গেছে শার্দূলগড়। হন্ডিয়া থেকে সোজা একটা রাস্তা চলে গেছে ভাটিন্ডায়। মানসা ভাটিন্ডার সংযোগ থেকে যে রাস্তাটা হন্ডিয়ার এসে মিলেছে, তার স্থানীয় নাম 'তেমাথা'। বারনালা থেকে আর একটা পথ রায়কোট হয়ে চলে গেছে বিলাসপুর কাটনি মৌগা। বারনালা ভদৌড়ের রাস্তাটা চলে গেছে জালাল বাজেখানে। মৌগা বাজেখানার পথ শেষ হয়েছে পখোক গাঁয়ের কাছাকাছি পখোক তেমাথায়। কয়েক বছর পর হন্ডিয়ার তেমাথা থেকে সঙ্গরুর একটি বাইপাস পখোক-তেমাথার সঙ্গে জুড়ে যায়। ভদৌড়ের আগে সালাবাতপুরার রাস্তাটা সাধনিয়ার সাঁকো অবধি এসেছে। এই রাস্তাতেই পড়ে ভাইরূপা বুর্জগিল্লা হরনামসিং গাঁ। ভাইরূপা থেকে একটি রাস্তা গেছে সেলবাড়ার দিকে, সেখান থেকে কলোক হয়ে হরনামসিং। ওখান থেকেই কোটের লোক ভাইরূপার বাস-গুমটি থেকে বাস ধরে। বুর্জগিল্লা আর সেলবাড়ার বাস-গুমটি কিছুটা দূরে। বেশির ভাগই বাস ধরে ভাইরূপার গুমটি থেকে। গাঁয়ের লোকের কাছে বাস নামক যানটিও এক আশ্চর্য ব্যাপার। এতদিন, ওরা লরি দেখে এসেছে। বাস বস্তুটি তাদের কাছে নতুন। যাত্রীরা ঠিক যেন বুঝতে পারে না বাসের ইঞ্জিন সামনে না পেছনে! ফলে বাসের মধ্যে কোনটা সামনের দিক, কোনটা পিছনের — তাও ঠিকমতো ঠাওর করা যায় না। মেয়েবউরা ড্রাইভারের কাছে এসে দাবি করে, 'আরে ভাই — তোমার আলমারিটা খুলে দাও, আমরা বসব!' ভেতরে ঢুকে তাক লেগে যায়ঃ কী লম্বা চওড়া ব্যাপার! লোকে মন্তব্য করে, 'শালা! এতো মোষের পিঠে পাখা গজিয়েছে— একদম উড়ে যাচ্ছে!'

অন্যদিকে চেয়ারের ওপর গদি, ইঞ্জিনে জল পাম্প, কুয়ো থেকে জল টানার পাম্প, বৈদ্যুতিক পাম্প— এসব দেখে লোকের ভিরমি খাওয়ার যোগাড়। প্রথম-প্রথম অচেনা শব্দগুলি উচ্চারণই হতে চাইতে না, যেমন, পাম্প টিউবওয়েল। তারপর, কথাগুলো সড়গড় হয়ে যায় — মোটরের জল, ইঞ্জিনের জল, বোরের জল ইত্যাদি।

নতুন ধাঁচের হাল, নতুন বীজ, নতুন মডেলের ট্র্যাকটর-ট্রলি — গ্রামে-গ্রামে হইচই ফেলে দেয়। সাবেকি আমলের লোক নতুন পৃথিবীটা দেখে অবাক, আশ্চর্য হয়। গাঁয়ে-গাঁয়ে স্কুল চালু হয়ে যায়, প্রাইমারি মিডল হাই। মেয়েরাও স্কুলে যেতে শুরু করে। সনাতনপন্থীরা আঁতকে ওঠে, 'য়্যাঁ! সব গোল্লায় গেছে। মাথার কাপড়চোপড় নেই, গা দেখিয়ে ছুঁড়িগুলো ইসকুলে যাচ্ছে— ছ্যা ছ্যা— ঘোর কলি, ঘোর কলি!'

রাস্তার জন্যে শহর গ্রামের যোগাযোগও সহজ হয়ে ওঠে। এমনকি, গাঁয়ের চালচলনও শহুরে হয়ে ওঠে। কোটের দোকানদার এখন দোকানে সোডার বোতল, বরফের চাঁই সাজিয়ে রাখে। লোকে বলে ওঠেঃ আই বাপ! এতো পাতিয়ালা শহর হয়ে গেছে দেখছি!

মুরব্বাদি থেকে নতুন একটা রাস্তা বানানো হয়েছে। গাঁয়ের আশপাশে জমির প্লট বিক্রি হচ্ছে। ঘর বানাবার জমি আলাদা, গোয়াল বানাবার আলাদা। ঝান্ডাও নতুন বাড়ি বানিয়ে ফেলেছে। কেল্লার মতো বিশাল বাড়ি। বিরাট উঠোন, লোহার গেট। ডানদিকে বাঁদিকে টানা বৈঠকখানা। দাওয়া বারান্দা — সবই বেশ লম্বা চওড়া। রান্নাঘরও বেশ

প্রমাণমাপের। কোমর-সমান উঁচু উনুন। জাফরি দেওয়া বারান্দা। উঠোনের একদিকে গোয়াল। অন্যদিকে নিমগাছ। স্বচ্ছল গৃহস্থালি।

ঝান্ডার এখন নিজস্ব জমি তিরিশ বিঘে, আর বাঁধা নেওয়া আছে বিশ বিঘে। হরদিতের এক ছেলে, এক মেয়ে। মেয়ে স্কুলে যায়। ছেলে ছোট। গাঁয়ে প্রথম ট্র্যাক্টর নিয়ে ঢোকে হরদিৎ। সারা গাঁ ঝেটিয়ে লোক আসে সেই ট্র্যাকটর দেখতে। বলদের জায়গায় কী আশ্চর্য যন্ত্র! সব ছুঁয়ে-ছুঁয়ে দেখে আশ্চর্য সেই যন্ত্রদানবকে। গোয়ালঘরের পাশে ছোট্ট একটা ঘরে সেটা থাকে। হরদিৎ-ই চালায় ট্র্যাকটরটা। খুবই গর্বিতভাবে সিটের ওপর বসে।

সেই বছর নাজর খেতের কাজ ছেড়ে দেয়। ভাইরূপার এক ব্যবসায়ীর সঙ্গে মদের ব্যবসা শুরু করে। সারা রাত তার ওখানেই কাটে। ভোর বেলা ফিরে আসে গাঁয়ে। নাওয়া খাওয়া বিশ্রামের পর ফের বিকেলের দিকে চলে যায়। হরনামির আজকাল বড় শ্বাসকষ্ট হয়। সন্ধ্যের দিকে সামান্য মদ আর রুটি খায়। তাতে শ্বাসকষ্টটা কমে, রাতে অন্তত ঘুমোতে পারে। এখন তার বয়েস হয়েছে। পাড়ার বুড়িদের সঙ্গে গল্পগুজব করে, অভিজ্ঞ মহিলাদের মতোই সুচিন্তিত মতামত ব্যক্ত করে নানা বিষয়ে।

গিন্দরকে বেশির ভাগ সময়ে দেখা যায় পরাগদাসের ডেরায়। গুরুমুখি শিখে এখন পাঞ্জাবি 'বালবোধ' পড়ে। পঞ্চ-গ্রন্থি শেষ করে বর্তমানে 'গ্রন্থসাহেব'-এর পাঠক। যোগী যোগিন্দর লোকের কাছে 'জ্ঞানীজি'। পরাগদাস এখন লোকের বাড়িতে অখন্ড পাঠের ব্যবস্থা করেছে, অবশ্যই তার নিজস্ব রীতিতে। ঠিকে কাজের মতোই পরাগদাস ব্যবস্থাটি করে দেয়। যে বাড়িতে অখন্ড পাঠের ব্যাপার হয়, সেখানে সন্ধ্যে থেকেই আরতিটারতি হয়। ভোগের দিন নানা অনুষ্ঠান-উপাচার চলে। হিন্দু দেবদেবীদের স্তবস্তোত্র বরপ্রার্থনা মানত— সব হয়। জটাধারী সাধুরা ঘনঘন মাথা নাড়ে। গিন্দর মাঝেমাঝে বাড়ি এসে হরনামির সঙ্গে দেখা করে যায়। নাজরও থাকে। কেউই বিব্রত বোধ করে না। জ্ঞানীজি ও নাজরকে একসঙ্গে আলাপ আলোচনায় রত থাকতে দেখা যায়। বুড়ো প্রতাপ ও তার বউ মারা গেছে। শ্যামির ফৌজি স্বামী এখন এখানেই থাকে। পেনশন পায়। দুই ছেলেই বেশ তাগড়া জোয়ান। মাকে বেশ করে পিটুনি দিয়ে-দিয়ে এখন সিধে করে দিয়েছে! ফলে শ্যামির মদ বন্ধ। বাড়ির বাইরেও বড় একটা যায় না। ছেলেদের ভয়ে মা থরথর করে কাঁপে। ছেলেরা খেতে কাজ করে, সঙ্গে বাবাও থাকে।

জগিরাও জেল খেটে ফিরে এসেছে। দু একদিন ঘরে থাকার পর আর ভাল লাগে না। নিঃসঙ্গ বোধ হয়। এক মা ছিল, সে তো কবে মারা গেছে। আত্মীয়স্বজনের বাড়ি যাতায়াত করে সে সময় কাটায়। তারপর হঠাৎ একদিন এক বিধবাকে বিয়ে করে ঘরে আনে। বিধবা হওয়ার পর সিতি ছ সাত বছর মায়ের কাছে থাকত। নিঃসন্তান। সাধেড়ে জগিরার এক বোনের বিয়ে হয়েছিল। সাধেড়ের লোকজনদের মধ্যস্থতায় জগিরা ওই বিধবা সিতিকেই তার ঘরনী করে নিয়ে আসে। এরপর ওরা দুজনে মিলে বিয়েবাড়ির কাজকর্ম থেকে বাসন মাজা, ভিন গাঁয়ে খবর পৌঁছে দেওয়ার কাজকর্ম ইত্যাদি ও ফুরনে আরও নানা কাজ করতে শুরু করে দেয়। ভাত রান্না আর হালুয়া বানাবার কাজে জগিরা অদ্বিতীয়। সিতি সারাদিন ধরে তাওয়ায় রুটি বানায় একনাগাড়ে। কনের সঙ্গিনী হয়। দিন ভালই কাটে।

মল্লণের টাহলি খেতের পুরোটাই এখন ঝাস্তার কাছে বাঁধা পড়েছে। ঋণের পরিমাণ তিরিশ হাজার। ছোট মেয়ে জ্যোতির বিয়ে হয় বড় মেয়ে লক্ষ্মীর দেওরের সঙ্গে। বলকার এখন কলেজে। ভাটিন্ডার সরকারি কলেজ। আরও কয়েকজনের সঙ্গে ঘর ভাড়া নিয়ে ওখানেই থাকে। মল্লণের সম্বল শুধু ভাইরূপা খেত। মোষ বিক্রি হয়ে গেছে। বাড়িতে অবশ্য একটি গোরু, একটি বাছুর আছে। দু চার বিঘে ভাগে কাজ করে অন্যের জমিতে। কোনও রকমে দিন গড়ায়। বলকার মাসে একবার বাড়িতে এসে খোঁজখবর নিয়ে যায়। কষ্ট হলেও মল্লণ ছেলের পড়ার খরচ চালিয়ে যায়। মনে মনে আশা, বি এ পাশের পর ছেলে চাকরি পেয়ে টাহলির খেত ছাড়িয়ে নেবে। পরাগদাসের প্রধান চেলা চরণদাস, ওরফে 'মহান্ত চরণ' দেহরক্ষা করেছে। তার ছেলে তিরথ গৌদির বিরুদ্ধে মকদ্দমা দায়ের করেছে। মামলা দু বিঘে জমি নিয়ে। চরণদাস, অর্থাৎ গুরুচরণের কোনও ছেলেপুলে ছিল না। অনেক দানধ্যান ক্রিয়াকর্ম করে পুণ্য অর্জনের ফলে শ্রীমান তিরথ ভূমিষ্ঠ হয়। পুণ্যার্জনের ব্যাপারটা গৌদি সামলায় বলে কৃতজ্ঞতা ও ব্রাহ্মণকে দানের বাড়তি পুণ্যের জন্যে গুরুচরণ দু-বিঘে জমি গৌদিকে দান করে। গৌদি অতঃপর ওই জমি ভোগদখল করতে থাকে। বাবা মারা যাওয়ার পর তিরথ কয়েকজন সালিশির পরামর্শে জমি ফেরত চায়। গৌদি সোজা জানিয়ে দেয়, 'দান ফেরত হয় না।' তিরথের দাবি, বাবার মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছিল— তাই এই দান করেছিল— কাজেই গৌদি ফেরত দিতে বাধ্য। তিরথের কথা শুনে গৌদি হকচকিয়ে যায়। ছেলেটা বলে কী? অতএব, নিজের ব্রাহ্মণত্ব প্রমাণের জন্যে গৌদিও হুংকার ছাড়ে: 'প্রাণ দেব, দান ফেরত দেব না!' এর পরেই, তিরথ ফুলে এসে মামলা রুজু করে। গৌদি অবাক হয়ে ভাবে, মতিচ্ছন্ন আর কি, ঘোর কলি!

তেরো

বদ্রিনারায়ণ বাড়ি এলেই বাবার সঙ্গে তার এক পশলা ঝগড়া হয়। সে আজকাল মাসে মাসেও আসে না। কয়েক মাস অন্তর-অন্তর একবার দেখা দিয়ে যায়। সংসার খরচ দেওয়া বন্ধ করে দিয়েছে। বলেছে, 'দিয়ে কী হবে? তোমাদের চালচলন তো পালটাবে না। তোমাদের টাকা দেওয়া মানে জলে টাকা ফেলা!' কৌশল্যা স্নেহের সুরে ছেলেকে বলে, 'পাগল! আমরা আর কদিন? দেখেশুনে একটা বউ আন, তোরও বয়েস হচ্ছে!'

বদ্রি মার কথা শুনে হাসে, 'কী যে বলো—ছত্রিশ বত্রিশ কোনও বিয়ের বয়েস নাকী? এখনও ঢের বয়েস বাকি—'

'তুই একটা আস্ত পাগল! এরপর আর কেউ তোকে বিয়ে করবে না।'

'ভালই তো— বনে গিয়ে বাস করব। বিয়ে করে এমনকী আর রাজ অট্টালিকা পাব?'

'ওর বিয়ে হয়েছে বইপত্তরের সঙ্গে।' গৌদি ফাঁক বুঝেই টিপ্পনি কাটে, 'হাজার হোক আমাদের 'কমরেড' পুত্র! সারা দুনিয়াই তো ওর সংসার।'

মা-বাবা বোঝালেও বদ্রি বিয়ে করতে নারাজ। কৌশল্যা ছেলের একগুঁয়েমিতে খাপ্পা হয়ে ওঠে, 'নিশ্চয়ই কোনও ছুঁড়ি তোর মাথাটা খেয়েছে!'

মার রাগ দেখে বদ্রি হেসে ফেলে। ছেলের হাসি দেখে কৌশল্যা আরও ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। কপাল চাপড়াতে-চাপড়াতে খাট থেকে নেমে পড়ে কৌশল্যাঃ একী বিদঘুটে ছেলে রে! বদ্রির আর কিছু বলে না। বাবাও ছেলের মতিগতি বুঝতে পারে না। বদ্রি গাঁয়ে এলেও, মা-বাবার সঙ্গে যতটা না সময় কাটায়, তার চেয়ে বেশি সময় কাটায় ছেলেবেলার বন্ধুবান্ধব পরিচিতদের সঙ্গে। এবার গাঁয়ে ফিরে মামলার কথাটি সে শোনে। প্রথমটা একটু রেগে গেলেও, তারপরই খুশি হয়। বাবার ভিখিরি স্বভাবে একটা ঘা মারার দরকার ছিল। বিশ্বাসটা ভাঙুক এবার। কিন্তু কাকস্য পরিবেদনা, গৌদির গোঁঃ ঘোর কলিকাল!

বদ্রি তবুও বাবাকে বলে, 'আমি তোমাকে জমির কথা বলছি না। শুধু দেখো — মানুষের চিন্তাভাবনা কেমন বদলে যাচ্ছে। আগেই বলেছিলাম এই ভিখিরিগিরি ছেড়ে দাও — এখন দেখছ তো? তোমার ওই পুণ্য আমদানি-রপ্তানির ব্যবসাটি ধোপে টিকছে না? জাঠেরা তোমাকে ব্রাহ্মণ, উঁচু জাত বলে এইসব দানটান দেয় না— আসলে, ওরা তোমাকে ভিক্ষে দেয়!'

নিশ্চুপ গৌদি মাথায় হাত বোলাতে থাকে। শেষ অবধি জবাব দেয়, 'তবুও জমি আমি ছাড়ছি না।'

'জমির কথা পরে হবে। আগে তুমি ভিক্ষে চাওয়া বন্ধ করো। তোমার ওই পুঁথিপত্তর ছিঁড়ে ফেলো।'

'তুই ভুল করছিস। সব জাঠ একরকম নয়। সবাই আমাকে ভক্তিশ্রদ্ধা করে। তিরথটা হলো গিয়ে কুলাঙ্গার। তোর কথায় যজমানি ছেড়ে দিলে কী হবে, জানিস?'

বদ্রি জিজ্ঞাসু চোখে তাকায়। গৌদি ব্যাখ্যা করে, 'এই গাঁয়ে চল্লিশ ঘর বামুন আছে। সব আমার জায়গা দখলের জন্যে হন্যে হয়ে বসে আছে। আমি ছেড়ে দিলেই ওরা ঝট করে ঢুকে পড়বে। প্রসন্ন মাকড়াটা তো এরই মধ্যে তিরথের বাড়িতে যাতায়াত শুরু করেছে। কুত্তার জাত! ব্যাটার ঠ্যাং ভেঙে দিতে হয়!' গৌদির চোখ ব্রাহ্মণ্যতেজে রক্তবর্ণ হয়ে যায়।

'তোমার মাথা থেকে এই যজমানি-ভূত নামছে না। আরে, যে যাচ্ছে তাকে যেতে দাও। তোমার জমি আছে — তাই দিয়ে সংসার চালাও। তিরথের দু বিঘে ফেরত দিয়ে দাও। জাঠেদের জাত তো তোমার জানা, ক্ষীর বাঁচলে জাঠেরা কুকুরকেও ক্ষীর দেয়! জমি ফেরত দিয়ে দাও, দেখবে সব পালটে গেছে। মামলা মকদ্দমা বড় বাজে জিনিস— দু বিঘে জমির জন্যে বাকি জমিও যাবে।'

গৌদির কিন্তু এক কথাঃ 'যজমানিও ছাড়ব না — জমিও না।'

বদ্রি অবার বলে, 'তুমি যতদিন যজমানি করবে — আমি বিয়ে করব না। তিরথের জমি ফেরত দাও— পাঁচজনের মতো মাথা উঁচু করে দাঁড়াও।'

বদ্রি বিয়ে করবে কথাটা শুনে গৌদির চোখ আয়নার মতো ঝকঝক করে ওঠে। চোখে এক গুচ্ছ স্বপ্ন ভেসে আসে। জবাব দেয়, 'ঠিক আছে। তুই বিয়ে কর। কিন্তু আমি যজমানি ছেড়ে দেব কেন? আর তিরথকে আমি জমি ফেরত দেব না। এটা ইজ্জতের লড়াই—'

বদ্রি আর কথা না বাড়িয়ে উঠে দাঁড়ায়। কাঁধ-ঝোলায় বই পত্রিকা পুরে উঠোনে এসে দাঁড়ায়; মাকে ডেকে বলে, 'মা সেলামালেকুম! আমি যাচ্ছি, আর আসব না তোমাদের কাছে।'

উঠোনে বসে কৌশল্যা বাসন মাজছিল। ছেলের কথায় তাড়াতাড়ি উঠে আসে, 'কী হয়েছে?' — ততক্ষণে বদ্রি গলি পার হয়ে গেছে।

পাখর নম্বরদার এখনও বেঁচে। বুড়ো হলেও গা-গতর ঠিক আছে। চলাফেরা করে, মদও খায়। আগের মতোই ফুলে যাতায়াত করে মামলা মকদ্দমার কাজে। বর্তমানে সে গৌদির পরামর্শদাতা। গৌদির সঙ্গে প্রীতমকে নিয়ে পাখর ফুলে যাতায়াত করে। প্রীতম আজকাল বড় বেশি মদ খায়। ফুলে এলেই গৌদি এদের 'মাল' খাওয়ার টাকা দেয়। সবই 'হরির ইচ্ছা!'

প্রীতম বলে, 'কাকা— তুমি আমাদের স্রেফ টাকাটা দাও। মালের বোতলে হাত দিলে তোমার পাপ হতে পারে— আমরাই বোত্‌লি আনছি।'

পাখরও বিগলিত হয়ে সায় দেয়, 'পণ্ডিতজি — তোমার কাছ থেকে তো আমরা চাইতে পারি না— তুমি খুশি হয়ে দাও, তাই নিই।'

দেওয়ানি মকদ্দমা। কত বছর চলবে, কে জানে। ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব প্রত্যেকবারেই দিন ফেলেন দু মাস পরে পরে। গৌদি আদালতের মুন্সি চাপরাশি আর্দালিকে 'খুশি' রেখে যায়। তারিখ পড়লেই গৌদিকে গোছা-গোছা টাকা নিয়ে যেতে হয়। পাখর বলে, 'পণ্ডিত, বড় আমলাকে কিছু দিতে হবে যে!' গৌদি দাঁত চেপে, দাড়ি চুলকে জিজ্ঞেস করে, 'কত?' — 'এই হাজার দুয়েক। কম নিতে চায় না— শালা মাংসের গন্ধ পেয়েছে।' গৌদি বিনা বাক্যে হাজার দুই ধরিয়ে দেয়।

ঝান্ডা ইদানীং পিঁয়াজেও টাকা লেনদেন করে। হাতে জমি এখন অঢেল। বন্ধকী জমির ব্যবসা তো আছেই। একজন জমি ছাড়ায় তো আর একজন বাঁধা দেয়। খেতের জন্যে পঞ্চাশ বিঘেই যথেষ্ট। গৌদি পিঁয়াজের ওপর এ-যাবৎ দু হাজার টাকা নিয়েছে। বড় আমলাকে ঘুষের টাকা দেবার জন্যেও গৌদি ঝান্ডার দ্বারস্থ হয়েছিল। আনাজের হিসেবে দু হাজার নগদ, এ ছাড়া কখনও দুশো, কখনও চারশো— জুড়েজাড়ে ঝান্ডা গৌদির নামে একটা তিন হাজার টাকার ঋণপত্র বানিয়ে ফেলে তিন বিঘে জমির হিসেবে। এটাও জানাতে ভোলে না, মিলখার কাছ থেকে গৌদি ওর দু বিঘে ছাড়াতে পারলে, এবং ছাড়িয়ে ঝাণ্ডাকে দিলে, চার হাজার দেবে। ঝান্ডার কাছে মুকুন্দর যে জমি বাঁধা ছিল, মুকুন্দর ছেলে পরমজিৎ দশ হাজার টাকায় তা ছাড়িয়ে নেয়। পরমজিৎ ড্রাফটসম্যান কোর্স শেষ করে, দূরের এক গ্রামে গত পাঁচ-সাত বছর পাটোয়ারিগিরি করছে। টাকা কামায় দু হাতে। বিয়ে থা করেছে। দশ হাজার তার কাছে কোনও ব্যাপারই নয়। পরমজিতের কাছ থেকে পাওয়া এই টাকাটা বাড়িতে রাখা নিরাপদ নয়। গৌদিকে সাত হাজার দিয়ে পাঁচ বিঘে জমি পাওয়া যাচ্ছে। গৌদিও আপত্তি করে না। ফলে, মুকুন্দ চার বিঘে ছাড়াতেই, ঝান্ডা গৌদির পাঁচ বিঘে পেয়ে যায়।

গৌদি তিন হাজর টাকার বান্ডিল আলাদা করে ফুলে যাওয়ার তোড়জোড় করতে লেগে যায়।

চোদ্দ

মুরাব্বাদি থেকে বুর্জগিল্লার দিকে গৌদির জমি আকৃতিগতভাবে ঠিক থাকলেও, অবস্থা শোচনীয়। একটানা জমিতে ছ রকমের নকশা। গোড়ার দিকে সরু, মাঝখানে চওড়া, তারপর আবার লম্বাটে, তারপর ত্রিভূজ। খাবলা-খাবলা করা জরিপী জমি। আশপাশের টুকরোর সঙ্গে সম্পর্কহীন। ফলে, হিসেব বের করা কঠিন ব্যাপার। লোকে বলাবলি করত, 'গৌদির মন্ত্রটন্ত্রে এখানে কিছু কাজ হয়নি। পাটোয়ারি সব বারোটা বাজিয়ে দিয়েছে!' — এই বারো বিঘের মধ্যে আট বিঘে কোনও ক্রমে টিকে আছে। দামের হিসেবনিকেশ পাটোয়ারি কীভাবে করেছে, সেই সম্বন্ধেও গৌদির কোনও ধারণা নেই। তাছাড়া, জমির দরদাম ঠিক করার সময় বা ফসল কাটার সময়, গৌদি জমির ধারেকাছেও যায় না। তিরথের বাবা গুরুচরণ যে জমিটা 'পুণ্যদান' করেছিল — সেই জমিটা গুরুচরণের লাগোয়া জমি থেকে আলাদা। একটু উঁচুর দিকে। জল পৌঁছত না। হাল চলত না। আগাছা আর জঞ্জালে ভর্তি সেই জমির দিকে গুরুচরণ ফিরেও তাকাত না। জমিটা, গুরুচরণের নিজস্ব জমিতে পৌঁছবার একটা পথ হিসেবে ব্যবহার হতো। এতে গোলমাল বাড়ে। লোকে এক কাট্টা হয়ে ওটাকে বারোয়ারি রাস্তা বানাবার চেষ্টা করে কিছুটা সফল হয়। লোকজনের সঙ্গে গোলমালে না গিয়ে, গুরুচরণ ওটি ফালতু জমি হিসেবই গৌদিকে 'পুণ্যদান' করে। গৌদি এবার জমি পেয়ে যথারীতি এক জাঠের কাছে জমা দেয়। জাঠতনয় বিচিত্র এক ছকে ফেলে জমিটাকে গৌদির জমির সঙ্গে মিশিয়ে দেয়। ফলে, গৌদির জমির সঙ্গে এই জমির এক ত্রিভুজ-সহঅবস্থান সম্পন্ন হয়। ওদিকে, তিরথের জমিও কম নয়। ষোলো বিঘে— তারই একটা দিক গৌদির জমির লাগোয়া। জমিটা এবড়োখেবড়ো হলেও তিরথ খাটাখাটুনি করে জমিটাকে বেশ বানিয়ে ফেলে। সেচের জল পেতেও অসুবিধে হয় না। তিরথের হলায়-গলায় বন্ধুত্ব ঝান্ডার ছেলে হরদিতের সঙ্গে। দু জনেই একসঙ্গে খেলাধুলো করে বড় হয়ে সংসারে মন দিয়েছে। দুজনেরই ধান্দা এক: প্রচুর টাকা। মাঝেমধ্যেই দুই বন্ধু একসঙ্গে, অবশ্যই পরিমিত মাত্রায়, মদ খায়। স্মৃতিচারী হয়ে ওঠে। লোকেরা বলে, 'শালার বাপঠাকুদ্দা মাল না খেলে কি হবে— এ শালারা বোতল সাবাড় করে দেয়!'

ঝান্ডার পুরনো ঘরে এখন আর কেউ থাকে না। ওটা এখন ভূসি রাখার ঘর। উঠোনটা বিরাট মাঠের মতো। দরজার কাছে দেওয়ালে লতাপাতা ঘাস গজিয়ে গেছে। অর্জুনের কামরা এখন বসার ঘরে পরিণত হয়েছে। বান্তি মাঝে মাঝে ঝাড়পোঁছ করে। ওখানে পাতা আছে দুটো খাট, একটা ছোট টেবিল, ভাঙাচোরা একটা চেয়ার। দুটো পুরনো আমলের বিছানা। ঝান্ডা প্রায়ই সন্ধ্যের দিকে বসে এ-ঘরে। কেউ দেখা করতে এলে, এখানে বসেই কথাবার্তা সারে। চলতি পথে কেউ কেউ এই ঘরে টুঁ দিয়ে খেঁজুরে আলাপও করে। ঝান্ডা এখন কথায়-কথায় হরদিল প্রসঙ্গ তোলে। ওর সঙ্গে হরদিলের দহরম-মহরমের কথাটা কারওর-ই অজানা থাকে না। হরদিল এখন মন্ত্রী। হরদিৎ আর তিরথ, এ ঘরে মদ খেতে ঢুকলে ঝান্ডা উঠে যায়। ছেলের সুরাসক্তি বাবার জানা। একদিন ওরা মদ খেয়ে নিজেদের কাজকর্মের কথা বলছে, এমন সময় আলমারি থেকে কিছু একটা বের করার অজুহাতে ঝাণ্ডা ঢোকে। তিরথ আর হরদিৎ চুপ মেরে যায়। হরদিৎ চটপট

বোতলটা লুকিয়ে উঠোনে নেমে যায়। অর্থাৎ, ঝান্ডা বেরোলেই আবার ঢুকবে। এই ফাঁকে ঝান্ডা তিরথের কুশল জিজ্ঞেস করে বলে, 'কাজকর্ম ঠিক চলছে তো? এ বছর কী ফেললি?'

'গম আর কিছু চারা—'

'তোর জমিটা বড় খাসা রে। বুর্জ-এ তোর খেত দেখলাম সেদিন। তোর বাবা সারা জীবন সাধু হয়েই কাটালো। নইলে ওই জমিটা কেউ এমন দান করে বেআক্কলের মতো? একেবারে মাগনা দান— ছি ছি — লোকে কাপড়চোপড় দান করে— তোর বাবা কীনা আস্ত জমি দান করে বসল!'

তিরথ কি উত্তর দেবে ঠিক করতে পারে না। বলে, 'কী করা যাবে আর? বাবা দিয়ে দিয়েছে — এখন তো কোনও উপায় নেই।'

'কে বলল উপায় নেই? তোর বাবা ছিল সাধুসজ্জন লোক, নিশ্চয়ই দানপত্রের কোনও লেখাপড়া হয়নি। তুই দাবি জানিয়ে, আদালতে একটা মামলা ঠুকে দে— গৌদি বাপ-বাপ করে তোকে জমি ফেরত দিতে বাধ্য! এখন তো মুরাব্বাদির জমিও ওর তালুকে ঢুকে গেছে।'

হরদিৎ বারান্দা থেকে উঁকি দিয়ে দেখে, ঝান্ডা আর তিরথ মন দিয়ে একটা কিছু আলোচনা করছে। সে অধৈর্য হয়ে পায়চারি করে। যদি পায়ের আওয়াজ পেয়ে বাবা চলে যায়। কিন্তু না রাম, না গঙ্গা — ওদের কথা আর শেষ হয় না। অগত্যা সে উঠোন থেকে ঘরে ঢোকে। বাবা তিরথকে তখন বলছে: 'তুই লড়ে যা সাহস করে। আমি হরদিলকেও টিপে দেব।' তারপরই ছেলেকে দেখে ঝান্ডা চলে যায়। হরদিৎ জিজ্ঞেস করে, 'কী ব্যাপার?'

'কাকা ঠিকই বলেছে। বামুন ব্যাটা মাগনায় জমি নিয়েছে।'

'কোন বামুন? কোন জমি?'

তিরথ বন্ধুকে 'পুণ্যদান' সম্পর্কে অবগত করে। জানায়, ঝান্ডা কি পরামর্শ দিয়েছে। হরদিৎ বলে, 'তাহলে এক কাজ কর। আমরা এক কাট্টা হয়ে কথাটা গৌদিকে বলি। হয়তো আমাদের কথায় রাজি হয়ে যেতেও পারে।' এখান থেকেই ঘটনা শেষ অবধি ফুলের কাছারিতে পৌঁছয়।

ফুলের কাছারিতে সেরেস্তাদার লালা দৌলতরাম খুবই ডাকসাইটে লোক। পুরনো দিনের কংগ্রেসি। ইংরেজ আমলে জেলটেল খেটেছে। সাতচল্লিশের পরেও কংগ্রেস করেছে চার যুগ ধরে। ভাল উর্দু জানে, গুরুমুখির কিছু হরফও তার জানা। লোকদেখানো এই চাকরিতে তার কেরামতি ছিল অন্য ব্যাপারে। বড় আমলাদের সঙ্গে, তাদের পরিবার পরিজনের সঙ্গে দৌলতরামের ঘনিষ্টতা খুব বেশি। তাদের অন্দরমহলেও যাতায়াত অবাধ। এ-সবের ফলে, পাখর নম্বরদারের সঙ্গে তার আঁতাত আছে। একদিন ভোরবেলা, চোরের মতো গুটি-গুটি পায়ে গৌদি ও পাখর তার কাছে আসে। আলাদা একটা কামরায় পাখর আর দৌলতে কথা হয়। গৌদি বৈঠকখানায় বসে থাকে। একটু পরেই ওরাও বৈঠকখানায় আসে। গৌদিকে ইশারা করতে, সে ধুতির গাঁট থেকে দু হাজারের বান্ডিলটা বের করে। পাখর সেটা নিয়ে দৌলতের হাতে দিতে, দৌলত এক মিনিটের মধ্যে টাকাটা গুনে, কুর্তার

নিচে, মলমলের পাটিতে ঢুকিয়ে ফেলে। অভয় দিয়ে বলে, 'ঠিক আছে। বড় জোর আর একটা তারিখ পড়তে পারে। পণ্ডিতজি— আপনি আর ভাববেন না। সব ঠিক করে দেব।'

গৌদিরা উঠে পড়ে। গৌদি জানতেও পারে না ওই দু হাজারের দুশো যাবে পাখরের পকেটে, তিন দৌলতের পকেটে, হাজার জজ সাহেবের পকেটে, আর বাকি পাঁচ দৌলতরামের বিবির বাকসে।

মহিলা এ-সব ব্যাপারে একেবারেই ভোলেভালা নন!

পনেরো

গৌদি তারিখমতো হাজিরা দেয়। জজ সাহেব মুচকি হাসেন গৌদিকে দেখে। দুই উকিলও বেশ হেসে হেসে কথা বলে। আগের তারিখে গৌদি জজ সাহেবকে বেশ আনমনা দেখেছে। কিছু শুনছেন, কিছু শুনছেন না। মানী লোক, মন বোঝা ভার। উকিল সেদিন অল্পস্বল্প জেরাও করেছিল। গৌদির উকিল ভাঙাচোরা চশমাটা নাকের ডগায় ঠিক করতে থাকে। পনেরো দিন পর জজ সাহব তারিখ ফেলেন। দু তরফের উকিলই বেশ খুশি হয়। বিপক্ষের উকিলের ভাবটা একটু দার্শনিক গোছের। গৌদি পাখর প্রীতমও নিজেদের মধ্যে আলাপ আলোচনা করে। আগে তারিখ পড়ত দু মাস, এমনকী তিন মাস পরেও। হঠাৎ একী! দুম করে পনেরো দিন পর? আবার তারিখই বা কেন? আজই তো জজ রায় দিতে পারতেন। গৌদি অস্বস্তি বোধ করে। দু হাজার কী বেকার গেল? উকিল আশ্বস্ত করে, পনেরো দিন পরেই রায় বেরোবে নির্ঘাৎ। উকিলের কামরা থেকে বেরিয়ে গৌদিরা যায় লালা দৌলতরামের কামরায়। দৌলতকে কিছু জিজ্ঞেস করতে হয় না, দৌলত নিচু গলায় জানিয়ে দেয়, পনেরো দিন পরেই রায় বেরোবে। দুশ্চিন্তার কিছু নেই। দৌলতরামের কামরা থেকে বেরিয়ে ওরা চলে আসে বাসস্ট্যান্ডে। বাস ছাড়বে বিকেল চারটেয়।

পনেরো দিন পরেই রায় বেরোলো। গৌদির পক্ষেই। তিরথ আর তার সাঙ্গপাঙ্গদের মুখ চুন। তিরথের উকিল পরের মামলার কাগজপত্রে ব্যস্ত হয়ে ওঠে। গৌদির উকিল আহ্লাদে গদগদ হয়ে বলতে থাকে, 'রাত বারোটা অবধি কেস-স্টাডি করেছি — জিতব না মানে?' গৌদি লাল উড়ুনি সামলাতে-সামলাতে উকিলের দিকে সপ্রশংস চোখে তাকায়। পাখরও উকিলকে কৃতজ্ঞতা জানায়। পরের মঙ্গলবার রায়ের প্রতিলিপি তোলার অনুরোধ জানিয়ে গৌদি তাঁর দক্ষিণা মিটিয়ে দেয়। দৌলতরাম নাকের ডগায় চশমা টেনে আবদার জানায় 'পণ্ডিতজি— মিষ্টি কই?' পাখর আর প্রীতমকে বসিয়ে রেখে গৌদি ছুটে বেরিয়ে যায়। একটু পরেই ফিরে আসে এক গাদা বরফির প্যাকেট নিয়ে। প্যাকেট মুহূর্তের মধ্যেই বিলি হয়ে যায় সমাগতদের মধ্যে। দৌলতরাম জানায়, 'দরকার হলেই আমার কাছে চলে আসবেন।' বাসস্ট্যান্ডে এসে প্রীতম আবদার করে, 'আজ দু বোতল লাগবে পণ্ডিতজি!' গৌদি আজ বেজায় খুশি, জবাব দেয়, 'দুই কেন? চার বোতল নাও — জাঠশালাদের খোঁতামুখ ভোঁতা করে দিয়েছি! পুণ্যের দান ফেরত পাওয়া কি এত সোজা রে, বাবা?'

নিজের গাড়ি ভাড়াটুকু রেখে— সব টাকা সে পাখরকে দিয়ে দেয়। পাখর নম্বরদার তিরিশ চল্লিশ টাকা ফেরত দিয়ে সবিনয়ে বলে, 'পণ্ডিত— এই পঞ্চাশেই আমাদের হয়ে যাবে। বাকি টাকায় তুমি বাড়ির জন্যে লাড্ডু মিঠাই কিনে নিয়ে যেও। দাদির জন্যে তো বটেই—'

গৌদির জয়ে গ্রামের লোক উল্লসিত: 'বামুন ঠিক নিজের জেদ রাখল। যতই লোকসান হোক জাঠেদের গালে তো চড় হাঁকালো।' 'কিন্তু, জেদ বজায় রাখতে গিয়ে দু বিঘের জন্যে তিন বিঘে খোয়ালো। মাথায় গোলমাল আছে বামুনের। আর তিরথ শালাটাও গাধা। ফালতু গাঁটগচ্চা গেল দু জনেরই।' 'উঁহু, বাবা — যে ফায়দা লোটার সে লুটে নিয়েছে। ঝাণ্ডা মাঝখান থেকে পাঁচ বিঘে বাড়িয়ে নিল।' 'তবে— তিরথের চেয়ে টাকা বেশি খরচ হয়েছে গৌদির।' 'বুঝলে না! তিরথ আর গৌদিকে তাতিয়ে দেয় শালা ঝাণ্ডা! নিজের স্বার্থে লড়িয়ে দেয় দু পক্ষকে। পাখর আর প্রীতম আড়াই বছর ধরে গৌদিকে 'বধ' করে গেছে।'

গৌদি কিন্তু গর্বিত ভঙ্গিতে বুক টান করে চলে। অন্য ব্রাহ্মণদের কাছে নিজের প্রতিপত্তি জাহির করে। আড়ালে সব বলে, 'খুব বোলচাল! পারলে দু বিঘে ঘাড়ে করে বেড়াত। পাঁচ বিঘে দিয়ে দু বিঘে — কী কেরামতিই না দেখালো গৌদি ব্যাটা!'

সেই দিনই বদ্রি গাঁয়ে আসে বছর দুই পর। বাবার কাণ্ড দেখে সে থ! প্রতিবেশী এক বুড়ি বদ্রিকে ডেকে বলে, 'বাবাকে একটু বুদ্ধিশুদ্ধি দে, বদ্রি। বাপদাদার জিনিস তো তোর বাপ একদম উড়িয়ে দিতে বসেছে। শেষে তোকেই ভুগতে হবে।'

কথাটা শুনে বদ্রির খারাপ লাগে। তবুও সে জবাব দেয়, 'ব্রাহ্মণের জমির দরকার কী, দাদি? পুণ্য করার জন্যে জাঠেরা জমি দিয়েছিল, তাদের কাছেই জমি ফেরত যাবে। ব্রাহ্মণেরা ভিখিরির জাত— জমি নিয়ে কী করবে?'

একটু রেগেই যায় সে। বুড়িও আর কোনও কথা বলে না। বদ্রি মা-বাবাকেও এ বিষয়ে কিছু জিজ্ঞেস করে না। বাবার সঙ্গে তো কথাই বলে না। মার সঙ্গে একটু-আধটু কথা হয়। দুপুরের দিকে বাড়ি ফিরে, খাওয়াদাওয়া সেরে বিকেলে আবার চলে যায়।

তিরথের মেজাজ এমনিতেই খিঁচড়ে আছে। ছবিটা এবার তার কাছে পরিষ্কার। গৌদির জমি হাতাবার জন্যে ঝাণ্ডা এই মোক্ষম চালটি দিয়েছে। দু বিঘের জন্যে এতো অশান্তি! দু বিঘে পেলেই বা সে কী এমন জায়গিরদার হতো? তবুও সে গৌদির ওপর রেগে থাকে ! 'খচ্চর বামুন! জেদ ছাড়ে না— শালা জমি বেচেও লড়ে গেল!' মিলখা ফৌজি অবশ্য একটা পরামর্শ দিয়েছে: 'গৌদি মানসম্মানের কাঙাল— গাঁয়ের কিছু লোককে জড়ো করে ওর পায়ে পাগড়ি রাখো। দেখবে, কাজ হাসিল হয়ে যাবে।' তিরথ, পাথর প্রীতম ও হরদিতের সঙ্গে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করে। হরদিৎ সায় দেয়, 'চেষ্টা করে দেখো।' পাখর, সুযোগ বুঝেই গৌদির বিপক্ষে চলে যায়, সোৎসাহে তিরথকে বলে, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, খাসা মতলব এটা। গৌদি কথা না শুনলে, আমরা এক কাট্টা হয়ে ওকে বয়কট করব। অন্য বামুনকে ওর জায়গায় বসাব। সারা গাঁ এক হলে, গৌদি শালা পেচ্ছাপ করে ফেলবে!'

এই এলাকার চল্লিশ পরিবারের মধ্যে পঁচিশ পরিবার জাঠ। বাকিরা ধোপা নাপিত বেনিয়া ঘরামি মেথর ইত্যাদি। এর মধ্যে এক ঘরই ব্রাহ্মণ— গৌদি। তিরথ প্রত্যেকের বাড়ি বাড়ি গিয়ে পরের দিন সকালে চৌপালে আসার অনুরোধ জানিয়ে আসে। পরের দিন তাদের বাড়ি থেকে ডেকেও আনে।

জাঠেদের ভেতর থেকে আসে বিশজন। গৌদিকেও ডাকা হয়েছিল। পায়ে খড়ম, ধুতিকুর্তা, মাথায় গেরুয়া পাগড়ি, কাঁধে লাল উড়ুনি, কপালে ইয়া এক তিলক গৌদি নাটকীয় ভঙ্গিতে 'হরি ওম হরি ওম' করতে করতে হাজির হয়। আশীর্বাদ করার ভঙ্গিতে হাত দুটো ঈষৎ তোলা। সবাই যখন ভাবছে ঘটনাটা কি, হরদিৎ তখন হাত জোড় করে বলে, 'আপনি আমাদের সবার প্রণম্য। আমাদের কুলপুরোহিত। বলুন, হ্যাঁ কী না?'

'হ্যাঁ। তাতো বটেই।' গৌদি জবাব দেয়।

'আমি তিরথ সিংহ— ' তার হাতে এক টুকরো কাঠ ধরা ছিল, সেটি সে গৌদির পায়ের ওপর রেখে হাত জোড় করে বলে, 'আপনার যজমান—'

'তিরথ — শুধু তুমি কেন, এখানে সবাই আমার যজমান। আমার কাছে তোমরা সবাই সমান। বলো, আমি তোমার জন্য কী করতে পারি?'

তিরথ এবার তার মাথার পাগড়ি গৌদির পায়ে রাখার উপক্রম করতেই গৌদি বিব্রত হয়ে ওঠে, 'আরে, আরে, করছোটা কী? মাথা খারাপ হয়ে গেল নাকী?' বলার সঙ্গে সঙ্গে গৌদি তার হাত থেকে পাগড়িটা কেড়ে নিয়ে মাথায় বসিয়ে দেয়। তিরথ বিনীতভাবে বলে ওঠে:

'আমি আদালতে আপনার কাছে হেরেছি। আপনি আমায় ক্ষমা করুন। আমার স্বর্গত পিতা আপনাকে যে জমি পুণ্যদান করেছিলেন, তা আমাকে ফিরিয়ে দিন — এই প্রার্থনা।'

নম্বরদার পাখর এতক্ষণ চুপচাপ ছিল। সে এবার মুখ খোলে, 'ভাই গৌদিরাম, এটা পঞ্চায়েত। সরকারের চেয়েও বড়। তিরথ তোমার পায়ে যখন পাগড়ি রেখেছে—'

প্রীতম খেই ধরায়, 'গৌদিরাম, খামোকা কেন মন ছোট করবে? দু বিঘে তোমার কাছে এমনকী আর? ফেরত দিয়ে দাও, ল্যাটা চুকে যাক। সারা জীবন তোমার জুতো আমরা মাথায় রেখে দেব। মানইজ্জত বড় না দু বিঘে বড়?'

মিলখা ফৌজিও সায় দেয়, 'নর-ব্রাহ্মণের কথা তো তোমার অজানা নয়, ভাই গোবিন্দরাম—'

নাজরই শুধু চুপ করে থাকে। তিরথ আর গৌদি পরস্পরের দিকে তাকায়। তিরথ হাত জোড় করে থাকে। মল্লণ পাশের জনকে বলে, 'তামাশা! প্রথমে গৌদিকে তাতালো— দু জনের মধ্যে মুরগি-লড়াই চলল— এবার নতুন প্যাঁচ! পাগড়িটা আগে রাখলেই তো পারতিস, বাপু। পাখর আর প্রীতম — দোগড়ের চাঁই। গৌদির হাড় চিবিয়ে এখন তিরথকে ভর করেছে—'

তিরথ আবার পাগড়িটা খুলে গৌদির পায়ে রাখার চেষ্টা করতে, গৌদি বাধা দেয়। ভক্তির এই প্রদর্শনে গৌদি গলে জল! সে উদাত্ত কণ্ঠে বলে ওঠে, 'হরি ওম! তিরথ, তোমার দু বিঘে ফেরত দিলাম।'

সভায় তুমুল কলরব, করতালি। গৌদিকে প্রণাম করার জন্য হুড়োহুড়ি পড়ে যায়। সেই মুহূর্তে গৌদির মনে হয়, প্রণাম করে এরা যেন জানিয়ে দিচ্ছে: 'গৌদি — তোমার আক্কেলকে বলিহারি। মাথার নাট-বল্টু নিশ্চয়ই ঢিলে হয়ে গেছে!'

ষোলো

পঞ্চায়েত শেষ হতেই তিরথ নাজরের কাছে আসে। ভাইরূপা থেকে চার বোতল মদ পাঠাতে বলে। নাজর জবাবে জানায়, বোতল যত খুশি নাও, কিন্তু পাঠাবো কাকে দিয়ে। তিরথ উত্তরে জানিয়ে দেয়, হরদিতের বারোমেসে দেবু চামার যাবে বোতল আনতে। হরদিতের ওখানেই খাওয়া হবে, এবং নাজরও যেন আসে। নাজর সবিনয়ে জানায়, 'আমার ফিরতে রাত হবে। ফিরি কী না তারও ঠিক নেই। তোমরা খেলেই আমার খাওয়া হবে।'

'উঁহু — তা হবে না। তোমাদের জন্যে আমার এত বড় কাজ হলো। আমরা অপেক্ষা করব।'

'চেষ্টা করব। তবে কী না— রাতেও আমাকে অনেক সময় থাকতে হয়।'

'মানে, হরনামি একা থাকে?'

'হ্যাঁ। রুটিটুটি খেয়ে শুয়ে পড়ে।'

'য়্যাঁ! তবে কীনা মেয়েমানুষের জাত—'

'সে ভয় আমার আর নেই'

পোষ-মাঘের ঠান্ডা। সন্ধ্যের আগেই হরদিতের কাছে বোতল পৌঁছে যায়। হরদিৎ আলমারির মধ্যে রাখে সেগুলি। তিরথও এসে পড়ে— পাখর প্রীতমকে ডেকে আনে। মিলখাও এসে পড়ে। পাঁচজনেই এবার বোতল খুলে বসে যায়। ছোট টেবিলটায় আগে থেকেই পাঁচটা গ্লাস বসানো ছিল। বালতিভর্তি পাম্পের টাটকা জলও মজুত। তিরথ বাড়ি থেকে এনেছিল আম-আচার, কিছু পিঁয়াজ। হরদিৎ-ই সবার গ্লাসে এক পেগের হিসেবে মদ ঢালে। পাখর আর প্রীতম এক চুমুকেই তা শেষ করে দেয়। মিলখা অল্প-অল্প করে খায়, টেবিলে গ্লাসটা রেখে দেয়। তিরথ আর হরদিৎ খায় আধ গ্লাস। কথাবার্তা চলে। মিলখা বলে, 'গৌদির অক্কেলকে তোবা! দু বিঘের জন্যে নিজের জমি অবধি বেচে দিল।'

তিরথ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে, 'তোমরা ছিলে বলেই না এটা আমি আবার ফেরত পেলাম। তোমাদের ঋণ আমি জীবনে শুধতে পারব না। গৌদি যে এমনভাবে মেনে নেবে— আমি স্বপ্নেও ভাবিনি। এটা জানলে আমি কি আর আদালতে যেতাম? দু তিন বছর ফালতু কেটে গেল!'

'তোর আর কী হয়েছে? উকিলকে কিছু দিতে দিন পড়ল, কিন্তু গৌদির হাল দ্যাখ—'

'আসলে গৌদির পেছনে কাঠি দিয়েছে আমাদের নম্বরদার!' হরদিৎ পাখরকে হেটো করার চেষ্টা করে। পাখরও ছাড়ে না। সে সঙ্গে সঙ্গে জবাব দেয়:

'তাতে তো তোর উপকার হয়েছে রে! তোর বাপ ফাঁক তালে গৌদির তিন বিঘে ঝেড়ে দিল!' কথাটা বলে পাখর আচার চুষতে থাকে তারিয়ে তারিয়ে।

মিলখা সঙ্গে সঙ্গে জুড়ে দেয়, 'তিন নয় পাঁচ! আমার কাছ থেকে তো দু বিঘে ছাড়িয়ে নেয় আগেই।'

প্রীতম বলে ওঠে, 'যেতে দাও ওসব কথা। তোমাদের সক্কলেরই লাভ হয়েছে। এখন শান্তিতে মাল টেনে যাও। কী সব পাখির মতো ছিটেফোঁটা খাচ্ছ? য়্যাঁ!' — প্রীতমের

কথাগুলো জড়িয়ে যায় আস্তে আস্তে। তিরথ ও হরদিৎ মদ একটু কম খায়। গ্লাস খালি করে এদের লক্ষ করে। মিলখা গ্লাস হতে ধ্যানস্থ! প্রীতম বলে ওঠে, 'ফৌজি! তুমি তো শালা সাহেবি কায়দায় মাল টানছ ...'

হরদিৎ এই ফাঁকে প্রীতমের গ্লাস ভরে দেয়। নম্বরদার পাখরের। মিলখা যৎসামান্য নিজেই ঢেলে নেয়। সেইটুকু চুকচুক করে খেয়ে, সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে বেরিয়ে যায়। তিরথ আর খেতেই চায় না। প্রীতমই বকবক করে যায়, 'দ্যুস্ শালা! এটা তোরা মাল খাচ্ছিস? এতো স্রেফ গলা ভিজছে?' দু বোতল সাবাড় হয়ে যাওয়ার পর, তৃতীয় বোতলের সবটাই প্রীতম খায়। হরদিৎ আড়চোখে প্রীতমের অবস্থা দেখে তিরথকে কানে কানে বলে, 'চার নম্বর বোতলটা আর খুলব না। এই দুই বুড়ো ঝামেলা করবে। নম্বরদারকে তো পাঁজাকোলা করে বাড়ি পৌঁছে দিতে হবে মনে হচ্ছে। প্রীতমের বাচ্চা কি করে, কে জানে?'

চতুর্থ বোতল আলমারিতে পড়েই থাকে। সবাই উঠে দাঁড়ায় এক সময়। বাড়ি যাওয়ার জন্যে পা বাড়ায়। একাই। পরের দিন সন্ধ্যেবেলায় হরদিৎদের পুকুরের কাছে প্রীতমের সঙ্গে হরদিতের দেখা হয়ে যায়। প্রীতম ঈষৎ লজ্জিতভাবে বলে, 'রাতে একটু মাত্রা চড়ে গিয়েছিল। এখন ঘুম থেকে উঠলাম। খেতির কাজে যেতে পারিনি। এই চুতিয়া মদ—' অশ্রাব্য খিস্তি করে প্রীতম।

'তোমাদের জন্যেই তো ভাইরূপা থেকে 'ইস্‌পিসাল' চার বোতল আনাই।' হরদিৎ বলে।

'য়্যাঁ! চার জনে চার বোতল? ভল্‌লে-ভল্‌লে। তবে মিলখা শালা বেশি খায়নি—' প্রীতম একটা হিসেব করতে বসে যায়।

'না। না। তোমরা তিন বোতল খেতে পেরেছ। এখনও এক বোতল আছে। চলবে?' হরদিৎ প্ররোচিত করে প্রীতমকে। কথাটা শুনে প্রীতমের চোখ প্রত্যাশায় চকচক করে ওঠে। তবুও ভদ্রতা করে জিজ্ঞেস করে, 'তিরথ ওটা নিয়ে যায়নি?'

'না। খেতে ইচ্ছে হলে, বলো। তিরথ ওটা আমার জন্যেই রেখে গেছে।'

প্রীতমকে আর বলতে হয় না। সঙ্গে সঙ্গে রাজি হয়ে যায়, 'চল তাহলে। শরীরটা চাঙ্গা হয়ে যাবে।'

'তুমি গিয়ে বাইরের ঘরে বসো। আমি কাজের লোকটাকে কালকের কাজ বুঝিয়ে দিয়ে যাব।'

'তার চেয়ে, একসঙ্গেই যাই আমরা। তুই কাজের লোকের সঙ্গে কথা বলে নে।'

একটু পরেই ওরা বাইরের ঘরে আসে। ঝান্ডা দরজার কাছাকাছি একটি লোকের সঙ্গে খাটিয়ার দড়ি বুনছিল। প্রীতমকে দেখে খুশি হয়: 'আরে, প্রীতম যে!' তারপরই স্নেহের সুরে, 'হারামজাদা কোথাকার— এখানে আসাই ছেড়ে দিয়েছিস একেবারে? খুব কাজে ব্যস্ত?'

'না, বড়ভাই— কাজে আর ব্যস্ত কোথায়—' প্রীতম আবোলতাবোল বকতে থাকে। মহা আপদ— এই বুঝি ঝান্ডা টাকার কথা তোলে! গিন্দরের জমি নিজের নামে নবীকরণের সময়, ঝান্ডার কাছ থেকে সে দু হাজার টাকা নেয়। পিঁয়াজ দেবে, এই চুক্তিতে। এত বছর হয়ে গেছে। টাকাটা এতদিনে নিশ্চয়ই ছ-সাত হাজারের আশপাশে পৌঁছে গেছে। ফেরত

দেওয়া শক্ত। আষাঢ়ী ফসলে হয়তো ফেরত দিতে পারত। কিন্তু একটা না একটা ঠেকায় পড়তে হয়েছে। ঝান্ডাও ছ সাত মাস অন্তর একটা করে নতুন কাগজ লিখিয়ে নিয়েছে। ঝান্ডার ইচ্ছে জমিটা নিয়ে নেওয়া। কিন্তু, প্রীতম গররাজি। প্রীতম ঝান্ডার পাশে বসে পড়ে। হরদিৎ উঠোনে খেতের কাজ করে আসা দেবু চামারের সঙ্গে কথা বলার জন্যে বারান্দায় নেমে যায়। ঝান্ডা আসল কথায় আসে: 'এবারের আষাঢ়ী — হেঁ হেঁ— বুঝলে না, ছোটভাই?'

'একদম আলাদা করে রেখে দেব—'

'কিন্তু, অনেক বছর হয়ে গেল যে! আমার চলে কী করে? একটা গতি করো—' বলেই নাতনিকে ডাকে, 'পুষ্পিন্দর! ওরে— ও পুষ্পিন্দর— চাচার জন্যে কমসে কম এক গ্লাস দুধ নিয়ে আয়!'

'না, না— বড়ভাই! আমি দুধ খেয়েই এসেছি।'

'পাগল!' ঝান্ডা স্নেহের অবতার বনে যায়, 'বাড়িতে এসেছিস। দুধ না খাইয়ে তোকে ছাড়তে পারি?'

প্রীতম না-না করে আপত্তি জানালেও, হরদিতের ছেলে হরিন্দর ঘরে ঢুকে একটি গ্লাস প্রীতমকে, অন্যটি গিলুকে, যে খাট বুনছিল, তাকে দেয়।

প্রীতম চুপচাপ দুধ খেয়ে গ্লাসটা রেখে দেয়। একটু পরেই হরদিৎ এসে প্রীতমকে ডেকে নিয়ে যায় ভেতরের ঘরে। ঝান্ডা বেরিয়ে যেতে আবার তারা ফিরে আসে। হরদিৎ বোতল খোলে। প্রীতমের গ্লাসে একটু বেশিই মদ ঢালে। প্রীতম এক চুমুকে সেটা শেষ করে অপেক্ষা করতে থাকে। হরদিৎ নিজের গ্লাসে মদের চেয়ে জল ঢালে বেশি। ভাব দেখায় যেন সমানে-সমানে টানছে। হরদিৎ বুঝে গেছে প্রীতমের অস্থিমজ্জায় এখন মদ ঢুকে গেছে। মদের জন্যে সে যে কোনও কাজই করতে পারে। বউ নন্দ, বাড়িতে দুটি যুবতী মেয়ে, এখনও বিয়ে হয়নি। ছেলে নেই। জমি বলতে নিজস্ব চার পাঁচ বিঘে, আর গিন্দরের কাছ থেকে হাতিয়ে নেওয়া ছ সাত বিঘে। সংসারে তবুও টান আছে। ঘাড়ে ঋণের বোঝা। সব মদে উড়িয়ে দেয় প্রীতম। আগে এত খেত না। হরদিতের কাকা অর্জুনই তাকে এইভাবে মদ ধরায়। টাকা না থাকলেই হরদিতের দ্বারস্থ হয় সে। তারপর, হরদিৎ ওকে ট্র্যাকটরে চাপিয়ে চলে যায় ভাইরূপায় নাজরের ঠেকে। টাকা কখনও হরদিৎ দিত, কখনও ধারের খাতায় নাম লিখিয়ে প্রীতম নিজেই কিনত। মাসে মাসে টাকা শোধ করত হরদিৎ, কিন্তু প্রীতমের হিসেবটা টুকে রেখে দিত। কিছুদিন পর, হরদিৎ নাজরকে টিপে দেয়, প্রীতমের চাহিদামতো মদ সে যেন দিয়ে যায়, আর টাকাটা যেন মাসে মাসে হরদিতের কাছ থেকে নিয়ে নেয়। এরপর আর প্রীতমকে দেখে কে! রোজ এক বোতল তো বাঁধাই ছিল— চারটি করে বোতল সঙ্গে নিয়ে যেত। যেন বিনাপয়সার মদ! মাস ছয়েক পরেই হরদিৎ প্রীতমকে হিসেবের খাতাটা দেখায়। এ-যাবৎ হাজার টাকা হরদিৎ নাজরকে দিয়েছে প্রীতমের হয়ে। মুকুন্দর দোকানে গিয়ে ওরা দেনাপাওনা লিখিয়ে নেয়। চুক্তি হয় পিঁয়াজের বিনিময়ে প্রীতম টাকা শোধ করবে। পরম ঔদাসীন্যে প্রীতম টিপসই দিয়ে দেয়।

সতেরো

কয়েক বছর হলো গ্রামে কোঅপারেটিভ সোসাইটি বসেছে। সদস্যও জুটেছে প্রচুর। গাঁ থেকে বেরোবার পথে একটা ব্যাংকও বসেছে। অভাবী চাষি কোঅপারেটিভ ব্যাংক থেকে ঋণ নেয়। আষাঢ়-শ্রাবণের ফসলে খেপে-খেপে ঋণ শোধ হবে কথা হয়। কিন্তু, বেশির ভাগই কিস্তির অর্ধেক দিয়ে চুপচাপ বসে থাকে। ঘরে ঘরে তাগাদা দিতে বেরিয়ে পড়ে ম্যানেজার স্বয়ং। কর্তাব্যক্তিরা লোকজনদের ব্যাংকে এনে ধমক দেয়। আইন আদালতের ভয় দেখায়। কিন্তু, কোনও [illegible] গাঁয়ের বাড়ি [illegible] কে বলে, 'এর চেয়ে বেনিয়াদের কাছ থেকে ধার করাই ভাল ছিল! কে [illegible] খেপায়। প্রীতম [illegible] টিওয়ালাদের মতো ঢ্যারা পেটায় না। শালা মানইজ্জত একেবারে [illegible] টের ওপর। এমন [illegible]

সোসাইটিওয়ালাদের কথা একটিই: বকেয়া শোধ না দিলে, জেলা সোসাইটি টাকা দেয় না। গাঁয়ের সোসাইটি নতুন সদস্য যোগাড় করতে উঠে পড়ে লাগে। জেলা সোসাইটির দপ্তরে চিৎকার চেঁচামেচি করে ঋণশোধের সীমা বাড়িয়ে নেওয়া হয়। টাকা আসে, বকেয়া আদায় করে নতুন কর্জ দেওয়া হয়। এই ফাঁকে, সোসাইটির ম্যানেজার এবং প্রবীণ মাতব্বররা বেশ কিছু টাকা আত্মসাৎ করে! অবশ্যই গাঁয়ের বেনিয়ারা সোসাইটিকে ভাল নজরে দেখে না। সোসাইটি ওদের ব্যবসা মাটি করে দিয়েছে। লাগে টাকা দেবে গৌরী সেন— সরকারকে ঝাঁজরা করে ছেড়ে দেবে, হ্যাঁ! টাকা ক-জন ফেরত দেবে? — কথাটা যে একেবারে মিথ্যে, তা নয়। কমিটি মেম্বার আর ম্যানেজারের যোগসাজশে কোনও কোনও জাঠের নামে দশ-পনেরো হাজার টাকা স্রেফ টিপসইয়ে গায়েব হয়ে যায়। যার নামে তোলা হয়, সে টেরও পায় না। ম্যানেজার সময়মতো কেটে পড়ে। মামলা মকদ্দমা চলে। এক সময় পুরো ব্যাপারটা ধামাচাপা পড়ে যায়। নতুন ম্যানেজার আসে। একই খেলা চলে নতুনভাবে। রাসায়নিক সার, নতুন বীজ, কীটানুনাশক সবই সোসাইটিতে আসে, কিন্তু আসার সঙ্গে সঙ্গে পাচার হয়ে যায় কমিটি মেম্বার আর তাদের বশংবদদের কাছে: এ যেন দুগ্ধবতী মহিষী; হাঁকডাকওয়ালারা পায় দুধ, আর আমজনতা পায় লস্যি! এ ছাড়াও, আরও নানা কারচুপির কারখানা এই সোসাইটি। চাষিরা ভেতর থেকে ফোঁপরা হয়ে যায়।

ওদিকে, বেনিয়ারা ধার দেয় আঁটঘাট বেঁধে। বকেয়ার কারবার নেই। খানদানি জাঠেদের বেনিয়ার কাছে হাত পাততে সংকোচ হয়। সোসাইটিতে সে বালাই নেই। সবার জন্যেই দরজা খোলা। বেনিয়া আর সোসাইটি— এই দুয়ের মধ্যে অভিনব এক সম্পর্ক। চাষিরা বেনিয়াকে পিঁয়াজ দিয়ে টাকা নিয়ে সোসাইটির দেনা শোধ করে। এ ছাড়া অন্য পথ নেই, কেননা কিস্তির টাকা আদায়ের জন্য সোসাইটি পুলিশ আনে। পুলিশ ত্রাণকর্তা হিসেবে গরিবগুরবোদের মারধোর করে, সর্বস্ব লুটেপুটে নেয়, টাকা ছিনতাই করে। ফলে ইজ্জত বাঁচাবার জন্যে জাঠ-চাষি বেনিয়াদের দ্বারস্থ হয়। ঝান্ডা ও হরদিৎ— সোসাইটির সঙ্গে আদায়-কাঁচকলা সম্পর্ক হলেও — ওপরে-ওপরে ভাবখাতির রেখে চলে। সোসাইটির কিস্তি শোধ করতে অপারগ, পুলিশি অত্যাচারে অতিষ্ঠ জাঠ চাষি ঝান্ডাদের পিঁয়াজ দিয়ে, সেই টাকায় দেনা শোধ করে।

পঞ্চায়েত সম্পর্কেও হরদিৎ খুব একটা উৎসাহী নয়। পঞ্চায়েতে নির্বাচনের কথা শুনে লোক তো হেসে কুটিকুটি। এই জাতীয় কথা এই প্রথম তারা শোনে। নিজেদের মধ্যে

আলোচনা করে, পঞ্চায়েত তো জ্ঞানীগুণীদের জায়গা। সরকারি পঞ্চায়েত তো হবে লোচ্চা লাফঙ্গাদের আড্ডা! 'পঞ্চ' মানে ভগবান, তা সরকার কী 'ভগবান' বানাতে মন দিয়েছে? তোদিয়াল পাটোয়ারি চৌকিদারকে দিয়ে ট্যাঁড়া পেটায়, পঞ্চায়েত নির্বাচনে লোকজনকে আসতে বলে। 'সরপঞ্চ' অর্থাৎ পঞ্চায়েত প্রবীণকে নির্বাচিত করা হবে। প্রার্থী তিনজন ! পাখর নম্বরদার, মুকুন্দ বেনিয়ার ছেলে রমেশ ও মহঙ্গা চামার। ইসকুলের মাঠে গাছের নিচে সব বসে। পাটোয়ারি প্রথমে পাখরের নাম ঘোষণা করতে, সব হাত তুলে হই-হই করে সমর্থন জানায়। পাটোয়ারি গোনে: চল্লিশ হাত। রমে[illegible] ষাট হাত, মহঙ্গার নামে তিরিশ। অতএব রমেশ নির্বাচিত। বুদ্ধিমানেরা চলে কী করে এসেছিল আশি-নব্বই জন, কিন্তু এত হাত কোথা থেকে এলো? মানে চাচার জনেই দু হাত তুলেছে! কেউ কেউ নিশ্চয়ই তিনবার! অর্থাৎ, ব্যাপারটা মজার খোরাক হয়ে দাঁড়িয়েছিল। পাটোয়ারি স্রেফ হাতই দেখেছে, হাতের মালিককে দেখেনি। এইভাবে পঞ্চায়েত-সদস্যও নির্বাচিত হয়ে যায়। পাঁচজনের একটা দল মাঠে দাঁড়াতে, যাদের মধ্যে যে দু জনের সমর্থনে বেশি হাত ওঠে, তারাই নির্বাচিত হয়।

এর ঠিক বছর পাঁচ-ছয় পর ঠিকমতো ভোটাভুটির মাধ্যমে পঞ্চায়েত প্রতিষ্ঠিত হয়। সরপঞ্চ নির্বাচিত হয় মিলখা ফৌজি। পাঁচ সদস্যের মধ্যে হরিজন মহিলাও থাকে। নির্বাচিতদের মধ্যে মল্লণ ও প্রীতমও থাকে। ব্রাহ্মণ বেনিয়া ও অন্যান্যদের পক্ষে গৌদি নির্বাচিত হয়। এই তিনজন ছাড়া থাকে মুকুন্দ, পাখর ও নম্বরদার। হরদিৎ সম্মুখসমরে না নামলেও, নেপথ্যে কলকাঠি নেড়ে যায়। বুঝতে পারে, সময়ের দৃশ্যপট বদলে যাচ্ছে। যার জন্যে মিলখাকেও যেমন হাতে রাখে, প্রীতম-পাখরকেও হাতে রাখে। যাদের জমি তার কাছে বাঁধা, তাদের সে গোপনে জানিয়ে দেয়, সরপঞ্চের ভোট মিলখাকে, আর সদস্য-ভোট প্রীতম ও পাখরকে দিতে। যে-সব মজুর ও হরিজন তার কাছে কাজ করে, তাদেরও সে একই নির্দেশ দেয়, এ-ছাড়া, বশংবদদের মধ্যেও এই ফতোয়া জরি হয়ে যায়। হরদিলও হরদিতের কাছ থেকে জেনে যায়: কোটে খড়কের সরপঞ্চ 'আমাদের' লোক। দুই সদস্য পাকা কংগ্রেসি, যেমন হরিজন ও তার সঙ্গে নির্বাচিত অপরজন।

কয়েক বছর বাদে, গিন্দরের কাছ থেকে হাতানো জমি প্রীতম বাঁধা দেয়। টাকা খোলামকুচির মতো উড়িয়ে দেয় মদে। ঘরে দুই অবিবাহিত যুবতী মেয়ে — তাদের বিয়ে দেওয়ার কথা তার মনেও আসে না। তার ভাঙাচোরা কদাকার চেহারাটা দেখলে পাড়ার লোক অন্যদিকে মুখ ফেরায়। টিটকিরি দেয়, এমনকি মুখ খারাপও করে: 'শালা — ঘরে জোয়ান মেয়ে— শুয়োরের বাচ্চাটা এদিকে মাল টেনে ঘুরে বেড়াচ্ছে!'

শেষ অবধি প্রীতমের শালা— একই ঘরে যাতে দুই ভাগ্নীর বিয়ে হয়, এমন একটা সম্বন্ধ আনে। নন্দ কৌর ভাইয়ের কাছে কেঁদে পড়েছিল। ভাইও বোনের অনুরোধ ফেলতে পারেনি। পাত্র তো যোগাড় হলো, কিন্তু বিয়ের খরচ জোটানো হয়ে দাঁড়ালো বিরাট এক সমস্যা। তারপর, বিয়ের ঠিক আগেই প্রীতমের মা মারা গেল। অবিকল মল্লণের মতো অবস্থা। তবে মল্লণের মতো সাহস তার একেবারেই ছিল না। শ্রাদ্ধশান্তির খরচ, তারপর মেয়েদের বিয়েতে সামাজিক অনুষ্ঠানের খরচ ইত্যাদির ধাক্কা সামলাতে, গিন্দরের যে-জমি প্রীতমের দখলে ছিল, তার সবটাই সে বাঁধ দেয় হরদিতের কাছে। চার-পাঁচ বিঘে কোনও

রকমে থেকে যায়। খেতের কাজ অনেক অগেই ছেড়ে দিয়েছে। বাড়িতে এখন দুটি জীব। সে আর তার বউ। নন্দ কোনও ক্রমে দুটি রুটি বানায়, তাতেই দু জনের চলে যায়। এর মধ্যে প্রীতম একটা নতুন ধান্দা ধরেছে। মামলা মকদ্দমায় মিথ্যে সাক্ষী দেওয়া। স্রেফ এক বোতল মদ পেলেই হলো। দিনকে রাত, রাতকে দিন করার সাক্ষী দিয়ে-দিয়ে তার নিজেরই দিনরাত্রের জ্ঞান এখন লোপ পেয়েছে। গলির মুখে বেহুঁশ হয়ে পড়ে থাকে। জ্ঞান ফিরলে উঠে বসে নিজেরই মাথাটা চেপে ধরে। বিড়বিড় করে বকে: 'শালী! সব শালা যুগ্গি-ঝুপড়ি এবার উপড়ে ফেলব!' গাঁয়ের বাচ্চা ছেলেরা পেছনে লাগে। 'কৌরা' 'কৌরা' বলে তার পেছন-পেছন দৌড়য়, খেপায়। প্রীতম রাগে না, বরং হাসে অদ্ভুত এই কৌতুকে।

ঝান্ডা এখন ষাটের ওপর। এমন কিছু বয়স নয়, তবুও হঠাৎ একদিন শরীরের বাঁ দিকটা পঙ্গু হয়ে যায়। দুটি মাস খাটে শুয়ে থাকে। নানা রকমের চিকিৎসা চলে। সপ্তাহ খানেক বাদে রামপুরার বড় ডাক্তার আসে। কিছুদিন পর তাকে অল্প স্বল্প চলাফেরা করতেও দেখা যায়। হরদিৎ বাবাকে রোজ বাসে চড়িয়ে রামপুরামন্ডিতে নিয়ে যায়। বাবার পাশে বসে কাঁধটা ধরে থাকে। বাঁ দিকটা পুরোপুরি অসাড়। বাঁ দিকের চোখ অনেকক্ষণ ধরে বোজা থাকে, তারপর আপনা থেকেই খুলে যায়। তবে, কখন খোলে, কখন বোজে — তার ঠিক নেই। বাঁ পা কোনও ক্রমে মাটি ছুঁয়ে যায়। ডান হাতের লাঠি ভর করে অতি কষ্টে চলতে হয়। কষ্টেসৃষ্টে 'ব্যক্তিগত' কৃত্যাদি সারতে পারে। খাওয়াদাওয়া কমতে থাকে। কথাবার্তা বলে খুব ধীরে। সামনাসামনি হলে লোকে সহানুভূতি জানায়: 'কারও কোনো অপকার করেনি— বরং উপকারই করে এসেছে সবার। অথচ, ভগবান যত কষ্ট একেই দিচ্ছেন!' চৌপালে গেলে, হঠাৎ যদি কেউ বয়েসটা জানতে চায়, ঝান্ডার মনে হয় সামনে যেন যমদূত দাঁড়িয়ে আছে! ঝান্ডার আড়ালে সব বলে, 'হবে না! শুয়োরের বাচ্চাটা কত লোকের সব্বনাশ করেছে— কত অভাবীর জমি মেরে দিয়েছে— এর শাস্তি হবে না তো কার হবে? চলো শালা, পোঁদভাঙা কুকুরের মতো এখন লেংচে-লেংচে চলো! ভগবান কাউকে রেহাই দেয় না। পাপের শাস্তি হবেই, হুঁ!'

আঠারো

পাঞ্জাব এখন তিন টুকরো হয়ে গেছে। দিল্লির দিকে যে টুকরোটা পড়েছে, তার নাম হয়েছে হরিয়ানা। পাহাড়ি এলাকাটার নাম হিমাচল প্রদেশ। আর, ভাষাগতভাবে, পাঞ্জাবিভাষায় যেখানে লোকজন কথা বলে, তার নাম 'পাঞ্জাবি সুবা'। মজার ব্যাপার, পাঞ্জাবি বহু গ্রাম হরিয়ানার মধ্যেই থেকে গেছে। পাঞ্জাবের সংস্কৃতি যেন হরিয়ানার প্রকোষ্টবদ্ধ হয়ে যায়। পাঞ্জাবি সুবার সাংস্কৃতিক ব্যাখ্যায় বুদ্ধিজীবীরা কেঁদে কুল পান না। পাঞ্জাবের হাড়মাসের সঙ্গে যুক্ত হিমাচলিরা পাঞ্জাবি বললেও, বুদ্ধিজীবী ব্যাখ্যায় ওটি হয়ে যায় পাহাড়ি পাঞ্জাবি এবং উপভাষা। 'সুবা' শব্দটি যেন পাখির খাঁচায় ছোট্ট একটি কোনা। সাইকেলে করে

অনায়াসেই একদিনে এই প্রান্ত থেকে ওই প্রান্ত ঘুরে আসা যায়। কিন্তু চতুর বুদ্ধিমন্তেরা এসব নিয়ে মাথা ঘামান না। বিধান সভার নির্বাচনে অকালি দল জিতে যায়। সরকার গড়ে। সরকারে জনসংঘীরাও জায়গা পায়। এর আগে অকালি দলের সরকারে জন-সংঘী ও কমিউনিস্টরাও ছিল। দল-বদলের খেলাটিও বেশ জমাটি। যথারীতি, এক নতুন মুখ্যমন্ত্রী নির্বাচিত হন। বৈশিষ্ট্য হলো এই মুখ্যমন্ত্রীর নিজস্ব কোনও পার্টিটার্টি ছিল না, বরং তিনি নিজেই ছিলেন এক পার্টি। তাঁরই অনুগামীরা তাঁকে মুখ্যমন্ত্রী নির্বাচিত করেন। ভদ্রলোক কাজকর্মে ছিলেন খুবই সক্রিয়, কাজের। তাঁরই নির্দেশে— গ্রামের সংযোগ-পথটি বড় সড়কের সঙ্গে জুড়ে যায়। প্রত্যেক গাঁয়ে একটা করে ইসকুল বসে, বিদ্যুৎ যায় — অর্থাৎ উন্নয়নমূলক কাজ হতে থাকে। মুখ্যমন্ত্রী কোথাও গেলেই দরবার বসে যায়। লোকের অভাব-অভিযোগ শুনে মিটিয়ে দেওয়া হয়। মহকুমার আমলা কর্মচারীরা মুখ্যমন্ত্রীর দাপটে তটস্থ। মনে হয় যেন মহারাজ রণজিৎ সিং-এর পুনর্জন্ম ঘটেছে! বহু বছর মানুষ এই মুখ্যমন্ত্রীকে মনে রেখেছে। কিন্তু, যেহেতু এই সৎ ব্যক্তিটি কোনও রাজনৈতিক দলে ছিলেন না তাঁর মুখ্যমন্ত্রিত্বকে তাই গণতান্ত্রিক বলে মনে করা হয়নি। জনগণ বলে ব্যাপার, সেখানে 'গণতন্ত্র' না হলে চলবে কেমন করে? জনগণের দেখভাল করার জন্য চাই পার্টি। তাদের শাসনে জিনিসপত্রের দাম বাড়বে না। কালোবাজার থাকবে না। সব চট করে পাওয়া যাবে ইত্যাদি ইত্যাদি!

পাঞ্জাব নতুনভাবে গড়ার জন্যে অকালি সরকার তৈরি হয়, কংগ্রেসিরা ভোল পালটে অকালি বনে যায়। এমনকী ভাল-ভাল শিখ কংগ্রেসি-অকালি বলতে থাকে, 'খাদি কাপড়ে গা কুট-কুট করিয়ে লাভ কী? বাজারে যখন পপলিন-টেরিলিন আছে?' হরদিল কংগ্রেসি টিকিট দুবার মন্ত্রিত্ব করার পর, আর যেই টিকিট পেল না, ব্যাস, হয়ে গেল অকালি এম এল এ! একেবারে রাতারাতি দেখাদেখি, সারা গাঁ নীল পাগড়ি মাথায় চাপায়। কেননা হরদিল বলেছে, 'আগে আমরা ছিলাম ফালতু শিখ— এখন আস্‌লি শিখ!' এম এল এ হলেও হরদিলের দাপট কিন্তু কমে না। মুখ্যমন্ত্রী ও অন্যান্য মন্ত্রীরাও তার পরামর্শে ওঠ-বস করে। মহকুমার শাসক তোয়াজ করে চলেন। হরদিল বশংবদদের নিয়ে চন্ডিগড়ে যাতায়াত করে। এম এল এ হোস্টেলে থাকে— সব খরচই আসে পরের মাথার কাঁঠাল ভেঙে, এমনকি হুইসকির বোতলও। গোলমালে আটকা পড়া মানুষের ঘাড় ভেঙেই এইসব খরচ আসে। এই জাতীয় লোকেরা একদিন আগে এসেই ব্যবস্থাপত্র করে রাখে, পরের দিন হরদিল সদলবলে হাজির হয়। কারও কাজ হয়, কারও হয় না। এসব নিয়ে অবশ্য হরদিল মাথা ঘামায় না। দরকারই বা কী? মন্ত্রী থাকাকালীন সে প্রচুর জায়গাজমি টাকাকড়ি করেছে। নিজের গাঁয়ে আশি বিঘে জমি। আর কী চাই? বাপের ছিল স্রেফ পনেরো বিঘে। এখন, আশি বিঘে ছাড়াও হরদিলের পেল্লায় একটা বাড়িও হয়েছে। রামপুরায় একটা বাঙলোবাড়িও হাঁকিয়েছে। ছেলে এম বি বি এস করে রুরাল ডিসপেনসারিতে ডাক্তারি করে। এখনও বিয়ে হয়নি। দুই মেয়ে বি এ-র পর বি এড করে এখন শিক্ষিকা। বিয়েও হয়েছে ভাল ঘরে। জামাই সরকারি আমলা। হরদিল থাকেও বেশ ঠাটেবাটে। লোকে 'সর্দার' বলে সেলাম ঠোকে। কে বলবে, এই হরদিলের বাবা ছিল এক নগণ্য চাষি, সারা বছর দেনার দায়ে মহাজনের কাছে মাথা বিকিয়ে রাখত?

মল্লণ হঠাৎ একদিন হরদিতের কাছে আসে, 'ছেলেটার একটা চাকরি জুটিয়ে দাও ভাই, হরদিলকে ব'লে— তোমার তো ভাবখাতির আছে হরদিলের সঙ্গে। কথা এড়াতে পারবে না।'

হরদিৎ তৎক্ষণাৎ রাজি, 'আরে — তুমি তো আমার ঘরের লোক। বলকারকে পাঠিয়ে দাও। যেদিন বলবে সেদিনই ওকে নিয়ে যাব।'

হরদিতের আশ্বাসে মল্লণ খুব খুশি। বলে, 'যে কোনও কাজ হলেই চলবে। নিজের খরচটা চালাতে পারলেই হলো। আমি আর কতদিন?'

বলকার ভাটিন্ডা থেকে বি এসসি পাশ করেছে। প্রথমে শহরতলিতে একটা কামরা ভাড়া করে থাকে। সঙ্গে এক বন্ধু-ও থাকত। প্রত্যেক মাসে গাঁয়ে এসে বাবার কাছ থেকে খরচ নিয়ে চলে যায়। পড়াশোনার ব্যাপারে বলকার চিরকালই মনোযোগী। বি এসসি-তে ফার্স্ট ডিভিসন হয়। এর পরই সে কামরা ছেড়ে চলে যায়। মাঝেমধ্যে গাঁয়ে এসে দু চারদিন থেকেই হঠাৎ উধাও হয়ে যায়। এমনিতেই চুপচাপ. বৈঠকখানায় বসে দিনরাত ধরে কি যেন পড়ে। কী পড়ে, কেউ জানে না। মল্লণ বা চাঁদও ছেলে কি পড়ছে এত মন দিয়ে— আঁচ করতে পারত না। বেশির ভাগ সময়েই থাকে গাঁয়ের বাইরে। জিজ্ঞেস করলে জবাব দেয়, ভাটিন্ডার পুরনো ঠিকানাতেই সে আছে। চাকরিবাকরি খুঁজছে বটে, সুবিধে করতে পারছে না। মাসিক খরচ অগের মতোই নেয় বাবার কাছ থেকে। মা বলে, 'ভাটিন্ডায় গিয়ে কী হবে? তুই এখান থেকেই তো চাকরির খোঁজখবর নিতে পারিস।' বলকার এ জাতীয় প্রশ্নের উত্তর এড়িয়ে যায়। মল্লণ একদিন ক্ষুব্ধ হয়ে বলে, 'চোদ্দ ক্লাস পাশ করেও এখনও কিছু জোটাতে পারলি না? টো-টো করে ঘুরে বেড়াচ্ছিস শুধু! কতদিন তোকে ঘরে বসিয়ে খাওয়াব, য়্যাঁ?'

এরপর বলকার আর গাঁয়ে আসেনি। মা-বাবা ভেঙে পড়ে। কড়া কথা বললে কি হবে, হাজার হোক ছেলে, নাড়ির টান যাবে কোথায়? এই কারণেই মল্লণ হরদিতের কাছে যায়। যদি বলকারের একটা হিল্লে হয়। একটা চাকরি পেলেই সব ঠিক হয়ে যাবে। চাকরির পর সংসার, ভাল সম্বন্ধ জুটবে। বাড়িতে নতুন বউ আসবে। বন্ধকী জমিটাও আস্তে আস্তে ছাড়িয়ে নেওয়া যাবে। মল্লণ স্বপ্ন দেখে। জীবনের সব গ্লানি, সব দুঃখ চলে যাবে। এরপরই একদিন, মল্লণ হরদিলের সঙ্গে রামপুরা যায়। হরদিল নেই— নিজের গ্রামে গেছে গম দেখতে। রামপুরা থেকে হরদিৎ ও মল্লণও এবার হরদিলের গ্রামে গিয়ে পৌঁছয়। অপেক্ষা করতে হয়— হরদিল এখনও খেত থেকে ফেরেনি। ফেরে দুপুরের দিকে। এদের দেখে এক গাল হেসে স্বাগত জানায়। হরদিৎ মল্লণের পরিচয় দিয়ে বলে, 'আমাদের লোক। ছেলেটা বি এসসি করে বসে আছে— চাকরিবাকরি পাচ্ছে না—'

'বেশ তো। আমার কাছে নিয়ে এসো। আমি চন্ডিগড় যাচ্ছি— মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলে তোমার ছেলেকে কোথাও না কোথাও ঠিক ভিড়িয়ে দেব।'

মল্লণ হাত জোড় করে কৃতজ্ঞতা জানায়। মনে হয়, হরদিতের সুপারিশ মঞ্জুর হয়ে গেছে। হাত মুখ ধুয়ে হরদিল ওদের সঙ্গেই রুটি খেতে বসে যায়। প্রথমে মৃদু আপত্তি জানালেও মল্লণ খায়। এমনকি দুটো রুটি বেশিই খায়। সর্ষে-শাক মাখন আচার টক-লস্‌সি — বেশ ভূরিভোজ। ফেরার পথে, হরদিৎ ও মল্লণ অনেক গল্প করে। সন্ধ্যের দিকে গ্রামে

ফিরে আসে। চাঁদও খবর শুনে খুশি। ছেলেটার তাহলে একটা গতি হবে। লেখাপড়া শেখাটা ফালতু যাবে না।

মল্লণ এর আগে দুবার ভাটিন্ডা আসে। রামদাস, যার সঙ্গে বলকার থাকত, সে খুবই পরিচিত। রামদাস ব্রাহ্মণ, বাড়ি মুদেড় গাঁয়ে। খুব শান্ত বিনয়ী। হরদিলের সঙ্গে কথা বলে মল্লণ ছেলের খোঁজে ভাটিন্ডায় ফের যায়। বলকারকে সঙ্গে নিয়ে আসবে। রামপুরায় হরদিলের বাঙলোয় পৌঁছে দেবে।

উনিশ

মল্লণ ভাটিন্ডায় পৌঁছয়। বাসস্ট্যান্ড থেকে কিছুটা হাঁটা পথ। সিংদরজাওয়ালা বিরাট বিরাট বাড়ি। বলকারের বাসাটা ডান দিকে। ডান দিকের গলি ধরে কিছুটা এগোলে ইসকুল। দু একটি ছাত্রকে বেরোতে দেখা যায়। স্কুলের পাশেই বলকারের বাসা। মল্লণ খুঁজে-খুঁজে বাসার সামনে আসে। দরজার কাছেই রামদাস দাঁড়িয়ে। মল্লণকে দেখেই সে সম্ভাষণ জানায়: 'সৎশ্রী আকাল!' দু চারটে প্রাথমিক কথাবার্তার পরই মল্লণ জিজ্ঞেস করে, 'বিল্‌লু কোথায়?'

'বলকার তো এখন এখানে থাকে না, বাপুজি।'

'য়্যাঁ? কোথায় থাকে তাহলে?'

'তাতো জানি না। তবে মাঝেসাঝে, আমাকে তো বলেছিল, গাঁয়েই থাকে আজকাল। দিন পনেরো আগে এসেছিল।'

কথা বলতে বলতে রামদাস স্টোভ জ্বালে, 'একটু চা করি — খেয়ে যাবেন।'

'না ভাই — এখন আর চা খাব না। তুই বরং আমার একটা কাজ করে দে— এবার বিল্‌লু যেদিন আসবে, ওকে বাড়ি যেতে বলিস। আমি এসেছিলাম ওর খোঁজে— এটাও বলে দিস। জরুরি কাজ আছে — ও যেন নিশ্চয়ই গাঁয়ে আসে।'

রামদাস একটু হকচকিয়ে যায়। বলকার তাহলে আছে কোথায়? মল্লণ আনমনেই চা খেতে থাকে। রামদাসকে জিজ্ঞেস করে, 'তোর এখন কোন্ ক্লাস?'

'চোদ্দ ক্লাসের শেষ বছর।'

'কিন্তু তুই তো বিল্‌লুর সঙ্গে পড়তিস এক ক্লাসে?'

'গত বছর পাশ করতে পারিনি।'

'ও। তাহলে এবার মন দিয়ে পড়াশোনা কর। আজ উঠি, তাহলে?'

হতাশ বিষণ্ণ মল্লণ বাসস্ট্যান্ডে আসে। বিল্‌লু তাহলে থাকে কোথায়? রামদাসও একই কথা ভাবে মল্লণ যাওয়ার পর।

এই ঘটনার ঠিক পাঁচ-সাত দিন পর দুই পুলিশ আসে মল্লণের বাড়িতে। চাঁদ তাদের চা খাইয়ে অপ্যায়িত করে। মল্লণ বাড়ি নেই— ভাইরূপার খেতে। চাঁদ পাড়ার একটি

ছেলেকে পাঠিয়ে তাকে ডাকায়। মল্লণ পুলিশ দেখেই সন্ত্রস্থ হয়ে ওঠে। মনে হয়, পায়ের নিচে থেকে মাটি সরে যাচ্ছে। যেন এখনই মুখ থুবড়ে পড়বে। পুলিশ ওয়ারেন্ট এনেছে বলকারকে ধরার জন্যে। চেয়ারম্যান সঙ্গারা সিংকে খুন করার অভিযোগ। অভিযুক্তদের মধ্যে আরও অনেকের নাম আছে। সেদিনের মধ্যেই বলকার যদি থানায় গিয়ে আত্মসমর্পণ না করে, তাহলে পুলিশ এসে বাড়িশুদ্ধু সবাইকে তুলে নিয়ে যাবে। পুলিশ চলে যেতে স্বামী-স্ত্রী কান্নায় ভেঙে পড়ে। কী সর্বনাশই না করল ছেলেটা! মল্লণ বলে, 'ভাটিন্ডায় ওকে না পেয়ে আমার মনে একটা খটকা লেগেছিল।'

চাঁদ প্রবোধ দেয়, 'অন্য কেউ হয়তো ওর নাম দিয়ে দিয়েছে। আমাদের বিল্লু এমন সাংঘাতিক কাজ করতে পারে না। আত্মীয়স্বজনদের খবর দাও— নিজে যাও, দেখো ছেলেটা কোথায় আছে।' চাঁদ কিছুতেই বিশ্বাস করে না, বলকার এমন কাজ করতে পারে। মল্লণ আত্মীয়স্বজনদের বাড়ি-বাড়ি গিয়ে খোঁজ নেয়। ফিরে আসে চারদিন পরে। আশা ছিল ধুরকিট কি মৌনিবাধে একটা খবর পাবে। কিন্তু, কোনও খবর কেউ দিতে পারে না। ননিহালেও কেউ কিছু জানে না। কোথায় যেতে পারে সে? পিসি মাসিও নেই যে, তাদের বাড়ি গিয়ে উঠবে। মল্লণ ভেবে পড়ে।

কয়েকদিন পরেই পুলিশ আসে। জিপ আর ট্রাকে। মল্লণের বাড়িটা ঘিরে ফেলে দরজার ওপর লাঠির বাড়ি মারতে থাকে। তারপর কিল চড় ঘুষি লাথি মারতে-মারতে মল্লণ আর চাঁদকে বের করে আনে। তন্নতন্ন করে খানাতল্লাশি চালিয়েও বাড়ির মধ্যে আপত্তিকর কিছু পাওয়া যায় না। না বই, না পত্রিকা, না কাগজপত্র। থানার বড়বাবু নাগাড়ে গালিগালাজ করে, 'বল্ শুয়োরের বাচ্চা, খানকির ছেলে, বলকার কোথায়?' গালাগাল দিতে দিতেই বড়বাবু সজোরে লাঠির ঘা দেয় মল্লণের পিঠে। চাঁদকে এক থাপ্পড়ে মাটিতে ফেলে দেয়। একটা পুলিশ আবার মুখ থুবড়ে পড়া চাঁদের পা দুটো ধরে, মরা কুকুরকে যেমন মাটির ওপর দিয়ে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে যাওয়া হয় — সেইভাবে পাঁচ সাত গজ টেনে নিয়ে যায়। চাঁদ কাঁদতে-কাঁদতে হাত জোড় করে, 'দোহাই হুজুর— আমরা কিছু জানি না। বলকার কয়েক মাস বাড়িতে আসেনি।'

পঞ্চায়েতের লোকজনও অনুরোধ জানায়: 'হুজুর! কেন এই বুড়োবুড়িকে মারছেন? এদের কী দোষ? বলকার গাঁয়ে এলে আমরাই আপনাকে খবর দেব — এদের ছেড়ে দিন—'

পঞ্চায়েতের অনুরোধে পুলিশ মারধোর বন্ধ করে বটে, কিন্তু বুড়োবুড়িকে ট্রাকে তুলে থানায় নিয়ে আসে। তিন রাত আটকে রাখে ফুলের লক-আপে। মল্লণকে উলঙ্গ করে জুতো পেটা করে যায় এক নাগাড়ে। মেয়ে-পুলিশ চাঁদকে ক্রমাগত চড় থাপ্পড় ঘুষি লাথি মেরে চলে। কিন্তু, ওদের মুখ থেকে কিছু জানা যায় না। যাবেই বা কী করে? ওরা সত্যিই তো কিছু জানে না।

মল্লণের অনুপস্থিতিতে বাড়ির পোষা গোরুটির অবস্থা হয় মারাত্মক। রাতে, প্রচন্ড খিদেয় চিৎকার করে এক গাদা নাদের ভেতর থেকে বেরিয়ে আসার চেষ্টা করে। প্রতিবেশীদের একজন তাড়াতাড়ি অবোধ পশুটিকে বের করে নিজের বাড়িতে নিয়ে যায়। একটা তালা এনে মল্লণদের সদর দরজাটি আটকে দেয়। চার দিনের দিন মল্লণ আর চাঁদ

ছাড়া পায়। ঘরের বিধ্বস্ত ছত্রখান অবস্থা দেখে তাদের কান্না পায়। লজ্জায় অপমানে মাটির সঙ্গে মিশে যেতে ইচ্ছে করে। এমন ছেলে কীভাবে জন্মাল? ছিঃ ছিঃ!

সঙ্গারা সিং-এর বয়েস হয়েছিল সত্তরের আশপাশে। জেলা পরিষদের প্রাক্তন চেয়ারম্যান। যৌবনে, সঙ্গারা ভগৎ সিং-এর বিরুদ্ধে মিথ্যা সাক্ষী দিয়েছিল। শত্রুর মুখে ছাই দিয়ে সারা জীবন খুব মৌজে কাটিয়েছে। সেদিন সন্ধ্যের দিকে সঙ্গারা ট্র্যাকটরে চেপে গাঁয়ে ফিরছিল শহর থেকে। ট্র্যাকটর চালাচ্ছিল ড্রাইভার। চেয়ারম্যানের গলায় একটা রিভলবার ঝোলানো। তিনজন কমবয়েসী ছেলে দাঁড়িয়েছিল রাস্তার ঢালে, সরকন্ডির মাঝামাঝি একটা ঝোপের আড়ালে। ট্র্যাকটর এগিয়ে আসতেই, তিন জনের একজন বেশ পাকা হাতে রাইফেলে ব্ল্যাংক-ফায়ার করে। ড্রাইভারের হাত থেকে স্টিয়ারিং বেরিয়ে যায়। ট্র্যাকটর ঢালের মুখে গড়াতে থাকে। নাদুসনুদুস চেয়ারম্যান ঘাবড়ে গিয়ে রিভলবারটা ধররার চেষ্টা করতেই, কাঁধে একটা গুলি লাগে। আর একটা গুলি এসে লাগে বুকে। ড্রাইভার চলন্ত ট্র্যাকটর থেকে নেমে দৌড়তে লাগে। ছেলেরা কিন্তু কেউ ওকে তাড়া করে না। চেয়ারম্যান সঙ্গারা কোনও রকমে নিঃশ্বাস ফেলে বলে, 'আমাকে ছেড়ে দাও। এখনও বেঁচে যেতে পারি। যত টাকা চাও, দেব।' ওরা ততক্ষণে সঙ্গারাকে টেনে হিঁচড়ে নামিয়ে ফেলে। মুখে কয়েক ঘা জুতোও মারে। চোখে বালি ছিটিয়ে তীব্র ঘৃণায় বলকার জবাব দেয়: 'কুত্তার বাচ্চা! ভেবেছিলি সবাই ভুলে গেছে তোর কীর্তি? আজ চল্লিশ বছর পর তোর সাজা হলো', পর মুহূর্তেই বলকার সঙ্গারার কান লক্ষ করে গুলি চালায়। সঙ্গারার নিষ্পন্দ দেহটা পড়ে থাকে।

দলের ওই তিনজনের প্রত্যেক মাথার সরকারি দাম এখন পাঁচ হাজার টাকা করে। ওদের যারা ধরে দেবে, বা ধরার ব্যাপারে সাহায্য করবে, তাদের পুরো নিরাপত্তার দায়িত্ব সরকার নিয়েছে। কোটেতে সব খবরই পৌঁছে যায়। একদিন একটা আজব খবর পায় সবাই।

রামমন্ডির কাছে কামালু গাঁয়ের এক বাড়িতে পুলিশ হানা দেয়। বাড়ির চারদিকে পুলিশ। সামনে পেছনে ছাদে — এমনকী আশপাশের বাড়ি ছাদ ও দরজায়। ওই বাড়ির ছেলেটি বলকারের বন্ধু। বলকার ওখানে মাঝেমধ্যে আসে — রাতে থেকে ভোরে চলে যায়। সেদিন বন্ধু বা বন্ধুর স্ত্রী বাড়িতে ছিল না। ছিল শুধু বুড়ি মা। চতুর্দিকে পুলিশ দেখে, বুড়ি সিন্দুক খুলে বউয়ের সালোয়ার কামিজ বের করে বলকারকে পরিয়ে দেয়। সেই সঙ্গে নিজের শাল ও জুতো। ঠিক বউয়ের মতোই তাকে সাজিয়ে পুলিশকে বলে, 'ওরে, তোরা যাকে ধরতে এসেছিস, সে তো নেই। আমি বউকে নিয়ে একটু 'জঙ্গলপানি' করতে যাচ্ছি— তোরা ততক্ষণ খোঁজাখুঁজি কর— চ মেয়ে—'

বুড়ি এইভাবে বলকারকে নিয়ে খেতে চলে আসে। বলে, 'যা বাবা— বাঘের মুখ থেকে ছাড়া পেয়েছিস। এখন তোর কপাল!'

আর একটা খবর আসে। কোটের কাছাকাছি শাহিকি খেতে কিছু লোক গাছ কাটছিল। সূর্য ডুবে গেছে। পুলিশ খবর পেয়েছে বলকার শাহিকি গাঁয়ে ঢুকেছে। পুলিশের ট্রাক শাহিকিতে চক্কর মারে, কিন্তু বলকারকে পায় না। এদিকে, পুলিশ আসার খবর পেয়ে বলকার চলে আসে খেতে, লোকগুলো যেখানে গাছ কাটছিল, সেখানে। তাদের বলে, 'আমি কোটের বলকার। পুলিশ তাড়া করেছে।' ট্রাকটাও দূরে দেখা যায়। পরিচয় পেয়েই

লোকজন তাকে কেউ নিজের পাগড়ি, নিজের কুর্তা চাদর ইত্যাদি পরিয়ে দেয়। তারপর, তার মাথায় আগুনভর্তি একটা উনুন চাপিয়ে— পুলিশ যেদিক দিয়ে আসছিল, সেই দিকে পাঠিয়ে দেয়। মাথায় উনুন চাপিয়ে বলকার পুলিশের সামনে দিয়েই চলে যায়। মুখের ওপর জ্বলন্ত এক পাতার টুকরো এসে পড়ায়, পুলিশ তার মুখ ঠিকমতো দেখতে পায় না। পুলিশ, এবার যারা গাছ কাটছিল, তাদের ওপর হম্বিতম্বি শুরু করে। দু একটা চড় থাপ্পড়ও বসায়। জিজ্ঞেস করে, 'বল্ শুয়োরের বাচ্চারা— বলকারকে কোথায় লুকোলি? আমরা তাকে এদিকে আসতে দেখেছি—'

কিন্তু সবাই এক জবাব দেয়, 'আপনারা ভুল দেখেছেন হুজুর, এদিকে কেউ আসেনি। আপনারা দেখে নিন না! আমরা তো আর একটা আস্ত লোককে গিলে ফেলতে পারি না!'

কুড়ি

'আমরা স্বাধীন? দেশের উন্নতি হচ্ছে চটপট? রাস্তাঘাট বিদ্যুৎ রেল মোটর? বলি, উন্নতিটা কাদের হচ্ছে? পুঁজিপতিদের না সাধারণ মানুষের? আসলে, পুঁজিপতিরা এখন এককাট্টা। গরিব চাষি মজুর পঞ্চাশ পয়সার টিকিট কেটে বাসে উঠলে কী হবে, তাদের কাঁচা দেওয়ালের বাড়িতে কিন্তু চল্লিশ ওয়াটের বাল্‌ব জ্বলে। ব্যাস, এতেই দেশের উন্নতি হয়ে গেল? গরিব, পণ্ডিতজি, একই অবস্থায় আছে! ভগৎ সিংহ বলেছিলেন, হিন্দুস্থানের লড়াই হলো জমিদার-মধ্যবিত্তের লড়াই। এর লক্ষ খুবই সীমিত। কংগ্রেস পুঁজিপতিদের সঙ্গে মিলেমিশে ইংল্যান্ডের ওর আর্থনীতিক চাপ সৃষ্টি করে কিছু সুবিধে আদায় করতে চায়। দেশে যে কোটি কোটি মজুর কিষান আছে — তাদের স্বাধীনতা এভাবে আসতে পারে না।' গায়ে কম্বল জড়ানো, স্টেশনের একটা কাঠের বেঞ্চে বসে, বলকার কথাগুলো বলছিল বদ্রিনারায়ণকে। ফেব্রুয়ারির শেষ দিন। বলকারের মাথার চুল ছোট করে ছাঁটা। পাগড়ির বালাই নেই। চান করার সুযোগসুবিধে পেলে, মাথার ওপর হাত রেখে সে বলে ওঠে, 'হরি ওম।' রামপুরাফুল স্টেশন থেকে পাতিয়ালার গাড়ি ধরে দিনের দিন পৌঁছে যায়। গাড়ির জন্যেই বলকার অপেক্ষা করছিল। প্লাটফর্মের এদিক ওদিক ঘুরে বদ্রিও সেখানে আসে। তাকেও পাতিয়ালার গাড়ি ধরতে হবে। বদ্রি অবশ্য বলকারকে প্রথমটা চিনতে পারে না। বলকারই বলে ওঠে, 'মাস্টারজি! কোথায়?'

বদ্রি থেমে যায়, 'তোমাকে তো ঠিক চিনতে পারছি না—'

'পারবে। বোসো এখানে।'

বদ্রি বসে, কিন্তু বলকারকে তবুও চিনতে পারে না। বদ্রির কানের কাছে মুখ এনে বলকার বলে, 'আমি মল্লণ সিংহের ছেলে বলকার। তোমার গাঁয়েই বাড়ি।'

বদ্রি চমকে ওঠে। বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মতো সরে আসে। বলকার হেসে বলে, 'একী! কমরেড কমরেডকে ভয় পাচ্ছে! ঘুরে বসো। কিছু কথা বলব।'

বদ্রি থতমত খেয়ে যায়। আমতা-আমতা করে, 'না-না-ভয় পাব কেন? আমি মানে—' ঠিক কি বলবে, বদ্রি বুঝতে পারে না।

'কোথায় যাবে?'

'বারনালার দিকে।' বদ্রি জবাব দেয় কিন্তু বলকার কোথায় যাচ্ছে জিজ্ঞেস করে না। কিছু সময় দুজনেই চুপচাপ। প্লাটফর্মে ছড়ানো ছেটানো কিছু যাত্রী। এদিক ওদিক দেখে বদ্রি বলকারের কাছে সরে আসে। নিচু সুরে বলে, 'তুমি আমার গাঁয়ের ছেলে। তাই জানতে ইচ্ছে করে, এই পথ বাছলে কেন?'

'অন্য পথ নেই, মাস্টারজি। তোমাদের বাম-দক্ষিণপন্থী পার্টি পার্লামেন্ট নামে শুয়োরের খোঁয়াড়ে আটকে গেছে। ভোট দিয়ে বিপ্লব পৃথিবীর কোথাও হয়েছে?'

'তাহলে তোমরাই বিপ্লব আনবে, ঠিক করেছ?' বদ্রির উত্তরে শ্লেষ ফুটে ওঠে, 'ওই যে চেয়ারম্যান— যার এক পা কবরে ছিল — তাকে মেরেই কী তোমরা বিপ্লব, যাকে বলে 'ত্বরান্বিত,' করলে?'

'না। চেয়ারম্যানের রক্তটাই ছিল দূষিত। ভগৎ সিং-এর বিরুদ্ধে সাক্ষী দিয়েছিল। দুষিত রক্তের লোককে আমরা বাঁচতে দেব না। পুলিশের রক্তও তাই। কাজেই ওদের আমরা খতম করব। ওরা আমাদের কাজ আটকে দেয়।'

'কিন্তু — এইভাবে, তোমরা তো সাধারণ মানুষ থেকে দূরে চলে যাচ্ছ। প্রথম লোককে শিক্ষিত করো। সংঘর্ষের পথে এসো, তারপর—'

'বহুত খুব! বলি, তোমরা তো বিশ পঁচিশ বছর ধরে পার্টি চালাচ্ছ, কটা মানুষকে শিক্ষিত করেছ, শুনি? তোমাদের তাত্ত্বিক বিপ্লব এমন হাঁটু ভেঙে দ হয়ে গেছে কেন? পার্লামেন্টের খোঁয়াড়ে এক পাল শুয়োরের মতো ব্যা ব্যা করছ কেন? ভগৎ সিংহের কথা মনে পড়ে? — 'আমাদের লড়াই ততদিন চলবে, যতদিন না খেটে-খাওয়া মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হবে'— 'এই লড়াই নানা পথে, নানাভাবে হবে। কখনও উগ্র, কখনও গোপন, কখনও ভয়ংকর। এত ভয়ংকর হতে পারে যে জীবনমৃত্যু পরস্পরের সঙ্গে বাজি ধরবে।' এই হলো সার কথা কমরেড!'

গাড়ি আসার সময় হয়ে আসে। ভিড় বাড়ে। দু একজন ওদের বেঞ্চে এসে বসে। ওরা কথা থামিয়ে চুপ করে থাকে। গাড়ি এলে একই কামরায় ওঠে। দরজার কাছে দাঁড়িয়ে থাকে, বসে না। আশপাশে কেউ নেই দেখে আবার কথা শুরু করে। বদ্রি বলে, 'কথাগুলো হয়তো ঠিকই। কিন্তু এই বিপ্লব পৌঁছতে-পৌছতে তো আমাদের ভিটেমাটি ছাড়া হয়ে যেতে হবে। বুর্জোয়ারা জমি বাঁধা নেয়— না খেয়ে মরি আমরা। . . . অনেকদিন গাঁয়ে যাইনি। লোকজনের সঙ্গে দেখা হলে শুনতে পাই, সবাই জায়গাজিরেত খুইয়ে বসছে। গাঁয়ের সব জমি এখন ঝান্ডা সিং-এর কবজায়। বলশালীরা কমজোরিদের হাতেও মারছে, ভাতেও মারছে!'

'ঝান্ডা?' বলকার তার খোঁচা-খোঁচা গোঁফে হাত দেয়। তারপর বলে, 'সেইজন্যেই তো বলছিলাম মাস্টারজি— তোমার পার্টি ছেড়ে দাও। ওতে বিপ্লব আসবে না। আমার সঙ্গে পথ চলো।'

'না, ভাই। তোমার রাস্তাও ঠিক নয়, তোমাদের ওই 'খতম' রাজনীতিতে কিছু হবে না। সারা পাঞ্জাবের সত্তর-পঁচাত্তর জমিদার জোতদারকে মেরে কী হবে? পুরো দেশের পার্লামেন্ট ওদের সঙ্গে গাঁটছড়া বেঁধে আছে। এই কথা জনে জনে বোঝাতে হবে। শত্রুর হাত অনেক জোরালো। গরিবদের হাতে পার্লামেন্ট আনো, অবস্থাটাকে তৈরি করো।' বদ্রি তার রাজনীতি ব্যাখ্যা করে।

বলকার হাসে, 'অবস্থা তৈরি করতে হয় না। আপনা থেকেই আসে। আর বন্দুকের নল থেকেই বিপ্লব আসে।'

বদ্রি জবাবে বলে, 'তোমার ভাবনার সঙ্গে আমার ভাবনা মিলছে না। তবুও, তোমার সফলতা কামনা করি।'

হন্ডিয়া স্টেশন। খালি সিট পেয়ে দু জনেই বসে পড়ে। বদ্রি নেমে যায় বারনালায়। বলকার কয়েকটা স্টেশন পরে নামবে।

সন্ধ্যের দিকে রুটি বানানো শেষ করে চাঁদ বাসন মাজছে। মোতি তার শ্বশুরবাড়ি ধুরিকিটে গেছে। শ্বশুরবাড়িটি বেশ প্রতিপত্তিশালী। মারাঝের গুরুদেবও বেশ প্রভাবশালী ব্যক্তি। মল্লণ ঠিক করে, এদের সবাইকে নিয়ে এমন একটা কিছু করতে যাতে বলকার বেঁচে যায়। জেল হোক, ফাঁসি যেন না হয়। দরকার হলে ভাইরূপার জমিও বেচে দেবে। বলকারকে বাঁচানো যেতে পারে, এই ধরণের একটা আশা তার মনে আছে। পা টিপে-টিপে একটি ছেলে উঠোনে ঢোকে। রান্নাঘর থেকে চাঁদ জিজ্ঞেস করে, 'কে?'

'আমি, মা।' গলার স্বর অচেনা। চাঁদ রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে আসে। ছেলেটি বলে, 'মা— আমি বলকারের বন্ধু। বলকার আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছে— পরাগদাসের ডেরার কাছে যে পাঁচিল, সেখানে দাঁড়িয়ে আছে। আপনি কাউকে কিছু না বলে, চলে আসুন।' বলেই ছেলেটি চলে যায়।

চাঁদ পায়ে জুতো গলিয়ে, হাতে একটা বোরা নিয়ে, রান্নাঘরের জিনিসপত্র এদিক ওদিক করে, দরজা-জানালা যেমনটি ছিল, তেমনটি খোলা রেখেই বেরিয়ে যায়। পরাগদাসের ডেরা-লাগোয়া পাঁচিলের কাছে তিনটি অস্পষ্ট ছায়াশরীর। চাঁদের আলো থাকলেও, গাছের ছায়ায় জায়গাটা অন্ধকার। চেহারাগুলো বোঝার উপায় নেই। চাঁদ বলকারকে খুঁজে বের করার জন্যে ইতিউতি দেখে। মায়ের রকমসকম দেখে বলকার হেসে ফেলে। হাসির শব্দেই মা ছেলেকে চিনে, বুকের ওপর জড়িয়ে ধরে। গালে মাথায় চুমু খায়। অন্য ছেলে দুটি একটু দূরে সরে যায়। একজন বলে, 'বলকার— দেরি করিস নি। মার সঙ্গে কথা সেরে নে।' বলকার কিছু বলার আগেই চাঁদ ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠে, বলে, 'তোকে এত লেখাপড়া শেখালাম— সারাজীবন ধরে তোর বাবা হাড়মাস কালি করে গেল। আশা ছিল চাকরিবাকরি করে আমাদের টাহলির খেত তুই ছাড়িয়ে নিবি, তোর চাকরির জন্যে তোর বাবা হরদিলের সঙ্গে দেখা করে এলো, হরদিল তোকে ঠিক একটা চাকরির পাইয়ে দেবে বলেছে. . .'

বলকার মার কাঁধ ধরে বসিয়ে দেয়। তার সঙ্গীরাও বসে পড়ে। সামনের অন্ধকার রাস্তাটায় কিছু দেখা যায় না। পরাগের ডেরার দরজাটা বেশ একটু উঁচু। বলকার মার হাত ধরে বলে, 'অবুঝ হোয়ো না। গুরু গোবিন্দ সিং নিজের বাবাকে দিল্লিতে শহিদ করেছিল।

নিজের দুই ছেলের হাতে তলোয়ার তুলে পাঠিয়ে দিয়েছিল চমকৌর যুদ্ধে। গুরুমা-ও ছেলেদের তৈরি করেছিলেন সেইভাবে। মা, তোমার মনের মধ্যে যে সাহসটা আছে— সেই সাহসটাকে জাগাও। জেনো— আমি ঠিক পথেই যাচ্ছি। কোনও খারাপ কাজ করছি না।'

ছেলের কথা শুনে মা হাসে, অতি দুঃখেও হাসি পায়: 'আমি গুরুজির মতো কেমন করে হব রে? গরিব জাঠ আমরা, দিন আনি দিন খাই।'

'না মা— গুরু গোবিন্দের পথ ধরে আমরা চলতে পারি। জুলুম অত্যেচারের বিরুদ্ধে আমাদেরই রুখে দাঁড়াতে হবে। কংগ্রেসের ভারত সরকার আর অকালিদের পাঞ্জাব সরকার— দুই-ই এক। জায়গিরদার আর জোতদারের আস্তানা। ব্যবসায়ীদের রাজত্ব। বদ দুষিত রক্ত — এদের খতম না করে উপায় নেই। তুমি দেখে নিয়ো মা, আমরাই মুক্তি আনব পাঞ্জাবি চাষি মজুরের। সংশয় রেখ না — তুমি শুধু আমার মা নও, আমাদের প্রত্যেকের মা, পাঞ্জাবের প্রতিটি নওজোয়ানের মা!'

চাঁদ চোখের জল মোছে: 'ঠিক আছে বাবা— আমি তোদের প্রত্যেকের মা— পুলিশ থেকে দূরে থাকবি।'

'শাবাশ! এই তো মা!' বলকার আনন্দে মাকে জড়িয়ে ধরে, তারপর বলে, 'একটা কথা বলে যাই— আমার কী হবে, আমি জানি। যাই হোক না কেন, তুমি কিন্তু আমার জন্যে কেঁদ না।'

চাঁদ অতি কষ্টে কান্না চেপে রাখে।

তিনজনেই উঠে দাঁড়িয়ে চাঁদকে প্রণাম করে। তারপর, ছায়ার মতই অন্ধকারে মিলিয়ে যায়।

একুশ

একদিন রাতে বলকার দেবু চামারকে খবর পাঠায় খালের সাঁকোর ওপর দেখা করার জন্যে। দেবু ভয়ে ভয়ে আসে। বলকার বলে, 'আমাকে চিনিস তো? তুই হরদিতের কাছে কাজ করিস, না?'

দেবু ভয়ে জড়সড়। মাথা নেড়ে জবাব দেয়: 'হ্যাঁ।'

'হরদিৎকে আমার নাম করে বলিস, তোর হাত দিয়ে যেন পাঁচ হাজার টাকা পাঠিয়ে দেয়। কাল এই সময়। পুলিশ-টুলিশে খবর দিলে, পরশুদিনই ওর লাশ পড়ে যাবে। যা।'

দেবু মাথা নেড়ে পালায়। ফিরে তাকাবার সাহস অবধি পায় না। পরের দিন সে ফের আসে একটা ঝুলিতে টাকা ভরে। বলকারের সঙ্গে আরও দুজন আছে। কিছুদিন পর হরদিৎ জানতে পায়, বলকার ও তার দুই সঙ্গী কোটেতেই আছে। নারাঙ্গ চামারের ঝুপড়িতে রাতে থাকে। নারাঙ্গ ওখানে চামড়া-টামড়া শুকোয়। রোদ বর্ষার হাত থেকে রেহাই পাওয়ার জন্যে ওখানে একটি ঝুপড়ি বানিয়েছে। একটা দরজা, পাতা ছাওয়া ঘর। নম্বরদার পাখরের ছেলে

মেহের রুটি দিয়ে আসে। যোগাযোগের মাধ্যম নারাঙ্গ। রুটি খেয়ে ওই ঝুপড়িতেই ওরা খাট টেনে শুয়ে পড়ে। দু জনে শুলে, একজন পাহারায় থাকে। কোথা থেকে আসে, কখন যায় — কেউ জানে না। নম্বরদারও নাকী ওদের সঙ্গে মাঝেমাঝে দেখা করে! সাবধানও করে, 'গাঁয়ের মধ্যে ভুলেও ঢুকিস না। কে কখন চুক্‌লি করে ঠিক নেই!'

দেবুর হাত দিয়ে টাকা পাঠাবার পর থেকেই হরদিৎ ভয়ে ভয়ে থাকে। রাতে সদর দরজার ভাল করে তালা এঁটে দেয়। ঘরে সবাইকে সতর্ক সজাগ থাকতে বলে। বলকার কিংবা ওর দলবলের লোক জানে মেরে দেবে। একটু রেগেও যায় সে, কালকের ছেলে — এত দাপট!— লাঠিও না-ভাঙে, সাপও যাতে মরে, এই রকম একটা ফন্দি করতে হবে। আবার একটু ঘাবড়েও যায়। কাজ ভেস্তে গেলে তো প্রাণ যাবে!

একদিন, সূর্য ওঠার অগেই গাঁয়ের লোক দেখে পুলিশ সারা গাঁ ঘিরে ফেলেছে। পুলিশে-পুলিশে ছয়লাপ হয়ে গেছে। দশ হাত দূরে দূরে, রাইফেলধারী পুলিশ! প্রাইমারি স্কুলটার মাঠে একটা জিপ আর ট্রাক। স্কুলের বাইরেও দু তিনটে ট্রাক। চেয়ার টেবিল সব বাইরে বের করা— ডি এস পি, ও থানার বড়বাবু ছোটবাবুরা সেখানে বসে। কিছুক্ষণ পর চার পুলিশ বেধড়ক পিটুনি দিতে-দিতে চাঁদ আর মল্লণকে টেনে আনে। ডি এস পি স্বয়ং ডাণ্ডা দিয়ে মারে মল্লণকে। জ্ঞানহীন মল্লণ মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। মল্লণের অবস্থা দেখে চাঁদও জ্ঞান হারিয়ে মাটিতে পড়ে যায়। একটা পুলিশ মল্লণের মুখে জলের ঝাপটা মেরে জ্ঞান ফিরিয়ে আনে। ডি এস পি তার দাড়িটা সজোরে টেনে প্রশ্ন করে: 'বল্ শুয়োরের বাচ্চা— তোর ছেলে কোথায়?'

মল্লণ জোড় হাতে জবাব দেয়, 'জানি না, হুজুর।'

'তবে রে খানকির ছেলে! সোজা আঙুলে ঘি উঠবে না— ' ডি এস পি গর্জে ওঠে বীরবিক্রমে, পুলিশদের বলে, 'চল্ এর বাড়ি।'

চার পুলিশ দু দিক দিয়ে হাত ধরে মল্লণকে দাঁড় করায়। তারপর, হ্যাঁচড়াতে হ্যাঁচড়াতে নিয়ে যায় বাড়ির দিকে। পা কাঁপে, বুড়োবুড়ি হোঁচট খেয়ে পড়ে। হরদিৎ জানলেও, চাঁদ বা মল্লণ জানে না বলকার নারাঙ্গ চামারের ঝুপড়িতে থাকে। এছাড়া মেহের আর নম্বরদার ছাড়া আর কেউ কিছু জানে না। ডি এস পি পুলিশদের হুকুম দেয়, 'ঘরের মালপত্র বের করে ট্রাকে তোল। ঘরদোর ভেঙে দে।' পুলিশ লাঠি হাতে ঘরের মধ্যে ঢুকে যায়। ভাঙচোর শুরু করে দেয়। ট্রাকে মালপত্র উঠতে থাকে। গোরুর দড়ি কেটে দিতে, গোরুটা ভয় পেয়ে বাইরে দৌড় দেয়। ঘন্টা দুয়েকের মধ্যেই পুলিশ ঘরের দরজা-জানালা বসার ঘর রান্নাঘর ভেঙেচুরে তছনছ করে দেয়। তিরিশ জন পুলিশের সেই তাণ্ডব দেখে মল্লণ আর চাঁদ জ্ঞান হারিয়ে পড়ে যায় উঠোনে। পঞ্চায়েত, গ্রামের মান্যগণ্য, বুড়োবুড়ি, যুবক — প্রত্যেকে নীরবে এই তাণ্ডব দেখে যায়। কারও মুখে কোনও কথা ফোটে না।

পুলিশ আগের দিন খবর পেয়েছিল বলকার নাকী গ্রামে এসেছে। বলকারের খোঁজে তারা প্রতিটি বাড়িতে হানা দেয়, তল্লাশি চালায়। সন্দেহভাজনদের মারধোর করে, দাড়ি উপড়ে ছিঁড়ে দেয় কিন্তু বলকারের হদিশ পায় না। সেই রাগেই আজ তারা মল্লণদের বাড়ি ভাঙচুর করেছে। মালপত্র ট্রাকে তোলার পর, মল্লণ চাঁদ ও আরও কিছু লোককে তুলে নিয়ে পুলিশ চলে যায়। মল্লণদের ওপর জুলুমের এই চেহারা দেখে, অমানুষিক অত্যাচার

দেখে, সারা গ্রাম ভেতরে ভেতরে জ্বলে ওঠে। ভালমানুষেরা ভয়ে ভয়ে ঈশ্বরের নাম নেয়। আর হরদিৎ মনে মনে একটা মতলব আঁটে। যাতে কেউ না টের পায় সে কী করছে। চৌপালে আসতে পাখরের সঙ্গে দেখা হয় তার। এক পাশে বন্দুকটা রাখা, পাখর পাগড়ি বাঁধতে ব্যস্ত। নানা বিষয়ে ছড়ানো-ছেটানো কিছু কথা বলার পর, হরদিৎ খুব খাতির করে পাখরকে বাড়ি নিয়ে যায়। বৈঠকখানায় বসিয়ে একটি বোতল বের করে। হরদিৎ নিজের জন্যে একটা বোতল সর্বদাই রেখে দেয় বাড়িতে। দু পেগ চড়াতেই পাখর বকতে শুরু করে। কথায় কথায় বলকারের কথাও এসে পড়ে। হরদিৎ বলে, 'নম্বরদার — তুমি তো বুদ্ধিমান লোক। একটা বুদ্ধি বাতলাও দেখি—'

'এতে আর বুদ্ধি কী লাগবে? ছোকরা তো নারাঙ্গ চামারের ঝুপড়িতে আছে। তিনজন থাকে। বলো তো, এখুনই পুলিশে খবর দিতে পারি!'

'কাজটা করে ফেলো নম্বরদার! তোমার লাভ হবে। পাঁচ হাজার— না, না— তিনজনকে ধরিয়ে দিলে তুমি তিন পাঁচে পনেরো হাজার পাবে—'

হরদিৎ আড়চোখে দেখে। নম্বরদারের চোখ লোভে চকচকে হয়ে উঠেছে। কথাটা তার মনে ধরেছে। আর একটু মদ দিয়ে হরদিৎ বলে, 'একটু বসো। আমি এখনই আসছি।'

'আয়। তবে আর মাল আনিস না। বহুত খাওয়া হয়ে গেছে।' নম্বরদার খাটিয়ার ওপর এবার শুয়ে পড়ে। হরদিৎ একটু পরেই ফিরে আসে। হাতে কুড়িটা একশো টাকার নোটে দু হাজার টাকা, আর একটা মদের বোতল। নম্বরদারের চোখের ওপর সে নোটগুলো চক্রাকারে ঘোরায়। করকরে তরতাজা নোট দেখে নম্বরদারের চোখ যেন ঠেলে বেরিয়ে আসতে চায়। হরদিৎ নোটগুলো নম্বরদারের পকেটে গুঁজে দেয়: 'এটা রাখো— আরও দেব। পনেরো হাজার তো সরকার দেবে। চিফ মিনিস্টার তোমার বাড়ি আসবে। দেখবে তোমার মানইজ্জত কত বেড়ে গেছে! টাকাটা কাজে লাগবে তোমার, তোমার বাড়ির কাজ তো এখনও বাকি। আমি এখনই ট্র্যাকটর স্টার্ট করে তোমাকে দয়ালপুরা নিয়ে যাচ্ছি — কেউ জানতেও পারবে না।'

হরদিৎ দয়ালপুরা থানা থেকে একটু দূরে ট্র্যাকটর থামায়। পাখরকে বলে, 'যাও, কাজটা সেরে এসো। রাতে থানাতেই থেকো। কিন্তু আমার নাম কাউকে বলবে না।'

এরপর, পুলিশ প্রায় ঝড়ের গতিতে নারাঙ্গ চামারের ঝুপড়ি ঘিরে ফেলে। প্রহরারত ছেলেটিকে জখম করে, অন্য দুজনকে ধরে ফেলে। বলকারের কাছে ছিল রিভলবার। অন্য দু জনের কাছে রাইফেল। খাটের নিচে কার্তুজ গ্রেনেড ইত্যাদি। পুলিশ কখন এলো, কখন গেল, কেউ টেরও পেল না। নম্বরদার পাখর পুলিশের জিপে এসে ঝুপড়িটা ইশারায় দেখিয়ে দিয়ে বাড়ি গিয়ে শুয়ে পড়েছিল।

পুলিশ ওই তিনজনকে এক গোপন জায়গায় নিয়ে গিয়ে প্রচন্ড মারধোর করে। অমানুষিক অত্যাচার করে। কাগজে খবর বেরোয়: 'নকশালপন্থী বলকার ও তার দুই সঙ্গ ী পুলিশের হেফাজত থেকে পালিয়েছে।'

দিন চারেক পরে সাধনিয়ার সাঁকোর কাছে ওই তিনজনের লাশ পাওয়া যায়। জানা যায়, খুব ভোরবেলায় সূর্য ওঠার আগে পুলিশের সঙ্গে 'সংঘর্ষে' ওরা নাকী মারা গেছে। বলকারের রিভলবার, অন্য দুজনের রাইফেল— যেমনটি ছিল, ঠিক তেমনটিই আছে।

লোকে ভেবে পায় না, পুলিশের হেফাজত থেকে পালালে, এগুলো তাদের কাছে ফেরত আসে কী করে।

পোস্টমর্টেম হয় ফুলে। বলকারের লাশ গ্রামে এসে পৌঁছয় মাঝ রাতে। গ্রামের লোক হায় হায় করে ওঠে। গ্রামশুদ্ধু সবাই শেষবারের মতো বলকারকে দেখতে আসে। মল্লণ আর চাঁদ অর্ধমৃতের মতো পড়ে থাকে। জ্ঞান ফিরলেই চাঁদ ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠে। মৃত ছেলের বুকের ওপর মাথা রেখে মল্লণ শুয়ে থাকে। গাঁয়ের লোক খুঁটিয়ে দেখে, বলকারের দুই হাতে ধারালো গজাল বা ছেনি পুঁতে দেওয়ার চার পাঁচটি চিহ্ন, দাঁতগুলো সব ভাঙা, কেউ পাথর বা হামানদিস্তের মতো ভারি কিছু দিয়ে মুখটাকে থেঁতলে দিয়েছে। চোখ উপড়ে নেওয়ার চিহ্ন বেশ স্পষ্ট। পা দুটো বিবর্ণ — এক জায়গায় রক্ত জমাট বেধে আছে। কুড়ুল দিয়ে পা দুটো কোপানো হয়েছে। বুকের ওপর দিয়ে গুলি পিঠ ভেদ করে বেরিয়ে যাওয়ার দাগ ও গর্ত।

বাইশ

কীর্তিটা যে তার বাবার, মেহের জানত না। জানল সেদিন, যেদিন দয়ালপুরা থানার দুই পুলিশ নম্বরদার পাখরকে থানায় নিয়ে যেতে বাড়িতে এলো। তার আগেই পুলিশ অবশ্য গ্রামের লোকজনদের খবরটা জানিয়ে দেয়। খবর শুনেই লোক উত্তেজিত হয়ে ওঠে। পাখর উটের পিঠে উঠে পুলিশের সঙ্গে চলে যেতেই গ্রামের লোক রাগে ফেটে পড়ে, 'হারামির বাচ্চা! টাকার লোভে গাঁয়ের ছেলেটাকে মারলি!' একজন বলে বসে, এর মধ্যে নিশ্চয়ই মেহেররও হাত আছে। আর একজনের অভিমত, নারাঙ্গ চামারও এর মধ্যে অছে। কিন্তু, পুলিশই আসল খবরটা জানিয়ে গেছে, মাঝরাতে নম্বরদার কীভাবে মদে চুর হয়ে থানায় এসে খবরটা দেয়। বলকারদের আত্মগোপনের জায়গাটি ইশারায় কীভাবে দেখিয়ে দেয়। মেহেরের কানে কথাটা যেতে ঘৃণায় তার সারা শরীর রি রি করে ওঠে। ওই তার বাবা!

নেশায় টঙ হয়ে পাখর সন্ধ্যের দিকে গাঁয়ে ফেরে। পা টলে। চৌপালের কাছে তাকে দেখতে পেয়ে লোক গালাগাল দিয়ে ওঠে। গতিক সুবিধের নয় দেখে পাখর পড়ি-মরি করে ছুটে এসে বাড়ির দরজায় কড়া নাড়ে। দরজা খুলে মেহের পথ আগলে দাঁড়ায়: 'কোনও কথা নয় — বেরিয়ে যাও। এ বাড়ির ছায়া অবধি মাড়াবে না!' বাবার হাত থেকে বন্দুকটা কেড়ে নিয়ে সজোরে এক ধাক্কা মারে। ধাক্কা সামলাতে না পেরে পাখর হুমড়ি খেয়ে পড়ে। মেহের দরজা এঁটে দেয় ভেতর থেকে। গ্রামের এক দঙ্গল ছেলে এসে দাঁড়ায়। প্রথমে কেউ কোনও কথা বলে না। তারপর হঠাৎ তারা একযোগে জুতো ঘুষি লাথি মারতে শুরু করে পাখরকে। ফাঁকে-ফাঁকে ইট পাথরের ব্যবহারও চলে। পাখর জোড় হাতে মিনতি জানায়। উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করে। আবার পড়ে যায়। আবার ওঠার চেষ্টা করে। কাপড়চোপড় খুলে যায়। সহসা একটা ইট এসে পড়ে মাথার ওপর। বেহুঁশ হয়ে পাখর এলিয়ে পড়ে। সেদিন কত যে ইটপাথর পড়েছিল তার ওপর, হিসেব করা শক্ত। এরই মধ্যে প্রবীণরা এসে

পড়ে ছেলেদের বকাবকি করে ভাগিয়ে দেয়। নম্বরদারের অবস্থাটা দেখে। একজন ওর গলাটা নিচে থেকে ধরে বসিয়ে দেওয়ার চেষ্ট করতেই, নম্বরদার পাখরের দেহটা কাঠের তক্তার মতো গড়িয়ে পড়ে মাটিতে; প্রাণহীন নিস্পন্দ। 'আপদ গেছে!' প্রবীণরা মন্তব্য করে। নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে তারা মেহেরের কাছে যায়। তাকে বোঝায়, 'খুব আফসোসের কথা। গাঁয়ের কোন ছেলেরা কাণ্ডটা করেছে আমরা জানি না। আমরা থাকলে অবিশ্যি এ ঘটনা ঘটত না। কাকে দোষ দিই, ভাই?'

মেহের প্রণাম জানিয়ে বলে, 'আমার বাবা ঠিক কথা— কিন্তু পাপের শাস্তি হয়েছে! আপনারা শেষ কাজটুকু করে দিন। আমার মাথা আর কাজ করছে না।'

মেহের আবার ঘরের ভেতর ঢুকে যায়। খাটের ওপর শুয়ে পড়ে। এই মুহূর্তে সে সব কিছু ভুলে যেতে চায়।

গ্রামের লোক হাতাহাতি করে চিতার কাঠ যোগাড় করে ফেলে। কোনও ক্রিয়াকর্ম হয় না। খাটের ওপর পাখরের শবদেহটি তুলে নিয়ে ওরা চলে যায় গ্রামের বাইরে। খাটটাও ফেলে দেয় চিতার আগুনে। সূর্য ওঠার আগেই সব শেষ। ছেলেদের কথা সবাই জেনে যায়, সঙ্গে সঙ্গে এটাও বুঝে যায় পুলিশে চুকলি করলে নম্বরদারের অবস্থা হবে। পাখর, এইভাবে হরদিতের গোপনীয়তা সঙ্গে নিয়েই মারা যায়। হরদিৎ তাকে টাকার লোভ দেখিয়ে, মদ খাইয়ে কীভাবে উসকে দেয় — তা আর কেউ জানল না। হরদিৎ দিন দশেকে চুপচাপ থাকে। কারও সঙ্গে কোনও কথাবার্তা বলে না। চৌপালে লোকের মুখে বলকার ছাড়া আর আলোচনা নেই। পাখরের উদ্দেশ্যে গালাগালি চলে। হরদিৎ ভালমানুষের মতো বসে থাকে এইসব আলোচনার সময়। কেউ হয়তো মন্তব্য করে, 'ছেলেটা মায়ের দুধ খেয়েছিল বটে! এমদম বাঘের বাচ্চা। বিশ্বাসঘাতক চেয়ারম্যানকে চল্লিশ বছর পরেও সাজা দিয়ে তবে ছাড়ল! চাঁদসূয্যি যতদিন থাকবে, বলকারকে লোকে মনে রাখবে ততদিন!' হরদিৎ সমর্থন জানায়, 'এমন ছেলে কি আর ঘরে-ঘরে জন্মায়!'

জুন-জুলাই, প্রথম বর্ষা শেষ। ঘরে ঘরে পুয়ে আর ক্ষীর বানানো শুরু হয়। ঝান্ডা একদিন দুটো গুলগুলা বেশি খেয়ে পৃথিবীর সঙ্গে তার সম্পর্ক চুকিয়ে দেয়। শ্রাদ্ধ বেশ ঘটা করেই হয়। বাইরের ঘরে বেজায় ভিড়, যেন মেলা বসেছে। গরিবগুরবোদের জন্যে মোটা চালের ভাত রুটি হালুয়া লাড্ডু ছোলা-মুগের ডাল ইত্যাদির ঢালাও ব্যবস্থা। কাজকর্ম করছে জগিরা ও জগিরার বউ। সঙ্গে আত্মীয়দের দুই ডাগর মেয়েও এনেছে। নাজর হরনামিও এসেছে। হরনামি প্রবীণ মহিলাদের মধ্যে বসে বেশ গম্ভীর-গম্ভীর কথাবার্তা বলে যায়। তিরথ ঘুরে-ঘুরে সবাইকে জিজ্ঞেস করেঃ চা? — গৌদি শামিয়ানার নিচে জমিয়ে বসে ভক্তজনকে গীতা আর গরুড়পুরাণ পড়ে শোনায়। লাল উত্তুরিটা দিয়ে হাওয়া খায়, ঘাম মোছে। বৈঠকখানায় বসে আছে হরদিৎ। পাশে সরপঞ্চ মিলখা ফৌজি হাত পাখা নাড়ে। বৈদ্যুতিক গোলযোগেই ফ্যান অচল, এবং গরমে লোক কাবু। লাউডস্পিকারে শ্রাদ্ধের কথাটা আগেই ঘোষণা করা হয়েছিল। সন্ত পরাগদাসের শরীরটা আজকাল বিশেষ ভাল থাকে না। তবে, অখন্ড পাঠের ভোগে সশরীরেই হাজির থাকে। কাজকর্ম করে শিষ্যেরা, বাবাজি শুধু পাঠ যেদিন শুরু, সেদিন আধ ঘন্টা পৌনে এক ঘন্টা বসে চলে যায়। আবার আসে ভোগের দিন। বাবাজি দর্শন না দিলে ভোগের হাঁড়ি চড়ে না। মল্লণ এসে, টাকা

রেখে, ঈষৎ মাথা ঝুঁকিয়ে চলে যায়। চাঁদ মহিলাদের মধ্যে নীরবে বসে থাকে। মেহের আসেনি— বাড়ির বাইরে আসতে তার আর ভাল লাগে না। সন্ত পরাগদাস অনুষ্ঠানের শুরুতে উপদেশ দেয়, 'মানুষ সব সময়েই চলে যায়। মৃত্যু মানেই আনন্দ, পরমানন্দ! ঝান্ডার বদান্যতার কে না জানে, য়্যাঁ? স্বর্গে আজ ওর জন্যে নিশ্চয়ই জয়ঢাক বাজছে!'

প্রীতম আজও মত্ত অবস্থায় ঘোরাফেরা করে। মুখ দিয়ে বিচিত্র সব আওয়াজ বের করে। হরদিতের কাছে অবশ্য যায় না, বৈঠকখানায় এসে হরদিলকে 'সাস্‌রিকাল' (সৎশ্রী আকাল) জানায় বিচিত্র ভঙ্গিতে; কাণ্ড দেখে লোকজন হাসে, হরদিলও। প্রীতম পাগড়ি ঠিক করতে করতে সামনে মুখ করে পিছনদিকে হাঁটে! লোকে আরও হাসে। ভোগের সময় তাকে লোহার গেটের কাছে উবু হয়ে বসে থাকতে দেখা যায়। মুখ দিয়ে নানা রকম আওয়াজ বের করে, চুপ হয়ে যাচ্ছে মাঝেমাঝে। পরাগদাস ঝান্ডার নামে স্বর্গে জয়ঢাক বাজছে ঘোষণা করার সঙ্গে সঙ্গে প্রীতম চেঁচিয়ে ওঠে: 'ওরে গেঁড়ে সাধু — তোর নামেও স্বগ্‌গে জয়ঢাক বাজবে রে!' প্রীতমের পাশে যারা ছিল, তারা তার মাথায় মৃদু চাঁটা মারতে পাগড়িটা খুলে যায়। প্রীতম আবার চুপচাপ থাকে। হরদিল ভাষণ দিতে শুরু করে। মানুষের জন্মমৃত্যু নিয়ে বস্তাপচা কথাগুলি পুনরাবৃত্তি করে, ঝান্ডার মহত্ব নিয়ে ভূয়সী প্রশংসা করার ফাঁকে ফাঁকে পাঞ্জাবি সুবার রাজনীতি, মুখ্যমন্ত্রীর কৃতিত্ব, নিজের জ্ঞানগরিমার কথাও জুড়ে দেয়। শুধু নকশালপন্থী যুবকদের কথাটা এড়িয়ে যায়। অবশেষে হরদিতের সুখ্যাতি করে ভাষণ শেষ করে।

প্রীতম এতক্ষণ কান খাড়া করে শুনছিল। হরদিৎ যেই হরদিলকে ধন্যবাদ জানিয়ে 'বাহে গুরুজি কি খালসা' বলে, সঙ্গে সঙ্গে প্রীতম চেঁচিয়ে বলে ওঠে, 'নম্বরদারের সঙ্গে এ ব্যাটাকেও চিতেও ফেলা উচিত ছিল! শালা জোঁক — লোকের রক্ত চুষে খাস! আবার সর্দার হয়েছিস, বোনভাতারি সর্দার হরদিৎ সিং!' বক দেখিয়ে প্রীতম ভেংচে ওঠে, তারপর বাইরের দিকে পা বাড়ায়। একজন বলে ওঠে, 'প্রীতম সাহেব — প্রসাদ নেবে না?'

'প্রসাদ নেয় শালা বদমায়েশরা!' — বিদঘুটে একটা আওয়াজ করে প্রীতম নিজেই হেসে কুটিকুটি হয়, তারপর বেরিয়ে যায়।

তৃতীয় খণ্ড

ছোট ছোট কথা। ছোট ছোট অভিযোগ। অন্তহীন। কোন্ বিন্দু থেকে অভিযোগ শুরু হয়ে কোনখানে শেষ হয়, কেউ জানে না। একটি প্রশ্নের উত্তরে একটি জবাব, আবার সেই জবাব থেকে আর একটি নতুন প্রশ্ন তৈরি হয়ে যায়। শুরু হয়ে যায় কথা, কথার পিঠে কথা। বক্তা তখন ধরে উঠতে পারে না, প্রশ্ন করবে না উত্তর দেবে। এইভাবে নতুন কথারা সার বেঁধে চলে। কথারা শেষ হয় না, শেষ অবধি মনে হয় কিছুই তো কথা হলো না।

রামপুরা থেকে গাঁয়ে ফেরার পথে নানা রুটের বাস কলেজের গেটে এসে থামে। না থামলে কলেজের পড়ুয়ারাই হইচই করে থামিয়ে ছাড়ে। ড্রাইভার জানে এইসব ছেলেরা বড় জেদি ও বদরাগি। তর্ক জুড়লে আর রক্ষে নেই! কপালে অশেষ দুর্গতি। এই ধরনের ঘটনা বেশ কয়েকবার ঘটেছে। কোনও ছাত্র রামপুরা যাবে, কেউ অথবা ফুল, হাত দেখালে বাস না থামলে, বা থামবার ইচ্ছে না দেখালে, ছাত্ররা সব দঙ্গল বেঁধে রাস্তার মাঝখানে, সারা রাস্তা আটকে দাঁড়িয়ে পড়ে, যেন বাসের চাকার নিচে প্রাণ দিতে সব বদ্ধপরিকর! গোঁয়ারগোবিন্দ ড্রাইভার যদি ছাত্রদের কথা না শোনে, সঙ্গে-সঙ্গে ইষ্টকবৃষ্টি শুরু হয়ে যায় দুর্দান্ত উদ্দীপনায়। বাসের কাঁচ ভাঙে, যাত্রীরা চেঁচাতে লাগে। ড্রাইভার-কন্ডাকটর তেড়ে গেলে মারপিট বেধে যায়। ড্রাইভারের হাতে টায়ারে হাওয়া-ভরা রড আর কন্ডাকটরের হাতে হয়তো লোহার রড—আর দূর থেকে ছুটে আসে ইটপাথর! এরপর, যাত্রীরা নেমে দু পক্ষকেই শান্ত করে বিবাদ মিটিয়ে দেয়। ড্রাইভার নিজের দলের লোক এনে পালটা মার

দেওয়ার চেষ্টা করলেও ইষ্টক-আক্রমণ থেকে অক্ষত হয়ে বেরোতে পারে না। ফলে, ভয়ে-ভক্তিতেই সব বাস কলেজ গেটের সামনে দাঁড়ায়।

সেদিন পিরিয়ড শেষ। কলেজ ক্যান্টিনের বিশাল চত্বরে চেয়ার টেবিল জুড়ে ছেলেমেয়েরা গল্পস্বল্প করে যাচ্ছে। নসিব ও পুষ্পিন্দরও ওখানে আছে। কলেজে ওদের পরিচিতি ভাল ছেলে মেয়ে হিসেবে। পুষ্পিন্দর কলেজের ছেলেমেয়েদের সঙ্গে সহজভাবে মেলামেশা করে। সর্বজনীন 'বীরা'— ছোট বোন। নসিব একটু লাজুক প্রকৃতির। তবুও সবাই তাকে বেশ পছন্দ করে।

ডিসেম্বর জানুয়ারির একটি দিন। পরিষ্কার ঝকঝকে আকাশ। আশপাশে অজস্র ফুলের ওপর দিয়ে ঝিরঝিরে হাওয়া বয়ে যায়। মিষ্টি রোদে দেহাতি ছোঁয়া। পুষ্পিন্দরের সারা শরীরে রোমাঞ্চিত ভাব। হাত দুটো কাঁধ বরাবর তুলে আড়ামোড়া ভাঙে। হঠাৎ জিজ্ঞেস করে, 'আমি মরে গেলে তুমি কতটা কাঁদবে?' নসিব জবাবে হাসে, 'সুন্দর জিনিস কখনও মরে না। বরং সুন্দরকে যে চায়, সেই মারা পড়ে!'

'ধুৎ! আমি আর কোথায় সুন্দর?'

'তোমার চোখ দুটো বড় সুন্দর।'

'আমার চোখ? মা যে বলছিল . . .'

'মা কী বলছিল।'

'উহুঁ, বলব না।

'কেন?'

'আমার খুশি।'

'বলো না— আমার দিব্যি!' নসির আড়চোখে তাকায়।

'ঈস্! একেবারে দিব্যি খেয়ে বসলে?'

'বলো তাহলে, মা কী বলছিল।'

'মা বলছিল কি—' পুষ্পিন্দর হাসতে থাকে, 'বলছিল কি, আমি ট্যারা!' বলেই সে হেসে গড়িয়ে পড়ে। আশপাশে কেউ নেই। যে যার বাড়ি চলে গেছে। ওরা উঠে ক্যান্টিনে চায়ের পয়সা মিটিয়ে দেয়। তারপর, বেরিয়ে কলেজ গেটের কাছে সিমেন্টের যে বেঞ্চটা আছে, সেখানে দাঁড়িয়ে থাকে বাসের জন্যে। মিনিট দশেক কেটে যায়, বাসের দেখা নেই। পুষ্পিন্দর বলে, 'চলো, ফুল অবধি হেঁটে যাই। ওখান থেকে বাস ধরব।' নসিব রাজি। দু জনেই হাঁটতে থাকে। এর আগেও ওরা কয়েকবার এইভাবে হেঁটেছে। এতে কথা বলার সুযোগ বেশি। কলেজ চত্বরে এই সুবিধেটুকু পাওয়া শক্ত। ওদের কথা অন্যের কানে পৌঁছে যাওয়ার বিপদ আছে। যদিও, ওদের মেলামেশার খবরটা সবারই জানা। কেউ কিছু না বললেও, নিজেদেরই কেমন যেন অস্বস্তি হয়। রাস্তার মাঝামাঝি, একটা অশ্বত্থ গাছে পিঠ দিয়ে পুষ্পিন্দর দাঁড়িয়ে পড়ে। বই দিয়ে গালের একদিক আড়াল করে জিজ্ঞেস করে, 'একটা কথা জিজ্ঞেস করব?'— নসিব দাঁড়িয়ে পড়ে। পুষ্পিন্দর নিশ্চয়ই জরুরি কিছু বলবে। পুষ্পিন্দর বলে ওঠে, 'এই আড়াল আবডালে আর কত দিন চলবে? একটা ফয়সালা করো।'

'কী ফয়সালা?'

'কথা রাখবে?'

'তোমার কোন্ কথা আমি রাখি না?' নসিব পুষ্পিন্দরের হাত ধরে। হাতের সেই স্পর্শ বিদ্যুৎপ্রবাহের মতো নসিবের অণু-পরমাণুতে ছড়িয়ে পড়ে। পুষ্পিন্দর বলে, 'এটা আমাদের কলেজে শেষ বছর। বড় জোর এক মাস কলেজে আসতে পারব। তারপর?'

'কী করা যায়— তোমার মতে?'

'আমার মতে বি এ পরীক্ষার পর, বিয়েটা করে নিই।'

প্রস্তাব শুনে নসিব থ। বিব্রত বোধ করে। কি বলবে ঠিক করতে পারে না। পুষ্পিন্দরই আবার জিজ্ঞেস করে, 'সায় নেই তোমার?'

'সায়ের ব্যাপার নয়। এটা এখনই সম্ভব হবে না।'

'কেন সম্ভব হবে না? তুমি কী ভাবছ, আমি জানি। জাতপাতের কথা, না? ওসব নিয়ে এখন কেউ মাথা ঘামায় না। বাবা আগে ছিল কংগ্রেসি। এখন অকালি। অকালিরা জাতপাত মানে না। আসলে—' পুষ্পিন্দর নসিবের হাতটা ধরে, 'তোমাকে সাহসী হতে হবে।'

নসিব অবশ্য কোনও দিন এতটা ভাবেনি। লোকে জাতপাত সম্বন্ধে কী ভাবে, না ভাবে, তা নিয়ে এ-যাবৎ চিন্তা করেনি। দুটো বাস দুদিক দিয়ে বেরিয়ে যায়। একটি প্রাইভেট গাড়িও। ওদের কোনও খেয়াল থাকে না। একমনে শুধু একটি কথাই ভেবে চলে। নসিব এক সময় বলে, 'চলো— এগোতে থাকি। এভাবে দাঁড়িয়ে থাকাটা ঠিক নয়। কে কি ভাববে—'

পুষ্পিন্দরের চোখে জল টলটল করে। আস্তে আস্তে হাঁটে ওরা। একটা শিরীষ গাছের কাছে এসে থামে। পুষ্পিন্দর আবার বলে, 'যা বলার আজই বলে দাও। নইলে, আমি আর তোমার কাছে আসব না।'

'আচ্ছা বাবা! তোমার কথাই মেনে নিলাম, কিন্তু তোমার বাবা—?' নসিব হাঁ-না-এর মাঝামাঝি প্রশ্নটি করে।

'আমি বাবাকে সামলাব, কিন্তু তুমি যেন শেষ অবধি বেঁকে বোসো না!'

ওরা আবার হাঁটতে শুরু করে। নসিব জবাব দেয়: 'কিন্তু আমার মতো ছোট নীচু জাতকে জাঠেরা খেদিয়ে দেবে না তো?'— কথা বলতে বলতে ওরা ফুলের কাছে এসে পড়ে। নসিব আপনমনেই বলে চলে, 'আমার কোনও জায়গাজমি নেই। জাঠেদের বাড়িতে এক সময় বাসন মাজার কাজ করেছি। আমাদের বাড়ি আসতে তোমার লজ্জা করবে না তো?'

'এখানে আমরা থাকব না। দু জনেই আমরা চাকরি করব। তাতেই আমাদের চলে যাবে। জায়গাজমির দরকার কী?'

'কিন্তু চাকরি তো এক অনিশ্চিত ব্যাপার। বিএ, এমএ কতো বেকার! চাকরি না পেলে খাব কী আমরা?'

পুষ্পিন্দর একটা চিন্তায় পড়ে। বাসস্ট্যান্ডে পৌঁছে গেছে তারা। আশপাশে লোকজন। পুষ্পিন্দর জবাব দেয়, 'বেশ তো— তুমি চাকরি না পাওয়া অবধি আমি অপেক্ষা করব। জায়গাজমির কথা মন থেকে সরিয়ে দাও। বাবার জায়গাজমি আমার আর কোন্ কাজে লাগবে? আর, ওই জাঠ ধোপা নাপিত — ওসব কথাও মন থেকে সরিয়ে দাও। সব মানুষই এক। আমার মাথার দিব্যি, শেষ অবধি পিছু হোটো না। দশ বছরও যদি আমাকে অপেক্ষা করতে হয়, আমি করব।'

নসিব ঘাড় নাড়ে। তারপর বলে, 'ঠিক আছে— এখন আমরা আলাদা-আলাদা বাসে উঠব। তোমার সব কথাই মেনে নিয়েছি। এখন, একটু হাসো দেখি!'

পুষ্পিন্দর কিন্তু হাসে না। আরও গম্ভীর হয়ে এদিক ওদিক তাকায়, দেখে আশপাশে কোটের কেউ আছে কী না। একটু চাপা গলায় সে নসিবকে বলে, 'কাল থেকে কলেজে আমরা আলাদা-আলাদা থাকব। যদিও আমাদের সামনাসামনি কেউ কিছু বলে না— তবুও এখন থেকে একটু সাবধানে থাকতে হবে। কথাবার্তা বিশেষ বলা হবে না।'

নসিব ঘাড় নাড়েঃ 'আমারও পরীক্ষার পড়া করতে হবে। ফার্স্ট ডিভিসন হলে তো কথাই নেই, এখন পাশ করতে পারি কী না সন্দেহ, না হলে সব ভেস্তে যাবে!'

রামপুরার বাস আসতেই, নসিবকে এক ঝলক দেখে সে বাসে উঠে পড়ে। কিছু যাত্রী নামে, কিছু ওঠে। কন্ডাকটার সিটি মারতে বাস ছেড়ে দেয়। ভাইরূপায় নেমে পুষ্পিন্দর গাঁয়ের পথ ধরে। দয়ালি, পুষ্পিন্দরের মা পথের দিকে হাপিত্যেশ হয়ে তাকিয়ে ছিল। দাদি জিজ্ঞেস করে, 'তোর আজ এত দেরি হলো যে? বড়ইয়ের মেয়ে কখন ফিরে এসেছে!'

'আর বোলো না— দু তিনটে বাস ছাড়তে হয়েছে— এত ভিড়! ফুল অবধি হেঁটে এসে বাস ধরেছি। বড়ইয়ের মেয়ে আমার আগেই বেরিয়ে ছিল— তাই তাড়াতাড়ি ফিরেছে।'

দুই

জগিরা নাপিতের বোনপো নসিব। থাকত সাধেড়িয়ায়। জগিরার এই দিদির চার ছেলে, দুই মেয়ে। দুই মেয়ে তিন ছেলের বিয়ে হয়ে গেছে। সবার ছোট নসিব গ্রামের স্কুলে ক্লাস টেন অবধি পড়ে মাধ্যমিক উত্তীর্ণ হয়। লেখাপড়ায় ভাল। বড়জন নিরক্ষর, তাই ছোটভাইকে আরও বেশি লেখাপড়া করাবার ইচ্ছে ছিল। কিন্তু বউ তাতে রাজি হয়নি, কেননা নিজের ছেলেও বড় হচ্ছে। নিজের ছেলেকে পড়াবে না দেওরকে? দেওরকে লেখাপড়া শেখালে, সে কী পরে তাদের সংসার দেখবে? খাওয়াবে, পরাবে? নসিবের বাবা আগেই গত হয়েছে। বেঁচে থাকলে নিশ্চয়ই ছেলেকে পড়াতো। নসিবের বুড়ি মার কোনও কথাই আজকার খাটে না। বারনালা কলেজে ঢোকার অনেক চেষ্টা করে নসিব, কিন্তু বউদি বাগড়া দেয়। মা শেষ

অবধি ছেলেকে পাঠিয়ে দেয় কোটেতে, জগিরা মামার সঙ্গে কথা বলতে। জগিরা হয়তো একটা কিছু করতে পারে। শেষটায় ছেলেকে একা না পাঠিয়ে, মা-ই তাকে নিয়ে আসে জগিরার কাছে, কোটেতে। দিদির কথা শুনে জগিরা বলে ওঠে, 'এই কথা! আমি ওকে পড়াবো। বোনের ছেলে তো নিজের ছেলেই! আর, তোমরা ছাড়া আমার তিন কূলে আছেই বা কে? নসিব আমার কাছেই থাক। কালই আমি ওকে রামপুরা কলেজে ভর্তি করে দেব। ওখানকারে এক প্রোফেসরও আমার জানাশোনা আছে। ফুলের লোক— এখন রামপুরায় থাকে।'

নাসিবের মা হাতে যেন স্বর্গ পায়। সে নসিবকে রেখে যায় জগিরার কাছে। বলে যায়, 'তোকেই আমি দিয়ে গেলাম এই ছেলে। তিন ছেলে তো সারা জীবন লোকের বাড়ি বাসন মেজে কাটালো। দেখবি, এ ঠিক মানুষ হবে তোর কাছে।'

সিতিও ছেলে পেয়ে খুব খুশি। পরম স্নেহে বুকে জড়িয়ে ধরে নসিবকে। ননদকে ধন্যবাদ জানায়, 'তোমার উপকার ভুলব না দিদি! তুমি আমার সংসার সাজিয়ে দিলে। আমার একটা ছেলে হলো এতোদিনে!'

পরের দিনই জাগিরা নসিবকে নিয়ে চলে আসে রামপুরা কলেজে। সোজা দেখা করে অধ্যাপক সজ্জন সিং-এর সঙ্গে: 'এ হলো আমার বোনপো— স্যার, আপনি একে মেহেরবানি করে কলেজে ভর্তি করে নিন—'

সজ্জন সিং চশমার মোটা কাঁচের ফাঁক দিয়ে নসিবকে দেখেন। জিজ্ঞেস করেন, 'কোন্ গাঁ?'

'ভুলে গেছেন, স্যার? কোটে খড়ক সিং। হরদিৎ সিং-এর বাড়িতে আপনার সঙ্গে অনেকবার দেখা হয়েছে। আমি জগিরা— হাজামের কাজ করি—'

সজ্জন হাসেন। নসিবকে জিজ্ঞেস করেন, 'ফর্ম ফিল আপ করেছ?'

নসিব চুপ করে থাকে। সজ্জন নিজেই উঠে গিয়ে একটা ফর্ম আনেন। তারপর, ফর্ম ফিল আপের পর সেটি প্রিন্সিপ্যালকে দিয়ে মঞ্জুর করিয়ে নেন। নসিবকে ফর্মটি দিয়ে বলেন, 'ফি মুকুবের জায়গায় সরপঞ্চের সিলমোহর মেরে আনো। পারলে আজ, নয়তো কাল। আজ করলে ঝঞ্ঝাট চুকে যাবে।'

জগিরা দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে সব দেখে, তারপর সজ্জনকে বিদায় জানিয়ে ভাগ্নেকে নিয়ে চলে আসে গাঁয়ে। সরপঞ্চের সই সিলমোহর হয়ে যায়। পরের দিনই নসিব রামপুরা খালসা কলেজের ছাত্র হয়ে যায়।

ওই দিন হরদিৎ-ও আসে মেয়েকে ভর্তি করতে। সুতারার মেয়েও ওই একই দিনে ভর্তি হয়। যাতে দুই মেয়েই একসঙ্গে যাতায়াত করতে পারে। কোটের আর জনা তিন চার ছাত্র ছিল। অন্য গ্রাম থেকেও ছাত্র আসে। এক একটি গ্রাম থেকে দু জন, বেশি হলে পাঁচ ছ জন। অন্য গ্রাম থেকে ছাত্রী এলেও, ফুলের ছাত্রীসংখ্যাই বেশি। রামপুরামন্ডির মেয়েরা এখানে বড় একটা ভর্তি হয় না, কেননা ওখানে মেয়েদের একটা আলাদা কলেজ আছে। রেজাল্টও বেশ ভাল করে। শেঠ-জমিদারদের ছেলেরা চলে যায় ভাটিন্ডায় পড়তে। যাতায়াতে অসুবিধে হয় না, কেননা ট্রেন চলাচল করে। ছাত্রদের জন্যে কম ভাড়ার পাসও

আছে। শহরে শ্রীমানরা গণ্ডগোলও করে! মালকা কলেজে ছাত্ররা বড় একটা যেতে চায় না, কেননা প্রিন্সিপ্যাল বেজায় রাশভারি ও কড়া। শিক্ষিত এই ভদ্রলোক পুরনো দিনের কমরেড। সারা জীবনই জনস্বার্থে কাটিয়ে দিয়েছেন। জেলটেলও খেটেছেন। অধ্যাপকরাও তটস্থ থাকেন 'বাবা' নামে পরিচিত এই প্রিন্সিপ্যালের ভয়ে ও দাপটে। হুল্লোড়প্রিয় বকাটে ছেলেদের জায়গা তাঁর কলেজে নেই। বয়েস বাষট্টি-তেষট্টি, এখনও বুক টান করে, ঘাড় উঁচিয়ে চলেন। যে কোনও যুবকের মতোই করিৎকর্মা। ক্লান্তি কথাটি তাঁর অজানা। ফুল আর মহারাজ গাঁয়ের পঞ্চাশ একর জমি কলেজের বানাবার জন্যে কিনেছিলন মুম্বাইয়ের এক সজ্জন ব্যক্তি। গুরুর স্মৃতি রক্ষার্থে তিনি এই কাজে হাত দিয়েছিলেন। কলেজ-দালানটি কিছুটা করেই তিনি আবার মুম্বাই চলে যান। কাজ সামান্য হয়ে পড়ে আছে দেখে, গ্রাম পঞ্চায়েত কাজে হাত দেয়। সম্পন্ন ও বিত্তবানেদের কয়েক লক্ষ টাকায় কলেজ-বাড়ি ও অন্যান্য কাজ শেষ হয়। সেই সময়ই 'বাবা প্রিন্সিপ্যাল'-কে কে যেন নিয়ে আসে। তারপর, বাবা আনেন সজ্জন ও অন্যান্য অধ্যাপকদের। সজ্জনের জন্ম ফুলে। বড়ও হয়েছেন ওখানে। থাকতেন রামপুরামন্ডিতে। ওখানে একটা 'জ্ঞানী কলেজ'-ও খুলেছিলেন। প্রত্যেক বছর অন্তত চল্লিশজন ওখান থেকে জ্ঞানী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়। ফলে, এলাকার প্রতিটি যুবক অধ্যাপক অধ্যাপিকা কেরানি মায় ইলেকট্রিক মিস্ত্রি অবধি সজ্জনের কলেজ থেকে জ্ঞানী-পরীক্ষায় পাশ করেছে। বি এ পাশের পর, কোনও ট্রেনিং নেওয়ার জন্যে যে ফাঁক থাকে, সেই ফাঁকেই বেশির ভাগ জ্ঞানীর পাঠক্রম শেষ করে। বিয়ের দেরি আছে এমন মেয়েও যেমন আসত, ঠিক তেমনই আসত অন্যান্য পাঠার্থীরা। অনেক অধ্যাপক অধ্যাপিকা শিক্ষক শিক্ষিকা এইভাবে এফ এ ইংলিশ বা বি এ ইংলিশ-ও করে একটি বিষয়ে ডিগ্রি নিয়েছে পছন্দমতো। পরীক্ষাও হতো ভাটিন্ডায়। রামপুরামন্ডি এইভাবেই 'শিক্ষিত এলাকা' হিসেবে পরিচিতি পায়। এখানে প্রত্যেক বাড়িতেই পড়াশোনার চর্চা হয়। জ্ঞানী, এফ এ ইংলিশ, বি এ, এম এ— সব রকমের পাঠার্থী এই এলাকায় থাকে। পাঞ্জাবি ভাষা ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে সজ্জন নীরবে যে কাজে করে যাচ্ছেন, তার দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত পাওয়া কঠিন। এই জন্যেই এখানে নানক সিং খুবই পরিচিত, মোহন সিং-এর কবিতা সবাই জানে, অমৃতা প্রীতম অনেকেরই কাছে চেনা। তরুণ পড়ুয়ারা বুল্লেশাহ ও বারিসশাহের অসাধারণ কাব্যের স্বাদ গ্রহণ করতে শিখে গেছে। গুরবক্স সিং-এর প্রবন্ধ পড়ে শব্দের গাঁথুনি আয়ত্ব করেছে। গুরবক্সের রচনা মানেই নতুন শব্দ বাক্যের এক মায়াবি জগত। প্রেমপত্র লিখতে গেলেও গুরবক্সের উদ্ধৃতি কাজে লাগে।

সজ্জন যখন প্রথম কলেজটি খোলেন, অনেকেই ধরে নিয়েছিল রামপুরায় ওসব চলবে না। এই সময় সজনের কলেজের চাকরিটিও পাকা হয়ে যায়। ফলে, জ্ঞানী কলেজের টাকা তাঁর দরকার লাগত না। জ্ঞানী-কলেজের সর্বেসর্বা হিসেবে প্রার্থীকে চাকরি দেওয়ার আগে তিনি শর্ত করিয়ে নিতেন চাকরির জন্যে সুপারিশ চলবে না, দক্ষিণা সম্পর্কে কোনও দাবিদাওয়া খাটবে না, রাজনৈতিক কোনও দলে যুক্ত থাকার সুবাদে ম্যানেজিং কমিটির মেম্বার বা প্রিন্সিপ্যাল পদের দাবি জানানো যাবে না। আর জ্ঞানী-কলেজকে সেই পর্যায়ে পৌঁছে দেওয়ার অনবরত চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে, যেখানে জ্ঞান বুদ্ধি ও রুচির ত্রিবেণী সঙ্গম ঘটে। বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চশিক্ষার প্রবেশ-সোপান হিসেবে জ্ঞানী-কলেজের ভূমিকা

এইভাবেই অপরিহার্য হয়ে ওঠে। গরিব ঘরের ছেলেমেয়েদের এইভাবে সুযোগ আর কেউ দিতে পারত না। পড়ুয়ারা জানতেও পারত না কখন তারা লক্ষে পৌঁছে গেছে। আর, এ সবেরই মূলে ছিলেন সজ্জন সিংহ, তাঁর নিঃস্বার্থ ত্যাগ। মধুমক্ষিকার মতো গুঞ্জনে ব্যস্ত থাকলে, তিনি এই অসাধারণ কাজটি করতে পারতেন না। পড়তে, পড়াতে ভাল লাগে বলেই সজ্জন রাত বারোটার আগে শুতে যান না। শীত গ্রীষ্ম বর্ষা — উঠতেন ঠিক ভোর পাঁচটায়। জ্ঞানী-কলেজ শুরুর সময় তিনি ছিলেন এফ-এ জ্ঞানী। এখন তিনি ছটি বিষয়ে এম এ; অধীত বিষয়গুলির মধ্যে পাঞ্জাবি ভাষা ও সাহিত্য, ইংরিজি, রাষ্ট্রবিজ্ঞান ইতিহাসও আছে।

তিন

মার্চ মাস। এপ্রিল থেকে পরীক্ষা শুরু হবে। শেষ ক্লাস করে ছাত্ররা চলে যাবে শনিবার। অধ্যাপকরা নিজের নিজের ক্লাসে গিয়ে বিষয় ঝালিয়ে দেন। বি এ ফাইনালের ক্লাস সজ্জনের। ক্লাসে জনা চল্লিশ ছাত্র। অধ্যাপক সজ্জন লেকচারার-ডেসকের ওপর ঝুঁকে পড়ে পরীক্ষাপ্রস্তুতি সম্বন্ধে কিছু পরামর্শ দিলেন। পরনে শাদা জামা, গায়ে ঈষৎ-ধূসর স্যুট, মাথায় শাদা পাগড়ি। শাদা জমির ওপর লাল-স্ট্রাইপ টাই। মোটা কাঁচের চশমা। ডেসকের ওপর কালো চামড়ার ব্রিফকেস। সজ্জন বলছিলেন, 'এই সময়টা খাওয়াদাওয়া কম করবে। বেশি খেলেই ঘুম পাবে। পরীক্ষা হলো যুদ্ধক্ষেত্র। সন্তর্পণে এগোতে হয়। বই আর মন, এক করে রাখবে। পরীক্ষা চুকে গেলে—'

ছেলেমেয়েরা হাসে। সজ্জন তখনও বলছেন: 'দিন-রাত ভাগাভাগি করে নেবে। খাওয়াদাওয়া ঘুম পড়া বেড়ানো সব ঘন্টার হিসেবে ভাগ করবে। এমনকি কোন্ সাবজেক্ট কতক্ষণ পড়বে। পুরো বই রিভিসন করে নেবে—'

সজ্জন হয়তো আরও কিছু বলতেন, এমন সময় পুষ্পিন্দর উঠে দাঁড়ায়। সারা ক্লাসের চল্লিশ জোড়া কৌতূহলী চোখ ওর দিকে। মেয়েটা কী বলবে? ছোট্ট রুমালে ঠোঁট পুঁছে পুষ্পিন্দর বলে, 'স্যার, আজ তো আমাদের শেষ ক্লাস। একটা অনুরোধ করব আপনাকে?'

সজ্জন জিজ্ঞাসু চোখে তাকান। ছেলেমেয়েরাও। পুষ্পিন্দর বলতে থাকে, 'আপনার জীবনের ঘটনা আমাদের আর একবার শুনিয়ে দিন, প্লিজ।' নসিরও উঠে দাঁড়ায়, সমর্থন জানিয়ে বলে, 'হ্যাঁ স্যার। প্লিজ।'— বি এ ফাইন্যালের ছাত্ররা চার বছর এই ক্লাসে আছে। সজ্জন প্রতি বছর প্রথম ক্লাস নিয়ে নিজের সম্বন্ধে কিছু বলতেন। সজ্জনের জীবনকাহিনী ছাত্রদের বেশ ভালই লাগত। এতে ছাত্রদের সঙ্গে তাঁর ব্যক্তিগত বন্ধুত্ব হয়ে যেত। সুখ দুঃখ পরামর্শ বিনিময় চলত। আজও ছাত্ররা তাঁর জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতা শোনার জন্যে উৎসুক হয়ে উঠল।

টাইয়ের ফাঁস আলগা করে সজ্জন কথা বলতে লাগলেন। এই সময় তাঁর চেহারাটা কেমন যেন উদাস, প্রশান্ত হয়ে ওঠে।

'আমার জন্ম ফুলে। জায়গাজমি কিছু ছিল না। থাকতাম কাঁচা এক বাড়িতে। বাবা ছিলেন ফৌজি। ফৌজির চাকরি শেষ হলে তিনি গ্রামের ধর্মশালায় 'পন্থী' হলেন। ফৌজে থাকতেই তিনি গুরু-গ্রন্থসাহেব অল্পস্বল্প পড়তে শিখেছিলেন। ধর্মশালা থেকে ওঁকে একদিন তাড়িয়ে দেওয়া হলো। অন্য কোনও কাজকর্ম জানতেন না। আমরা তিন ভাই। আমিই ছোট। মা আমাকে সরকারি গুরুদ্বারে রেখে এলেন। গুরুদ্বারের মহান্তই আমাকে গুরুমুখি শেখান। বাসন মাজার কাজ করতাম, গ্রাম থেকে রুটি ভিক্ষে করে আনা ছিল আমার 'ডিউটি'। মাঝে মাঝে বাড়ি পালিয়ে আসতাম। মা আবার জোরজার করে আমাকে গুরুদ্বারে পৌঁছে দিতেন। এইভাবে একদিন আমি 'পাঠী' হয়ে গেলাম। অকালগড়ের গুরুদ্বারে আমি এক বছর পাঠী ছিলাম। অখন্ড পাঠ করিয়ে আমাকে অর্ধেক পারিশ্রমিক দিত ওরা। দশম গ্রন্থের পাঠও অবশ্য কেউ কেউ করত। যেমন, নিহগ সিং। দরাজ গাঁয়ে বাবা গুরদিতের গুরুদ্বার আছে। দশম গ্রন্থ পাঠের ব্যবস্থাও আছে। সেখানকার গ্রন্থী ফুলের লোক। আমাকে তাঁর খুব ভাল লাগল। বছর দুয়েক ওখানে থেকে পাঠীর কাজ করলাম। এই সময় আমার বাবা মারা যান। আমাকে ফিরে আসতে হলো ফুলে। সংসারের দায়িত্ব ঘাড়ে পড়ল। মা কষ্টেসৃষ্টে সংসার চালাতে লাগলেন।

'এই সময়, এক ভদ্রলোক আমায় ডি সি সুপারিটেনডেন্টের দপ্তরে এক চাপরাশির কাজে ঢুকিয়ে দেন। এখানেই আমার জীবনের মোড় ঘুরল। ডি সি লোকটি ছিলেন ভীষণ ভাল, কিন্তু বউটা ছিল মহা-দজ্জাল প্রকৃতির। আমাকে দিয়ে বাড়ির কাজ অবধি করিয়ে নিতেন। এ ছাড়া, আরও নানা কাজ। নাকের দম ছুটিয়ে ছাড়তেন একেবারে! সকাল ছটায় বাড়ি থেকে বেরিয়ে রাত নটায় ফিরতাম। সকালে ডি সির বাড়িতে বাসনমাজা কাপড়-ধোয়া ঘর পরিষ্কার, দশটায় দপ্তর। আক্কা দিন কেটে যেত দরখাস্তর তারিখ ধরে লোকেদের হাঁকডাক করে ডাকতে, সন্ধ্যেবেলায় আবার ডি সির বাড়িতে বাসনমাজা ও আরও নানা কাজ। 'ডিসিনি' সাহেবার মেজাজ কিন্তু খিঁচড়েই থাকত! আমার বানানো রুটি তাঁর পছন্দ হতো না। মুখের ওপরই রুটি ছুঁড়ে মারতেন। অবিশ্যি, কুকুরটাকে এক টুকরো ঠিকই দিতেন! ডিসিনি আমার সঙ্গে যত খারাপ ব্যবহারই করুন না কেন, আমি রাগতাম না। চুপ পরে থাকতাম। আমার মা, এই চাকরির জন্যে, খুশিই ছিলেন।

'এর মধ্যে আবার দেশ স্বাধীন হলো। ফুল আর জেলা রইল না। পেপসুর নতুন জেলা হয়ে গেল বারনালা। ডি সি বদলি হয়ে গেলেন মলেরকোটলা। তাঁর বদলে এলেন এক ম্যাজিস্ট্রেট। তখন জুডিসিয়ারি ও এগ্‌জিকিউটিভ আলাদা ছিল না। আমি এবার ম্যাজিস্ট্রেটের দপ্তরে আর বাড়িতে কাজ করতে লাগলাম। আমার বয়েস তখন পনেরো। ম্যাজিস্ট্রেটের বউটি ছিলেন খুব ভাল। নিজের ছেলের মতো আমাকে ভালবাসতেন। উনিই আমাকে পড়াশোনার জন্যে উৎসাহ দিলেন। বারনালায় গিয়ে পরীক্ষা দিলাম, পাশ করলাম। এই সময় হলো কি, ম্যাজিস্ট্রেটের স্ত্রী হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়লেন। কঠিন অসুখ, বাঁচবেন কী না সন্দেহ। ম্যাজিস্ট্রেট আমাকে এবার আত্মীয়স্বজনদের কাছে খবর দেওয়ার জন্যে নানা জায়গায় পাঠালেন। লুধিয়ানা পাতিয়ালার নানা জায়গায় ঘুরে, আমি দু একদিনের মধ্যে সবাইকে জড়ো করে ফেললাম। ম্যাজিস্ট্রেটের স্ত্রী সে-যাত্রা বেঁচে গেলেন। আমাকে প্রাণভরে আশীর্বাদ করলেন। বললেন, 'না— তোকে আর চাপরাশির কাজ করতে হবে না।

বাসনটাসনও মাজতে হবে না।' এবার আমার নতুন কাজ হলো গ্রামে গ্রামে গিয়ে শমন জারি করে আসা।

'অমৃতসরে নিহাল সিং-রসের জ্ঞানী কলেজে— রস সাহেবকে চিঠি দিলাম আমার সব কথা জানিয়ে, এ-কথাও জানালাম আমি তাঁর কলেজে ভর্তি হতে চাই। চিঠির জবাব এলো, 'চলে এসো'। ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবকে আমার ইচ্ছার কথা বললাম। তিনি বললেন, 'ঠিক আছে— তবে একজনকে নিয়ে যাও তোমার সঙ্গে।' মিউনিসিপ্যালিটিতে কেরানির কাজ করত যোগিন্দর সিংহ। ম্যাজিস্ট্রেট তাকে দু মাসের স-বেতন ছুটি দিলেন। যোগিন্দর আর আমি জালিয়ানাওয়ালার কাছে একটা বাসা নিলাম। কলেজের পড়াও চলতে লাগল। আমাদের কাছে স্টোভ ছিল, নিজেরাই চা বানাতাম। রুটি আসত মেস থেকে। রাত নটায় শুয়ে পড়তাম, ভোর দুটো থেকে পড়াতে বসতাম। রস সাহেব সকাল-সন্ধ্যে আমাদের টেস্ট নিতেন। যোগিন্দরের তুলনায় আমি সব সবয়েই নাম্বার বেশি পেতাম। ফলে, যোগিন্দর আমাকে হিংসে করত। জব্দ করার চেষ্টা করত। নিজে দুটোর সময়ে উঠে পড়লেও, আমাকে জাগাতো পাঁচটার সময়! তবুও, আমি নাম্বার বেশি পেতাম! বারো জনের মধ্যে আমার নাম থাকত। পরীক্ষা দিয়ে আমরা কাজ করতে চলে গেলাম আবার। রেজাল্ট বেরোতে দেখা গেল, আমি ফার্স্ট ডিভিসন। যোগিন্দর পাশ করতে পারেনি।'

চার

পিরিয়ড শেষ হয়ে গেছে। শেষ দিনের শেষ ক্লাস। সজ্জনেরও অন্য ক্লাস নেই। তিনি ব্রিফকেস নিয়ে তৈরি হন। ছাত্ররা দাঁড়িয়ে পড়ে, পুরো গল্পটা শোনা হলো না। দু একজন ক্লাস থেকে বেরিয়ে যায়, বোধ হয় তাড়া আছে। বাকিরা কিন্তু দাঁড়িয়ে থাকে, তাদের যাওয়ার ইচ্ছে নেই। সজ্জন ওদের দিকে তাকান, বলেন, 'গল্পটা শেষ হলো না? মিনিট দশ পনেরো যদি থাকো, তাহলে বাকিটা শুনে যেতে পারবে।'

ওরা বসে পড়ে। সজ্জন আবার শুরু করেন:

'পুরনো ম্যাজিস্ট্রেট বদলি হতে, নতুন যিনি এলেন, তাঁর স্ত্রী যখন জানলেন আমি 'জ্ঞানী'— তখন তিনি আমাকে 'বুদ্ধিমানী' পড়াবার জন্যে ধরলেন। আমি রাজি হলাম। এ ছাড়া, আরও দু তিনজনের বাড়িতে গিয়ে জ্ঞানীর প্রাইভেট টিউশন করতে লাগলাম। রামপুরামন্ডির একটা প্রাইভেট স্কুল থেকে অফার পেলাম পাঞ্জাবির টিচার হিসেবে। মাইনে ছাপান্ন টাকা। চাপরাশির কাজে মাইনে পেতাম তেতাল্লিশ। চাপরাশির কাজ ছেড়ে এবার শিক্ষকতার কাজে এলাম। চাপরাশি থেকে শিক্ষক— এটাই একটা বিপ্লব! ওই স্কুলে থাকতেই, রামপুরা অ্যাকাডেমি আমাকে নিয়ে যায় ষাট টাকা মাইনেতে। জ্ঞানী ছাড়া মিডল আর ম্যাট্রিক ক্লাস পড়াতে হতো; অ্যাকাডেমির সঙ্গে আমার চুক্তি ছিল, আমাকে ইংরিজি ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় বসার ব্যবস্থা করে দিতে হবে। জ্ঞানীর তুলনায় মিডল আর ম্যাট্রিকে ছাত্র কম হতো। যাক, আমি তো ইংরিজিতে ম্যাট্রিকটা করে নিলাম। পরের বছর,

অ্যাকাডেমির চাকরি ছেড়ে নিজেই একটা জ্ঞানী-কলেজ খুলে বসলাম। পাঞ্জাবের যে কোনও জ্ঞানী কলেজের তুলনায় আমার কলেজে ছাত্র সর্বদাই বেশি হতো। যার জন্যে, রোজগারও ভালই হতো। বিয়ের সম্বন্ধও আসতে লাগল— সব আনপঢ় নিরক্ষর পাত্রী! আমি চাইছিলাম লেখাপড়াজানা চাকরি করতে পারে— এমন মেয়ে। ততদিনে আমার এফ এ হয়ে গেছে। বাটালা থেকে এক সম্বন্ধ এলো। মেয়ের বাবা খোলামনের লোক। মেয়ে এফ এ করে বি টি করছে। বাটালার কাছে ধারিওয়ালে, কি একটা কাজে গিয়ে আমি ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা করি। চমৎকার ব্যবহার! ওদের কথাবার্তা চালচলন সবই আমার ভালো লেগে যায়। মেয়ের বাবা যখন জিজ্ঞেস করলেন, 'কী দিতে হবে?' আমি জবাবে বললাম, 'কিছু না! স্রেফ এক টাকা।' কথা পাকা হয়ে গেল। আমার বয়স তখন পঁচিশ, মেয়ের উনিশ। ফুলে মাকে বলতে মা মেনে নিলেন। বিয়ে হয়ে গেল। জাতপাত বিচার করিনি। আমার বংশ সন্ন্যাসী-সাধুর, মেয়ের অঢ়োর। আজকাল অবিশ্যি এটা তেমন কিছু নয়, কিন্তু তখন এটাই ছিল এক ভীষণ ব্যাপার। . . .

'আমার জীবনের সব চেয়ে বড় ঘটনা। আমি একবার পাতিয়ালা যাই। পাতিয়ালার ডি সি তখন ফুলের সেই ডি সি, একেবারে দেবতুল্য মানুষ। ভাবলাম, তাঁকে যদি গিয়ে বলি, সব পরীক্ষা-টরীক্ষা ডিঙিয়ে এখন আমি এক ডিগ্রি কলেজের প্রিন্সিপ্যাল, তিনি নিশ্চয়ই খুশি হবেন। আমার স্ত্রীও বি এ বি এড, সরকারি চাকরি করেন। যাক, আমি তো ওঁর দপ্তরে গিয়ে দেখা করে সব বললাম। উনি খুশিতে আমাকে জড়িয়ে ধরলেন। বললেন, 'চলো আমার বাড়ি।' আমি না না করলেও, উনিতো আমাকে জোর করেই নিয়ে গেলেন। শীতকাল, তবে বিশেষ ঠান্ডা পড়েনি। আমাকে নিয়ে গিয়ে লনে বসালেন, চাকরকে তিন কাপ কফি আনতে বলে ভেতরে গেলেন সর্দারনিকে ডেকে আনতে। আমার পরনে গরম কাপড়ের স্যুট, টাই, চকচকে কালো জুতো। সর্দারনি তো, মানে 'ডিসিনি', আমাকে চিনতেই পারলেন না। আমি হাত জোড় করে দাঁড়িয়ে উঠে সৎশ্রী আকাল জানালাম, বুকের ভেতরটা টিপটিপ করছে, আবার যদি আগের মতন খিঁচিয়ে ওঠেন! সর্দারনি ডিসিনি কিন্তু চোরা-চোখে আমার দিকে তাকাতে লাগলেন। ডি সি জিজ্ঞেস করলেন, 'একে চিনতে পারছ?' ডিসিনি ঘাড় নাড়লেন: না। ডি সি হাসলেন, 'আরে এ হলো আমাদের সজ্জন— ফুলে আমার চাপরাশি ছিল। বাড়িতে বাসন মাজত, তুমি সব সময় যার ওপর খিঁচিয়ে থাকতে! সজ্জন এখন ডিগ্রি কলেজের প্রিন্সিপ্যাল, ওর বউও বি এ বিএড—'

'কথাটা শুনেই সর্দারনির মাথা হেঁট। মুখ দিয়ে আর কথা সরে না। পরের ঘটনা অবিশ্যি আরও ছোট কিন্তু অদ্বিতীয়। যে ম্যাজিস্ট্রেট আমাকে জ্ঞানী পরীক্ষা দেওয়ার জন্যে অমৃতসর পাঠিয়েছিলেন, তাঁর বড় ছেলের বিয়ে। ছেলে পিসিএস (পাঞ্জাব সিভিল সার্ভিস) অফিসার। বিয়েতে আমার নেমন্তন্ন হয়। খুব বাছাবাছা লোকজনকে ডাকা হয়। আমি যেতেই ম্যাজিস্ট্রেট আর তাঁর স্ত্রী সোজা বউয়ের কাছে নিয়ে গেলেন। আমার তো লজ্জা-লজ্জা করছে, এদের বাড়িতে বাসন মাজতাম এক কালে! ম্যাজিস্ট্রেটের স্ত্রী বউয়ের সঙ্গে আমার পরিচয় করাতে গিয়ে বললেন, 'বউ, এ হলো তোর দেওর সজ্জন সিং!'

ছাত্রদের খেয়ালই ছিল না পিরিয়ড শেষ হয়ে আরও ঘন্টা তিনেক কেটে গেছে। গল্প শুনতে সবাই বিভোর ছিল। সজ্জন ক্লাস থেকে বেরিয়ে স্টাফরুমে ঢুকে পড়লেন। কেউ

নেই — অধ্যাপকরা চলে গেছেন। বাবা প্রিন্সিপ্যাল তাঁর ঘরে একজন কেরানির সঙ্গে কথা বলছেন। কেরানি চলে যেতেই প্রিন্সিপ্যাল বললেন, 'কী হে সজ্জন— আজ যে ডাবল পিরিয়ড করে ছাড়লে!'

'আর বলবেন না স্যার। ওরা ধরলে ডাবল, এমনকী ট্রিপল পিরিয়ড অবধি করতে হয়!'

'বেশ। এখন উঠবে না কী?' বলতে বলতে প্রিন্সিপ্যাল দরজার দিকে তাকান, 'দেখো, তোমার ক্লাসের বোধ হয়।' প্রিন্সিপ্যালকে সৎশ্রী আকাল জানিয়ে সজ্জন বাইরে আসতে, নসিব জিজ্ঞেস করে, 'স্যার — আপনি কী মন্ডির দিকে যাবেন?' সজ্জন ঘাড় নাড়তে, নসিব বলে, 'আমরা আপনার সঙ্গে যাব। একটা পরামর্শ চাই আপনার কাছ থেকে।' সজ্জন এক ঝলক পুষ্পিন্দরকে দেখে নেন। তারপর, 'চলো' বলে এগোতে থাকেন। বেশ বলিষ্ঠ পদক্ষেপেই তিনি গেটের দিকে এগোলেন— এক পাশে নসিব, অন্য পাশে পুষ্পিন্দর। সিমেন্টের বেঞ্চের কাছে এসে সজ্জন দাঁড়ান, তারপর নিজের মনেই বলেন. 'ভাগ্যিস্— সাইকেলটা আনিনি। তাহলে দুজনে যেতে পারতাম বড় জোর। এখন আমরা তিন জনেই একসঙ্গে যেতে পারব।' পুষ্পিন্দর জিজ্ঞেস করে, 'স্যার, অপনার স্ত্রী কোথায় কাজ করেন?'

'রামপুরায়। হাইস্কুলের টিচার।'

'ছেলেমেয়ে?'

'তিন ছেলে। মেয়ে নেই । এক ছেলে ভাটিন্ডায় কলেজে পড়ে— অন্য দুজন স্কুলে।'

'স্যার— আপনার বিয়ের সময় কোনও গন্ডগোল হয়নি?'

'না। করলেই বা কী হতো? মিয়াঁ-বিবি রাজি তো কেয়া করেগা কাজি? তাছাড়া শ্বশুরশাশুড়ি আমাকে পছন্দ করেছিল। মা-ও মত দেয়। আসলে কী জানো, সমাজ শেষ অবধি সবই মেনে নেয়। সামাজিক স্তরে আধুনিক কিছু ঘটলে, প্রথম ঝটকায় একটা ঝড় ওঠে — তারপর সেই ঝড় এক সময় থিতিয়ে যায়। তবে ঝড়ই উঠুক, আর তুফানই উঠুক, সমাজ যার যা প্রাপ্য ঠিক মিটিয়ে দেয়। আমাদের নিয়েই তো সমাজ। অদলবদল— সবই তো আমাদের হাতে।'

'কিন্তু আমাদের সমস্যাটা যে অন্য ধরনের—'

'বাড়িতে গিয়ে শুনব, চলো।'

বাস আসতে তিনজনেই উঠে পড়ে।

পাঁচ

সেচের কাছে যে সাঁকো, সেই সাঁকোটার কাছে এসে ওরা নামে। জঞ্জালে ভর্তি একটি গলি পার হতে হয়। সজ্জনের স্ত্রীও স্কুল থেকে ফিরে এসেছেন। স্কুলের ছুটি আজ একটু তাড়াতাড়ি হয়েছে। তবে, সজ্জনের একটু দেরি হয়ে গেছে ফিরতে। শেষ ক্লাস করে নসিব পুষ্পিন্দরকে সঙ্গে নিয়ে আসার জন্যেই এই দেরি। ড্রয়িংরুমে তিনজনে কিছু জলযোগ করে।

সজ্জনের স্ত্রীও ওদের সঙ্গে খাওয়াদাওয়া করে নিজের কামরায় ঢোকেন একটু গড়িয়ে নিতে। বড় ছেলে এখনও ভাটিন্ডা থেকে ফেরেনি। ছোট দু জন পাড়ায় খেলতে চলে গেছে। সজ্জন গোঁফদাড়ি চুমরে, পাগড়িটা রাখেন একটা কাউচের ওপর। কাঠের একটা ছোট চিরুনি দিয়ে চুল আঁচড়ে নেন। চশমাটা খুলে ব্রিফকেসটা তুলে রাখেন জানালার কাছাকাছি একটা তাকে। তারপর বলেন, 'বলো তো তোমাদের সমস্যাটা কী?'

'সমস্যাটা সহজই—' নসিব উত্তর দেয়, 'আপনি তো জানেন আমি জাতে নাপিত, আর পুষ্পরা জাঠ। আমরা বিয়ে করব ঠিক করেছি। কিন্তু জাঠেরা—'

সজ্জন আড়চোখে পুষ্পকে দেখে কপট গাম্ভীর্যে বলে উঠলেন, 'একী অনাসৃষ্টি কাণ্ড! নাপতের ছেলে হয়ে জাঠিনির দিকে হাত বাড়িয়েছ— আস্পদ্দা তো কম নয়!' তারপরই সুর পালটে, 'দেখো, প্রশ্নটা নাপিত বা জাঠ নিয়ে নয়, প্রশ্নটা হলো সংসার চালাবার মতো টাকাকড়ি আছে কী না। তোমরা যদি পরস্পরকে ভালবাস, তাহলে নাপিত কিংবা জাঠ কোনও প্রশ্নই নয়।'

'টাকাকড়ির ব্যাপারটা—'

'স্বাভাবিকভাবেই ওঠে। বেঁচে থাকার প্রশ্নটাই হলো বড়। চটপট কিছু করে বোসো না। পরস্পরকে আরও ভালভাবে চেনাজানা দরকার। তাছাড়া, সামনে পরীক্ষা — ভাল নম্বর তুলে চাকরিবাকরি যোগাড় করো— নিজের পায়ে দাঁড়াও। মা-বাবা আপত্তি করলে অন্য কোথাও গিয়ে বিয়েটা করো।'

নসিব জবাব দেয়, 'আমি অবিশ্যি এটা আগেই ভেবে রেখেছি, স্যার।'

'ঠিকই ভেবেছ। তাহলে সমস্যাটা কোথায়?'

'সমস্যাটা হলো নসিব—' পুষ্প জবাব দেয়, 'আমার বাবাকে ভীষণ ভয় পায়। ভাবে, বাবা শুনলে হয়তো ওকে মেরেই ফেলবে!' পুষ্প চুনুরির আড়ালে মুখ ঢাকে। নসিবের মনে হয়, পুষ্প রসিকতা করছে। সজ্জন বলে ওঠেন:

'পাগল! মারধোর কে কাকে করবে? সমাজ এক বিচিত্র ব্যাপার। প্রথমে যেটা খারিজ করে, পরে সেটা মেনেও নেয়। মা-বাবাও শেষ অবধি সব কিছু মেনে নেয়। মনে জোর রাখো, ঝড় তুফান যাই উঠুক— ঠিক সামলে নিতে পারবে।'

সজ্জনের কথায় ওরা বেশ উৎসাহিত বোধ করে। কোনও খারাপ কাজ যে তার করছে না, এই বিশ্বাসটা মনে আসে। তিনটে থেকে সাড়ে তিনটে বেজে যায়। সজ্জন মনে মনে বিশ্রাম করতে চাইলেন। ভাটিন্ডা থেকে বড় ছেলে ফিরে আসে। ছোটরা এখনও ফেরেনি। সজ্জনের স্ত্রী বেরিয়ে আসেন। উঠোনে দাঁড়িয়ে সজ্জন জিজ্ঞেস করেন, 'এক কাপ করে চা হবে?'

নসিব উঠে পড়ে, 'না, স্যার — আমরা এখন যাই।' সজ্জনের স্ত্রী রান্নাঘরে বাসন ধুচ্ছিলেন। পুষ্প চট করে রান্নাঘরে ঢুকে পড়ে। সজ্জনের স্ত্রীর সঙ্গে চা-টা বানিয়ে ফেলে। সজ্জনের স্ত্রী পুষ্পকে দেখেন, মেয়েটির চেহারায় কেমন যেন এক উদাসীন সৌন্দর্য জড়িয়ে আছে। ওদিকে, ড্রয়িংরুমে নসিবকে সজ্জন বলছেন, 'ভেবে চিন্তে কাজ কোরো। বড়লোকের মেয়ে, তায় জাঠ— শেষ অবধি বাবার দাবড়ানিতে যেন ঘরে আটকে না পড়ে।'

'পুষ্প সে রকম মেয়েই নয়, স্যার।'

'ব্যাস। তাহলে ঘাবড়াবার কিছু নেই। মনে সাহস রেখে, মাথা উঁচু করে চলবে। দু চার বছর দেখতে দেখতে কেটে যাবে। একটু-আধটু ঝামেলা হয়তো হবে, কেননা জাঠেরা নাপিতদের মানুষ বলেই মনে করে না! ভয় পেয়ো না—'

পুষ্প চা নিয়ে ঢোকে, পেছনে সজ্জনের স্ত্রী। তিনি রান্নাঘরেই পুষ্পর কাছ থেকে সব কিছু জেনে নিয়েছেন। হাসি-হাসি মুখে তিনি সজ্জনকে বলেন, 'এদের তাড়াতাড়ি কিছু করার বুদ্ধি দিয়ো না। আর একটু বয়েস না হলে এরা ঠিক ম্যাচিয়োরড হবে না!'

সজ্জন উত্তর দেন, 'এতে আবার ম্যাচিয়োরড হওয়ার কী আছে? চার মাস পরেই গ্রাজুয়েট হয়ে যাচ্ছে— ম্যাচিয়োরড তো এরা হয়েই আছে!'

'তবুও। বুঝেসুঝে পা ফেলা দরকার। পরে না হলে পিছু হটতে হবে। তাতে বদনাম হবে। তার চেয়ে বরং—' মহিলা থেমে-থেমে, জোর দিয়ে বলেন, 'মানে, পরে পিছু হটতে হলে এখানেই ইতি টানা দরকার।

সৎশ্রী আকাল জ্ঞাপন করে নসিবও পুষ্প বেরিয়ে আসে। পথে যেতে-যেতে পড়াশোনার কথা আলোচনা করে। পুষ্প বলে, 'ব্যাস— এবার পড়াশোনা— অন্য কথা আর ভেব না।'

নসিব উত্তর দেয়, 'হুঁ। এই সময়টা আমাদের আর দেখাশোনা হবে না। আমিও তোমার বাড়ি যাব না— তুমিও আসবে না। পরীক্ষার পর আবার — তুমি বাসস্ট্যান্ডে যাও। আমি একটু পরে যাব।' নসিব দাঁড়িয়ে পড়ে।

'এখনই চলে যাবে?' পুষ্প একটু মনমরা হয়ে কথাটা বলে।

'এর মধ্যেই মন খারাপ?' নসিব হাসে, 'পরীক্ষা অবধি কাটাবে কী করে?'

পুষ্পর চোখ ছলছলে হয়ে ওঠে। নসিব বলে, 'যাও এখন—'

'উহুঁ— আমার সঙ্গে ওই সাঁকোটা অবধি চলো।'

'গিয়ে দেখবে গাঁয়ের অন্তত বিশ জন ওখানে দাঁড়িয়ে আছে। কার চোখে পড়ে যাবে, ঠিক নেই। তার চেয়ে তুমি বরং একা চলে যাও।'

পুষ্প তবুও রাজি হয় না। চোখ জলে ঝাপসা হয়ে ওঠে। অগত্যা নসিবকে এগোতে হয়। পুষ্পর ঠোঁটে হাসি ফোটে। চোখ মুছে নেয়। সাঁকো পার হয়েই বাসস্ট্যান্ড। পুষ্প জানালার ধারে একটা সিটে বসে। নসিব বাইরে দাঁড়িয়ে ওকে দেখে। পুষ্প আশপাশ লক্ষ করে চেনাজানা কেউ আছে কী না দেখতে। বাস চলতেই পুষ্প হাত নাড়ে। আরও কিছুটা যাওয়ার পর, পুরো ব্যাপারটা ভাবার চেষ্টা করে। গোলমাল একটা হবেই। নিজেকে সাহস দেয়, যে গোলমালই হোক, সে ঠিক সামলে নেবে। নসিব সঙ্গে থাকলে সে হিমালয়ের চুড়োয় অবধি চলে যেতে পারে। বাবার জায়গাজমি প্রচুর। টাকাকড়িও দেদার। বাবা হয়তো বাবার মতোই বেজায় বড়লোক পাত্র খুঁজছেন। কিন্তু বড়লোক বর পেলেও মনের মিল অসম্ভব। বড়লোক? বড়লোকরা তো এখন শুধু জাঠেদের মধ্যেই নেই। সব জাতেই আছে। চুরিচামারি করে টাকা করা এখন তো কোনও ব্যাপারই নয়। জাঠেদের মধ্যেও তো বহু গরিব, উপবাসী মানুষ আছে। বাবার মতো বড়লোক আর কজন? নসিব— নসিব যেন ওর

অস্থিমজ্জার সঙ্গে মিশে গেছে। শরীরী এক উত্তাপের মতো নসিব অবিচ্ছেদ্য। নসিবের সঙ্গে প্রথম দেখা ঠাকুর্দার শ্রাদ্ধের দিন। তখন লোকসভা নির্বাচনের মহড়াও চলছে। লোকে ভাবছে, দুঃখের কালো দিন এবার বুঝি শেষ হবে। কংগ্রেস ও নানা বিরোধী দলের মধ্যে জনতা পার্টিও কোমর বেধেছে — নির্বাচনে জিততে হবে। হরদিৎ অবিশ্যি দাঁড়াবার চেষ্টা করেনি। অকালি প্রার্থীর হয়ে খাটাখাটুনি করেছে। ঝান্ডার শ্রাদ্ধে লোকজনকে এক জায়গায় জড়ো করার একটা মওকা পেয়ে গেছে। তার আগে লিফলেট ছেপে বিলি করেছে। ডাকসাইটে অকালি নেতারা শ্রাদ্ধে যোগ দিয়েছিল। শ্রাদ্ধে ঝান্ডার কথা কেউ উল্লেখ করেনি। স্রেফ ভোটের দামামাই পিটে যায়। নসিব আর পুষ্প কাঁচের গ্লাসে লেবুচিনির সরবৎ আর জল দিচ্ছিল অভ্যাগতদের। কাজটা করতে হচ্ছিল খুব চটপট। কাজ করার ফাঁকে-ফাঁকে পুষ্প অবাক হয়ে নসিবকে দেখছিল। আকাশ থেকে আশ্চর্য কোনও বস্তু যেন পৃথিবীতে ছিটকে পড়েছে— বস্তুটা যেন তারই। ধরা ছোঁয়ার মধ্যে আছে, কিন্তু ধরা যাচ্ছে না। সেদিন শরীরে আশ্চর্য এক কম্পন অনুভব করেছিল সে।

ছয়

ঘরে এসে পুষ্প মাকে বলে, ফুলে এক বান্ধবীর বাড়ি যাওয়ার জন্যে ফিরতে দেরি হলো। সেখানে গিয়ে দেখে, মানপক্ষিতে তার যে দিদি থাকে, তার ছেলের ষষ্ঠি হচ্ছে। মেয়েরা নাচগান করছে। পেটভর্তি করে পকৌড়া বরফি খাইয়েছে। মেয়ের বউদি না খাইয়ে তো কিছুতেই ছাড়বে না। শেষ অবধি অনুরোধ এড়াতে না পেরে চা খেয়ে আসতে হলো।

দয়ালি মেয়ের দিকে তাকায়। সত্যি মিথ্যে ধরতে পারে না। মেয়ের আজকাল প্রায়ই ফিরতে দেরি হয়। ব্যাপারটা কী? সুতারের মেয়ে, যার সঙ্গে পুষ্পর এত বন্ধুত্ব ছিল, তার সঙ্গে এখন তেমন বন্ধুত্ব নেই কেন? সুতারের মেয়েও তো এ-সম্বন্ধে কোনও উচ্চবাচ্য করে না। কিছু জিজ্ঞেস করলে, সুতারের মেয়ে কেমন যেন দায়সারা গোছের উত্তর দেয়। পুষ্পর চালচালন যেন কেমন-কেমন। মেয়েকে সোজাসুজি কিছু জিজ্ঞেস করা যায় না। বড় মেয়ে। কোন কথা কীভাবে মনে লাগে। পুষ্প অবশ্য মার সঙ্গে হেসে হেসেই কথা বলে। হালকা ইয়ারকিও মারে। দাদিও বেশ মজা পায় নাতনির মজার মজার কথা শুনে। মা-মেয়ের কথা কাটাকাটিও বাস্তিবুড়ির কাছে বেশ উপভোগ্য। নাতনির সরলতা বাস্তির খুব ভাল লাগে। মেয়েটা সব সময়েই বেশ হাসিখুশি। দয়ালি কিন্তু মেয়ের আনমনা উদাসীন ভাবটাই বেশি লক্ষ করে। ওপরে হাসিখুশি থাকলেও, মেয়ের চোখে কীসের এতো বিষণ্ণতা? নিশ্চয়ই কিছু একটা হয়েছে, পুষ্প গোপন রাখছে বিষয়টা। চুল এলোমেলো, গালের রং বিবর্ণ, কথা বলতে গিয়ে অন্যমনস্ক হয়ে পড়ে, গেলাস আনতে গিয়ে কৌটো আনে, সালোয়ার কামিজ পরে চুল আঁচড়াতে ভুলে যায়, মনে করিয়ে দিলে চুলটা হয়তো কাঁধের দিকে ছড়িয়ে দেয়; পড়তে-পড়তে হঠাৎ দেওয়ালের দিকে তাকিয়ে থাকে এক মনে, মনে হয় যেন দেওয়ালের সঙ্গে কথা বলছে! মেয়েটার হলো কী?

পরীক্ষার দিন এগিয়ে আসে। সহপাঠী ছেলেমেয়েরা কেউ কেউ বাড়িতে আসে। পড়ার কথা বলে চলে যায়। পুষ্প অবশ্য কারও বাড়ি যায় না। সারাদিন ধরে বৈঠকখানায় বসে পড়ে যায়, আর কি যেন ভেবে যায়। এক-একদিন সারা দিনই পড়ে, এক-একদিন আবার এক বর্ণও পড়া হয় না। চুপচাপ শুয়ে থাকে। মাঝে মাঝে চোখ মোছে। নসিব একদিনও আসেনি। যদি পাখি হয়ে সে নসিবদের বাড়ি উড়ে যেতে পারত! তাহলে নসিবের বইটা সে উনুনের মধ্যে ছুঁড়ে ফেলে দিত। ওর কাঁধে মাথা রেখে কাঁদত। ভীষণ রাগ হয় এক-এক সময়। একবারটি তো আসতে পারত! সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ে নিজেদের অঙ্গীকার: পরীক্ষার আগে কোনও দেখাশোনা নয়। নসিব কথা রাখতে জানে। পুষ্প কথাটা ভেবে খুশি হয়ে ওঠে। আগামি দিনের ঝড়ঝাপটাতেও সে নিশ্চয়ই কথা রাখতে পারবে। পুষ্পর অভিমান উবে যায়।

রোদের তেজ বাড়ে। গমের দানায় পাক ধরে। সোনালি সবুজ রঙের ঢেউ। দূর থেকে মনে হয় যেন সোনালি গমের সমুদ্দুর! কাঁচামিঠে একটা গন্ধও বেরোয়। মনে হয়, সব কিছুর মধ্যেই যেন যৌবনের ছোঁয়া আছে। টাহলি খেতে সবুজ পাতার ফাঁকে সোনালি ঝিলিক। ছাদ থেকে পুষ্প সেই আশ্চর্য দৃশ্য দেখে। দেহে-মনে একটা নেশা লাগে। খেতের সেই আশ্চর্য দৃশ্যে, ফসলের রহস্যে, সে জীবনের সম্পর্ক খোঁজার চেষ্টা করে। নসিবের চেহারাটা চোখের ওপর ভেসে ওঠে। অনুভব করে সেই মুহূর্তে— জীবন বেঁচে থাকার জন্যে। এই সমস্ত দৃশ্য, ফল ফুল, আকাশে উড়ে যাওয়া পাখি, মাটিতে চলমান গবাদি পশু, খেতের উদার বিস্তার যেন জীবনের চিহ্নকেই স্পষ্ট করে দেয়। বাবার কথাও মনে আসে। তাঁর কল্পিত বংশমর্যাদা ও মূল্যবোধের কথা ভাবলে কেমন যেন রাগ আসে। শরীরটা থিরথির করে কেঁপে ওঠে। আনন্দ পরিণত হয় বিষাদে।... পরীক্ষার আর সাত দিন বাকি। সহপাঠীরা জানিয়ে দিয়ে গেছে অ্যাডমিট কার্ড কলেজে এসেছে, দু জন এর মধ্যে নিয়েও এসেছে। সুতারার মেয়ে জলিকে পুষ্প তার-ও অ্যাডমিট কার্ডটা নিয়ে আসার জন্যে বলে। জলি জবাব দেয়, 'তা হয় নাকী? সই করতে হবে না? তুই বরং চল আমার সঙ্গে।'

পুষ্পিন্দর যাবে বলে এসেছে। হয়তো নসিবের সঙ্গে দেখা হয়ে যাবে। জলিদের বাড়ি যাওয়ার পথেই নসিবদের বাড়ি। আজ কলেজে যাওয়ার কথাটা নসিবকে বলে গেলে কেমন হয়? না। 'পরীক্ষার আগে দেখাশোনা নয়'। শেষ অবধি, পুষ্প জলিদের বাড়িতে ঢুকে পড়ে। জলি তৈরি হয়েই বসে ছিল। ভাইরূপা স্ট্যান্ড থেকে ওরা বাস ধরবে। নসিব এই বাসে ওঠেনি তো? পুষ্প আশপাশ দেখে: না। জলি কিছু জিজ্ঞেস করলে, সে আলগোছে জবাব দেয়। জলি যে সঙ্গে আছে, সে প্রায় ভুলেই যায়। মনে হয়, পাশে নসিব বসে আছে। কলেজ গেটের সামনে ওরা নামে। জলি প্রায় লাফ মেরে মেরে কলেজের দিকে হাঁটা দেয়। পুষ্পর পা যেন চলে না। দু একজন ছাত্রকে দেখা যায়। অন্য কোনও ছেলে দেখে মনে হয় যেন নসিবই। কাছে আসতে ভুল ভাঙে। চাপরাশির দিকে তাকায়। নসিব হয়তো চাপরাশিকে কিছু বলে গেছে। জলি একটু পিছিয়ে, পুষ্পর হাত ধরে প্রায় টেনে নিয়ে যায় রেজিস্ট্রারের কামরায়। দু জনে সই করে অ্যাডমিট কার্ড নেয়। জলি তার চেনা একজনকে জিজ্ঞেস করে, 'তোর রোল কত?' ছেলেটি জবাব না দিয়ে অ্যাডমিট কার্ড দেখায়। জলি খুশি হয়ে বলে ওঠে, 'আরে! তোর সিট তো আমার কাছেই পড়েছে!'— ওরা বেরিয়ে আসে। সিমেন্টের বেঞ্চে বসে বাসের জন্যে অপেক্ষা করতে থাকে। পুষ্প চুপচাপ — জলির

মুখে কথার খই ফুটছে। একটা প্রশ্ন করে, আবার নিজেই জবাব দেয়। হঠাৎ পুষ্প ভাবে, রেজিস্ট্রারের কাছ থেকে জেনে এলে হয় নসিব অ্যাডমিট কার্ড নিয়ে গেছে কী না। জানাও যাবে, সিট কোথায় পড়েছে। এই ভেবেই সে উঠে দাঁড়ায়। জলিকে বলে, 'দাঁড়া — আমি এখনই আসছি।'

জলি পুতুলের মতো বসে থাকে। পুষ্প কেরানির কামরায় গিয়ে রেজিস্ট্রার দেখে। নসিব আগেই অ্যাডমিট কার্ড নিয়ে গেছে। নসিবের সইটা দেখলেও রোল নাম্বার দেখতে ভুলে যায়। বাইরে এসে কথাটা মনে পড়ে। আফসোসে ঠোঁট কামড়ায়। মনে হয়, পুরো কলেজের দরজা-জানলা যেন বন্‌বন্‌ করে ঘুরছে! কলেজে যারা ঘোরাফেরা করছে, মনে হলো তারা যেন কিছু একটা বলি-বলি করেও বলছে না। জলির কাছে ফিরতেই, বাস এসে পড়ে। বাসে উঠে জলি প্রশ্ন করে, 'নসিবকে তো দেখলাম না কোথাও? বোধহয় আগেই নিয়ে গেছে।' পুষ্প নীরব থাকে। তারপর বলে, 'মাথাটা টিপটিপ করছে—' জলি পুষ্পর কাঁধ ধরে, 'বেশি পড়েছিস বোধ হয়?'

'না। না।'

'তুই শুয়ে পড়।' সিটের লাগোয়া রডে মাথা ঠেকিয়ে পুষ্প চোখ বোজায়। জলি বকেই চলে। ভাইরূপা আসতে দু জনেই নেমে পড়ে। গাঁয়ের পথ ধরে।

সাত

যারা সরষে আর ছোলা ফেলেছিল, তাদের ফসল কাটা হয়ে গেছে। গম কাটার তোড়জোড় চলছে জোর। পথে কুলোওয়ালাদের ডাক শোনা যায়: 'কুলো চাই? চাই-ই কুলো-ও-ও' কুলো বানাবার কাজ এখনও কোনও কোনও ঘরে হয়। ফসল মাড়াইয়ের কলও কোথাও-কোথাও কাজে লাগে। যারা সম্পন্ন, তাদের নিজস্ব মাড়াইকল আছে। নিজেদের কাজ হয়ে গেলে, অন্যদের মাড়াইকল ধার দেয়। যে যার খুশিমতো গম মাড়াই করে। রোদের তেজও বাড়ে। ছায়া দেখলে দাঁড়িয়ে পড়তে ইচ্ছে করে। হাওয়াতে অবধি রোদের হলকা। হলকায় লতাপাতা শুকিয়ে যায়। পুষ্প মনে মনে কেমন যেন একটা অস্বস্তি অনুভব করে। মন দিশাহারা হয়ে যায়। পড়তে ভাল লাগে না। ভাবে, বি এ পাশ করেই বা কী হবে— ওকে তো আর চাকরি করতে হবে না। বাবার এতো জমিজিরেত। তরপরেই ভাবে, বাবার জমিজিরেত আছে তো আমার কী? নসিবই তো আমার সব কিছু। বাপের টাকা এর কাছে কিছু নয়। নসিবকে পাওয়ার পর ওকে সামলে রাখার পথ একটাই। আর্থিক ব্যাপারটা ঠিক রাখা দরকার। সজ্জন ঠিকই বলেছেন। সংসার চালাবার টাকাপয়সা হাতে রাখা দরকার। বি এ পাশ করে আগে চাকরি, তারপর বিয়ে। দু জনেই চাকরি করবে। না, পড়াশোনাটা ভাল করে করা দরকার। সে আবার বই তুলে নেয়। নোটস মিলিয়ে নেয়। পাঞ্জাবি ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাস গোলমাল করবে না। ঝামেলা হয় ইংরিজিতে। গ্রামার ট্রানশ্লেসন বেশি

করে করতে হবে। অবশ্য ক্লাস টেনে শেখা গ্রামার ও টেনস কাজ দেবে। মাস্টারমশাই বলতেন, 'এখন ভাল করে শেখ, পরে পস্তাতে হবে না।' ঠিকই বলতেন। মাস্টারমশাই কাছের জিনিস দেখতে পেতেন না। দূরের জিনিস দেখতে পেতেন। পড়াবার সময় চশমাটা নাকের ডগায় টেনে আনতেন। ফ্রেমের ওপর দিয়ে পড়ুয়াদের অবস্থা দেখতেন। হেসে ফেলতেন, ছাত্রছাত্রীরাও হাসত। বড় ভাল লোক ছিলেন। বাবার মতো আদর করতেন। মন দিয়ে পড়াতেন। হাসিঠাট্টাও করতেন। কখনও বাবা, কখনও দাদা, কখনও বন্ধুর মতো ব্যবহার করতেন।

পরীক্ষার ঠিক দু দিন আগে পুষ্প উতলা হয়ে ওঠে। বই ছুঁড়ে ফেলে, বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়ে দুপুরবেলায়। বাবা রামপুরা গেছে ট্র্যাকটর নিয়ে। হরিন্দর এখনও স্কুল থেকে ফেরেনি। সে এখন ক্লাস টেনে পড়ে। মা কোন কাজে যেন চন্ননবাল গেছে। বাড়িতে ঠাকুমা একা। বুড়ি জিজ্ঞেসও করে না নাতনি কোথায় যাচ্ছে, বা কখন ফিরবে। চটপট হেঁটে পুষ্প পৌঁছে যায় জগিরাদের বাড়িতে। দরজার পাল্লাটা ভেজানো। পাল্লা টেনে সে ভেতরে ঢুকে পড়ে। রাস্তায় কে তাকে দেখল, না দেখল, কিছুই খেয়াল করল না। এমনকী চৌপালে কারা বসে, তাও তার নজরে পড়ল না। জগিরার উঠোনেও কেউ নেই। সিতি বোধ হয় কোনও কাজে বেরিয়েছে। ভেতরের ঘরের লাগোয়া কামরায় পুষ্প উঁকি দেয়। নসিব খাটিয়ায় শুয়ে, চোখ দুটো বোজানো, বুকের ওপর একটা বই। অর্থাৎ, পড়তে-পড়তে ঘুমিয়ে পড়েছে। জেগে নেই তো? হয়তো মনে মনে কোনও প্রশ্নের উত্তর নাড়াচাড়া করছে। একটু রাগও হয় পুষ্পর। বাবু কেমন নিশ্চিন্ত হয়ে পড়া করে যাচ্ছে, আর সে মাছের মতো ছটফট করে যাচ্ছে! পড়াও হচ্ছে না, আবার বইও ছাড়তে পারছে না। একটা আজগুবি চিন্তা আসে: যদি নসিবের বুকের ওপর পড়ে থাকা বই হতে পারতাম!

নসিব কিন্তু গভীর ঘুমে অচেতন। এতটুকু শব্দ না করে পুষ্প এগোয়। রাস্তার দিকে দরজাটা হাপাট খোলা। পিছিয়ে এসে দরজাটা এঁটে দেয় সে। আশপাশ দেখে নেয়, বাইরে কেউ নেই। নসিব পূর্ববৎ ঘুমে অচেতন। পুষ্প সন্তর্পণে বইটা তুলে নেয় তার বুকের ওপর থেকে। পেটের ওপর হালকা আঙুলে বিলি কাটতেই, নসিব ধড়মড় করে উঠে বসে। চোখ খুলেই মনে হয়, সে যেন স্বপ্ন দেখছে! স্বপ্নের মধ্যেই সে যেন পুষ্পকে দু হাতে জড়িয়ে ধরে। দু জনেই নিশ্চুপ। হৃৎপিন্ডের স্পন্দন দ্রুত থেকে দ্রুততর হয়ে ওঠে।... ঠিক সেই সময়েই উঠোনে একটা শব্দ হয়। পুষ্প ঝট করে সরে বসে। দাঁড়িয়ে পড়ে। পর মুহূর্তেই নসিবের মাসি সিতিকে দেখা যায় উঠোন পার হতে। পুষ্প সঙ্গে সঙ্গে বলে ওঠে, 'তাইজি— সৎশ্রী অকাল!'

'সস্‌রিকাল!' সিতি প্রত্যুত্তর দিয়ে বলে, 'আরে দাঁড়িয়ে কেন? বস।'

নসিবও ততক্ষণে উঠে বসেছে, 'মামি— এতক্ষণ কোথায় ছিলে?'

'আর বলিস না! ধালিওয়ালের শালা মারা গেছে। জোয়ান ছেলে। খবর পেয়েই বউটা অজ্ঞান। ভাইয়ের বউয়ের কী হবে? ওখানেই ছিলাম এতক্ষণ। পাড়ার অন্য বউঝিরাও ছিল।'

'ভাইটা মারা গেল কেন?' পুষ্প ভেবেচিন্তে প্রশ্ন করে।

'ঠিক জানা যায়নি। এখন কট্টুতে গিয়ে ওদের বাড়িতে খবর দিতে হবে। বউ এলে তবে দাহ হবে। কিন্তু কতক্ষণে যে লোক পৌঁছয়—' নসিবের মাসি বেশ চিন্তায় পড়ে। পুষ্প চেয়ারে বসে। নসিব জিজ্ঞেস করে, 'মামি — এখন চা বানাবে নাকী?'

'বানাবো। তাছাড়া, মেয়েটা এসেছে কষ্ট করে। পড়াশোনা কেমন চলছে রে, পুষ্পি? নসিব তো দিনরাত বই মুখে নিয়ে বসে আছে। বাড়ি থেকে বেরোয় না অবধি, যেন ঘরের বউ!'

মামির কথায় দু জনেই হেসে ওঠে। রান্নাঘরে গিয়ে সিতি উনুন ধরিয়ে জল চাপায়। চা-চিনি পরিমাণ মতো বের করতে থাকে। পুষ্প এই সুযোগে নসিবের কাছে সরে আসে। হাতটা ধরে বলে, 'তাহলে বইয়ের সঙ্গেই সংসার পেতেছ?'

'সংসার— আমার না তোমার?' নসিব আবার শুয়ে পড়ে।

'আমার সংসার? আমার তো ইচ্ছে করে বইগুলো টেনে ফেলে দি— খালি তোমার কথা মনে আসে!'

'কেন?'

'কেন আবার কী? আমি মরেছি না বেঁচে আছি— সে খবর তো তুমি নাও না!'

'কেমন করে নেব? দিব্যি গালিয়ে নিয়েছ, না? 'পরীক্ষার আগে দেখাশোনা বন্ধ'— মনে আছে?'

'চুলোয় যাক দিব্যি! আমি থাকতে পারছি না!'

'ধন্যি মেয়ে! তাহলে এত ঘটা করে দিব্যি গালালে কেন? নিজেই শেষ অবধি ধরাশায়ী?'

'ছেড়ে দাও ও-সব কথা। ঠিক করেছি পরীক্ষা দেব না।'

নসিব একটু কাৎ হয়ে খাটের নিচ থেকে একটা চপ্পল টেনে আনে: 'দেখেছ এটা?'— পুষ্পর চোখ ছলছল করে ওঠে। চোখের জল মোছে। তারপর বলে, 'পড়তে ইচ্ছে করে না তো পরীক্ষা দেব কী? সব সময় মন ছটফট করে।'

'মনটন এখন বাদ দাও। আগে তো বি এ পাশ করো। তারপর মনটনের কথা ভেবো। সব ঠিক হয়ে যাবে।'

'কী ঠিক হয়ে যাবে?'

'যা তুমি চাও। বি এ পাশের পর চাকরি— তারপর বিয়ে।'

'বেশ।' পুষ্প চোখ মোছে। সিতি দু গ্লাস চা নিয়ে ঢোকে। পুষ্প বলে ওঠে, 'মামি— এ-তো অনেক চা। তুমিও একটু নাও এ থেকে।'

'না, না — তুই খা। কেটলিতে এখনও অনেক চা আছে।'

'তাহলে আর এক গ্লাস এনে আমাদের সঙ্গে বসো।'

চা খেতে খেতে সিতি ওদের দিকে এক পলক তাকায়। চোখের ভাষা খুবই স্পষ্ট। ভগবান বোধ হয় এমনি করেই সবাইকে মিলিয়ে দেন— সিতি ভাবে।

আট

নসিবের সঙ্গে দেখা হওয়ায় পুষ্প মনে জোর পায়। জীবনের পথে এগিয়ে যাওয়ার এক অদম্য প্রেরণা অনুভব করে। নিশ্চিত হয়ে এবার সে শুধু নিজের জন্যে বাঁচবে না। কল্পিত এক পারিবারিক জীবনের ছবি ফুটে ওঠে তার চোখের ওপর। বি এ ডিগ্রিটা কাজে লাগবে। চাকরি করলে নসিবেরও সাহায্য হবে। আর্থিক স্বাচ্ছল্য আসবে। বাবার টাকার পরোয়া করতে হবে না। সে, ভেড়াছাগল নয় যে বাবা তাকে খুশিমতো চরাবে! সে চিন্তা করে: লেখাপড়া শিখেছি। সচেতন মেয়ে, এ যুগের প্রতীক। কাকে জীবনসঙ্গী করব, আমার ব্যক্তিগত ব্যাপার। স্বামী জাঠ হবে, না অ-জাঠ হবে— সেটা তো আমারই ঠিক করার কথা। জাতপাত মানুষ তৈরি করেছে— জাতপাতের বিচারে কী হবে? সব মানুষের জন্ম তো এক ভাবেই হয়। চাল চলন রঙ রূপ— সবই এক। নসিব আমার মনের মানুষ। ওকে নিয়েই আমি ঘর বাঁধব।'

দুটো রাত আর একটা দিন পুষ্প ভীষণভাবে পড়ে। কোন্ প্রশ্নের কি উত্তর হবে, তা মনে করে বার বার লিখে যায়। পরীক্ষার দিন এসে পড়ে। পরীক্ষার্থীরা সব তৈরি হয়েই এসেছে। নসিব বেশ গম্ভীর, মুখে কথাবার্তা, এমনকী হাসিও নেই। এক-একটা পরীক্ষা দেয়, আর কলেজের গেটে শিরীষ গাছটার নিচে গিয়ে বসে থাকে। মনে-মনে হিসেব করে দেখে, কোন্ পেপারে কত নাম্বার উঠতে পারে। দু জনেই প্রত্যাশিত নাম্বার মিলিয়ে দেখে। তারপর, খুশি হয়ে বাসে ওঠে। গাঁয়ে ফিরে যায় পরের পরীক্ষা প্রস্তুতির জন্যে। পরীক্ষা দিতে যাওয়ার মুখে রোজই দু জনের দেখা হয়। ছোট্ট হাসি বিনিময় হয়। পরীক্ষা শেষ করে দু জনেই চলে আসে শিরীষ গাছের নিচে। ব্যক্তিগত কোনও কথাবার্তা হয় না। শুধু পরীক্ষা নিয়েই কথা চলে। শেষ দিনের পরীক্ষা দেওয়ার পর মনে হয়, মাথা থেকে বিরাট এক বোঝা নেমে গেছে। মাথাটা এত হালকা লাগে যে, মনে হয় যেন বিনা পাখাতেই ওরা আকাশে উড়ে যেতে পারে। পুষ্প নসিবকে জানায়, পরের দিন সে চন্নবালের আত্মীয়দের বাড়ি যাচ্ছে। নসিব যেন তার সঙ্গে বাসে বারনালা অবধি সঙ্গ দেয়। অল্প সময়ের কথাবার্তায় মন ভরে না। চন্নবাল যাওয়ার পথে অনেকক্ষণ ধরে কথা বলা যাবে। খোলাখুলি কথা। নসিব হেসে জিজ্ঞেস করে, 'খোলাখুলি আর কী কথা হবে? সব কথাই তো হয়ে গেছে!'

'সব কথা আর কোথায় হলো?' পুষ্প প্রতিবাদ জানিয়ে বলে, 'ওসব শুনছি না— আমার সঙ্গে তুমি যাবে। আটটা-নটার সময় ভাইরূপার বাসস্ট্যান্ডে এসে দাঁড়াবে— আমি আগে এলে অপেক্ষা করব, আর তুমি আগে এলে আমার জন্যে অপেক্ষা করবে।'

পরের দিন ভাইরূপা থেকে দু জনেই আলাদাভাবে বাসে ওঠে। পুষ্পর পেছনের সিটে বসে নসিব। সালাবাতপুরায় এমনভাবে নামে যেন কেউ কাউকে চেনে না। স্কুলের কাছে একটা

গাছের নিচে পুষ্প ইট পেতে বসে। নসিব দাঁড়ায় এক দোকানির ছাউনির নিচে। হাতে সেদিনের খবরের কাগজ। দুজনেই ভাগতাজালাল থেকে আসা বাসটিকে উদাসীন চোখে দেখে। একটু পরেই ফরিদকোট-বারনালার বাস এসে থামে। দুটো খালি সিট পেয়ে ওরা বসে পড়ে। মিনিট দশেক বাস দাঁড়ায় এখানে। ড্রাইভার-কন্ডাকটার চা খেতে নেমে যায়। পুষ্প বলে, 'বেশ কয়েক বছর পর এখানে এলাম। সালাবাতপুরার ভোল পাল্টে গেছে— এখন চেনাই যায় না!' ড্রাইভার গাড়ি ছাড়ে। পুষ্প বিজ্ঞের মতো বলে চলে, 'জায়গাটা এখন পাক্কা শহর বনে গেছে। অগুনতি চায়ের দোকান, ঠেলার ওপর ফল— সব এসে গেছে।'

'হবে না কেন? সব জায়গার বাস এখানে এসে থামে। ভিড়ভাট্টা তো সব সময়েই— দোকানপাট ব্যবসা বাড়বে, এটা আর আশ্চর্য কী!' নসিব গম্ভীরভাবে আলোচনা করার ভাব দেখায়।

'খুব সমঝদার হয়ে গেছ, দেখছি।'

'আমি আর সমঝদার হলাম কোথায়? আসল সমঝদার তো তুমি। তোমার কাছে বসেই তো আমার জ্ঞানগম্যি বাড়ছে!' নসিব টিপ্পনী কেটে এমনভাবে বেঁকে বসে যে পুষ্প ওর কাঁধে হাত রাখে। হেসে বলে, 'হাওয়া দিচ্ছ?'

'হাওয়া? হাওয়া দেওয়ার যন্ত্রই নেই আমার কাছে!' — জবাব শুনে পুষ্প হেসে ওঠে। নসিব আশপাশটা দেখে নেয়। মনে হয়, বাসের যাত্রীরা যেন ওদের দিকেই তাকিয়ে আছে। নসিব পুষ্পর পায়ে চাপ দিয়ে ইশারা করে, কানে-কানে বলে, 'ঠিক করে বসো। কথাবার্তা পরে। লোকে কী ভাবছে, কে জানে!'

'লোকে তো ঠিকই ভাবছে।'

'বকবক কোরো না। ঠিক হয়ে বসো।' নসিবের গলা বেশ গম্ভীর। পুষ্প আর কিছু বলে না। বাস প্রচন্ড গতিতে এগিয়ে চলে। ভদৌড়ে এসে বাস থামে। কিছু যাত্রী নেমে যায়। পুষ্প জানালা দিয়ে বাইরেটা দেখে। ভদৌড়ও পালটে গেছে। আগের মতো আর নেই। রাস্তার ধারে কত নতুন বাড়ি দোকানপাট। পুরনো বাসস্ট্যান্ড আর চেনা যায় না। পাকা বাড়ি, বিরাট চত্বর, প্রস্রাবাগার, এক চিলতে ওয়েটিং রুম। দু তিনটে চায়ের দোকান, মদের দোকান, ঠেলার ওপর সাজানো মৌসুমি ফল— কি নেই: এমনকী, রাস্তার ওপর রিকশা অবধি দাঁড়িয়ে আছে। আগে তো এসব কিছুই ছিল না। আগে ছিল এবড়ো খেবড়ো বাসের আড্ডা বা গুমটি, নোঙরা পরিবেশ, সভ্যতাবর্জিত, ঈশ্বর-পরিত্যক্ত একটি স্থান। বাসের জন্যে তীর্থের কাকের মতো বসে থাকতে হতো। ভোগা থেকে ভাগতাজালাল— এখন লোক ওঠা-নামা করে জলের ফেয়ারার মতো। মেয়েদের উঁচু গলা শোনা যায়, 'উঁহু— ডান দিকে।' কাচ্চাবাচ্চাদের ধরে তারা হিড়হিড় করে টেনে বসিয়ে দেয় নির্দিষ্ট জায়গায়। সেই সঙ্গে চলে ড্রাইভারের চোস্ত খিস্তি, কন্ডাকটরের হুইস্‌ল, চায়ের দোকানের পরিচারকদের হাঁকডাকসহ এক মিলিত কোরাস। যেন আজব কোনও নাটক অভিনীত হচ্ছে বাসস্ট্যান্ডকে মঞ্চ বানিয়ে। আশপাশে নজর চালালে চোখে পড়ে রাস্তার ধারে-ধারে জলাজমির ওপর বেশ কিছু কাঁচাপাকা বাড়ি। স্টপেজ এলেই যাত্রিদের মধ্যে হুড়োহুড়ি, ধাক্কাধাক্কি শুরু হয়ে যায়। কে কার আগে নামবে, প্রতিযোগিতা চলে। পুষ্প চুপটি করে

বসে থাকে। সবাই নেমে যাক আগে। ভিড় হালকা হতে সে উঠে দাঁড়ায়। চোখ ফিরিয়ে দেখে কি নসিব দিব্যি ঘুমোচ্ছে! কাঁধে হাত পড়তেই, সে চোখ খোলে। 'বারনালা এসে গেছে?' — বাস থেকে নেমে বলে, 'একটু চা খাওয়া যাক। শরীরটা ম্যাজম্যাজ করছে।' পুষ্প আশপাশে তাকায়। চারিদিকে শুধু দোকান আর দোকান। ফলের দোকান, ডাবের দোকান— খদ্দেরদের চিল চিৎকার, বাসস্ট্যান্ডে যাত্রীদের চেঁচামেচি। রাস্তার ওপরই 'ভাগ টি স্টল'। আশপাশের নতুন দোকানের মধ্যে এটিই শুধু পুরনো। নসিব-পুষ্প ঢুকতে পরিচারক তাদের টেবিলে দুটি ফাঁকা গ্লাস, একটি ময়লাটে জলভর্তি প্লাসটিকের জাগ রেখে যায়। চা খেতে খেতে ওরা দুজনকে দেখে। মুখে চোখে খুশির ছোঁয়া। নসিব জিজ্ঞেস করে, 'এবার কোন বাস?'

'যে কোনও।'

'চন্নবালের বাস এখান থেকে পাবে?'

'জিজ্ঞেস করে দেখতে হবে।'

'ও।' নসিব চটপট চায়ে চুমুক দেয়। পুষ্প বলে, 'এত তাড়া কেন?' বলে সে ধীরে সুস্থে বেশ মৌজ করে চা খেতে থাকে। নসিব চায়ের পয়সা দিতে গিয়ে দোকানদারকে চন্নবালের বাসের কথা জিজ্ঞেস করে। সে জবাব দেয়, হ্যাঁ— চন্নবাল যাওয়ার বাস এখানে পাওয়া যায় বটে, তবে সময়টা তার জানা নেই। বাস আড্ডার টাইমকিপার খবরটা দিতে পারবে। দোকান থেকে বেরিয়ে টাইমকিপারের খোঁজে যেতে, একটি ছেলে ঝোলানো একটি বোর্ড দেখিয়ে দেয়। বাসের যাতায়াতের সময় ওতেই লেখা আছে। ওরা বোর্ড দেখে। প্রথমে বুঝতেই পারে না, তারপর ধরে ফেলে নির্ঘণ্টী-ভাষা! প্রথম বাস আসবে বেলা দুটোয়— তারপর সন্ধ্যে ছটায়। এখন বেজেছে বারোটা, পুষ্প বলে, 'বাস আসতে যখন দেরি— চলো, আমরা বাইরে থেকে একটু ঘুরে আসি।'

'চলো। তাছাড়া, এখানে সিনেমা হলও আছে। একটা ছবি দেখা যেতে পারে।'

বাইরে বেরিয়ে এক রিকশাওয়ালার কাছে জানা গেল, এখানে দুটো সিনেমা হল আছে। আড়াইটের সময় হল খুলবে, এখনও অনেক 'টেম' আছে। 'ভেইয়া' রিকশাওয়ালার 'টেম' শুনে নসিব হেসে ফেলে: 'আমরা বিলেত থেকে আসছি যেন— তাই 'টেম' আছে। ব্যাটা জানে না আমি কাছেই সাধেড়েতে বড় হয়েছি!' বাসস্ট্যান্ডের রাস্তা ধরে কিছুটা আসতেই স্টেশন। ওরা স্টেশনে ঢুকে ওয়েটিং রুমের একটা বেঞ্চে বসে পড়ে। দুপুর দুটোর গাড়ি থেকে বেশ কিছু যাত্রী নামে। ওরা দেখে—তারপর ঠিক দুটোর সময় উঠে পড়ে। পা চালায় প্রভাত সিনেমার উদ্দেশে।

নয়

ছবি দেখে ঠিক সাড়ে পাঁচটায় ওরা বেরিয়ে আসে। বাস-গুমটির দিকে হাঁটা দেয়। নসিব রিকশায় ওঠার কথা বলে, যাতে বাস ধরা যায়। পুষ্প যেন কথাটা শুনেও শোনে না। সে আরও ধীরে পা চালায়। যেন বাস ধরার কোনও ইচ্ছেই নেই! রেলের মালগুদামটার কাছে এসে পুষ্প দাঁড়িয়ে পড়েঃ 'বাসে উঠব না।'

নসিব থ! 'মানে?'

'মানে — সাধেড়ে যাব। তোমার মার সঙ্গে দেখা করব।'

'কিন্তু—' পুষ্পর প্রস্তাব শুনে নসিবের মুখে কথা জোগাল না।

'কিন্তু কী— ভয় পাচ্ছ?'

'না-না — ভয় পাব কেন?'

'তাহলে চলো। সাধেড় কত দূর এখান থেকে? বাস যায়?

'সাধেড় এখান থেকে মাইল খানেকের পথ। বাসের চেয়ে রিকশাই ভাল।'

'মোটে এক মাইল? তাহলে হেঁটে যাই, চলো।'

প্রভাত সিনেমার দিকে না গিয়ে, ওরা আর একটা পথ ধরে নেহেরু স্ট্যাচুর কাছে এসে পৌঁছয়। ওখান থেকে সদর বাজার। বাজারে বেশ ভিড়। গাড়ি স্কুটার ঠ্যালা আর খচ্চরটানা গাড়িতে ছয়লাপ। পাশ কাটিয়ে যাওয়াটাও বেশ কষ্টকর। মনে হয় যেন একটা জঙ্গল, যেখানে কেউ কাউকে চেনে না। যেমন খুশি যাও, কেউ কারও দিকে তাকায় না। পুষ্প বলে, 'এখানে আমাদের কেউ দেখছে না, দিব্যি যাচ্ছি আমরা। ইচ্ছে হচ্ছে এখানে থেকেই যাই।'

'হুঁ। যতক্ষণ অচেনা ততক্ষণই ভাল, চেনা হলেই যে মুশকিল!

ছত্রাখু চৌকের এখানে-ওখানে ছড়িয়ে থাকা বাজারে আলু আর সবজি খুব বেশি। দোকানিদের হাঁকডাক পরস্পরের সঙ্গে প্রতিযোগিতা চালিয়ে বিচিত্র এক শব্দমন্ডল তৈরি করে চলেছে। নসিব সবজি কেনে— নইলে মা অচমকা কোথায় যাবে সবজি কিনতে? পুষ্প কিছু ফলমূল কেনে। সবজির টাকাটা পুষ্পই দেয়। বাজার থেকে ওরা ধরে সিঙ্কপাতি জাতীয় সড়ক। খুচরো বাজার, মুটেদের আড্ডা পার হয়ে সাধেড়ের রাস্তা ধরে কিছু পরেই।

সূর্য ডোবে। রাস্তা দিয়ে যেতে-যেতে পুষ্প কথা চালিয়ে যায়ঃ 'মনে হয়, আমি যেন ঘরে ফিরছি।'

'ঘরেই তো যাচ্ছ।'

'ধ্যুৎ! আমি বলতে চাইছি শ্বশুরবাড়ি ফিরছি।'

কথাটা শুনে নসিব কেমন যেন নিভে যায়। প্রাণটা উড়ে যায়। মুখ দিয়ে কথা সরে না। পুষ্প আবার বলে, 'কী, তোমার এ-রকম মনে হচ্ছে না?'

নসিব কোনও ক্রমে ঢোক গিলে জবাব দেয়, 'হুঁ'।

'কিন্তু, এমন চুপসে গেলে কেন?'

পুষ্প সোজাসুজি কথাটা বলতে নসিব বড় অসহায় বোধ করে। কি বলবে ঠিক করতে পারে না। কেমন যেন বোবা হয়ে যায়। পুষ্প কিন্তু অন্য মেজাজে। হালকা সুরে সে বলে, 'কী ব্যাপার, তোমার মুখটা কেউ সেলাই করে দিয়েছে না কী?'

নসিব কথা ঘোরায়, 'সেলাইয়ের দরকার কী? এমন সুন্দরী মেয়ে কাছে থাকলে কারও মুখ থেকে কথা বেরোয়?'

'কাছে, না পাশে থাকলে?'

নসিব এবার সত্যিই জবাব খুঁজে পায় না। ইটের ভাটা পড়ে সামনে। কল খুলে দু জনেই জল খায়। গাঁয়ের কাছাকাছি আসতে পুষ্প আবার উচ্ছল হয়ে ওঠে, 'আচ্ছা— মাকে প্রণাম করব না সৎশ্রী জানাব?'

'সৎশ্রী করলেই হবে।'

'উঁহু, আমি প্রণাম করব।'

'আজ নয়, পরে।'— এবার একটা স্কুল এসে পড়ে। তার সামনে দিয়ে যে রাস্তাটা, সেই রাস্তা ধরে গিয়ে একটা সাঁকো— তার নিচে সেচ। সাঁকো পার হতে সুজাপতির বাড়ি। পাকাপোক্ত বিশাল এক দরজার সামনে ঢালাও এক লম্বাটে রক। রকের ওপর বেশ কিছু লোকজন জটলা করে যায়। গাঁয়ে কেউ ঢুকলে তাদের নজর এড়িয়ে যেতে পারে না। ওরা তীক্ষ্ণ চোখে দেখে, তারপর নিজেদের মধ্যে আলাপ আলোচনা শুরু করে দেয়। অথবা জিজ্ঞেস করে: 'কে ভাই? কোথা থেকে আসছ? কোথায় যাবে?'— নসিব পুষ্পকে বলে দেয়, মাথা নিচু করে চটপট পথটুকু পার হয়ে যেতে। দু জনেই চটপট হেঁটে পথটুকু পার হয়ে যায়। বসে থাকা লোকগুলো শ্যেনচক্ষুতে ওদের চলে যেতে দেখে। নসিব যে পুষ্পকে নিচু গলায় নির্দেশ দিচ্ছে, এটাও তাদের চোখ এড়ায়নি। এগিয়ে এসে পুষ্প প্রশ্ন করে, 'ওখানে কী সব সময়েই লোক এমন হাঁ করে বসে থাকে?'

'হ্যাঁ। ওটা হলো গ্রামের চৌপাল, বারোয়ারি বৈঠকখানা। বাড়িটা আগে ছিল স্কুল। ভেতরে একটা গুরুদ্বারও আছে। ওই বিশাল দরজাটা অন্তত একশো বছরের পুরনো।'

লম্বাটে পথ ধরে রাস্তাটা ঘুরে গেছে ডাইনে। একটু এগোলেই নসিবদের বাড়ি— প্রমাণমাপের লম্বা চওড়া বাড়ি। খোলা বারান্দা। উঠোনে দুটো বিরাট গাছ, একদিকে বসার ঘর, রান্নাঘর; বিপরীত দিকে আর একটি ছোট ঘর। এই ছোট ঘরটিতেই থাকে নসিবের মা। ঘরটির লাগোয়া পাঁচিলের গায়ে উনুন, খানিকটা চিলতে উঠোন— অর্থাৎ রান্নাঘর। একটা কাপড়ের ওপর কিছু কলাই ডাল রোদে দেওয়া হয়েছে। বর্ষায় জলের ছাঁট আটকাবার জন্যে পাঁচিলের দু দিকে মোটা কাঠের জাফরি। বুড়ির কাছে ছোট আর একটা উনুন আছে। এদিক-ওদিক স্বচ্ছন্দে নিয়ে যাওয়া যায়। বর্ষা বেশি হলে এই উনুনটাকে ঘরের মধ্যে জ্বালানো হয়। রান্নাবান্না বুড়ি নিজেই করে। ছেলেদের পরোয়া করে না। ছেলের বউদের সঙ্গে বিশেষ সদ্‌ভাব নেই। হাত পা এখনও বেশ শক্ত সামর্থ। সারা গাঁ চষে বেড়ায়। পরিচিত ঘরের সঙ্গে সম্পর্ক অটুট। ফলে, খাওয়াপরার ব্যাপারে কোনও মুশকিলে পড়তে হয় না। তিন ছেলেই আলাদা থাকে। যে যার রোজগারে সংসার চালায়। বউদের আলাদা রান্নাঘর আর, মার থাকার ঘর— তিন ছেলে মিলেই করে দিয়েছিল। শাশুড়ি-

বউয়ের ঝঞ্ঝাট মেটাবার এইটিই ছিল সোজা পথ। বউরা অবশ্য শাশুড়ির খবর ঠিকই নিয়ে যায়— বনিবনা রেখে চলে, কিংবা চলার চেষ্টা করে। নসিবের বড়দা মোষের দালালি করে, মেজো গাঁয়ের মধ্যেই টুকটাক কাজ করে, সেজো অর্থাৎ নসিবের বড়, ভদ্দলবড়ের মদের দোকানে কাজ করে। কখন যায়, কখন আসে— ঠিক নেই। তিন ভাইয়েরই ছেলেমেয়ে আছে। নসিবের বাবা ছিল গ্রামের ডাকসাইটে নাপিত। ঘোড়া ছাড়া কাজে যেত না। বেজায় বুদ্ধিমান এই লোকটিকে গ্রামবাসী এখনও মনে রেখেছে। তার সব চেয়ে বড় গুণ ছিল, বিপদ-আপদে লোকের পাশে দাঁড়ানো। যার জন্যে তার পরিচিতির ক্ষেত্রটি ছিল বেশ বড়। পরিশ্রমের টাকায় বাড়ি, উঠোনের একদিকে কুয়ো— সবই তার নিজের হাতে বানানো। উঠোনে যে বিরাট বটগাছটা বসিয়েছিল, স্মৃতি হিসেবে তা এখনও দাঁড়িয়ে আছে।

ঘরে ঢুকেই নসিব মাকে ডাক দেয়। চেনা গলার আওয়াজ পেয়ে মা রুটি বানাতে বানাতে থেমে যায়। তারপরেই, ওদের দুজনকে দেখে একটু হকচকিয়ে যায়। নসিব পরিচয় করিয়ে দেয়, 'চন্ননবাল যাচ্ছিল— বাস ধরতে পারেনি। তাই নিয়ে এলাম— কোথায় যাবে বেচারা!'

'ভাল করেছিস। তুই এখানে বস মা।' বুড়ি খাটিয়ার ওপর পুষ্পকে বসিয়ে দেয়, জড়িয়ে ধরে একটু আদরও করে। নসিব পেছনে দাঁড়িয়ে, থাকে, পুষ্প যেন আবার প্রণাম করে না বসে। পুষ্প কিন্তু চুপচাপই থাকে। এদিক-ওদিক উকি মারতে দু একজনকে যাতায়াত করতেও দেখে। বাচ্চারা নসিবকে দেখে ঐকতানে 'কাকা' 'কাকা' বলে হুড়মুড়িয়ে ছুটে আসে। পুষ্পকে দেখে কৌতূহলী হয়ে ওঠে। এরপরই ঢোকে তিন বউ; শোনে, বাস ধরতে না পেরে পুষ্প এখানে এসে পড়েছে। বড় মিষ্টি মেয়েটা! বড় বউ বলে, 'মা— আমার কাছে ডাল আছে। রুটিও। তোমাকে কিছু বানাতে হবে না এদের জন্যে।'

ভেতরে শোয়ার ব্যবস্থা নেই। উঠোনে শোয় সবাই। নিজের নিজের কামরার সামনে খাটিয়া পড়ে। খাওয়াদাওয়া সেরেই খাটিয়া পেতে বিছানা করা হলো নিত্যকর্ম। নসিব তার বড়দা ও মেজদার সঙ্গে দেখা করে। কুশল বিনিময় চলে কিছুক্ষণ। সেজোজন এখনও ফেরেনি। ফিরতে ফিরতে মাঝরাত হবে। আবার, দোকানেও থেকে যেতে পারে। নসিবের মার ঘরের সামনে তিনটে খাটিয়া পড়ে। মাঝখানে মা, দু পাশে নসিব ও পুষ্প। বাচ্চারা সব নিজেদের খাটে। চাঁদনি রাত। একটু পরেই বড় বউ আর মেজ বউ খাট থেকে উঠে পড়ে। দুই বউয়ের মধ্যে ইশারা হয়। তারপর ছোট বউও উঠে যায়। নসিব দেখে। পুষ্প নসিবের মার সঙ্গে গল্প করে চলে। দু জনের মধ্যে কি কথা হচ্ছে— কে জানে। ভেতরের ঘরে কম পাওয়ারের একটা বাল্‌ব জ্বলে। তিন বউ খুব উত্তেজিত হয়ে কি যেন আলোচনা করে। চাপা গলার সেই আলোচনা নসিব শোনার চেষ্টা করে। কিন্তু বিন্দুবিসর্গও শুনতে পায় না। আধ ঘণ্টা-পঁতাল্লিশ মিনিট পর তিনজনই বেরিয়ে এসে যে-যার খাটে শুয়ে পড়ে। কেউ কারও সঙ্গে আর কথা বলে না। চাঁদনি রাতটা ধীরে ধীরে গড়িয়ে যায়। বটগাছের পাতার ফাঁক দিয়ে চাঁদের আলো চুঁইয়ে পড়ে। মনে হয় চাঁদের আলোটাও যেন কিছু একটা শোনার চেষ্টা করছে। সময়ের গতি বড়ই মন্থর, ঠিক মানুষের মতোই সন্তর্পণে পা ফেলে। নসিব আর পুষ্পর চারপাই তফাতে থাকলে কি হবে, মন দুটো যেন বড় কাছাকাছি হয়ে কথা বলে।

দশ

সকালে সূর্য ওঠার আগে তিন বউই উঠে পড়ে উনুনে আঁচ দেয়। কাঠ চেরাইয়ের আওয়াজ ভেসে আসে। চায়ের কেটলি চাপে গনগনে আঁচে। নসিবও উঠে পড়ে। মা এখনও ঘুমোচ্ছে। পুষ্পও জেগে উঠেছে। কিন্তু, বিছানা ছাড়ে না। নসিবকে উঠে বসতে দেখে সে-ও উঠে পড়ে। নসিব বলে, 'মা কখন উঠবে কে জানে, চা বসাব?'

'বসাও। কিন্তু আগে এক গ্লাস জল —'

পুষ্পর হাতে জলের গেলাস দিয়ে নসিব উনুন ধরিয়ে ফেলে। কেটলি চাপিয়ে মার ঘরে ঢোকে। চিনির কৌটো পেলেও, চায়ের কৌটো খুঁজে পায় না। ভাবে, মাকে ডেকে জিজ্ঞেস করে। তারপর, কি ভেবে চলে যায় বড় বউদির কাছে। এক মুঠো চা-পাতা নিয়ে এসে কেটলির মধ্যে ঢালে। আঁচটা আর একটু উসকে দেয়। দুধের শিকে থেকে ঘটি নামিয়ে দেখে, দুধ নেই, জল ভরা আছে তাতে। মাকে জাগাতে যাবে, এমন সময় বলবীরি এক গেলাস দুধ হাতে ঢোকে। বলবীরি বড়দার ছোট মেয়ে। দুধটা নিয়ে নসিব আদর করে তার মাথায় একটা চাঁটা দেয়: 'আরে বাঁদরি! কথা নেই কেন মুখে?' বলবীরি হেসে ফেলে। এবার পুষ্প তাকে কাছে টেনে জিজ্ঞেস করে, 'বাথরুম কোথায়?'

'বাতলুম?' বলবীরি তোতলায়।

'ধ্যুৎ!' পুষ্প হেসে বসে ওঠে। বলবীরি এবার ব্যাপারটা ধরে নেয়। পুষ্পকে সঙ্গে করে নিয়ে যায়। ফেরার পথে, নসিবের বড় বউদি তাকে ডাকে। হাত ধরে নিয়ে যায় ঘরের ভেতর। খাটের ওপর বসিয়ে নানা প্রশ্ন করে। চা খাওয়ায়। তারিয়ে তারিয়ে দেখে: 'নিশ্চয়ই এক কলেজে পড়ো? ভাইবোন কজন? চন্নবালে কোন্ আত্মীয় থাকে?' পুষ্প সব কথারই জবাব দিয়ে যায় ছোট করে, হেসে হেসে।

নসিব দু গ্লাস চা মার জন্যে রেখে দেয় ঢাকনা লাগানো একটি পাত্রের মধ্যে, যাতে চা ঠাণ্ডা না হয়ে যায়। উকি মেরে দেখে, পুষ্পর সঙ্গে বউদিরা জমিয়ে গল্প জুড়ে দিয়েছে। নসিব চা খেয়ে খেতের দিকে চলে যায় প্রাতঃকৃত্য সারতে। সেজো ভাই খুব ভোরেই বেরিয়ে গেছে খেতের কাজে। ওর চালচলন অনেকটা বাবার মতো। ঘোড়ায় চড়ে যাতায়াত করে সর্বত্র। এখন গম কাটার মরসুম। ফেরার পথে ঠিক কিছু ভূসি কিংবা দানা আনবে। বড়জনের মোষ আছে। দুধ বিক্রি করে পাড়ায়—অন্য দুই ভাইও দাদার কাছ থেকে দুধ কেনে। বড় বউ অবিশ্যি শাশুড়িকে সকাল সন্ধ্যেয় দুধ দেয় বিনা পয়সাতেই। এতে বুড়ি খুশি থাকে। তিন ভাই তিন ধরনের। বড়র চুল আর পাগড়ি বাঁধার ধরনে মনে হয় সাক্ষাৎ গুরু সিং, দ্বিতীয়জন মেজো-র চুল লম্বা কিন্তু পাগড়িটাগড়ির বালাই নেই, দাড়ি ছাঁটলেও গোঁফ ছাঁটে না, কুণ্ডলী পাকিয়ে রাখে আর এনতার বিড়ি খেয়ে যায়! সেজোজন পাগড়ি পরে বটে কিন্তু গোঁফদাড়ি নিপাট কামানো। মাথার চুলও কাটায়। এই হলো যথাক্রমে সুর্জন মিলখিরাম ও সুখদেব সিং, এবং মা হর কৌর। তিন ভাই-ই পুষ্পকে দেখে। মা জেগে উঠে বসে, বলে, 'আমাকে জাগালে পারতিস, কেন মিছিমিছি কষ্ট করলি? মেয়েটা চা খেয়েছে তো? গেল কোথায়?'

'হ্যাঁ। ওই তো সুখদেবের বউয়ের সঙ্গে বসে গল্প করছে।'

'ডেকে আন। চা খাওয়াই। তাড়াতাড়ি পৌঁছে দে ওকে—সাইকেলটা নিয়ে যাস। সময়মতো বেচারা তাহলে বাড়ি যেতে পারবে।' হর কৌর বেশ চিন্তিত। মা-ছেলে কথা বলছে দেখে, সুখদেবের বউ পুষ্পকে বলে, 'যা বোন—ওরা বোধ হয় তোকে খুঁজছে।' পুষ্প উঠে দাঁড়াতে, নসিব এসে জানায়, মা খুঁজছে। যাওয়ার সময় সুখদেবের বউ নসিবকে ধরে, 'আসল ব্যাপারটা কী বল তো? কেন লুকোচ্ছিস আমাদের কাছে? মেয়েটা কে?'

'বুঝে নাও!' নসিবও রসিকতা করতে ছাড়ে না।

'কিন্তু—এতো জাঠেদের মেয়ে—আমরা—'

'আমারা নাপিত, এই তো? আরে, আমাদেরও তো রক্তের রং লাল—ঠিক জাঠেদের মতোই!'

'তোর মাথাটা গেছে! ওদের জাত —'

'জাতপাত চুলোয় যাক! মেয়েটাকে তোমাদের কেমন লেগেছে?'

'খুব মিষ্টি! কিন্তু চালচলন তো মেমসায়েবের মতো। ওকে এখানে রাখবি কী করে? আমরা নখ-কাটুনে জাত। ওর বাবা সর্দার—'

'নখ-কাটুনে আমার বাবা ছিল। আমি নই। সর্দার-ফর্দার মানি না। আমরা নিজেরাই সব ঠিক করেছি।'

'এসব বাপু আমার মাথায় ঢুকছে না।'

'তোমায় আর মাথায় ঢোকাতে হবে না! দাদাদের কানেও কথাটা তুলো না এখন। শুনলেই ঘাবড়ে যাবে। সময়মতো আমিই সব জানাব। মাকেও কিছু বোলো না। তুমি জানতে চাইলে বলেই বললাম।'

'আমার পেট থেকে কথা বেরোবে না। কিন্তু, তুই সাবধানে থাকিস।'

'ভেব না, বউদি।' বউদিকে অভয় দিয়ে নসিব মার ঘরে আসে। পুষ্পকে বলে, 'চলো, তোমাকে বাসস্ট্যান্ডে পৌঁছে দিই।'

পুষ্প কিন্তু ওঠার কোনও লক্ষণ দেখায় না। নসিবের মাকে বোঝায়, 'একটু দেরি হলে কিছু হবে না।' কেননা, চন্নবালে এত তাড়াতাড়ি পৌঁছনটা ঠিক হবে না। রাতে কোথায় ছিল, তার কৈফিয়ৎ দিতে হবে। নসিবের দিকে সে অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকায়। নসিব ঠিক বুঝতে পারছে না, একদম বুদ্ধু! নসিবের মা কিন্তু ব্যাপারটা বুঝে ফেলেছে। সে পুষ্পকে বলে, 'মেয়ে—তুই বরং চানটান করে নে। আমি রুটিটা বানিয়ে ফেলি। খাওয়াদাওয়া করে বরং যাস। লস্‌সিটা আমি ততক্ষণে বড় বউয়ের কাছ থেকে নিয়ে আসি।'

উঠোনেই কুয়ো। কুয়োর লাগোয়া একটা বাথরুম। চৌবাচ্চার মধ্যেই কল বসানো আছে। জলের অসুবিধে নেই। পুরুষরা চান করে বাইরে। বাথরুমটি শুধু মেয়েদের জন্যে। বানিয়ে দিয়েছিল সুর্জন। গাঁয়ের স্কুলের ডান দিকে জলের টাংকিও বসে গেছে। একটু অবস্থাপন্ন সব বাড়িতেই এখন কল। বিনা পয়সার জল। পুষ্প স্নান সেরে নেয়। নসিব আগেই ওখানে তেল সাবান রেখে দিয়েছিল। এমনকি তোয়ালও। সুর্জনের বউ পরোটা,

লস্‌সির জাগ নসিবের মার ঘরে রেখে যায়। নসিবও স্নান সেরে নেয়। দুজনেই একসঙ্গে খেতে বসে। মা আমের আচার দেয় পাতে। দুজনকে এক সঙ্গে খেতে দেখে, বুড়ির চোখে একটা স্বপ্ন ভেসে আসে। বাড়ির বাচ্চারাও ছুটে এসেছে ওদের খাওয়া দেখতে। মিলখির ছেলে মজা পেয়ে হাততালি মারে। বাচ্চাদের কাণ্ড দেখে ওরা হাসে। নটা বেজে যায়। পাশের বাড়ির সাইকেলটা নিয়ে নসিব পুষ্পকে নিয়ে বেরোয়। তিন বউ বিদায় জানাতে রাস্তা অবধি আসে। সাইকেলের ক্যারিয়ারে পুষ্প বসে। নসিব আস্তে-আস্তে সাইকেল চালায়। একটু পরেই পুষ্প বলে, 'এত আস্তে চালাচ্ছ কেন? পায়ে ব্যথা নাকী? তার চেয়ে বাপু — হেঁটেই চলো।'

নসিব জবাব দেয়, 'সেই ভাল। গল্প করতে করতে যাওয়া যাবে। আর, এত তাড়াতাড়ি গিয়েই বা কী হবে?'

'আমি ভাবছি—বাবার কানে কথাটা গেলে কী হবে—আমাকে তো মেরে শেষ করে ফেলবে!'

'দ্যুৎ! এত দূরে—তোমার বাবা জানবে কী করে?' নসিব অভয় দেয়।

'কিছু বলা যায় না। কে কোথায় কাকে দেখে!' তারপর নিজেই উত্তর দেয়, 'যেতে দাও এসব কথা। একদিন না একদিন তো জানাজানি হবেই। এখন ভয়ে-ভয়ে থাকতে যাব কেন?'

'জানাজানি হলে কী করবে?' নসিব একটু চিন্তায় পড়ে।

'তখন দেখা যাবে। পা সামনে বাড়িয়ে পেছনে তাকাবার কোনও মানে হয় না।' খুব দৃঢ়ভাবে পুষ্প কথাটা বলে।

ওরা বরগলার স্টপে না গিয়ে টোকরিওয়াল স্টপের দিকে এগোয়। সিন্ধুপতি সড়ক ধরে চন্নবালের বাস ওখানেই থামে।

এগারো

পুষ্প জানায় চন্নবালে সে দশ দিনের বেশি থাকবে না। কবে ফিরবে, কখন ফিরবে, অর্থাৎ সময় ও তারিখ, চিঠি দিয়ে জানিয়ে দেবে। নসিব ওই সময় যেন বারনালার বাসস্ট্যান্ডে হাজির থাকে। একসঙ্গে আসবে সালাবাতপুরা অবধি আর, নসিব যেন ভুলেও চন্নবাল না যায়। মামার ছেলে লোক সুবিধের নয়। কিছু উলটোপালটা হলেই বিপদ! মামার ছেলে কী করে বসে, ঠিক নেই। নসিব যেদিন থেকে মামার কাছে আছে, সাধেড়েতে এসে দুদিনের বেশি থাকত না। আসত চার পাঁচ মাস অন্তর-অন্তর। এখানে এলে নিঃসঙ্গ হয়ে পড়ত। তাছাড়া, জগিরা শুধু ওর পড়াশোনা আর খাওয়াদাওয়াই চালাত না, ভালও বাসত নিজের ছেলের মতো। মামি ছিল মার মতোই। নিঃসন্তান এই দম্পতির কাছে নসিবই ছিল সব কিছু। মামা তাকে ক্রমাগত পড়াশোনায় উৎসাহ দিয়ে যেত।

দশদিন কেটে যায়। পুষ্পর কাছ থেকে কোনও চিঠি আসে না। নসিব রোজই ডাকঘরে গিয়ে খবর নেয়। এই গ্রামের পোস্টব্যাগে রোজ কুড়ি তিরিশটা চিঠি আসে। চিঠি না পেয়ে নসিব ভেবে পড়ে। খিদেতেষ্টা অবধি চলে যায়। এক-একদিন, দুপুরের রুটি অবধি খায় না। চিঠির জন্যে নসিবের এই প্রতীক্ষা, পুষ্পর জন্যে যে প্রতীক্ষা, তার চেয়েও বেশি যন্ত্রণার। সকালে উঠেই তার প্রতীক্ষা শুরু। রাত আর কাটতে চায় না। পোস্টম্যানের জন্যে হাপিত্যেশ হয়ে বসে থাকে। স্কুলের সামনে এক সাইকেল মেরামতির দোকানে গিয়ে বসে থাকে অনেকক্ষণ ধরে। বারনালা থেকে সাইকেলে করে আসা লোকজনদের দেখে যায়। মনে হয়, এই বুঝি পুষ্প এলো! পোস্টম্যান চলে গেলেই, প্রাণটা মাছের মতো ছটফট করে। মনে হয়, এখনি বুঝি মরে যাবে। পোস্টম্যানের সঙ্গে সঙ্গে চলতে থাকে। ডাকঘরে এসে পোস্টম্যান থলি খুললেই, সে শ্যেনদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে। ডেলিভারির লোক ঠিকানা পড়তে শুরু করলেই, সে উৎকর্ণ হয়ে ওঠে। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ঠিকানা অনুসারে সাজানো চিঠিগুলো দেখে। না, ওর চিঠি নেই! শরীরটা সঙ্গে সঙ্গে কেমন যেন অবশ, নিস্তেজ হয়ে পড়ে। বুকটা কেমন যেন শুকিয়ে যায়। কলজেটা জ্বলে যায়। কান ভোঁ ভোঁ করে।

পা ঘসটাতে-ঘসটাতে সে ডাকঘর থেকে বেরিয়ে পড়ে। বাড়ি না গিয়ে চলে যায় বাবা টেকদাসের ডেরায়। সেখানে, নিমগাছের নিচে একটা চাতালে বসে পাঞ্জাবি কাগজটা পড়ে। বুড়ো নিমগাছের ঝুরির এদিক-ওদিক লোকের জটলা, খেত থেকে আনা লতাপাতার ডাঁই, জড়ো করা কাঠ, জড়িবুটির নানা উপাদান। দু-তিনটে খাটিয়া হামেশাই পড়ে থাকে। গাঁয়ের বাইরে থাকা আসা লোকজন এই খাটিয়া টেনে শোয় কিংবা বসে। কাগজ পড়ে, সারা দুনিয়ার খবর নিয়ে আলাপ-আলোচনা তর্কবিতর্ক করে যায়। লঙ্গরখানা থেকে রুটি, খাট্টা লস্যি, চা—সবই এখানে দেওয়া হয়। নসিবের হাতে কাগজ দেখে নিরক্ষর মানুষ সাগ্রহে জিজ্ঞেস করে, 'আজকের কাগজে কি লেখা আছে?' নসিব কখনও তাদের পাতা তিন চার পড়ে শোনায়, কখনও কোনও বিশেষ খবর। কখনও গম্ভীরভাবে বলে, 'আজ বিশেষ কোনও খবর নেই।' উলটো দিকের বারান্দা ও তক্তপোশেও অনেকে বসে থাকে। কেউ আবার নিমগাছের নিচে রাখা তক্তপোষটি দখল করে বসে। টেকদাস এখানে বসেই ওষুধপত্তর জড়িবুটি বিতরণ করেন। ওষুধপত্তর দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে রাজনীতি ধর্ম সাম্য ও সাহিত্যের আলোচনাও করেন। টেকদাস মহান্তিকে একটা ছোট প্রশ্ন করলেই হলো, তিনি অন্তত আধ ঘন্টা ধরে প্রশ্নটির উত্তর ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করে দেবেন। তাঁর সামনেই একটা বড় টেবিল। টেবিলের ওপর নানা ধরনের অগুনতি শিশি। বাঁ দিকে একটা আলমারি। চেয়ারে বসে টেকদাস মহান্তি একটা পাথরবাটিতে সব সময়েই কিছু-না-কিছু বাটাবাটি করে যান। ভেষজ ওষুধে টেকদাসের বেশ নাম যশ আছে। বদ্যি হাকিমদের মতোই তিনি ওষুধ দেন, রোগের বিবরণ নেন। তাবিজ মাদুলির বুজরুকি থেকে সরে গিয়ে টেকদাস মহান্তি রোগীদের শারীরবিদ্যা বুঝিয়ে দেন। রোগীও আসে নানা গাঁ থেকে। ঈষৎ রোদ পোড়া গায়ের রঙ, টেকদাসের চেহারাটি পেটা বলিষ্ঠ চেহারা। দাড়ি নেমে এসেছে বুক সমান। পরনে চাদর আর বাঙালি-কামিজ। মাথায় গেরুয়া পাগড়ি সব সময় একইভাবে থাকে। হিন্দি ও পাঞ্জাবি সাহিত্যে বেশ দখল

আছে। কথা বলার সময় ইংরিজি শব্দও ব্যবহার করেন। রোগী ছাড়াও, নানা ধরনের লোক তাঁর কাছে আসে। কংগ্রেসি অকালি কমিউনিস্ট থেকে ব্যবসায়ী, অধ্যাপক, সাহিত্যসভার উদ্যোক্তা, কিংবা ভবঘুরে ফকির পাগল কোনও দুঃখী। কেউ কেউ আবার বিনা পয়সায় খাওয়ার লোভেও জোটে। টেকদাস ওষুধ বিলি করেন সকাল থেকে দুপুর, তারপর বিকেল থেকে সন্ধ্যে। ওখানে বসেই সবার খবর নেন। সুখ দুঃখের কথা শোনেন। কষ্টের কথা শুনে চিন্তিত হন, কষ্ট লাঘবের চেষ্টা করেন। চাঁদা সংগ্রহকারীরা চাঁদা নিয়ে যায়। রাজনৈতিক দল, ধর্মীয় সংগঠন, শিক্ষণকেন্দ্র, সামাজিক সংস্থা — প্রত্যেক জায়গা থেকেই লোক আসে টেকদাসের কাছে। দরাজদিল বাবা টেকদাস তাঁদের সাহায্য করেন দু হাতে। বেশ অনেকখানি জমি নিয়ে টেকদাসের ডেরা। ওষুধ বেচেও রোজগার কম হয় না। কিন্তু, সব টাকাই তিনি খরচ করে দেন নানান লোকহিতকর কাজে। নিষ্কাম নির্লোভ বাবা টেকদাস সাংসারিক সব কিছুর ঊর্ধ্বে। কারও বাড়িতে গ্রন্থসাহেব পাঠ হলে বাবার ডাক পড়ে সবার আগে; যে অবস্থাতেই থাকুন, বাবা ঠিক স্কুটার চড়ে ছুটে যান। ধর্মসভাই হোক, সাহিত্যসভাই হোক — বাবা ঠিক যাবেন। সাহিত্যসভায় মাঝে মাঝে কবিতাও পড়েন।

নসিব কাগজ পড়ছিল নিম গাছের নিচে বসে। বাবার সঙ্গে চোখাচোখি হতে সে সম্ভাষণ জানায়। বাবা নসিবকে খুব পছন্দ করেন। জিজ্ঞেস করলেন, 'রেজাল্ট কবে বেরোচ্ছে?'

'ঠিক জানি না।' নসিব জবাব দিয়ে চুপ করে যায়।

বাবা মাঝেমাঝে নসিবের পাশে এসে বসেন। পিঠ চাপড়ে দেন। নানা কথার ফাঁকে নসিব একদিন বাবার কাছে মার্কসবাদ নিয়ে আলোচনা করে। বাবা মন দিয়ে নসিবের ব্যাখ্যা শোনেন। তারপর মুগ্ধ হয়ে বলেন, 'কী চমৎকার তুই বোঝাতে পারিস! আমার সঙ্গে দু-একজন মার্কসবাদীর পরিচয় আছে — কিন্তু ওদের কথা বোঝে কার সাধ্যি! ওরা নিজেরাই বোধহয় ব্যাপারটা বোঝে না!'

গত বছর মে-জুনে বদ্রিনারায়ণ কোটেতে আসে দু তিন দিনের জন্যে। এই সময় নসিবের সঙ্গে তার আলাপ হয়। এবং, চলে যাওয়ার আগে নসিবকে সে দুটি বই পড়তে দিয়ে যায়। ওই দিনই নসিব সাধেড়ে আসে। সময় কাটায় হয় মার সঙ্গে গল্প করে কিংবা বাবা টেকদাসে ডেরায়। বই দুটো পড়তে খুব ভাল লাগে নসিবের। একটি বই, এমিল বার্নসের 'মার্কসবাদ কী?'-এর পাঞ্জাবি অনুবাদ; অন্যটি এঙ্গেলস্-এর বিখ্যাত বই, 'পরিবার সম্পত্তি ও রাষ্ট্রের ইতিহাস।' দুটিই মস্কোর প্রগতি প্রকাশনের বই। প্রথম দু তিনটি পাতা ছেঁড়া ফাটা, শেষেরও তিন চারটে পাতা বোধহয় নেই। নসিব কোটে গেলে তার মা যত্ন করে বই দুটি রেখে দেয়, যাতে উই না ধরে। এবার সাধেড়ে এসে নসিব বই দুটো আরও খুঁটিয়ে পড়ে। টেকদাসের ওখানেও সে একটি বই হাতে করে নিয়ে যায়। নসিবের কানে আসে, রবিবার একটার সময় বারনালা লেখক সভা এক আলোচনা-চক্রের আয়োজন করছে। তাতে অনেক স্থানীয় লেখক উপস্থিত থাকবেন। আলোচনার বিষয়: উপন্যাস। রবিবার বারোটা নাগাত নসিব বারনালায় এসে পৌঁছয়। ছত্রাখু চৌকের 'রাহি কি দুকান'-এ এসে সব জড়ো হতে থাকে। তার মধ্যে নসিবকেও দেখা যায়। ওখান

থেকেই সব যাবে হন্ডিয়া বাজারের আগরওয়াল ধর্মশালায়। সভাটা বসবে ওখানেই। একটা বাজতেই সব ওইদিকে হাঁটা দেয়।

লম্বা চওড়া একটা কামরার এ-মাথা থেকে ও-মাথা অবধি সতরঞ্চি বিছানো। এক কোণে শাদা চাদর বিছিয়ে, তার ওপর একটা তাকিয়া রাখা হয়েছে। নানা দলে ভাগ হয়ে লেখকরা আলোচনা করছেন। ট্রে-র ওপর কাঁচের গ্লাসে টলটলে জল। এক-একটি দলে অবার গায়ক-কবি গানও গাইছেন। আলোচনা যিনি শুরু করবেন, তিনি অর্থাৎ সভাপতি এখনও আসেননি। নতুন লেখকেরা সমস্বরে দাবি করছেন: 'আলোচনা না হয় পরে হবে, এখন বরং দু একটা কবিতা পড়া হোক।' রোগা পাতলা চেহারার সেক্রেটারি হাঁটুর ওপর হাতের ভর রেখে বসেছিলেন। চশমাটা নাকের ডগায় এঁটে তিনি বললেন, 'কবি-সম্মেলন শুরু হয়ে গেলে, পেপার শুনবে কে, শুনি? কবি-সম্মেলন বরং পরে হবে। এখন মিনিট দশেক অপেক্ষা করা যাক।' এইসব কথাবার্তা চলছে, এমন সময় ঢুকলেন আলোচক ভদ্রলোক অর্থাৎ সভাপতি। হাতে চামড়ার ব্যাগ, কাগজপত্রে ঠাসা। পরনে ধোপদুরস্ত কুর্তাপায়জামা। মাথার পাগড়িটিও পরিপাটি করে বাঁধা। ঢুকেই এক গ্লাস জল খেলেন তিনি। সেক্রেটারি বললেন, 'চা পরে হবে, এখন বলুন তো আপনি কোন্ পেপার পড়বেন?' তারপর, উত্তরের অপেক্ষা না করেই সভাপতির উপস্থিতি ঘোষণা করলেন।

অজস্র করতালির মধ্যে সভাপতি আসন গ্রহণ করে, তাকিয়ায় ঠেস দিয়ে বসলেন। তারপর, 'পেপার' পড়ার জন্যে তৈরি হলেন। চামড়ার ব্যাগ থেকে পাণ্ডুলিপি বের করে, চশমা থেকে একটু দূরে রেখে সেটি পড়তে শুরু করলেন। কিছুটা পড়ার পর তিনি আবার গোড়া থেকে পড়তে লাগলেন। নিবন্ধটির প্রথম অংশ সামাজিক এক ব্যাখ্যা দিয়ে শুরু, তারপর সামাজিক বিভাজন, জায়গিরদারি-প্রথা, অর্ধ-জায়গিরদারি ও বুর্জোয়া মানসিকতার আলোচনা। দ্বিতীয় অংশ পাঞ্জাবি ঔপন্যাসিকের সমালোচনা; তৃতীয় অংশ নতুন ঔপন্যাসিকদের কর্তব্য ও সামাজিক ভূমিকা। এই অংশে বিদেশি কিছু লেখক, বিশেষ করে রুশ লেখকদের, আলোচনা আছে। তবুও আলোচনা বিশেষ জমে না। দু একজন, স্থানীয় উপন্যাস-লিখিয়েদের কঠোর সমালোচনা করলেন। বেশির ভাগই আবেগবাহিত হয়ে ব্যক্তিগত ক্যাথারসিস মোচন করলেন। মূল আলোচক উদাসীন ভঙ্গিতে বসে রইলেন। উনি অবশ্য এমনিতেই পাঞ্জাবি উপন্যাস সম্পর্কে নিস্পৃহ। শেষে ঘোষণা করলেন, 'আর কেউ যদি কিছু বলতে চান—'

দেখা গেল, আর কেউ কিছু বলতে চাইছেন না। কবিরাই শুধু অগ্রণী হায় কবিতা পড়তে শুরু করে দিলেন। শ্রোতাদের কারও দাবি গজল, কারও গীতিকবিতা, কারও বা আবার শুধুই গান। কবিতা পাঠরত কবি শূন্যদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন বিদগ্ধ সেই কোলাহলে। আর একজন কবি এমন এক দুর্বোধ্য কবিতা পড়তে শুরু করলেন যে, শ্রোতারা নিজেদের মধ্যে ফিসফিস করতে লাগলেন। সব কবিই অবশ্য কবিতা পড়ার সুযোগ পেয়েছিলেন। জাবদা খাতায় লেখা স্ব-নির্বাচিত সব কবিতা। মাঝে চা-পান পর্ব। কবি দরবার শেষ হতে পাঁচটা বেজে যায়। কিছু শ্রোতা বারনালাতে থেকে যাবেন ঠিক করলেন, কেউ ধাবায়, কেউ পরিচিত কারও বাড়িতে। অবশিষ্ট, জনা কয়েক স্থানীয় এক লেখকের বাড়িতে গিয়ে মদের আসর জাঁকিয়ে বসলেন।

বারো

আলোচক ভদ্রলোক মদ খান না। স্থানীয় লেখকেরা সনির্বন্ধ অনুরোধ জানালেও তিনি বারনালাতে থাকতে চাইলেন না। তাঁর গ্রাম এখান থেকে বেশ দূরেই। তিনি ঠিক করলেন, পাঁচ সাত মাইল দূরের একটি গ্রামে, তাঁর পরিচিত এক লোকের বাড়িতে রাতটা কাটিয়ে যাবেন। সভা শেষ হতেই তিনি হাঁটা দিলেন বাসস্ট্যান্ডের দিকে। সেখানে গিয়ে বাসের সময় ভাড়া ইত্যাদির খোঁজখবর নিতে লাগলেন। নসিবের খুব ভাল লেগেছিল এই ভদ্রলোকের আলোচনা। তিনি নিবন্ধ পড়ার সময় রসুল রমজাতিবের লেখা 'মেরা দাগিস্তান' ও আর একজন রুশীর 'আস্‌লি ইনসান কি কাহানি' বই দুটির কথা উল্লেখ করেছিলেন। নসিব দ্বিতীয় উপন্যাসটির কথা আগেও শুনেছে। একবার পড়তে শুরু করলে শেষ না করে তো ওঠাই যায় না, এমনকী বার-বার পড়তে ইচ্ছে করে।

আগরওয়াল-ধর্মশালার বাইরে যে-সব কথাবার্তা চলে, তা এই রকম:

— কোথায় যাবে?

— এখানেই থেকে যাব।

— প্রোগ্রাম?

— আরে, অনেকদিন তো দেখাই নেই!

— তোমার লেখা তো আজকাল বিস্তর ছাপা হচ্ছে!

— কী ব্যাপার? একদম চুপচাপ যে? লেখা দেখি না।

এই সব কথাবর্তার আলতো জবাব দিতেদিতেই আলোচক ভদ্রলোক বাসস্ট্যান্ডে পৌঁছতে, নসিব প্রশ্ন করে তাঁর উল্লেখিত বই দুটি কোথায় পাওয়া যাবে। ভদ্রলোক জানালেন সব দোকানেই পাওয়া যেতে পারে। মস্কোতে ছাপা—দামও বেশি নয়। চার পাঁচ টাকার মতো। বাসস্ট্যান্ডের কাছে যে পত্রিকার স্টল আছে, সেখানেও থাকতে পারে। তিনি নিজেই নসিবকে নিয়ে চললেন। ভদ্রলোকের অগাধ পড়াশোনা। তিনি যেতে যেতে নসিবকে বোঝাতে লাগলেন, 'নামে উপন্যাস হলেও গল্পটা কিন্তু সত্যি ঘটনা। প্রধান চরিত্র অ্যালেক্‌সি মাসয়েভ নিজেই ঘটনাগুলি বলে গেছে।'

'লিখেছেন কে ?'

'বরিস পোলেবি। উপন্যাসের ভুমিকা লিখেছেন অ্যালেক্‌সি নিজেই আর ঔপন্যাসিককে যেভাবে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন, তা কোনও বিদগ্ধ সমালোচকও জানাতে পারতেন না। অ্যালেক্‌সির কথায়, "আফসোস, আমি নিজে লিখতে পারি না, লিখতে পারলে আমি এইভাবেই লিখতাম। একই কথা, একই শব্দ ব্যবহার করতাম!"—এই কাহিনী একজন দেশভক্ত সৈনিক, ও নিয়মিত চিঠি-লিখিয়ের অভিজ্ঞতা ও অনুভব।'

'মেরা দাগিস্তান — ওটাও কী উপন্যাস?'

'উপন্যাস?' ভদ্রলোক একটু ভাবেন, তারপর বলেন, 'ওটা এমন একটা বই, যাকে উপন্যাস কাহিনী কাব্য, যে কোনও নাম দেওয়া যায়। প্রত্যেকটা লাইন কবিতার মতো। এই ধরনের বই আগে কেউ লেখেনি। ঠিক ধর্মগ্রন্থের মতো, সেখান থেকে খুশি পড়া যায়।'

'তাহলে তো বড় আশ্চর্য বই!'

ওরা পত্রিকার স্টলে ঢোকে। দুটো বই-ই পাওয়া যায়। মোট এগারো টাকা। নসিবের কাছে আট টাকা আছে, আলোচক ভদ্রলোক, নসিব সংকোচ বোধ করলেও, তিন টাকা দিলেন: 'দূর! পয়সার কথা ভাবছ কেন? বই পড়ার কথা, বই পড়বে, পরে হয়তো বই আর পাবে না।'

নসিব ভদ্রলোককে চা খাওয়াতেও পারল না। পকেটে ওই আট টাকাই বাড়তি ছিল। ভদ্রলোক নসিবের করমর্দন করে সঙ্গরুর বাসে উঠে পড়েন।

নসিব এসেছিল সাইকেলে। সাধেড়ে পৌঁছতে সন্ধ্যে হয়। গম কাটার মরসুম। চর্তুদিকে গমকাটা মেশিনের আওয়াজ। ঘরে এসে বই দুটো সে উলটে-পালটে দেখে। মনটা আজ একটু ভাল। পুষ্পর কথা বিশেষ মনে পড়ছে না। উঠোনে খাটিয়ার ওপরই সে 'ইনসান কি কাহানি' পড়তে শুরু করে দেয়। অ্যালেক্‌সির ভূমিকাটা পড়ে নেয় আগে। তারপর, "আকাশে এখনও তারা ঝকমক করছে। উজ্জ্বল কিন্তু শীতল। পূর্ব দিকে সূর্যের লালচে আলো—" নসিব একমনে পড়ে চলে। পলকহীন চোখে অক্ষরগুলিকে যেন গিলে খায়। মা বলে, 'মোমবাতি কেন? আলো জ্বেলে পড়।'—'সুইচটা টিপে দাও।' নসিব বই ছেড়ে ওঠে না। মা সুইচ টিপতে বাল্‌বের আলো শাদা চাদরের মতো উঠোনটা ছেয়ে দেয়। মা ডাল রুটি রেখে যায়। নসিব বই পড়তে পড়তেই খায়। জল খেতে গিয়ে বিষম লাগে। মা বলে ওঠে, 'এত তাড়াহুড়ো করছিল কেন? কাল সারা দিন পড়ে আছে, তখন না হয় পড়িস।' নসিব মার কথা শুনে হাসে। আস্তে আস্তে খায়। খাওয়ার পর চৌবাচ্চার কাছে গিয়ে হাত ধুয়ে, আবার বই নিয়ে বসে। মাকে বলে, 'বাসন ধোয়া হয়ে গেলে আমাকে এক গ্লাস চা দিয়ো। একটু রাত অবধি পড়ব।' —নসিবের মাথার দিকে বাল্‌ব। খুব একটা জোরালো আলো নয়। তবে অসুবিধে হয় না। বইয়ের ছাপা মুক্তোর মতো ঝকঝকে। রাত নটা নাগাত মা চা দিয়ে যায়। নসিব বইয়ের মধ্যেই ডুবে থাকে। কোনও হুঁশ থাকে না। কখন কোন ভাই ফেরে, তাও টের পায় না। এমনকী খাটের আশপাশে বাচ্চাদের কলরবও তার কানে পৌঁছয় না। বউদিরা বাচ্চা সামলাতে গিয়ে রেগে ওঠে, গালিগালাজ করে। কিন্তু, নসিবের কানে কিছু ঢোকে না। সারা মহল্লাই এক সময় চুপ হয়ে যায়। নসিব চা খেয়ে আবার পড়ে চলে। এত চমৎকার লেখা সে আগে কখনো পড়েনি। ভদ্রলোক ঠিকই বলেছিলেন প্রত্যেকটা শব্দ বাক্য যেন রক্তমাংসের আস্ত শরীর।

পরের দিন সোমবার। সে আর ডাকঘরে যায় না। এক নিস্পৃহতা আসে, 'চিঠি লিখে থাকলে, ঠিক পাব এক সময়।' সারা দিন ধরে সে বইটা পড়তে থাকে। রাতের মধ্যেই দু খণ্ড শেষ হয়ে যায়। তৃতীয় খণ্ডের কিছুটা পড়ে সে বইটা উপুড় করে রাখে। হঠাৎ মনে হয়, চিঠির জন্যে অপেক্ষা করা কত যন্ত্রণাদায়ক। অ্যালেকসির নকল পা। জিনিস্কার কাছে সে নাচ শেখে। নাচের এই আশ্চর্য ব্যায়ামে নকল পা-টা যেন শরীরের অঙ্গীভূত একটি অংশে পরিণত হয়। অ্যালেক্‌সির একটিই সমস্যা: এক মাস হয়ে গেল উলিয়ার কাছ থেকে চিঠি আসছে না কেন। একদিন সে নাচের তালিম নিচ্ছে, এমন সময় প্রত্যাশিত চিঠিটি আসে। অ্যালেক্‌সি নাচ থামাতেই জিনি রেগে যায় কিন্তু অ্যালেক্‌সি হাতে ছড়িটা তুলে, বুর্নাজয়ানের হাত থেকে চিঠিটা ছোঁ মেরে কেড়ে দৌড় দেয়। চলে

যায় ঝিলের কাছে। একটা গাছের গুঁড়ির ওপর বসে খামটা সযত্নে খোলে। চিঠিটা বের করে শেষ লাইনটা দেখে: 'শুধু তোমারই উলিয়া।' তারপর চিঠিটা পড়ে: 'আমার জন্যে তুমি প্রাণ দিতেও ভয় পাও না . . . কী আশ্চর্য মানুষ . . . তোমার সঙ্গে তো আমার তেমন কিছু ঘটেনি। . . . আমি তোমার জন্যে অপেক্ষা করে আছি। এখনও যে বেঁচে আছি, সে শুধু তোমারই জন্যে। তুমি যে অবস্থাতেই থাকো, চলে এসো। আমি তোমার জন্যে চিরকাল অপেক্ষা করে থাকব।'

বেশ রাত হয়েছে। নসিব পাতায় চিহ্ন দিয়ে বইটা বালিশের নিচে রাখে। ঘরে ঢুকে আলোটা নিভিয়ে দেয়। চাঁদের আলোটা বেশ ঝিরঝিরে, কিন্তু তার চোখে ঘুম নেই। বিমান দুর্ঘটনায় অ্যালেক্সির পা জখম হয়। হাসপাতালে পা কেটে বাদ দিতে হয়। নসিবের মনে হয়, তারও যেন পা নেই! পুরো সমাজটাই অ্যালেক্সির ব্ল্যাক ফরেস্টের মতো—কালো জঙ্গল। এই সমাজ ফ্যাশিস্ত কোনও প্লেনের মতো তাকে তাড়া করে যাচ্ছে! পা নেই, পুষ্পর জাঠ-পায়ের সঙ্গে নসিবের নাপিত-পা মিলিয়ে চলতে পারে না। জাঠ পায়ের কাছে ওর পা নকল পা, কৃত্রিম পা। কে জানে, পুষ্প নিজেই হয়তো এই সম্পর্ককে খারিজ করে দেবে। কিন্তু উলিয়া নকল পা সত্ত্বেও, অ্যালেক্সিকে তো প্রত্যাখ্যান করেনি। পুষ্পও করবে না। অথচ, ষোলো সতেরো দিন হয়ে গেল, পুষ্পর চিঠি আসছে না কেন? এতদিনে তো আসা উচিত ছিল। চন্নবালে এতদিন ধরে পুষ্প কী করছে?

তেরো

'আস্‌লি ইনসান কি কাহানি'-র তৃতীয় ও চতুর্থভাগ নসিব মঙ্গলবার সন্ধ্যাতেই শেষ করে। মঙ্গলবারেও সে ডাকঘরে চিঠির খবর নিতে যায়নি। টেকদাসের ডেরাতেও নয়। সারা দিন ধরে বইটা পড়ে যায়। পড়া শেষ করে সে এক স্বস্তি অনুভব করে। অ্যালেক্সির সঙ্গে তার মিল খুঁজে পায়। ঠিক করে, কোটেতে গিয়ে পুষ্পকে বইটা পড়াতে হবে। পরের দিন তার ঘুম ভাঙে একটু বেলায়। অনেকক্ষণ ধরে চান করে সে। পুষ্পকে উলিয়ার জায়গায় বসায় সে। কাপড় পরতে পরতে ভাবে, আজ তো চিঠি আসা উচিত। একবার খবর নিতে হবে। শালার পোস্টঅফিস! হয়তো, ঠিকমতো দেখে না চিঠি এসেছে কীনা! ডাকের থলি আসে দশটা-এগারোটায়। নসির 'মেরা দাগিস্তান' বইটার পাতা ওল্টায়, পড়েও ফেলে কুড়ি পঁচিশ পাতা। ঝরঝরে ভাষা, কিন্তু অর্থময়, ভীষণ ভাবে অর্থময়। ঢঙটা অনেকখানি লোকগীতির মতো, কিন্তু আশ্চর্য সব বর্ণনা:

— ঈগল কোথায় তোমার জন্ম?

— গুহায়।

— কোথায় উড়ে যাও?

— আকাশে, বিশাল আকাশে।

নসিব খাটিয়ার ওপর বসে দশটা অবধি পড়ে যায়। রোদ পড়তে বিছানা গুটিয়ে রাখে। বটগাছের নিচে খাটিয়াটা টেনে নিয়ে যায়। মাকে আর একবার চা দিতে বলে। তারপর, বিছানা গুটিয়ে বইটা পড়তে-পড়তেই ডাকঘরের দিকে হাঁটা দেয়। ডাকের থলি এখনও আসেনি। টুলের ওপরই বসে বইটা পড়ে যায় সে। পোস্টমাস্টার যে কি করছেন, লক্ষই করে না। রেজিস্টার মেলানো, ফর্ম ভর্তি করা, সিলমোহরের তারিখ-বদল এ-সব কিছুই তার চোখে পড়ে না। ঠিক এগারোটায় ডাকের থলি আসে। নসিব পোস্টমাস্টারকে জিজ্ঞেস করে, 'চিঠিতে সাধেড় ভায়া বারনালা জেলা সঙ্গরুর লিখলে চলে, না আরও কিছু লিখতে হয়?'

—'না, না — আর কিছু লিখতে হয় না। ভায়া-টায়া লাগেনা।'

নসিব একটু ভাবে। তারপর আবার জানতে চায়, 'এই গ্রামে নসিব সিং নামে আর কেউ আছে?'

'না।' ডাকবাবু কাজ করতে করতেই জবাব দেন। চিঠি বাছা থেকে রেজিস্ট্রিফর্ম গোছগাছ করেন। নসিব হতাশ হয়ে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকে। তারপর টেকদাসের ডেরার দিকে পা বাড়ায়। ওখানে, নিমগাছের নিচে খাটিয়ার ওপর আধশোয়া হয়ে 'মেরা দাগিস্তান পড়তে থাকে। আশপাশে কেউ নেই। নসিবের কেমন যেন ঝিমুনি আসে। স্বপ্ন দেখে কেউ যেন তাকে চিঠি দিচ্ছে 'অন্তর্দেশীয়' খামে। ধড়ফড় করে সে উঠে বসে। ওঃ, স্বপ্ন! স্বপ্ন হলে কি হবে, প্রতিক্রিয়াটা কিন্তু বড় গভীর। দূরে, এক যুবক ময়লা চাদরে গা ঢেকে পাম্পের জলে বোতল ধুচ্ছে। নসিব উঠে গিয়ে তার কাছে জল চায়। দুটো বোতল তখনও ফাঁকা। একটি বোতলে জল ভরে নসিবের দিকে এগিয়ে দেয় সে। টেকদাসের রোগীরা এখন নেই। চলে গেছে ওষুধ নিয়ে। সৌম্যকান্তি টেকদাস খাওয়াদাওয়া সেরে, নেয়ারের একটা খাটিয়ায় একটু গড়িয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করছেন। চারটের সময় চা খেয়ে নিমগাছের নিচে এসে বসবেন। লোকজনের সঙ্গে কথাবার্তা বলবেন। পাঁচটা থেকে আবার রোগী দেখা চলবে। হঠাৎ টেকদাসের নজর পড়ে উদাস ভঙ্গিতে বসে থাকা নসিবের দিকে। তিনি এগিয়ে আসেন, 'কীরে, শরীর ভাল নেই? এত মনমরা দেখাচ্ছে কেন? হাতে কী বই তোর?'

শেষ প্রশ্নটির জবাব দেয় নসিব, 'মেরা দাগিস্থান। বারনালা থেকে এনেছি।'

'মেরা দাগিস্তান? আরে, বইটার নাম তো আমি অনেক শুনেছি।'

'আমিও শুনেছিলাম, তাই বইটা কিনে নিলাম।' নসিব বইটা এগিয়ে দেয়।

'বেশ। তোর পড়া হয়ে গেলে, আমাকে একটু পড়তে দিস।'

বইটা নেড়ে-চেড়ে টেকদাস ফেরত দেন। তারপর আবার জিজ্ঞেস করেন, 'কিন্তু তোর চোখমুখ এত বসে গেছে কেন? রাত জেগে পড়াশোনা করছিস?'

'না—না—'

'তাহলে, মনের অসুখ?'

'তা হবে কেন?'

'দেখ—লুকোসনি আমার কাছে।' নসিবের পাশে টেকদাস বসে পড়েন। নসিব একটু অপ্রতিভ হয়ে ওঠে। টেকদাস ওর মাথায় হাত বোলান, 'এবারে তুই অনেকদিন থেকে গেলি। আগে তো এতদিন ধরে থাকতিস না!'

'দু একদিনের মধ্যেই যাব। মামা-মামি নিশ্চয়ই ভাবছেন।' নসিব করুণ স্বরে কথাগুলি বলে। টেকদাস নসিবের হাত থেকে বইটা আবার নেন। পাতা ওলটাতে-ওলটাতে মিদনকে—লঙ্গরখানার যে কাজ দেখে, সেই যুবকটিকে ডাক দেন। তাকে কিছু কাজের কথা বলে বইটার একটি অংশ পড়েন: 'বিশ বছর বয়সে যদি কারও জোর না আসে, পরে আসবে আশা করা উচিত নয়। আসবে না। তিরিশ বছরে বুদ্ধি না গজালে, আর তা গজাবে না। চল্লিশ বছরে টাকা না এলে, তা আর আসবে না। চমৎকার কথা!'

বই বন্ধ করে টেকদাস বলেন, 'নাঃ, বইটা দিস, আমি পড়ব। যাক, এখন কিছু খেয়ে নে।'

'আমি তো খেয়ে এসেছি।'

'আর একটু খেলে ক্ষতি হবে না। মিদন! নসিবকে খাইয়েদাইয়ে চা দিয়ে ছাড়িস। লেখাপড়া করা ছেলে, খাওয়াদাওয়া না করলে পড়বে কেমন করে?'

নসিবের খুব ইচ্ছে হয় টেকদাসকে সব কিছু খুলে বলতে। টেকদাস শিক্ষিত, বিজ্ঞ লোক; হয়তো একটা উপায় বলে দিতে পারেন। পুষ্পর চিন্তায় মনটা আচ্ছন্ন হয়ে আছে। তবুও, টেকদাসকে নসিব কিছু বলতে পারে না। লঙ্গরের কামরা থেকে মিদন ডাক দেয় নসিবকে। মোটা-মোটা দুটি রুটি দেয়, সঙ্গে মুগের ডাল, মাখন, বড় গ্লাসে মিঠে লস্‌সি। নসিব আর কিছু চায় না। বলে, 'চা করতে হবে না।'

'উহুঁ। বাবাজির হুকুম।'

'লস্‌সি আর চা—ভেতরে গিয়ে যুদ্ধ করবে না তো?'

'যুদ্ধ করলে বাবাজি তো আছেন!'

মিদনের চটজলদি জবাবে নসিব হেসে ফেলে। ব্যক্তিগত আলাপ শুরু করে, 'তোমার বাড়ি কোন গাঁয়ে?।

'চন্নবাল। কিন্তু, এখন আমার বাড়ি ঘরদোর, সবই এখানে। গাঁয়ে আর কোনও দিন যাব না।'

'চন্নবাল?' নসিব কৌতূহলী হয়ে ওঠে, 'কার বাড়ির ছেলে তুমি?'

'আমার বাবা অমরিক সিং। ঠাকুর্দা ধূলা সিং। জমিদার।'

য়্যাঁ! পুষ্পর মামার নামও অমরিক সিংহ। সে জিজ্ঞেস করে, 'অমরিক মানে যার বোন কোটে খড়কসিং-এ আছে?'

'হ্যাঁ। তুমি কী করে জানলে?'

'কোটেতে আমার মামা থাকে।' বলে নসিব চুপ করে যায়। আড়চোখে মিদনকে দেখে। মিদন জিনিসপত্র গুছিয়ে রাখে। চট করে একবার টেকদাসের কাছ থেকে ঘুরে

আসে। বাসন ধোয়। নসিব চৌকাঠের ওপর বসে পড়ে। চা খায়। লক্ষ করে, পুষ্প
চেহারার সঙ্গে মিদনের একটু যেন মিল আছে। চোখমুখ নাককানের আদল আসে। আস্তে
আস্তে চা খেতে থাকে নসিব। তারপর জিজ্ঞেস করে, 'শেষ কবে চন্ননবাল গিয়েছিলে?

'বছর দুই আগে। বাবা মারা গেলেন। ভাই আমাকে ইসকুল ছাড়িয়ে আনল। বলল খেতির কাজ করতে হবে। দুই ভাইয়েরই বিয়ে হয়ে গেছে। আমি বললাম, পড়ব। ওরা আমাকে বাড়ি থেকে বের করে দিল। আমি বেরিয়ে এলাম। বাবা টেকদাস আমাকে এখানে আশ্রয় দিলেন।' — এইসব বলতে বলতেই ওরা বেশ অন্তরঙ্গ হয়ে ওঠে। মিদনের কথা শুনতে বেশ ভাল লাগে। মিদনের সঙ্গে নসিব জীবনের একটা মিল খুঁজে পায়। সে বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করে, 'তুমি যে চলে এলে, তোমরা ভাইরা তোমাকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে আসেনি?'

'না। ভাই? এই দুনিয়ায় কে কার? মা থেকেও নেই—বউদিরা এমন দাবড়ে রাখে যে, মা রা অবধি কাড়তে পারে না! আমার বউদিরা হলো পাক্কা ডাইনি!'

নসিব অনেকক্ষণ ধরে মিদনের জীবনের কথা শুনে যায়। মিদন, হরদিৎ হরদিতের ছেলে হরিন্দর, মেয়ে পুষ্পর কথাও বলে। মিদনের মুখে পুষ্পর নামটা বড় মিষ্টি শোনায়। নসিব অবাক হয়ে নামটা উচ্চারিত হতে শোনে।

চোদ্দ

মিদনের সঙ্গে কথা বলে নসিব বাড়ি আসে। বটগাছের নিচে খাটিয়া টেনে 'মেরা দাগিস্তান' পড়ে। মা জিজ্ঞেস করে, 'তোর পরীক্ষার ফল কবে বেরোবে?'

'মাস খানেকের মধ্যে। তবে, ফল বেরিয়েই বা কী হবে?'

'কী হবে মানে? বি এ পাশ করলেই তো চাকরি!'

'খেপেছো? আমার মতো কত বি এ এম এ ফ্যা-ফ্যা করে বেড়াচ্ছে!'

'কী যে বলিস। চোদ্দ ক্লাস পড়লি, এখনও পড়ছিস—'

'এটা তো পড়ার বই নয়।'

'পড়ার বই আবার কী? সব বই-ই তো পড়ার।' মাকে বোঝায় কে? সে বলেই চলে, 'যত বেশি পড়বি, তত বেশি ভাল চাকরি পাবি—'

'চাকরি পেলে তো।'

'না পেলে কী করবি?'

'কী আর করব? বাপ-দাদা যা করেছে— লোকের গোঁফদাড়ি চুল কাটব—'

'যত্ত সব ছিষ্টিছাড়া কথা!' মা রেগে যায়।

'পাশ করার আগেই তো তুমি আমাকে চেয়ারে বসাতে চাইছ।'

'কেন চাইব না? আরে, আমার জাতের লোকই তো সবার আগে চাকরি পায়। জাঠুয়া বামুন পরে!'

'ওইখানেই তো গণ্ডগোল করেছে। বলো তো, আমাদের আগে কারা সুবিধে পায়?'

'কেন মজহরি রামদাসিয়ারা! কিন্তু জাঠ-বামুনরা নয়। এটাই তো ভাল।'

নসিব নিঃশ্বাস ফেলে: 'কোথায় আর ভাল? সবাই সমান হলে তো কোনও প্রশ্নই থাকত না। চাকরি পেশা সামাজিক সমতা—এ-সবের জন্যে নতুন কোন্ গান্ধী আসবে?' নসিব আরও একটি গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলে। তার আর পুষ্পর মধ্যে যদি জাঠ-নাপিত ফারাকটা না থাকত! সে মাকে বলে, 'জাঠ ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বেনিয়া—আর তার পেছনে যে শ্রেণী বিভাজন অর্থাৎ মজহরি রামদাসিয়া—এরই ফাঁকে একটা উঁচু মহলের জন্ম হয়ে গেছে। এই উঁচু মহলের নাগাল না পেলে আমাদের ব্যক্তিগত অধিকার সুরক্ষিত হবে না—'

'বাব্বাঃ! তোর কথা আমি একবর্ণও বুঝলাম না! শ্রেণী-শ্রেনি—এসব বড়-বড় কথা কী আমার মতো মুখ্যুসুখ্যু লোক বুঝতে পারে?'

'বেশ। গরিব বড়লোক বোঝো?'

'বুঝি।'

'বড়লোকেরা হলো উঁচুমহলের লোক। গরিবরা নিচুমহলের। আর এই নিচুমহলের অনেকেই এখন উঁচুমহলে ঢুকে পড়েছে।'

'কী রকম?'

'যেমন আমাদের ধনিয়া বাড়ুইয়ের ছেলে জজ, এই জজ সাহেব কী সাধেড়ের বাড়ুইদের চেনে? মাধি চামারেরর ছেলে ডি এস পি, মুকুন্দ ছিবের ছেলে আই এ এস করে ডি সি বনে গেছে—অর্থাৎ জজিয়তি থেকে ডিসিগিরি, সবই এখন এদের হাতে। সরকারি সব সুবিধে এদের বাপব্যাটা নাতিপুতিরা পায়। আমার বাবাও যদি ইংরেজদের জুতো চাটত; তাহলে আমারও একটা জায়গা বাঁধা থাকত। কিন্তু, আমাদের মতো নাপতের ছেলেকে কে পাত্তা দেবে? এখন রাজ হলো ধনিয়া চামারদের! আজাদি এলো, আর ওরা হয়ে গেল আলাদা এক জাত! ফয়দা তুলল কংগ্রেসিরা।'

'তোর কথাগুলো তো ক্ষুরের মতো! এই অবস্থাটা বদলাবে কে?'

'বিপ্লব না হলে বদলাবে না।'

'বিপ্লবটা হবে কবে?'

'হবে একদিন। এখন শুধু দেখে যেতে হবে। বিপ্লব হলেই গরিব-বড়লোক সমান হয়ে যাবে। জমির মালিকানা কারও একার হবে না। প্রত্যেকের সমান অধিকার থাকবে। একরকমের ঘর, একরকমের খাওয়াদাওয়া—সমাজে সব এক হয়ে যাবে। যে যাকে খুশি বিয়ে করতে পারবে—'

'য়্যাঁ!'

নসিব থতমত খেয়ে চুপ করে যায়। মুখ ফসকে কথাটা বেরিয়ে গিয়েছিল। সঙ্গে সঙ্গে কথা ঘুরিয়ে দেয় সে, 'মানে—জাতপাতের বালাই থাকবে না। জাঠ-নাপিত ক্ষত্রিয়-ব্রাহ্মণ, ছিবে-বাড়ুই—সব এক হয়ে যাবে।'

'তাহলে তো ভালই হবে। তোর বিপ্লবটা একটু তাড়াতাড়ি এলে সুবিধে হয়।' চায়ের বাসন ধুয়ে রেখে মা বেরিয়ে যায়। আজ বোধহয় কারও বাড়িতে কাজ আছে। নসিব বটগাছের নিচে চলে যায় বই পড়তে। খাটিয়ায় রোদ আসতে, সে সেটাকে ছায়ার দিকে টেনে নিয়ে যায়। সন্ধ্যে অবধি পড়ার পর, খাওয়াদাওয়া সেরে, অনেক রাত অবধি পড়ে। পরের দিন সন্ধ্যেতে বই শেষ হয়। রাতে পড়ার মতো আর কিছু থাকে না। সে 'মেরা দাগিস্থান' সম্বন্ধে ভাবতে থাকে। কী চমৎকার লেখার ভঙ্গি! লেখক যেন পাঠকের সঙ্গে কথা বলতে-বলতে এগোচ্ছেন। পাঠক জানতেও পারে না কোন ফাঁকে সে এক মায়াবী জগতে পৌঁছে গেছে! পরের দিন নসিবের ঘুম ভাঙে একটু দেরিতে। চান-টান সেরে, সে সটান চলে যায় বাবা টেকদাসের ডেরায়। টেকদাস এখনও বেরোননি, কিন্তু রোগীর ভিড় বেশ জমে যাচ্ছে। টেকদাস 'পাঠে' বসেছেন। মিদন নসিবকে দেখে মহা খুশি। আনন্দে তাকে ডেকে নিয়ে যায় লঙ্গরখানায়। টেকদাসের কামরা থেকে দুধের একটা ছোট গ্লাস আনে। বাবা খাননি—দুধটুকু বেঁচে গেছে। মিদন নসিবকে দেয় গ্লাসটি। কাঁচা তাজা দুধ, ছোট এলাচ বাদাম আর চিনিতে টলটলে। নসিবের খুব ভাল লাগে। টেকদাস সকালে চা খান না। এই দুধ খেয়েই তাঁর দিন শুরু। টেকদাস কামরার বাইরে আসেন। প্রসন্ন সদাশিব স্মিত চেহারা। নসিবের দিকে তাকিয়ে হাসতে, নসিব ঈষৎ মাথা ঝুঁকিয়ে বইটা এগিয়ে দেয়, 'আপনার জন্যে বইটা এনেছি—আমার পড়া হয়ে গেছে।'

'কেমন লাগল?'

'বলা শক্ত। তবে, এইটুকু বলতে পারি মিদন আমাকে যে দুধ এখনই খাওয়ালো, তারই মতো স্বচ্ছ স্বচ্ছন্দ এর প্রতিটি শব্দ!'

'বাপ্‌স্‌! তুই তো লেখকদের মতো কথা বলছিস।' টেকদাস বইটি নিয়ে মিদনকে বললেন তাঁর টেবিলের ওপর রেখে দিতে। সময় করে বইটা চটপট পড়ে ফেলতে হবে। এরপর তিনি বারান্দায় এসে বসেন। এক-এক করে রোগী দেখেন। লঙ্গরে মিদন ও নসিব গল্প করে। মিদনের চেহারার মধ্যে নসিব বার-বার পুষ্পকেই খুঁজে পায় যেন। অনেকক্ষণ কথা বলার পর নসিব নিমগাছের নিচে খাটিয়ায় এসে বসে। কাগজ এসে গেছে। নসিব কাগজ পড়ে। মিদন টেকদাসের এক বিশেষ অতিথির জন্যে চা বানিয়ে, এক গ্লাস নসিবকেও দিয়ে যায়। নটা-সাড়ে নটা নাগাদ নসিব উঠে পড়ে। বাড়ি যেতে যেতে ভাবে ডাকঘরটা একটু দেখে আসে। তারপরই ভাবে, এত ছটফট করে কী হবে, চিঠি যখন আসবার আসবে। সাধেড়ে অনেকদিন থাকা হয়ে গেল। পুষ্প চিঠি লিখে থাকলে নিশ্চয়ই পেত এতদিনে। কিন্তু, লিখল না কেন? কোটেতে গেলে জানা যাবে। এই হতচ্ছাড়া জায়গায় কাঁহাতক আর ভাল লাগে? বাড়িতে ঢুকে সে যথারীতি বটগাছের নিচে একবার বসে নেয়। এগারোটার সময় মা রুটি আনে। মাথাটা কেমন যেন ভারি, গা ম্যাজম্যাজ করছে। খাটিয়ার ওপর শুয়ে পড়তে, পুষ্পর কথা ভাবতে-ভাবতেই, ঘুমিয়ে পড়ে।

দুটো আড়াইটের সময় পাড়ারই একটি ছেলে দৌড়তে-দৌড়তে ঢোকে। উর্ধ্বশ্বাসে নসিবের মার দিকে একটা খাম ছুঁড়ে দিয়ে বলে, 'চিঠি!' ঘুমের মধ্যেই শব্দটি নসিবের কানে যায়। সে ধড়মড় করে উঠে বসে। মা বলে, 'দেখ তো, চিঠিটা কোথ থেকে এলো? চাকরিবাকরির ব্যাপারে ডাক আসেনি তো?' খামের ওপর নসিবের নাম ঠিকানা। হাতের

লেখা বেশ চেনা। পাঞ্জাবি হরফ। চিঠিটা হাতে নিয়ে নসিব মাকে বলে, 'আমারই চিঠি। খামটা নিয়ে নসিব বটগাছের দিকে চলে যায়। বুকটা ধ্বকধ্বক করে ওঠে। খামটা এত হালকা কেন? মনে হচ্ছে ভেতরে যেন কিছুই নেই! খামের ওপর শুধু ঠিকানা লিখে কেউ ডাকবাকসে ফেলেনি তো? খামটা একটু উঁচু করে সে আলোর দিকে রাখে। ভেতরে, ছোট্ট একটি কাগজের আভাস। খুব সন্তর্পণে সে খামটি ছেঁড়ে। একসারসাইজবুকের ছেঁড়া পাতা! পুষ্পর চিঠি হলে তো লম্বা চিঠি আসত। কিন্তু, কী আশ্চর্য—এটা তো পুষ্পরই চিঠি! চিঠির শেষে লেখা: 'ইতি তোমারই পুষ —' মনে হচ্ছে, 'পুষ' লেখার পর কি ভেবে আর কিছু লেখেনি। কিন্তু, এত ছোট চিঠি কেন? চিঠিতে তো অনেক কিছু লিখবে বলেছিল। এতদিন চুপচাপ, কত কথা জমা হয়ে আছে। কিন্তু, স্কুলের খাতা থেকে ছেঁড়া পাতায় এক চিলতে চিঠি? নসিব খুঁটিয়ে দেখে, চিঠি চন্নবাল থেকে আসেনি, কোটে থেকে এসেছে। চিঠি পড়ার আগেই সে মুষড়ে পড়ে। কানটা ভোঁ-ভোঁ করে। সে পড়তে থাকে: চন্নবালে কোনওক্রমে তিন দিন ছিলাম। চার দিনের দিন হরিন্দর আমাকে নিতে আসে। কারণ কিছু বলতে পারে না, শুধু বলে মার হুকুম। মামা-মামিও আপত্তি করে না। চন্নবাল থেকে এখানে আসার পর থেকে মা আমার সঙ্গে ভালভাবে কথা বলছে না। বাড়ি থেকে বেরোনো বন্ধ। বাবাও কথা বলে না বিশেষ। হরিন্দরও যেন সহজভাবে কথা বলছে না। ভেবেছিলাম, তুমি চলে আসবে। দেখা হলে সব বলব। গতকাল মাকে লুকিয়ে তোমার মামির সঙ্গে দেখা করেছি। সাধেড় থেকে, চিঠি পেয়েই, চলে এসো। খুব কষ্টে আছি।'

পনেরো

চিঠিটা পড়ে নসিবের হাত কাঁপে। চিঠিটা খামের মধ্যে ঢুকিয়ে পকেটে রাখে।

মা জিজ্ঞেস করে, 'কার চিঠি?'

'এক বন্ধু লিখেছে।'

'কী লিখেছে?'

'তেমন কিছু নয়।'

'কোথায় থাকে তোর এই বন্ধু?'

'রামপুরায়।' নসিব মার চোখের দিকে তাকায় না। আলতো করে জবাব দেয়। মা এত কথা জানতে চায়! সে আবার বটগাছের নিচে গিয়ে বসে। মাথার মধ্যে সিনেমার রিলের মতো নানারকম চিন্তা ও ছবি। হরিন্দর এত তড়িঘড়ি পুষ্পকে কোটেতে নিয়ে এলো কেন? নসিবের মাথায় অজস্র কারণ ঝাঁক বেধে আসে। পুষ্পর মা অসুস্থ হয়ে পড়েনি তো? মা-মেয়েতে কথা বন্ধ কেন? ওদের সম্পর্কে কেউ কিছু কানে তুলে দেয়নি তো? কিন্তু, কেউ ওদের দেখেছে বলে তো মনে পড়ে না। নিশ্চয়ই কোথাও কিছু গোলমাল হয়েছে। মনে হচ্ছে, ওদের ভাবসাবের কথাটা বাড়ির লোকের কানে পৌঁছেছে।

শুয়ে-শুয়ে নসিব এই সবই ভেবে যায়। ঠিক করে ফেলে, আজই কোটেতে যাবে। ওখানে গেলে ব্যাপারটা বোঝা যাবে। পুষ্প পথ চেয়ে বসে আছে। নসিব উঠে পড়ে। কলে জল নেই। টিউবওয়েলের পাম্প থেকে এক বালতি জল তোলে। হাতমুখ ধুয়ে সুখদেবের নীল কুর্তা-পাজামা ছেড়ে, নিজের প্যান্ট আর বুশসার্ট পরে নেয়। পাগড়িটা খুলে ঠিক করে বাঁধে। সুখদেবের পুরনো চপ্পলটা ছেড়ে, ছেঁড়া কাপড়ে নিজের চপ্পলটা পুঁছে নেয়। মা ছেলেকে বাইরে বেরোবার পোশাক পরতে দেখে জিজ্ঞেস করে, 'কোথায় যাচ্ছিস?'

'কোটে। দশটা টাকা দাও।'

'দশ কেন? পনেরো নে। কিন্তু হঠাৎ কোটেতে যাবি ঠিক করলি কেন?'

'একটা কাজ আছে। এখানে আর কদ্দিন থাকব?'

মা সিন্দুক খুলে একটা কাগজের বান্ডিল থেকে টাকা বের করে। আরও কিছু দেবে কি না, জানতে চায়। নসিব আবদার করে বলে, 'আরও গোটা পাঁচেক দাও।' মা টাকা দিয়ে সিন্দুক বন্ধ করতে-করতে বলে, 'একটা চাকরিবাকরি দেখ। মামা আর কতদিন টানবে?'

'রেজাল্ট বেরোক। ঠিক একটা কিছু জুটিয়ে নেব—তুমি ভেব না।' মাকে প্রণাম করে তিন বউদির সঙ্গে চটপট দেখা করে সে প্রায় দৌড় দেয় গ্রামের পথ ধরে। বউদিরা মা ভাইপো ভাইঝি দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে দেখতে থাকে। সাধেড়ের বাসস্ট্যান্ডে এসে সে থামে। সব বাস এখানে থামে না। একটা বাস ধরে সে চলে আসে বারনালা। সালাবাতপুরার বাস এখনও আসেনি। চারটে বেজে গেছে। টাইমটেবলের বোর্ড দেখে সে। ফরিদকোটের বাস সওয়া চারটেয়। নসিব ঠিক করে, ওই বাসে সালাবাতাপুরা থেকে ভাইরূপার বাস ধরবে। বাসটি অবশেষে আসে চারটে পঁয়ত্রিশে। সালাবাতপুরা হয়ে অন্য রুটে যাবে। পৌনে পাঁচটায় বাস ছাড়ে। বাসে বসে নসিব অস্থির হয়ে ওঠে। কোনও তেজ নেই, ছ্যাকরা গাড়ির মতো বাস দৌড়চ্ছে! একবার থামলে আর যেতে চায় না। শালা ড্রাইভার! অ্যাকসিলাবেটরের ওপর পা রাখতেই চায় না! সালাবাতপুরায় নেমে নসিব একটু উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠে। কেমন যেন ভয়-ভয় করে। কোটোতে ওদের নিয়ে কোনও কেচ্ছা কেলেংকারি ছড়িয়ে পড়েনি তো? মামার কানে কিছু যায়নি তো? পুষ্পর মা কিছু বলেনি তো? তাহলে তো কোটেতে আর থাকা যাবে না। নসিব দোটানায় পড়ে। পুষ্পর সঙ্গে এখনই দেখা হলে ভাল হতো। তেমন বুঝলে, কোটেতে না গিয়ে অন্য কোথাও চলে যেত। রামপুরাতেও আত্মীয়স্বজন আছে। রাতটা সেখানেই কাটাবে? হয়তো ওখানে গেলে কিছু জানা যেত। ভাইরূপার একটা বাস সন্ধ্যে ছটায় সালাবাতপুরায় আসে। পনেরো বিশ মিনিট দাঁড়ায়। কন্ডাকটার-ড্রাইভার চায়ের দোকানে গিয়ে জমিয়ে বসে। গেঁজিয়ে যায় হা হা হি হি করে। শালা, বাঁদরের বাচ্চা! নসিব বাসে বসেই গালাগাল দেয় মনে মনে। অন্য যাত্রীরাও বিরক্তি প্রকাশ করে। ভাগতাজালালের বাস। যাবে রামপুরা। আসলে, বাসটা অপেক্ষা করে বারনালার একটা বাসের জন্যে। রামপুরার কিছু যাত্রী পাওয়া যাবে। একজন বৃদ্ধ যাত্রী জানালা দিয়ে গলা বাড়িয়ে হাঁক দেন, 'এই! ড্রাইভার, তোদের কী এখনও পেট ভরেনি? বাসে তো তিল ধারণের জায়গা নেই—আর কত তুলবি?'

বুড়োর কথায় সবাই হেসে ওঠে। কেউ-কেউ তালি দিয়ে উল্লাস প্রকাশ করে। কন্ডাকটর জবাব দেয়, 'যাচ্ছি দাদু! আপনি যেখানে যাবেন, ঠিক সময় পৌঁছে দেব!'

ভাইরূপা আসতে নসিব নেমে যায়। সূর্য ডুবে গেছে। আধো অন্ধকার। নসিব বাসস্ট্যান্ডের দোকানটা উকি মেরে দেখে। কোটের কেউ হয়তো থাকলেও থাকতে পারে। কেউ নেই, থাকলে কোটের খবর নেওয়া যেত। কোটের রাস্তা ধরে একটু এগোতে, তার মাথায় একটা বুদ্ধি আসে আচমকা। ভাইরূপার মদের দোকানটায় একটু টুঁ দিলে কেমন হয়? কোটে থেকে অনেকেই এখানে সন্ধ্যেবেলা মদ নিতে আসে। কারও সঙ্গে দেখা হতে পারে। হয়তো মামাও আছে। কারও জন্যে মদ কিনতে এসেছে। মামার সঙ্গে দেখা হলে তো কথাই নেই। সব কথা জানা যাবে। কিন্তু, মামা যদি রেগে থাকে? নসিব কী করবে, ঠিক করতে পারে না। পাঁচ সাত ভাবতে-ভাবতেই সে গ্রামের পথ ধরে। গ্রামে ঢোকার মুখে বাজারের এক কোণে একটা মদের ঠেক আছে। পুরনো আমলের ভাঙাচোরা দোকান। সামনে একটা রোয়াক। দরজার পাল্লাটাল্লা এখনও বেজায় মজবুত। পেছন দিকের ছাদ অবশ্য হেলে পড়েছে। কত বছর ধরে যে এই ঠেক এখানে আছে, তা আন্দাজ করা শক্ত। ওর মধ্যেই দু তিনটে খাটিয়া পড়ে আছে। উঠোন থেকে জল এনে, ওই খাটিয়াতে বসেই সব মদ খায়। দরজার মুখে একটা পর্দা। যাতে বাজারে ভ্রাম্যমাণ কেউ উকি মারতে না পারে। ঘরের একদিকে একটা উঁচু জায়গা। ঠেকদারের গদি, অর্থাৎ দোকানের মালিক বসে ওখানে। মদ বিক্রি হয় ভেতরের ঘর থেকে। সামনের দিকে জবরদস্ত গরাদের জানালা। গরাদের ফাঁক দিয়ে আলমারি-ভর্তি মদের বোতল দেখা যায়। ঠেকদারের কাছে টাকা দিলে, গরাদের ওপার থেকে কর্মচারী বোতল বাড়িয়ে দেয়। গাঁয়ের লোক যতক্ষণ বাজারে আনাগোনা করে, ততক্ষণই দোকান খোলা। হয় মদ খেয়ে বাড়ি যায়, নয় খেপে-খেপে এসে খায়। মানী-গুণীরা অবিশ্যি বোতল নিয়ে বাড়ি চলে যায়। এখানে টানে না।

নসিব ঢোকে। দরজার কাছে দু চারজন কথা বলছে। একজন বিড়ি টানছে মনের সুখে। অচেনা। কোটের কোনও চেনামুখ চোখে পড়ে না। নসিব এবার ভেতরের ঘরে ঢোকে। দরজার মাথায় বাল্‌ব ঝুলছে। তিনটি খাটিয়ায় তিনজন বোতল নিয়ে বসেছে। ওর ভেতর থেকেই একটা চেনা গলা শোনা যায়, 'ভাগ্নে যে। ইদিকে আয়।' নসিব ঘুরে দাঁড়ায়। তিরথ, ওর সঙ্গে কোটের আরও তিন চারজন। সবে মদে চুমুক দিয়েছে, যার জন্যে এখনও হ্রস্ব-দীর্ঘ জ্ঞান আছে। তিরথ প্রশ্ন করে, 'কে পাঠালো তোকে, জগু?'

'কেউ পাঠায়নি মামা। বাস থেকে নেমে বাড়ি যাচ্ছিলাম. ভাবলাম দেখে যাই মামু এখানে আছে কি না। আমি সাধেড়ে ছিলাম এতদিন—' নসিব বিস্তারিতভাবে কথা বলে, যাতে তিরথ আর কিছু জিজ্ঞেস করার সুযোগ না পায়। তিরথ জবাব দেয়:

'জগু তো এ বেলা এসেছে বলে মনে হয় না। তা ভাগ্নে, চলবে নাকি একটু?'

'না, মামা। আমি তো ওসব কখনও খাইনি।' নসিব অন্য লোকগুলিকে দেখে। ভুল হয়েছিল, এরা কোটের নয়। 'আচ্ছ মামা' এখন যাই!'—বলে নসিব সবার দিকে হাত জোড় করে নমস্কার জানিয়ে বেরিয়ে যায়। 'আচ্ছা ভাই'—বলে তিরথ মদ ঢালে। বাকি জনেরা থুম হয়ে বসে থাকে। নসিব ততক্ষণে জানালা বরাবর এসে গেছে। গরাদের এপারে দুজন টাকা গুনছে। নসিব চিনতে পারে। এরা কোটের লোক। গরাদের ফাঁক দিয়ে বোতল নিয়ে ওই দুজন ঘুরে তাকায়, দুজনেই এক সঙ্গে বলে ওঠে, 'তুই এখানে?'

'একটা কাজে এসেছিলাম। তোমরা বাড়ি যাবে এখন?'—নসিব ওদের দিকে ভাল করে তাকায়। বাল্‌বের আলোয় দুজনের চেহারাই এক রকম দেখায়। একজন দেবু চামারের বড় ছেলে, অন্যজন পঞ্চায়েতের মিলখার ছেলে, কর্নেল। দেবুর ছেলে নসিবের সমবয়সী। বড় জোর বছর দুয়েকের বড়। নসিব কোটের প্রায় সবাইকেই মামা বলে ডাকে। বয়স বেশি হলে নানা। এই সম্বোধনেই সে সবার সঙ্গে আত্মীয়তার পথ সহজ করে নিয়েছিল। ঠেকের বাইরে এসে কর্নেল দ্রুত পা চালায়। দেবুর ছেলে কিন্তু কথা বলতে বলতে ধীরে-ধীরে এগোয়। নসিব গাঁয়ের খুঁটিনাটি খবর জেনে নেওয়ার চেষ্টা করে। দেবুর ছেলে কিন্তু নিজের কথাই বেশি বলেঃ 'আমি তো মদটদ খাইনা। বাড়িতে লোক এসেছে, তাই এখানে আসতে হলো।' কর্নেল তাড়া দেয়ঃ 'কী রে, বাড়িটাড়ি যাবি?' ওদের সঙ্গে কিছুটা এগিয়ে নসিব বলে, 'তোমাদের তাড়া আছে, তোমরা এগোও। আমি পরে যাব।'

পথে হালুয়ার এক দোকান পড়ে। সেখানে বেঞ্চে বসে এক বুড়ো পুরনো দিনের গল্প বলছে : 'নাভার রাজা ছিল ভরপুর সিং। বড় দুঃখে দিন কাটত। কোনও ছেলেপুলে ছিল না। রাজা গত হলে রানি হয়ে উঠল সর্বেসর্বা। রানিও একদিন গত হলো। ঠিক হলো ভরপুরের ভাইপো হীরা সিং রাজা হবে। হীরার বয়স তখন চৌত্রিশ-পঁয়ত্রিশ। সব তো তাকে ধরে বেঁধে রাজা বানায়। খুব অল্প দিনের মধ্যেই সে নাম করে ফেলে। এমন জেরা করে যে, বড় উকিলও হার মেনে যায়। সুবিচারের জন্যে রাজার খুব নামডাক হতে থাকে। হীরার ছেলে প্রদ্যুম্ন সিং। প্রদ্যুম্নের যেদিন জন্ম হলো, হীরা সিং সেদিন জেলের দরজা খুলে দিলেন। সবার সাজা মকুব হয়ে গেল। প্রদ্যুম্ন রাজত্ব করেছিলেন দশ বারো বছর। ইংরেজদের দুচক্ষে দেখতে পারতেন না। খিটিমিটি লেগেই থাকত। শেষ অবধি জ্বালাতন হয়ে এক ইংরেজ এজেন্টকে খুন করান। কিন্তু, ইংরেজদের সঙ্গে ঠিক যুঝতে পারলেন না। আঠারো বছর পর প্রদ্যুম্নের ছেলে প্রতাপ সিং, ততদিনে অবশ্য পাকিস্তান হয়ে গেছে—'

নসিব দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে গল্প শোনে। তারপর দোকানদারকে বলে, 'এক কাপ চা দাও, ভাই। কোটে যাব।'

ভাটির ওপর চায়ের মগ রেখে দোকানদার হো হো করে হেসে ওঠে, 'তোমাকে তো সাংঘাতিক দূরে যেতে হবে দেখছি!'

চা খেয়েই নসিব পা চালায়।

ষোলো

দাঁতন করতে-করতে জগিরা নসিবের খাটিয়ার কাছে এসে দাঁড়ায়। নসিবের মুখের ওপর পড়া খড়কুটো সরিয়ে দেয় সযত্নে। আস্তে-আস্তে ডাকে, 'আর কত ঘুমোবি? ওঠ বেলা হয়ে গেছে। হাত মুখ ধুয়ে নে।'

নসিব চোখ কচলে উঠে পড়ে। মামার দিকে তাকায়, জিজ্ঞেস করে, 'রাতে কখন ফিরলে?'

'খুব একটা দেরি হয়নি তো! মুকুন্দর বার্ষিক ক্রিয়া ছিল। পরমজিৎ বিরাট প্রোগ্রাম করে।'

'পরমজিৎ কে, মামু?'

'পরমজিৎ পাটোয়ারি। মুকুন্দর ব্যাটা। ওই যে রাস্তার ওপর বিরাট বাড়ি—রিটায়ার করে ওখানেই থাকবে। সামনে বিরাট জমি, তিন চার বছরে আরও বিঘে দুই হয়ে যাবে। পরমজিতের খাঁই বেশি—বাপের দশগুণ!'

'বুঝেছি। আমি পরমজিৎকে দেখেছি।'

'তুইও পাটোয়ারি হয়ে যা। দু হাতে টাকা কামাবি!'

মামি ওদের জন্যে দু গ্লাস চা রেখে যায়। নসিব হাত মুখ ধুয়ে নেয়। মামা বোধহয় আরও কিছু বলবে। জগিরাও দাঁতন ফেলে মুখ ধুয়ে নেয়। নসিবের পাশে বসে চা খেতে থাকে। ছোট ছোট প্রশ্ন করে।

'কাল কখন ফিরলি?'

'রাত্তিরে। সাধেড় থেকেই বেরোতে দেরি হয়ে গেল। বারনালাতে বাস পেলাম দেরিতে। সালাবাতপুরায় সন্ধ্যে কাবার। ভাইরূপায় রাত। এখানে আসতে আরও রাত। মামি ততক্ষণে রান্নাবান্না চুকিয়ে ফেলেছে। তোমার জন্যে বসে—'

'আরে, আমার তো কাজ শেষ হতেই চায় না। পরমজিৎদের ওখানে খাওয়াদাওয়া সেরেছি।' জগিরা এবার প্রসঙ্গান্তরে আসে, 'আমরা তো তোর জন্যে ভেবেই অস্থির। কোনও চিঠিপত্র দেই, খবর নেই! যাওয়ার সময় কিছু বলেও গেলি না স্পষ্ট করে, কতদিন ওখানে থাকবি—'

'মা আসতে দেয়নি।'

'তা চিঠি দিসনি কেন?'

'আজ আসব, কাল আসব করে-করে আর চিঠি দেওয়া হয়নি।'

'তোর মা কেমন আছে?'

'ভালই।'

'সুখদেব কী মদের দোকানেই?'

'হ্যাঁ।'

'মিলখি, বাবু?'

'সব ঠিক আছে।'

'আর সর্দার, মানে বড়জন?'

'মোষ দেখে যাচ্ছে মনের আনন্দে।'

'বউদের সঙ্গে তোর মার বনিবনা আছে, না আদায় কাঁচকলা?'

'ওই একরকম। তবে বড়-বউদির সঙ্গে ভাবসাব একটু বেশি।'

বোনের সব খবরই জগিরা খুঁটিয়ে জেনে নেয়। চা অনেক আগেই শেষ হয়ে গেছে। নসিব বিছানা গুটিয়ে বগলদাবা করে ভেতরের ঘরে রেখে আসে। চারপাইটা বসার ঘরে পেতে দেয়। জগিরা চান করার তোড়জোড় করে। নসিব প্রাতঃকৃত্যের জন্যে বেরোবে, জগিরা জিজ্ঞেস করে, 'আজ তোর কোথাও যাওয়ার আছে?'

'ন্ না।'

'তাহলে বারোটা নাগাদ পরমজিতের ওখানে আয়। দুটো আড়াইটের সময় খাওয়াদাওয়া হবে। তোকে একটা কাজে লাগিয়ে দেব।'

'বেশ।' নসিব বেরিয়ে যায়। মনের মধ্যে একটা কথাই ঘুরপাক খায়: পুষ্পকে আচমকা চন্নবাল থেকে নিয়ে আসা হলো কেন? তাকে আটকে রাখারই বা কারণ কী? কী এমন ঘটল? বাইরে থেকে কিছুই মালুম করা যাচ্ছে না। পুষ্পদের বাড়িতে সরাসরি গেলে কেমন হয়? বাড়ি গেলে বাজে কিছু ঘটে যাবে না তো? প্রাতঃকৃত্য সেরে নসিব ইচ্ছে করেই হরদিৎদের বাড়িতে সামনের রাস্তাটা ধরে। দরজা হাপাট খোলা। পুরো উঠোনটাই দেখা যায়। চৌকাঠের কাছে উঠোনে দুজন খাটিয়ার ওপর বসে কিংবা শুয়ে আছে। নসিব এই সব দেখতে-দেখতেই কয়েক পা হাঁটে। জানালা দিয়ে কেউ তাকে দেখছে না তো? পুষ্প কী ছাদে? ছাদে থাকলে তো ওকে দেখতে পাওয়ার কথা। একবার দেখলেই কাজ হয়ে যাবে। নসিব এসেছে, এটা অন্তত জানতে পারবে। চিন্তাগুলো কেমন যেন তালগোল পাকিয়ে যায়। একই রাস্তা দিয়ে সে ফিরে আসে আবার। এবারেও পুষ্পকে বা অন্য কাউকে দেখা গেল না। ছাদেও কেউ নেই। নসিব অগত্যা বাড়ি ফিরে চান করে নেয়। তারপর একটা বই নিয়ে বসে। মনে পড়ে যায় 'মেরা দাগিস্তান' বইটার কথা। বইটা সে বাবা টেকদাসকে দিয়ে এসেছে। কী দারুণ বই! যেখান থেকে খুশি পড়া যায়। বইটা কাছে থাকলে ভাল হতো। মন খারাপ ভাবটা কেটে যেত। টেকদাস বোধহয় এখনও বইটা শুরু করেননি। পুষ্পর চিঠি পেয়েই চলে আসতে হলো তড়িঘড়ি। হাতে এখন একটাও পড়ার মতো বই নেই। মাথাটা ধরে গেছে। মামি চা দিয়ে যায়, বলে, 'নসিব—আমি পাটোয়ারিদের ওখানে যাচ্ছি। ওদের খাওয়াদাওয়া অবধি থাকতে হবে। তুই বারোটা নাগাদ আসিস।' — মামি চলে যায়। মামু আগেই চলে গেছে। এই সময় নিজেকে বড় একা মনে হয়। মনে আজগুবি চিন্তা আসে যত। মনে হয়, পুষ্প যেন পাখি হয়ে উঠোনে এসে বসেছে। নসিব চোখ খোলে। চা ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। এগারোটার সময় নসিব পরমজিৎদের বাড়ি আসে। রাস্তার ওপর ঢাউস বাড়ি। লোকজন আত্মীয়স্বজন গমগম করছে। যে সব গাঁয়ে পরমজিৎ ছিল, সেইসব গাঁয়ের লোকজনও এসেছে। 'ভাড় মঙ্গৎ'-এর বিরাট বিরাট ভাতভর্তি কড়াই। হালুয়া পুরি লাড্ডু—নানা খাবারদাবার। মাটিতে গর্ত করে করে উনুন বানিয়ে, তার ওপর কড়া চাপিয়ে জগিরাই সব রান্নাবান্না করেছে। এখনও করে যাচ্ছে। সহকর্মীদের গালাগাল ও নির্দেশ একসঙ্গে চলছে : 'আরে

কঞ্জর কি পুত! ধোঁয়ায় চোখে দেখতে পাচ্ছি না!' নসিবকে দেখে জগিরা বলে ওঠে, 'এসে গেছিস—' তারপর ভ্রাম্যমাণ পরমজিৎকে: 'আমার ভাগ্নে এসে গেছে পাটোয়ারি সাহেব—ওকে কোনও কাজ দেবেন?'

পাটোয়ারি নসিবকে এক ঝলক দেখে। নাপ্‌তের ছেলে বলে মনে হয় না। সর্দারদের বাড়ির ছেলের মতো মনে হয়। সপ্রতিভ ব্যক্তিত্বময় চেহারা। কৌতূহলী পরমজিৎ প্রশ্ন করে, 'পড়াশোনা করো না কী?'

'আজ্ঞে, বি এ দিয়েছি।' নসিব সবিনয়ে জবাব দেয়। 'শাবাশ!' পরমজিৎ সোল্লাস অভিনন্দন জ্ঞাপন করে, 'তুমি ভাই আরও দু তিনজনকে নিয়ে লোকজনকে চা দাও—এসো, অন্য ছেলেদের সঙ্গে তোমার পরিচয় করিয়ে দিই।'

অন্য ছেলেরাও গ্রামের। বেলা দুটোর সময় গ্রন্থসাহেব পড়ার ব্যবস্থা হয়। সবার হাতেই চায়ের পেয়ালা। নসিব মহা উৎসাহে চা বিতরণ করতে লেগে যায়। পরমজিৎ, ভেতরে যারা আছে, তাদের কথা মনে করিয়ে দিয়ে চলে যায়। নসিবের জুড়িদার ছেলেটি বলে, 'তুই ওদিকটা যা, আমি এদিকটা দেখি।' এক হাতে জাগ, অন্য হাতে গেলাস, নসিব ভেতরের ঘরে ঢুকেই স্থাণুবৎ দাঁড়িয়ে যায়। মনে হয় যেন, অঙ্গারের ওপর পা রেখেছে! ইচ্ছে হয় পালিয়ে যেতে। অতিথি অভ্যাগতদের ঠিক মাঝখানে হরদিৎ বসে আছে। ঘাড় উঁচিয়ে এদিক-ওদিক তাকাচ্ছে। হরদিৎকে দেখেই নসিব হয়ে যায়। চোখাচোখি হতে ঢোক গিলে সৎশ্রী আকাল জানায়। হরদিৎ দরাজ গলায় প্রশ্ন করে, 'আরে—তুই! তোর রেজাল্ট কবে বেরোচ্ছে? আমাদের বাড়ির পথটা ভুলে গেছিস না কী? আসিস না কেন আজকাল? কাজকর্ম করছিস কোথাও?

'না। না। রেজাল্টের অপেক্ষায় আছি।' জিভে মোচড় দিয়ে নসিব জবাব দেয়। হরদিৎ আবার জিজ্ঞেস করে: 'রেজাল্ট কবে বেরোবে?' নসিব ততক্ষণে স্বাভাবিক হয়ে যায়, জবাব দেয়, 'সামনের মাসে চান্‌স আছে।' চা ঢালতে গিয়ে তার আর হাত কাঁপে না। মনে সাহস পায়। পুষ্পর বাবা রেগে থাকলে নিশ্চয়ই এভাবে কথা বলত না! গলার আওয়াজে কিংবা চোখে রাগের লেশমাত্র নেই। বসার ঘর থেকে লোক বেরিয়ে উঠোনে জড়ো হয়। লম্বা চওড়া উঠোনটায় লোক গিজগিজ করে। পেছন দিকের অংশে রান্নার বন্দোবস্ত। সব সাজানো গোছানো। বাপ লোকের জমি বাঁধা রাখত, কিন্তু ব্যাটার স্টাইলই আলাদা। লোক দেখানো ঠাটঠমকের কিছুই বাকি রাখেনি। নতুন কোনও অভ্যাগত এলেই হরদিৎ দরাজ গলায় হাঁক দেয়, 'নসিব ভাই—এদিকে একটা চা!' নসিব চা দিতে দিতে পুষ্পর চিঠির কথা ভাবে। খাওয়াদাওয়ার পাট শেষ হলে নসিব ও তার সঙ্গীরা লাড্ডুর প্যাকেট দিতে থাকে জনে-জনে। লাড্ডুর প্যাকেট নিয়ে হরদিৎ নসিবকে ঠিক আপনজনের মতোই বলে, 'আমাদের বাড়ি আসিস—হ্যাঁ?' নসিব ঘাড় নেড়ে জানায়, যাবে। —বাড়ি এসে নসিব ভাবতে থাকে, পরমজিৎদের ওখানে পুষ্পর বাবা এত ভাব-ভালবাসা দেখালো কেন? তাহলে কী হরদিতের কানে কোনও কথা ওঠেনি? ওদের বাড়ি গিয়ে পুষ্পর সঙ্গে একবার দেখা করলে কেমন হয়?

সতেরো

পরের দিন নসিব সকাল-সকাল স্নান সেরে নেয়। ইস্ত্রি করা প্যান্ট বুশসার্ট পরে সাত ভাঁজের পাগড়িটা গুছিয়ে বাঁধে। ঠিক করে হরদিৎদের বাড়ি গিয়ে সে হরদিৎকে একটা চাকরি জুটিয়ে দেওয়ার অনুরোধ জানাবে। অজুহাত হিসেবে এটিই হবে চমৎকার অজুহাত আর, চাকরি কী গাছের ফল? টুপ করে ঝরে পড়বে? বিএ-র ফল বেরোনোর আগে চাকরির চেষ্টা বেকার। আর এখন চাকরি পাওয়া গেলেও, তাতে আর কটা টাকা পাওয়া যাবে? আপাতত, পুষ্পর বাড়ি যেতে গেলে এর চেয়ে ভাল অছিলা আর নেই। বাড়ি থেকে বেরিয়ে সে হরদিতের বাড়ি যাওয়ার পথটি ধরে। মনের মধ্যে নানা হিজিবিজি চিন্তা। আস্তে-আস্তে সে এগোতে থাকে। বারবার মনে হয়, কেউ যেন ওকে পিছন থেকে টেনে ধরছে। একটু দোটানায় পড়ে। তারপরই ভাবে, দ্যুৎ! এসব চিন্তা করে লাভ কী? দেখাই যাক না কি হয়। ব্যাপারটা জানা যাবে অন্তত। পুষ্পর সঙ্গে কথা বললে কিছু ধোঁয়াশা কেটে যাবে। হরদিৎ যে কোনও কড়া কথা বলবে না, এই রকম একটা ধারণা নসিবের হয়েছে। পরমজিৎদের বাড়িতে যে-ভাবে কথাবার্তা হয়েছে, তাতে তো মনে হয় না হরদিৎ তাদের ব্যাপার কিছু জেনেছে; না, হরদিৎকে ভয় পাওয়ার কিছু নেই। হরদিৎদের বাড়ির লোহার গেট খোলাই আছে। উঠোনে কাউকে দেখা গেল না। বসবার ঘরটাও ফাঁকা। ভেতরে নিশ্চয়ই কেউ আছে। বসার ঘরের দরজায় হালকা টোকা মারে সে। দেওয়ালের সঙ্গে লাগোয়া খাটে পুষ্প শুয়ে ছিল। বিষণ্ণ করুণ চেহারা। সিলিঙে ফ্যান ঘুরছে। টোকা শুনেই সে উঠে বসে। আঙুল চালিয়ে চুল ঠিক করে, পায়ে একটা চপ্পল গলিয়ে এগিয়ে যায়। নসিবকে দেখেই হতবাক হয়ে যায় সে। কোনও ক্রমে বলে, 'তুমি!'

'হ্যাঁ। কিন্তু শরীরের একী হাল?'

'তাতে তোমার কী?'

'আমার অনেক কিছু! না হলে এভাবে দৌড়ে আসতাম?'

পুষ্প নসিবকে সোফার ওপর বসায়। তারপর এক নিঃশ্বাসে বলতে থাকে, 'মা এসে পড়বে। বাবা গেছে খেত দেখতে। আমাদের এক সঙ্গে সাধেড় যাওয়ার কথা মা টের পেয়েছে। কে বলেছে কে জানে। ওই জন্যেই মা হরিন্দরকে চন্নবালে পাঠিয়েছিল। হরিন্দরকে জিজ্ঞেস করেও আমি কিছু জানতে পারিনি। হরিন্দরও অবিশ্যি জানে না মা কোথা থেকে কথাটা শুনেছে। মা শুধু বলেছিল, 'দিদিকে নিয়ে আয়, একা-একা কোথায় যাবে কে জানে'—

কিন্তু কে কথাটা বলতে পারে, নসিব অনেক চেষ্টা করেও আন্দাজ করতে পারে না। পুষ্প বলেই চলে, 'মা কারও নাম করছে না। ভাইরূপা অবধি আমাদের এক বাসে যাওয়া, সালাবাতপুরা অবধি আমাদের পাশাপাশি বসা, 'নির্লজ্জ বেহায়াদের' মতো আমাদের 'ঢলাঢলি', বারনালার হোটেলে চা খাওয়া, তারপর বেপাত্তা হয়ে যাওয়া—মা এতটুকু জানে। সাধেড়ের কথা জানে না।' (অর্থাৎ, নসিব ভাবে, ভাইরূপা থেকেই কেউ আমাদের সঙ্গেসঙ্গে গেছে, আমরা খেয়াল করিনি। কিন্তু কে?) পুষ্প একটু থেমে বলে,

'এখানে আসার পর থেকেই মা আমার ওপর বিগড়ে আছে। একই কথা জিজ্ঞেস করছে, 'বল, কোথায় গিয়েছিলি? কেন চা খেয়েছিলি? লজ্জাসরমের মাথা খেলি কেন?' —এর পর থেকেই আমার ঘর থেকে বেরোনো বন্ধ হয়ে গেছে। তাই তোমাকে চিঠি লিখতে পারিনি।'

উঠোন থেকে পায়ের আওয়াজ আসে। কে আসছে, ওরা কেউ প্রথমটা আন্দাজ করতে পারে না। তারপরই, হরিন্দরকে দেখতে পায়। হাতে তিনটি রুটি, তার ওপর আচার। সে নসিবকে দেখে হাসে। তারপর বলে, 'একটু বসো—আমি এখনই আসছি।' বলেই সে বেরিয়ে যায়। একটু পরেই ফিরে আসে। নসিব তখন একাই। পুষ্প ভেতরে চলে গেছে। নসিব ছাদের দিকে আনমনে তাকিয়ে ছিল। হরিন্দর ওর পাশে বসে বলে, 'প্রীতমকে রুটি দিয়ে এলাম। শালা বলে কি অনেকদিন কিছু খায়নি! রুটি এনে দে—বেহেড মাতাল একেবারে!' হরিন্দর হাসতে থাকে। নসিবও সঙ্গেসঙ্গে হাসে। জোর করা কষ্টকৃত হাসি। হরিন্দর বলে, 'দাঁড়াও তোমার জন্যে চা আনি—' নসিব না-না বলে, কিন্তু হরিন্দর শোনে না, 'চা খাবে না, তা হয় না কী? এতদিন পর এলে, কোথায় থাকো আজকাল?'

'কেন? এখানেই।'

'তাহলে দেখি না কেন?'

'মাঝখানে দিন দশেকের জন্যে সাধেড় গিয়েছিলাম।'

'সাধেড়? কেন?'

'আমার মা থাকে ওখানে। ওই গ্রামেই আমি মানুষ।'

'তুমি সাধেড়ের ছেলে—তা এখানে এলে কী করে?'

'আমার মামা জগিরা—'

'কী সর্বনাশ! তোমার মামা, আমি তো ভাবতাম তুমি জগিরা কাকার ছেলে!'

হরিন্দরের কথার ঢঙে নসিব হেসে ওঠে। বলে, 'মামা হলেও উনি আমার বাবার মতো। মা-বাবা দুইই। সাধেড়ে যাই, এই যা।'

পুষ্প গিয়েছিল রান্নাঘরে। মাকে সে নসিবের আসার কথা জানিয়ে চা বানাতে বলে। দয়ালি গম্ভীরভাবে প্রশ্ন করে, 'এখানে কী করতে এসেছে ছোকরা?'

'আমি কী করে জানব? নিশ্চয়ই কোনও কাজ আছে।'

'কী কাজ?'

'তাই বা কী করে জানব? তুমিই গিয়ে জেনে নাও না!' ঝাঁজালো গলায় পুষ্প জবাব দেয়। দয়ালি নিজেকে সামলে নেয় কোনও মতে। রুটি সেঁকা থামিয়ে উনুনে কেটলি চাপায়। মা-মেয়ের মধ্যে আর কোনও কথা হয় না। পুষ্প তার হাতে ধরা কাঠের টুকরোটা ভাঙার চেষ্টা করে। কি ভেবে আর ভাঙে না। ওটা নিয়ে নাড়াচাড়া করতে থাকে। হরিন্দর ঢোকে: 'কার জন্যে চা করছ?' পুষ্প সঙ্গেসঙ্গে জবাব দেয়, 'নসিবের জন্যে।' মা মেয়ের দিকে তাকায়। কঠিন, রাগী চোখ। যেন, এখনই একটা চড় মারবে মেয়ের গালে। হরিন্দর একবার মা, একবার বোনের দিকে তাকায়। চায়ের জল উথলে

পড়ে। দয়ালি কাপড় দিয়ে কেটলির হাতল ধরে নামিয়ে ফেলে। তারপর, উনুনে চাটু বসিয়ে দেয়। হরিন্দর পুষ্পর কনুইয়ে ধাক্কা দেয়, 'এই—চা ঢাল!' ধাক্কা সামলাতে না পেরে পুষ্প বেকায়দায় পড়ে যেতেযেতে সামলে নেয়। একটু রুক্ষভাবে ভাইকে বলে, 'শুধু মুখে বললে কী হতো?'

'লজ্জাসরমের মাথা খেয়েছে! ভাইয়ের সঙ্গে কথা বলার ছিরি দেখো না!' মা গজরাতে থাকে। পুষ্প ততক্ষণে তিনটি গ্লাসে চা ঢেলে ফেলে একটা ট্রে-তে রাখে। তারপর, একটা গ্লাস তুলে নেয়, কি ভেবে আবার রেখে দেয়। হরিন্দর বোনের দিকে আড়চোখে তাকায়। তারপর ট্রে নিয়ে বেরিয়ে যায়।

তিনজনেই বসার ঘরে এক সঙ্গে চা খায়। হরিন্দর বোনের সঙ্গে একটু খুনসুটিও করে। তিনজনেই হাসাহাসি করে। হঠাৎ হরিন্দরের একটা কথা মনে পড়ে যায়। বলে, 'তোমরা বসো। আমার একটা কাজ আছে। আমি উঠছি।' হরিন্দর বেরিয়ে যেতেই ওরা নিজেদের কথা শুরু করে দেয়। খুব তাড়াতাড়িই কথা বলে যায়। পুষ্পকে মাঝপথে থামিয়ে নসিব কিছু বলে, আবার নসিবকে পুষ্প। দুজনেই তাদের মনের কথা, যতদূর সম্ভব দ্রুততায় প্রকাশ করতে থাকে। শব্দ বাক্য অসমাপ্ত, অধরা হলেও কিছু যায় আসে না। মাঝেমাঝে দু জনের মুখ থেকেই এক কথা বেরিয়ে পড়ে। চোখের ভাষা, শরীরের ভাষা বদলে যায়। চাপাগলায় ফিসফিস কথা।

'তোমার চিঠির অপেক্ষায় থেকে থেকে—'

'আমি তো রোজ আশা করে বসে ছিলাম—'

'তুমি কোটে পৌঁছেই চিঠি—'

'এখন কী করা যায়?'

'রেজাল্ট বেরোলে চাকরিবাকরি —'

'এতদিন ঘরে বসে—'

'কিছু একটা করো।'

'কী করব?'

'পাশ তো করবেই, জানা কথা। বরং, এম এ পড়া শুরু করে দাও।'

'এম এ?'

'হ্যাঁ।'

'সাবজেক্ট? ওটা তো আর এখনই ঠিক করা যায় না। তার চেয়ে একটা কাজ—'

'কী কাজ? ঘুঁটে গোবর কুড়োবার কাজ করবে না কী?'

'তুমি সঙ্গে থাকলে আমি নর্দমা পরিষ্কারের কাজও করতে পারি।'

'আমি ফুলের মতো রেখে দেব তোমাকে!'

'মিথ্যে কথা—কেন?'

'আমি কী তোমার সাইনবোর্ড হয়ে থাকব না কী?'

'তবে?'

'উঁহু—বউ হয়ে থাকব!'

'বউও তো এক ধরনের সাইনবোর্ড!'

'মোটেই না! মাসখানেক স্বামী স্বামীগিরি করে, বউ বউগিন্নি। তারপর কাচ্চাবাচ্চা ঘরসংসারের দায়িত্ব সব বউয়ের!'

'এগুলো কী যা তা কাজ?'

'খানিকটা। ভারতীয় পুরুষরা মনে করে বউ তাদের সম্পত্তি। স্বামীর মনোরঞ্জন ছাড়া তার আর কোনও সত্তা নেই। স্বামীকে শরীরী সুখ দেওয়া, স্বামীর দুঃখে দুঃখী হওয়া—এই সবই হয়ে দাঁড়ায় আদর্শ!'

'বউ হলে—'

'বউ হলে এসব মানতে হয়? আসলে, আমাদের স্বামীদেবতারা আমাদের চিনতে, বুঝতে চেষ্টা করে না। খাটবিছানার মতোই বউকে ব্যবহার করে। ঘরের আর পাঁচটা জিনিসের মতোই বউ একটা জিনিষ বা মাল!'

'ভুল। ঝোঁকের মাথায় ভাট বকছ! এই প্রেমে পড়াপড়ি একটা ঋতুর মতো। আসে, চলে যায়—কিন্তু বিয়ে কোনও ঋতু নয়—একটা গোটা জীবন, যে জীবনটা নানা ঋতু উপভোগ করে যায়। সুখ-দুঃখের ঋতু নিয়েই গোটা জীবন যা নারী-পুরুষ—দু জনেই উপভোগ করে।'

'দেখব তোমার এই ফিলজফি কতদিন ধোপে টেকে!'

'নিশ্চয়ই দেখবে। না দেখলে বুঝবে কী করে? প্রেম-প্রেম করে পদ্য লেখা যায়, আকাশে ডানা মেলা যায়—কিন্তু বাস্তব অন্যরকম।'

'আজ তাহলে এখানে ইতি।' পুষ্প একটু থামে, 'আমার মার সঙ্গে দেখা করবে না?'

নসিব একটু ইতস্তত করে। পুষ্পই আবার বলে, 'দেখা না করে গেলে— মা কিছু ভাবতে পারে।'

পুষ্প রান্নাঘরের দিকে যায়। দয়ালি কাজ চুকিয়ে রান্নাঘর পরিষ্কার করছিল। পুষ্প জিজ্ঞেস করে, 'রুটি হয়ে গেছে?' —মা সংক্ষেপে জবাব দেয়, 'হুঁ।' পুষ্প রান্নাঘরের লাগোয়া বড় কামরায় ঢুকে কাপড়চোপড় গুছিয়ে রাখে। নসিব সাহস করে উঠোনে চলে আসে। মৃদু গলা খাঁকারি দেয়। দয়ালি বেরোতেই সৎশ্রী আকাল জানায়। দয়ালি সামান্য মাথা ঝুঁকিয়ে, ঈষৎ ঠোঁট নেড়ে প্রত্যুত্তর দেয়। চুন্নির কোনা দিয়ে মুখ মুছে জিজ্ঞেস করে, 'খবর ভাল তো?'

'হ্যাঁ—এক রকম। মামি—মামাজি কোথায়?'

'খেতিতে গেছে। বীজ ফেলবে, তা মামার সঙ্গে—'

'একটু দরকার আছে, মামি।'

'সন্ধ্যের দিকে ফিরবে। ওই সময় একটু ঘুরে যেয়ো। দরকারটা বলে গেলে—'

'রামপুরায় হরদিলের সঙ্গে একটু দেখা করতে চাই।'

'হরদিলের সঙ্গে? কেন?'

'এই একটা চাকরিবাকরি যদি জোটানো যায়।'

'তাহলে সন্ধ্যেতেই এসো। আমি বলে রাখব।'

নসিব ঘাড় নাড়ে। নমস্কার জানিয়ে বিদায় নেয়।

আঠারো

নসিব চলে যেতেই দায়ালি ঘরে ঢোকে। মেয়ের দিকে তাকায়, যেন কিছু বলবে। কিন্তু, কিছু বলতে পারে না। রাগে গা রি-রি করে শুধু। তাছাড়া কি বলবে বা বলবে না— তাও ঠিক করতে পারে না। কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে একটু রুক্ষভাবে বলে ওঠে, 'হরিন্দর কোথায়? খেতিতে রুটি নিয়ে যাবে কে?'

'হরিন্দর বোধ হয় চৌপালে আছে। আমি ডেকে আনছি।'

পুষ্প বেরিয়ে যেতেই দয়ালি রুটির টুকরিটা আছড়ে ফেলে মেজের ওপর। যেন, ভেঙেই ফেলবে। তারপর, টুকরিটা তুলে নিয়ে রান্নাঘরে চলে যায়। এক এক করে রুটি তরকারি গোছাতে মন দেয়। ডাল পিঁয়াজ আচার, এমনকি বাটি ও লস্‌সিভর্তি গেলাস, কাপড়ের বেড় দিয়ে পরিপাটি করে সাজিয়ে রাখে। হরিন্দর ফিরে আসে। গুনগুন করে একটা ফিল্‌মি-গান গাইতে-গাইতে হাঁক দেয়, 'মা, রুটি দাও!'

'কখন থেকে রেখে দিয়েছি তোর জন্যে!' দয়ালি অনুযোগেব সুরে বলে।

'মাই ডিয়ার মাদার!' হরিন্দর রসিকতা করে, 'খাব তো দুটো রুটি, তার জন্যে এত তোড়জোড় কেন?'

'তাহলে খেত থেকেই খেয়ে নিস।'

'ওখানে যদি ফুরিয়ে যায়? তার চেয়ে, এখানেই খেয়ে নিই।' হরিন্দর নিজেই রান্নাঘরে ঢুকে ডাল ঢালে। রুটি তুলে নেয়। চৌকির ওপর বসে খেতে শুরু করে, দিদির উদ্দেশে বলে, 'কইরে—লস্‌সি দে!' খেয়েদেয়ে রুটির টুকরি নিয়ে হরিন্দর বেরিয়ে যায়। পুষ্প মাকে বলে, 'আমাকেও খেতে দাও।'

'অতিথি নাকী? নিজে নিয়ে খেতে পারছিস না?'

'না। তুমি হাতে করে দাও।'

'আদিখ্যেতা করতে হবে না আর!'

'আদিখ্যেতা? তুমি আমার আদরের মা—'

'ঢঙ দেখে আর বাঁচি না!'

'কেন, আমি কী করেছি?'

'কী না করেছিস? এমনকী, এখনও করে যাচ্ছিস!'

'খুলেই বলে না—কী করেছি?' পুষ্প নাছোড়বান্দা হয়ে প্রশ্ন করে।

দয়ালি রান্নাঘরের পিঁড়িটা সশব্দে বারান্দায় রেখে বসে পড়ে। তারপর বলে, 'ন্যাকা—কিছু বুঝিসনি? ওই ছোটোলোকের ছেলেটা কেন এসেছিল আজ?'

'ও-তো আগেও এসেছে।'

'আগে এমনি আসত কিন্তু এখন এসেছে মতলবে। বাজে ছেলে—তোকে একেবারে কবজা করে ফেলেছে! কে জানত ওর পেটে-পেটে এই মতলব?'

'মা, একটা কথা তুমি কিছুতেই বুঝছো না। তুমি কী মনে করো আমি নিজের মান ইজ্জত বুঝি না, নিজের ভালমন্দ জানি না? আমি কী কচি খুকি যে, যে কেউ আমাকে কবজা করে ফেলবে?'

'তোর এইসব কথাবার্তা আমি বিন্দুবিসর্গও বুঝতে পারি না। শুধু বুঝি, এই বদমায়েশটার সঙ্গে তুই বারনালা গিয়েছিলি। হোটেলে চা খেয়ে কোন্ চুলোয় গিয়েছিলি— এইটুকু শুধু জানি না! চন্নবাল যাওয়ার সময় তোর এইসব কীর্তিকাণ্ড আমার কানে এসেছে। হরিন্দরও জানে না, তার দিদি কী কেচ্ছাটাই না করেছে। তোর বাবা এখনও শোনেনি। এখনও সময় আছে—শুধরে নে। বাড়াবাড়ি করিস না!' দয়ালি একটুও না থেমে এক টানা কথাগুলো বলে যায়।

'সব মিথ্যে কথা! ডাহা মিথ্যে! কে তোমাকে বলেছে এসব কথা? আজে-বাজে এই সব কথা শুনে আমার ওপর বিগড়ে গেছ!'

'শুনতে চাস—কে বলেছে?'

'বলোই না!'

'শুমি বুড়িকে ডাকব?'

'কে তোমার শুমি বুড়ি?'

'প্রতাপের ছেলের বউ শ্যামি। ভাইরূপা অবধি তোদের সঙ্গে এক বাসে গেছে। সালাবাতপুরাতে তোদের দেখেছে। তোরা হোটেলে চা খেয়ে—'

'ওই বুড়িকে তো আমি দেখিনি!'

'ও তোকে দেখেছি।'

'ভুল দেখেছে! অন্য কারও সঙ্গে আমাকে গুলিয়ে ফেলেছে!'

'বাজে বকিস না! ওকে সবাই চেনে। তোকে বলছি, এভাবে চললে তুই বাপ-দাদার বেইজ্জত করবি!'

পুষ্প হঠাৎ যেন একটা ধাক্কা খায়। চোখে থেকে জল গড়িয়ে পড়ে। পাথরের মতো সে বসে থাকে। শূন্য চোখে মার দিকে তাকায়। দয়ালি উঠে পড়ে। মনে আর রাগ নেই। পুষ্প চোখের জল মোছে দোপাট্টায়। জলের দাগ থেকে যায়। দয়ালি রান্নাঘরে যেতে-যেতে বলে, 'কান্নাকাটি করতে হবে না আর। বুঝেসুঝে চল।'

পুষ্প খাটের বাজুতে পিঠ ঠেকিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। রান্নাঘরে দয়ালি ডাল ঢালে। সামান্য মাখন দেয়। থালায় রুটি পাট করে ছোট টেবিলটার ওপর রাখে। মেয়েকে বলে, 'নে, খেয়ে নে। বেজাত-কুজাতের হাতে পড়িসনি!'

জাতের কথায় পুষ্প অস্থির হয়ে ওঠে। মা রান্নাঘরে লস্‌সি আনতে যায়। পুষ্প রুটির থালা ফেলে চলে যায় উঠোনে। দয়ালি রেগে যায় আবার, 'খাবি না—খাবি না—অত তেজ দেখাবার কী আছে?' বলে দয়ালি নিজেই রুটি খেতে শুরু করে দেয়। মেয়ের দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে। লস্‌সি খেয়ে রান্নাঘরে চলে যায় আবার। থালাবাটি ঠিক করে রাখে।

শ্যামির দুই ছেলেই ভাল রোজগার করে। চাষের জমি ভালই আছে। তাদের বাবা ছিল এক কালের ফৌজি। বাস্তববাদী অভিজ্ঞ মানুষ। অযথা অপব্যয় করত না। আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে চলত। এক জাঠের দুই মেয়ের সঙ্গে ছেলেদের বিয়ে দেয়। দুই বউ-ই বেশ গোছানো, কাজের মেয়ে। দুই ভাইয়ের মধ্যে মিল আছে। খেতের কাজ করে নিরলসভাবে। রোজগারও ভাল। বউ-ছেলেরা বাবাকে খুবই যত্নে রাখে। কিন্তু, শ্যামির সঙ্গে একেবারে পটে না। বউদের কাজকর্মে শ্যামি নাক কুঁচকেই থাকে। খিটিমিটি লেগেই আছে। শ্বশুর বউদের পক্ষ নেয়, ফলে শ্যামি আরও রেগে যায়। যাচ্ছেতাই গালিগালাজ করে। অবস্থা অসহনীয় হয়ে উঠতে, শ্যামির বর একদিন বউদের সামনেই শ্যামিকে বেশ দু চার ঘা দিয়ে বসে। ব্যাস, আর যায় কোথায়! শ্যামির গালাগাল, চিৎকারের মাত্রা একেবারে পঞ্চমে ওঠে। পাড়ার লোক জড়ো হয়ে যায়। বউয়েরা তো লজ্জায় মুখ ঢেকে ঘরের ভেতর ঢুকে পড়ে। পাড়ার লোকেরা শ্যামিকে বোঝায় : 'খামোকা চিল্লসনি বাপু! তোর দিন শেষ হয়ে গেছে। এইভাবে চেঁচালে লোকে তামাশা দেখতে ভিড় করবে!'

কিন্তু শ্যামাসুন্দরীকে থামায় কার সাধ্যি! সে ততক্ষণে গায়ের কাপড় খুলে পিঠের দাগ দেখাতে আরম্ভ করেছে। শেষে ফৌজিই তাকে আলাদা করে দিয়ে বলে, 'তুই এবার থেকে নিজে রাঁধবি খাবি—বউদের সঙ্গে তোর কোনও লেনদেন থাকবে না। রোজ-রোজ আর যন্ত্রনা দিসনি আমাদের!'

অতঃপর শ্যামাসুন্দরী পনেরো-বিশ দিন নিজেই আলাদা রুটি বানিয়ে খায় কোনও ক্রমে। তারপরই কোনও-না-কোনও ছুতোয় বউদের দ্বারস্থ হয়। এমন ভাব দেখায় যেন বউদের সঙ্গে তার কত ভাবভালবাসা। কোনও দিন ঝগড়াঝাঁটি হয়নি। ছেলেরাও মা সম্পর্কে ভালমন্দ আর কিছু বলে না।

শ্যামি খুই সস্তা দামের কুর্তা সালোয়ার পরে। মাথায় মলমলের শাদা চুন্নি। কাপড় চোপড় পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। ছেলেদের বউয়েরাই ধুয়ে দেয়। মেজাজ ভাল থাকলে নিজেও ধোয়। পায়ে ঝুমকো বসানো চপ্পল। কমজোরি পা, যার জন্যে হাতে ছড়ি। সব বাড়িতেই তার যাতায়াত অবাধ। উঠোনে বসে জমিয়ে গালগল্প করে। পুরনো লোকেদের কাছে ওর প্রকৃতি অবশ্য অজানা নয়। তার 'প্রাজ্ঞ মহিলা' সাজার চেষ্টা দেখে, তারা বলাবলি করে, 'কি নখরা রে বাবা! যৌবনে মাল খেত মেমমাগিদের মতো, এখন শালি ধোয়া তুলসিপাতা!' নসিব ও পুষ্প যেদিন ভাইরূপা স্ট্যান্ড থেকে আলাদা-আলাদা ওঠে, শ্যামি সেদিন সেখানে হাজির ছিল। চশমার ভাঙা ফ্রেমের ফাঁক দিয়ে কিছুই তার নজর এড়ায়নি। সালাবাতপুরার বাসেও সে ছিল। বসে ছিল ওদের ঠিক দু তিনটি সিট পরে। পাশাপাশি

নসিব-পুষ্প তার চোখ এড়িয়ে যায়নি। বারনালার চায়ের দোকানে ওরা যখন ঢোকে, শ্যামি তখন বাইরে দাঁড়িয়ে ওদের ওপর নজর রাখে। নসিব বা পুষ্প কেউই টের পায় না ওদের গতিবিধি শ্যামি লক্ষ করে যাচ্ছে। চায়ের দোকান থেকে ওরা বেরিয়ে যখন স্টেশনের পথ ধরে, তারপর থেকে শ্যামি আর নজর রাখতে পারেনি। এরপর, শ্যামি ফরবাহির বাস ধরে। ওখানে ওর ছোট বোন থাকে। ফরবাহিতে গেলে শ্যামি বোনের সঙ্গে সাধারণত পাঁচ সাতদিন কাটিয়ে আসে। এবারে আর একরাতের বেশি থাকেনি। হরদিতের মেয়ের কেচ্ছা বলতে না পারায় ওর পেট ফুলছিল! পরের দিনই সে কোটেতে এসে দয়ালিকে, বেশ রসিয়ে-রসিয়ে, সব কিছু বলে দেয়।

উনিশ

কোনও মা বাবাই নিজের ছেলেমেয়ের বিরুদ্ধে কোনও কথা শুনতে তৈরি থাকে না; বিশ্বাসই করতে চায় না, তাদের সন্তান বদনামি কিছু করতে পারে। এই ধরনের আলোচনাও তাদের খারাপ লাগে। ভাবে, সব মিথ্যে কথা, বানিয়ে বলা। আত্মপক্ষ সমর্থনে কিছু না কিছু বলে। সন্তানের পক্ষে মা-বাবা না বললে, আর কে বলবে? সেদিনও ঠিক এই রকমটি হয়। শ্যামি ফরবাহি থেকে ফিরে, দয়ালিকে কথাগুলি বলতে দয়ালি স্বভাবতই তা ভালভাবে নেয় না। বাড়িতে একাই ছিল দয়ালি। দয়ালি শ্যামির কথা শুনে তো থ। শ্যামি কথার পিঠে কথা জুড়ে সাতকাহন বানিয়ে যায়, আর আড়চোখে দয়ালির প্রতিক্রিয়া লক্ষ করে যায়। দয়ালি ততক্ষণে নিজেকে সামলে নেয়, 'শ্যামি—তোর নিশ্চয়ই ভুল হয়েছে। সত্যি মিথ্যে না জেনে সব বানিয়ে বলছিস! ছেলেটাকে আমিই পাঠিয়েছিলাম পুষ্পর সঙ্গে। ছেলেটা তো আমাদের অচেনা নয়— কতদিন সে এ বাড়িতে আসছে—জানিস? ওকে আমি আমার ছেলের মতোই দেখি। ছেলেটা যাচ্ছিল সাধেড়ে ওর মার কাছে, আমার মেয়ে যাচ্ছিল চন্ননবাল, মামার কাছে। ওরা একসঙ্গে গেছে, এতে কী মহাভারত অশুদ্ধ হয়েছে শুনি? কলেজের ছেলেমেয়েরা একসঙ্গে যাতায়াত করে না? আর তোর কীর্তির কথা তো আমার জানতে বাকি নেই রে, শ্যামি! তিন কাল গিয়ে এক কালে ঠেকেছে—তুই কী না আমার মেয়ের পেছনে লেগেছিস! খবরদার বলছি, আমার মেয়ের পেছনে লাগবি না। মেয়ের বাবাকে তো চিনিস—ওর কানে গেলে তোকে আর আস্ত রাখবে না। সাবধান করে দিলাম, হ্যাঁ!'

দয়ালির প্রতিক্রিয়ায় এবার শ্যামি থতমত খেয়ে যায়। মনে হয়, কেন ছাই এসব বলতে এলাম! বড়লোকদের ব্যাপার, বোঝা ভার। উলটে আমাকেই ডেঁটে দিল! যা খুশি করুক, যেদিন ঝামেলায় পড়বে কেঁদে কূল পাবে না! হাড়ে-হাড়ে মালুম করবে আমার কথা। সে সঙ্গেসঙ্গে হাত জোড় করে, 'বোন! আমি কী অতশত জানতাম? আমরা হলাম

গিয়ে পুরনো দিনের লোক, আজকালকার ছেলেমেয়েদের চালচলন ঠিক বুঝতে পারি না। তোমাকে নিজের লোক মনে করি বলেই, এইসব বলতে এসেছিলাম। যাকগে, আমাকে ক্ষমা-ঘেন্না করে দাও।' বলতে-বলতে শ্যামি ছড়িতে ভর দিয়ে উঠে দাঁড়ায়। চশমাটা নাকের ডগায় এঁটে বাহেগুরু বাহেগুরু বলতে বলতে চলে যায়। শ্যামি যাওয়ার পরই দয়ালি গুম মেরে যায়। মেয়ের জন্যে চিন্তায় পড়ে। মনে হয়, মেয়ে বোধহয় আর ফিরবে না। যেভাবে হোক মেয়েকে ফিরিয়ে আনা দরকার। কলেজও বন্ধ যে পড়ার অজুহাতে মেয়েকে ফিরিয়ে আনবে। পাঁচ-সাত ভেবে, দয়ালি শেষ পর্যন্ত হরিন্দরকে চন্নবালে পাঠায় দিদিকে নিয়ে আসার জন্যে। মেয়েকে দেখেও দয়ালির রাগ কমে না। কারণে-অকারণে খোঁচা দিয়ে কথা বলতে থাকে। আবার মেয়ের হাবভাবেও একটু ধন্দে পড়ে। তার হাবভাবে তো কোনও বৈলক্ষণ্য দেখা যাচ্ছে না। শ্যামি নিশ্চয়ই বাজে কথা বলছে। পুষ্পি সে রকম মেয়েই নয়। আবার, বলা যায় না। রাগ কমলে সে ভাবতে বসে। মেয়েকে চোখে-চোখে রাখে। পুষ্প প্রথমটা ঘাবড়ে গেলেও, তারপরই ব্যাপারটি বুঝে যায়। মা কিছু বললেই জবাব দিয়ে দেয় সঙ্গেসঙ্গে। ঝাঁজালো গলায় চোখা জবাব। বুঝিয়ে দেয়, সে আর নাবালিকা নয়, নিজের ভালমন্দ ঠিক করার অধিকার তার আছে। সেদিন মেয়েকে বকুনি দিয়ে দয়ালির মন হালকা হয়ে যায়। মেয়ে নিশ্চয়ই কোনও ভুল পথে যাচ্ছে না। শ্যামির কথা শুনে মেয়েকে বকুনি দেওয়া ঠিক হয়নি। মাঝখান থেকে মেজাজ খারাপ! ছেলেমেয়েরা একসঙ্গে যদি কলেজে যেতে পারে, তাহলে হোটেলে একসঙ্গে বসে চা খেলে আপত্তির কী আছে? কথাগুলি ভাবতে-ভাবতে দয়ালির জাঠ-অভিমান জেগে ওঠে: হাজার হোক নাপতের ছেলে, সাহস-ই হবে না জাঠিনির দিকে অন্য চোখে তাকাতে!

সেদিন সন্ধ্যেবেলায় নসিব আবার আসে। হরদিৎ এখনও খেত থেকে ফেরেনি। দয়ালি নসিবকে বসায় রান্নাঘর সরাদ্দ চারপাইটায়। পুষ্পর সঙ্গে ছিটেফোঁটা কথা হয় নসিবের। দয়ালি আলো জ্বালে—সেই আলোতে দুজনকে বেশ অন্তরঙ্গভাবে কথা বলতে দেখে। তবুও কিন্তু মনে হয় না, দুজনের মধ্যে অন্য কোনও সম্পর্ক আছে, ভঙ্গিটা বেশ সহজ স্বাভাবিক। দয়ালি এক গ্লাস দুধ এনে দেয় নসিবকে। নসিব আস্তে আস্তে খায়। ছেলেটা বেশ সভ্য ভদ্র। দয়ালি নসিবকে বলে 'তোর মামা কখন খেত থেকে ফেরে ঠিক নেই। কাল রামপুরা যেতে পারবে বলে মনে হয় না—বীজ ফেলার কাজ চলছে। তুই বরং আরও দুদিন সবুর কর, তোর হয়ে আমিই বলে দেব না হয়—রামপুরা তো এমন কিছু দূর নয়—মামার সঙ্গে চলে যাবি।'

•

এরপর, নসিব আর কয়েকদিন আসে না। কেননা, কোনও ছুতো নেই। বিএ পরীক্ষার ফলও এখনও বেরোয়নি। বিএ পাশ না হলে, এমন কী ছাতার মাথা চাকরি জুটবে? পুষ্পও জানিয়ে দিয়েছিল, নসিব যেন ঘন-ঘন না আসে। মাঝেমধ্যে আসে। বললে কি হবে, পুষ্প কিন্তু উন্মুখ হয়ে থাকে নসিবের জন্যে। নিজেকে মনে হয় গৃহবন্দি। লোকজনের বাড়িতে যাতায়াতের অভ্যেস থাকলে, এক ফাঁকে অবশ্য নসিবদের বাড়িতে টুঁ মারা যেত। এখন, নসিবের জন্যে বসে থাকা ছাড়া উপায় নেই। এইভাবেই, অপেক্ষা

করতে করতে একদিন বিএ পরীক্ষার ফলাফল বেরিয়ে যায়। দুজনেই পাশ করেছে সেকেন্ড ডিভিসনে। যে কাগজে ফলাফল বেরিয়েছে, সেই কাগজটা হাতে নিয়ে নসিব ছুটে আসে পুষ্পদের বাড়িতে। হরিন্দর দোকান থেকে দু কিলো লাড্ডু কিনে আনে। দয়ালি চা চাপিয়ে দেয়। হরদিৎ ও তার বারোমেসেও সেদিন বাড়িতে ছিল। সবাইকে লাড্ডু ও চা দিয়ে আপ্যায়িত করা হয়। পুষ্প বিএ পাশ করেছে—এই কথাটাই ঘুরে-ফিরে সবাই বলে। হরিন্দরই শুধু নসিবের কথাটা উল্লেখ করে। পুষ্প অবশ্য নিজের সাফল্যে যতটা না খুশি, তার চেয়ে বেশি খুশি নসিবের সাফল্যে। পুষ্প নসিবকে এক ফাঁকে নিজের ঘরে নিয়ে গিয়ে বসায়। দুজনে দুজনের দিকে গভীর দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে। পুষ্পর মন আজ খুব ভাল। নসিব এবার একটা চাকরি পাবে । তারপর . . .

কুড়ি

জগিরা এবার নিজে এসে হরদিতের সঙ্গে দেখা করে। পরের দিন প্রথম বাস ধরে দুজনেই রামপুরা যায়। ওদের সঙ্গে নসিবও থাকে। হরদিলের ওই দিন রামপুরায় থাকার কথা। খবরটা জগিরাই নিয়ে আসে। সাধারণ নির্বাচন হয়ে গেছে। সারা দেশে কংগ্রেসবিরোধী হাওয়া। যার জন্যে, কংগ্রেস জিততে পারেনি। স্বয়ং ইন্দিরা গান্ধি হেরে গেছেন। কেন্দ্রে জনতা পার্টি। প্রধান মন্ত্রী মোরারজি দেশাই। পাঞ্জাবে অকালি সরকার। কেন্দ্রর সঙ্গে সম্পর্ক বেশ ভালই। হরদিল অকালি টিকিটে এম এল এ বনে গেছে। মন্ত্রী হওয়ার জন্যে কাঠ-খড় পোড়ালেও ঠিক সুবিধে করতে পারেনি। হরদিল মন্ত্রী হতে না পারলেও, তার হাঁকডাক প্রভাবপ্রতিপত্তি মন্ত্রীদের চেয়ে কম কিছু নয়। প্রায়ই দিল্লি যায়। হরদিৎ, জগিরার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়ে হরদিলকে বলে, '—এ হলো নসিব—জগিরার ভাগ্নে। বড় ভাল ছেলে—আমাদের গাঁয়ের গর্ব। জগিরা কাজের লোক, ভোটের সময় আমাদের হয়ে জান লড়িয়ে খাটে। জগিরার এই ভাগ্নেকে আপনি একটা কাজ জুটিয়ে দিন—'

হরদিল ওদের যথারীতি চা-পানে আপ্যায়িত করে, সোজাসুজি বলে, 'দেখ ভাই হরদিৎ, তোমাকে আমি না করতে পারি না। এখানে চাকরি খালির খবর পেলেই দরখাস্ত দিক—চাকরিটা কিন্তু ওকে খুঁজে নিতে হবে—তারপর আমি আছি। বলে কয়ে ঠিক করে দেব। ঠিক আছে?'

'কী জগিরা—ঠিক আছে?' হরদিৎ জিজ্ঞেস করে। জগিরা ঘাড় নাড়ে। নসিব নীরব থাকলেও খুশি হয়। তারপর হঠাৎ জগিরা বলে ওঠে, 'সর্দারজি—আপনি যখন এতটা করছেন, তখন দয়া করে আপনিই চাকরিটা খুঁজে দিন। আমরা মুখ্যুসুখ্যু লোক, চাকরি খালির খবর পাব কী করে?'

হরদিল জবাব দেয়, 'ভাই, চাকরি খালির খবর তো আমাদের কাছে আসে না। তবে, চাকরি খালি হলেই কাগজে বিজ্ঞাপন ছাপা হয়—গাদা গাদা পোস্ট—দরখাস্তে দিয়েই আমার সঙ্গে যোগাযোগ করলে হবে।' তারপর নসিবকে, 'কী হে কাগজটাগজ পড়ো তো?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'ব্যাস। অ্যাপলাই করেই আমার কাছে চলে আসবে—তারপর আমার কাজ।'

হরদিৎ হরদিলকে ধন্যবাদ জানায়। বিদায় নিয়ে ওরা তিনজনেই বেরিয়ে আসে। গ্রামের পথ ধরে এগোয়। রাস্তায় হরদিৎ বকবক করে চলে। মামা-ভাগ্নে চুপচাপ শোনে। খবরের কাগজে প্রত্যেক মাসের পনেরো ও আটাশ তারিখে কর্মখালির বিজ্ঞপ্তি বেরোয়। মনের মতো কাজের বিজ্ঞপ্তি দেখে নসিব পোস্টালঅর্ডারসহ দরখাস্ত পাঠিয়ে যায়। ইন্টারভিউয়ের চিঠি বড় একটা আসে না। ওদিকে, পুষ্প পাঞ্জাবি ভাষায় এম এ পড়বার তোড়জোড় শুরু করে দেয়। রামপুরা অ্যাকাডেমিতে পড়লে গাঁ থেকেই যাতায়াত করা যাবে। অ্যাকাডেমির বেশ সুনাম আছে। ভাল ভাল ছাত্র—বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের সঙ্গে সমানে পাল্লা দেয়। অধ্যাপক সজ্জনই এই অ্যাকাডেমি গড়েছিলেন। সহযোগী ছিলেন একজন স্কুল শিক্ষক। পরে এই শিক্ষক বাড়িতে বসে পাঞ্জাবি এম এ ছাত্র পড়াতেন। অ্যাকাডেমিতে শুধু জ্ঞানী-পাঠক্রম পড়ানো হয়। অধ্যাপক সজ্জন যাদের ওই শিক্ষকের কাছে পাঠাতেন, তারা প্রত্যেকেই ভাল ফল করত। শিক্ষকটি খুব যত্ন নিয়ে, পরিশ্রম করে পড়াতেন। ভদ্রলোক নিজে এম এ—পাঞ্জাবি ভাষায় অসাধারণ ব্যুৎপত্তি। সব চেয়ে বড় কথা, পরীক্ষার আগে সম্ভাব্য প্রশ্নের উত্তর তিনি খুব দক্ষতার সঙ্গে করিয়ে দিতেন। এর মধ্যে একদিন নসিব ও পুষ্পর দেখা হয়। পুষ্প তার পরিকল্পনা আগাগোড়া বদলে ফেলে। ঠিক করে, রামপুরা নয়, সে পড়বে পাতিয়ালা বিশ্ববিদ্যালয়ে। রামপুরায় থাকলে সবার নজরের মধ্যে থাকতে হবে। পাতিয়ালায় সেই ভয় নেই। দেখাসাক্ষাতের সুযোগ সুবিধে পাওয়া যাবে। পুষ্প বাড়িতেও সেইমতো জানিয়ে দেয়। খরচপত্র বেশি হলেও, হরদিতের আবার ভাবনা কী? হরিন্দর পুষ্পকে পাতিয়ালায় নিয়ে গিয়ে ভর্তি করে আসে। নম্বর ভাল থাকায় ভর্তি হতে অসুবিধে হয়নি। এই সময়, নসিব ব্যাংকের প্রোবেসনারি অফিসার পদের জন্যে একটি ইন্টারভিউ চিঠি পায়। জলন্ধরে লিখিত পরীক্ষা হবে। নসিব পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়। ব্যাংকের হেড অফিস দিল্লিতে। চেয়ারম্যানও থাকেন দিল্লিতে। কাজেই হরদিলের সঙ্গে দেখা করতে হয়। গাঁয়ের আরও দশ-বারোজন পরীক্ষায় বসে। তাদের মধ্যে সাতজন, নসিবকে নিয়ে, এবার হরদিলের সঙ্গে দেখা করে। হরদিল সাফ বলে, 'চেয়ারম্যান লোক ভাল। টাকাকড়ি খায় না কিন্তু ওর আমলারা টাকাকড়ি না পেলে অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার পাঠাবে না। তা, হাজার দুয়েক করে লাগবে।' সাত জনের কাছ থেকে চোদ্দ হাজার টাকা নিয়ে হরদিল চলে যায় দিল্লি। ফিরে এসে বলে, 'যা তোদের সবার কাজ হয়ে যাবে।'

মাস দুয়েক পর তিন জনের অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার আসে। তিন জনের দু হাজার বাদ দিয়ে হরদিল অন্যদের টাকা ফেরত দেয়, বলে, 'কাজ দিতে পারেনি—টাকা দেব কেন শালাদের? নে তোদের টাকা। পরের বারে—'

নসিবের পোস্টিং হলো কলকাতায়।

জগিরার মুখে হরদিলের প্রশংসা তো আর ধরে না। গাঁয়ের মধ্যে, বাইরে, সর্বত্রই সে হরদিলের কথায় পঞ্চমুখ। প্রকৃত ঘটনাটি কিন্তু অন্য রকম। হরদিল দিল্লিতে চেয়ারম্যানের সঙ্গে দেখা করেনি। টাকাও দেয়নি কাউকে। তিনজনই কাজ পেয়েছে যোগ্যতার নিরিখে। ওই ছ হাজার টাকা মাঝখান থেকে হরদিল পকেটস্থ করেছে। যাক, পুষ্পর কাছ থেকে নসিব চলে গেল অনেক দূর। প্রত্যেক সপ্তাহে পরস্পরের মধ্যে পত্র-বিনিময় চলে। দীর্ঘ চিঠিতে খাম ভারি হয়ে যায়। তবুও, সব কথা বলা হয় না। পুষ্প চিঠি দেয় প্রতি সোমবার, নসিব জবাব দেয় বৃহস্পতিবার। পুষ্পর চিঠি বুধ-বৃহস্পতির মধ্যে কলকাতা পৌঁছে যায়। নসিবের উত্তর এসে যায় শনি থেকে সোমের মধ্যে। চিঠিপত্রের সংসারে দুই পত্রী! একটি চিঠিতে পুষ্প জানায়, এবার গ্রামে ফিরে দেখে দুটি ছেলে তাকে 'দেখতে' এসেছে। তাদের বেশ খাতিরযত্ন করা হয়। দয়ালি পুষ্পকে দিয়ে বসার ঘরে ওদের খাবার পাঠায়। প্রথমে পুষ্প বোঝেনি—পরে হরিন্দর জানায় ওরা পুষ্পকে 'দেখতে' এসেছিল। এই নিয়ে মার সঙ্গে তুমুল ঝগড়া হয়। পরিষ্কার জানিয়ে দেয়, এম এ পাশ না করে বিয়ে করবে না।... তবে, মা বাবা এখনও চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। পছন্দমাফিক ছেলে পেলেই বিয়ে দিয়ে ছাড়বে। মনে হয়, মার যেন অদ্ভুত এক জেদ চেপে গেছে। নইলে, বিয়ের জন্যে এমন উঠে পড়ে লাগা কেন? চিঠির শেষে পুষ্প নসিবকে একটা ফয়সালা করতে বলে। তার আপত্তি থাকা আর উচিত নয়। পাকা চাকরি, প্রতিষ্ঠিত ইত্যাদি। তবে, বাড়িতে এখন জানানো চলবে না। বাড়ির বাইরে বিয়েটা সেরে কারও বাড়ি বা গুরুদ্বারে একটা ঘরোয়া অনুষ্ঠান, ব্যাস। নসিবের জবাব আসে, সে রাজি। কেননা, যখন সম্বন্ধ আসতে শুরু করেছে, কখন কি হয় বলা যায় না। কাজেই, এরই মধ্যে সে পাতিয়ালায় এসে শুভ কাজটি চুকিয়ে ফেলবে। চিঠির শেষে, নসিব তার প্রোবেসন পিরিয়ড সম্বন্ধেও লেখে। চাকরিটা পাকা হতে আর ছ মাস। বদলির ব্যাপারও আছে। পাঞ্জাবে বদলি হয়ে বিয়েটা করলে কোনও খেদ থাকত না। পুষ্প প্রত্যুত্তরে লেখে, ছ মাস শেষ হতে আর কত দেরি? তিনমাস হলো সে এখান থেকে গেছে। পাঞ্জাবে বদলি হওয়ার প্রসঙ্গ উঠছে কেন? কলকাতায় থাকতে তার কোনও অসুবিধে নেই। তাছাড়া, কলকাতায় অন্তত কেউ খবরদারি করবে না। নসিব রাজি হলেই সে কলকাতার ট্রেনে চেপে বসবে।

একুশ

ভগৎ ছোকরাকে দয়ালির একদম পছন্দ হয়নি। মোটকা বেঁটে—পুষ্পির পাশে একেবারেই মানাবে না। উচ্চতাতেও পুষ্পি লম্বা, হাঁটলে মাটি কাঁপে। লম্বা চওড়া ছেলে না হলে মেয়ের সঙ্গে তো একেবারেই মানাবে না। সুদর্শন পাত্র পেতে তো অসুবিধের কিছু নেই। মেয়ে সুন্দরী, বাড়ি অবস্থাপন্ন, মেয়ের বিয়েতে খরচও হবে দেদার, তাহলে? ভগৎ ছোকরা এম এ করে ল করেছে। বেজায় শিক্ষিত, কিন্তু শিক্ষিত জামাই নিয়ে কী হবে? সারা

জীবন কেবল পড়াশোনা করে যাবে, বউকে দেখবে কখন? এমন ছেলে চাই, যার জায়গাজমি আছে, আবার দেখতে শুনতেও ভাল। হরদিৎ যে কেন ভগৎ ছোকরাকে পছন্দ করল! দয়ালি মনে মনে হেসে ফেলে। হরদিৎ উকিল জামাই চায়, যাতে সব লুটেপুটে নেওয়া যায়। তাছাড়া জায়গাজমি দেখারও একটা ব্যাপার আছে। না বাবা, দয়ালি ঠিক করে নেয়, ও-রকম জামাই দরকার নেই আমার, মেয়ের বর আমি নিজেই খুঁজে বের করব। আর একটি পাত্রের খবর নিয়ে আসে হরদিৎ। মহামাসকারি গ্রামের ছেলে। বয়স বাইশ-তেইশ, বি এসসি। এফ সি আই, অর্থাৎ ফুড কর্পোরেশনে ইনস্‌পেকটরের কাজ করছে ছ মাস ধরে। পাঁচ ভাই এক সঙ্গে থাকে। বিঘে দশেক জায়গাজমি এক একজনের। পাঁচ ভাইয়ের পঞ্চাশ বিঘে, ফলে গ্রামে বেশ প্রভাব-প্রতিপত্তি আছে। বাবা নেই— একান্নবর্তী পরিবার। ছেলেটি বেশ লম্বা চওড়া, সুপ্রতিম। দয়ালির নিশ্চয়ই পছন্দ হবে। তবে, ছেলের পছন্দ না হলে, একটু মুশকিল। আবার, হরদিতের একটু মন খুঁত খুঁত করে একটি বিষয়ে, ছেলেটি চাকরি করে, নিজস্ব জমি মোটে দশ বিঘে; করারই কথা, কেন না হরদিতের নিজস্ব জমির পরিমাণ পঞ্চাশ বিঘে। সরকারের আইন অনুসারে, অর্থাৎ একর-বিধির ফলে, এখন জমি বাড়াতেও ভয় করে। হাতে রেখেছে স্রেফ তিরিশ বিঘে চাষের জমি। টাকা ব্যাংকে জমা করে নানা স্কিমের কথা ভাবে। সে ছেলেটিকে বেছেছে একটি কারণে, ফুড কর্পোরেশনে চাকরি মানেই 'আমদানি'র রাস্তা খুল্লম খুল্লা! হরদিৎ খবর রাখে, রামপুরা স্টেশনের কাছে ফুড কর্পোরেশনের যে গুদাম, সেখান থেকে গম ওঠে মালগাড়িতে। প্রত্যেক খেপে অন্তত তিনশ বস্তা হাত-ফের হয়ে পাচার হয়ে যায় ইনস্‌পেকটর পুলিশ ঠিকেদার আর রেলকর্মীর পেটে! এমনকী, ফুড কর্পোরেশনের চাপরাশিও বেশ ধনী লোক! সে ব্যাটার বিরাট বাড়ি, বউয়ের গা-ভর্তি গয়না, ব্যাংকে নোটের দিস্তে! ওদের ক্লাস টেন অবধি পড়া ছেলের সঙ্গে বিয়ে দিতে গেলেও মোটরবাইক দিতে হয়! গমের বস্তা নিয়ে ট্রাক গুদামের পথে যেতে-যেতে হঠাৎ অন্য পথ ধরে। অথচ, সাধারণ মানুষ উদয়অস্ত পরিশ্রম করে, মাটিয়ে ঘাম ঝরিয়েও সংসার টানতে পারে না! হরদিৎ ভেবে নিয়েছে, ইনস্‌পেকটর-পাত্র তো নোটের বস্তার ওপরই বসে আছে, জমি নিয়ে তার কী হবে? পুষ্পর কাছে চিঠি চলে যায়, 'জরুরি ব্যাপার। শনিবার আয়। রোববার থেকে সোমবার চলে যেতে পারবি।' কিন্তু জরুরি ব্যাপারটি যে কী চিঠিতে তার বিন্দুমাত্র আভাস নেই। চিঠি পেয়ে শনিবার সন্ধ্যেতেই, পাতিয়ালা থেকে বাস ধরে, সালাবাতপুরা দিয়ে ভাইরূপা হয়ে, পুষ্প গ্রামে এসে পৌঁছয়। সঙ্গে কিছু বই আর ব্যাগ। ব্যাপারটা অবিশ্যি সে আন্দাজ করে নিয়েছিল। রাগে গা গসগস করে তার। এসেই, সৎশ্রী আকাল না জানিয়ে মাকে সোজাসুজি প্রশ্ন করে, 'এমন কী জরুরি ব্যাপার?'

মা মেয়েকে বুকে জড়িয়ে ধরে হেসে ওঠে, 'আরে বাবা, তুই তো দেখছি ঘোড়ায় জিন দিয়ে এসেছিস! জলটল খা, বিশ্রাম নে, তা তোর জিনিসপত্র কোথায়? দেখে মনে হচ্ছে, এখনই যেন চলে যাবি! পাগলি মেয়ে!' মার আর আদর ধরে না। চেয়ার টেনে মেয়েকে বসায়। জলের গ্লাস এনে দেয়। পুষ্প আধ গেলাস জল খায় বটে, কিন্তু মনে হয় জল যেন গলা থেকে নামতে চাইছে না।

সেপটেম্বর মাস। আশপাশে ম্যালেরিয়া দেখা দিয়েছে। একটু উদ্বিগ্ন হয়ে দয়ালি মেয়েকে জিজ্ঞেস করে, 'জ্বরটর আসছে না তো? তোর মুখটা এরকম হয়ে গেল কেন?'

'জ্বর? জ্বরের আর দোষ কী?' পুষ্প অল্প হেসে জবাব দেয়।

দয়ালি তাড়াতাড়ি মেয়ের কপালে, গায়ে হাত রাখে : 'না। গা-তো দেখি ঠাণ্ডা।'

'আমার জ্বর কোথায়, তুমি বুঝবে কী করে?'

'কেন? আর তোর এই বিদঘুটে জ্বর নামবে কী করে?' সরসভাবে দয়ালি প্রশ্ন করে। পুষ্প জবাব দেয় হেঁয়ালিতেঃ

'জ্বর নামলে ঠিক বুঝে যাবে!'

'যাক—এখন কী খাবি? চা না দুধ?'

'দুধই দাও।' কথাটা বলেই পুষ্প গম্ভীর হয়ে যায়। যেন বিরাট এক সমস্যার সমাধান খোঁজায় চিন্তামগ্ন। দুধ খেয়ে, আড়ামোড়া ভেঙে সে জিজ্ঞেস করে, 'এখন তোমাদের জরুরি ব্যাপারটা কী বলো তো?'

'কাল তোকে দেখতে আসছে।' দয়ালি জবাব দেয়। পুষ্প কথাটা শুনে মার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকে নিঃশব্দে। চোখের ওপর নসিবের চেহারাটা ভেসে ওঠে। মাকে কী তাহলে এখনই কথাটা বলে ফেলবে? একদিন না একদিন তো জানাজানি হবেই। কিন্তু এখন কথাটা জানালে, সব যদি ভেস্তে যায়? অথচ, সমস্যাটা কাটানো দরকার, যাতে ভবিষ্যতে আর কোনও বাধা না আসে। প্রতিক্রিয়া প্রকাশ না করে পুষ্প হালকা চালে বলে, 'তাই নাকী? তা, ওরা দেখে গেলেই আমাকে বাড়ি থেকে বের করে দেবে না কী তোমরা?' কারা আসছে, কোথা থেকে আসছে এসব সে জিজ্ঞেসও করে না।

দয়ালি নিজে থেকেই বলে যায়, মহামা গাঁয়ের ছেলে, বি এসসি পাশ। ফুড কর্পোরেশনে চাকরি করে। পাঁচ ভাই, এক-এক ভাইয়ের দশ বিঘে করে জমি, বিরাট পরিবার, দেখতে-শুনতে ভাল ইত্যাদি ইত্যাদি। হরিন্দর-ও এ-সময় এসে পড়ে বাইরে থেকে। পুষ্প জানে, বাড়িতে এই ভাই ছাড়া আর কেউ তার মন বোঝে না। মা-বাবা আগের জন্মে নিশ্চয়ই শত্রু ছিল! এত তাড়াতাড়ি বিয়ের ব্যবস্থা কেন? এইভাবে তাড়িয়ে দেবার চেষ্টা কেন? মনে মনে অসম্ভব একটা ঘৃণা অনুভব করে সে। মেয়ে হয়ে জন্মালেই মা-বাবাদের মনের ভাব এ-রকম হবে কেন? উঠোনের জঞ্জালের মতো তাকে ঝেঁটিয়ে বের করে দেয় কেন? পুষ্প বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। না, এইভাবে সে যাবে না, যাওয়ার আগে সে জানান দিয়ে যাবে, যার খবর পৌঁছবে বহু দূরে।

হরদিৎ রামপুরা থেকে ফিরে আসে। সঙ্গে ঝুলিভর্তি খাবারদাবার। মেয়েকে দেখে খুব খুশি। আদরটাদর করে কুশল জিজ্ঞেস করে। একটু নাটুকে ঢঙে প্রশ্ন করে, 'কোন্ বাসে এলি?'

'এলি? ও-তো ঘন্টা খানেক আগে এসেছে।' জবাবটা দেয় দয়ালি। পুষ্প চেয়ার থেকে উঠে পিঁড়িতে বসে। পা হাঁটু ধরে গিয়েছিল। পিঁড়িতে বসে সে পা ছড়ায়। হাঁটু টেপে, একবার চোখ খোলে, একবার বোজে।

পরের দিনই, মোটরবাইক চেপে মহামার ছেলেটি আসে। সঙ্গে এক বন্ধু। বসার ঘর আগে থেকেই সাজিয়ে-গুছিয়ে রাখা হয়েছিল। সব পরিপাটি। হরিন্দর নিজের হাতে এসব

করেছে। হরদিৎ আগে থেকেই পাত্রপক্ষকে যৌতুকের অঙ্ক জানিয়ে রেখেছিল, সেই সঙ্গে উপহার, যেমন, রাজদূত মোটরবাইক ফ্রিজ টিভি চোদ্দ তোলা সোনা ইত্যাদি। ছেলের পছন্দমতো বিয়ের দিন ঠিক হবে। বরযাত্রী—পঞ্চাশ আশি কোনও ব্যাপার নয়। মদের ব্যবস্থা থাকবে। ছেলেকে চাক্ষুষ দেখে হরদিৎ মহা খুশি। দয়ালিরও খুশি ধরে না। খুবই সুদর্শন যুবক! পুষ্পর হাত দিয়ে চায়ের ট্রে পাঠানো হলো। পুষ্পর পরনে নতুন কাপড়, পরিপাটি করে আঁচড়ানো চুল, চোখ দুটো কখনও উজ্জ্বল, কখনও প্রদীপশিখার মতো নিষ্প্রভ হয়ে ওঠে। সে পাত্রপক্ষের সামনের সোফায় বেশ সপ্রতিভভাবে বসে পড়ে। নিঃসংকোচে কথা বলে যায়। প্রথমে ভেবেছিল, এলোমেলো কথা বলে ওদের জব্দ করবে, তারপর ভাবে, না, ওটা ঠিক হবে না। সে মামুলি আটপৌরে কথাই বলে যায়। আর যাই হোক, ওকে তো আর কেউ জোর করে এখান থেকে উঠিয়ে নিয়ে যাচ্ছে না। একটু পরেই সে ঘর ছেড়ে বারান্দায় এসে বসে। জোরে ফ্যান ছেড়ে দেয়, যেন পাখার হাওয়া তাকে উড়িয়ে নিয়ে যেতে পারে! দয়ালি দোপাট্টায় হাত মুছতে-মুছতে ঘরে ঢোকে। ছেলে দুটি এতক্ষণ চুপচাপ বসে ছিল। দয়ালির জিজ্ঞেস করে, 'কী ভাই—কী ঠিক করলে?'

'মেয়ে পছন্দ হয়েছে আমাদের', ছেলেটির বন্ধু জবাব দেয়, 'আপনারা দিনক্ষণ ঠিক করুন। মেয়ের বাবার সঙ্গে পরামর্শ—'

'মেয়ের বাবা আমার কথাতেই সায় দেবে।' দয়ালি হয়তো আরও কিছু বলত, কিন্তু এমন সময় হরদিৎ স্বয়ং ঢোকে, দয়ালির কথা টেনে বলে, 'ঠিক। ঠিক। সবই বাহেগুরুর ইচ্ছে ভাই—'

'তাহলে আজ আমরা চলি। আপনি আমাদের খবর দেবেন।' কথাগুলি বলে দু জনেই উঠে দাঁড়ায়। কিছুক্ষণ পরেই মোটরবাইকের আওয়াজ পাওয়া যায়। এরই মধ্যে, এক ফাঁকে হরিন্দর চুপটি করে দিদির পাশে এসে বসে। আনমনা দিদিকে ছোট্ট করে একটা ঘুষি মারে সে : 'কী রে—কোন্ তেপান্তরে হারিয়ে গেলি?' পুষ্প কোনও জবাব দেয় না। শূন্যচোখে ছাদের দিকে তাকিয়ে থাকে। মন উধাও হয়ে যায় গ্রামের সীমানা পেরিয়ে অনেক দূরে। নসিবের চেহারাটা সহসা ত্রিশূলের মতো মনে হয়, ত্রিশূলটা যেন তার মাথা তাক করে প্রশ্ন করছে : 'এবার কী করবে?'

বাইশ

রাত অবধি পুষ্পকে ওরা এক নাগাড়ে বুঝিয়ে যায়। পুষ্প একই কথা ধরে রেখেছে : 'এখন আমি বিয়ে করব না। আগে এম এ পাশ করি। বিয়ে কী পালিয়ে যাচ্ছে? পাশ করার পর কী আমি বর পাব না?' অন্যদিকে, বাবা-মা সমানে বলে যায়, এত ভাল ছেলে! হাতছাড়া করলে আর পাওয়া যাবে না। বনেদি বাড়ি—এম এ করে পুষ্প কী চাকরি করতে যাবে না কী? তার চেয়ে এখানেই পড়াশোনার পালা চুকিয়ে দিক। ঘরসংসারে মন দিক। গাঁয়ে চলে আসুক—বিয়ের তোড়জোড় হোক। এইসব কথায় পুষ্পর মাথা ধরে যায়—ব্যথায় মাথা ফেটে যাওয়ার উপক্রম হয়। মনে হয়, উচ্চৈস্বরে বিলাপ করতে করতে বাড়ি থেকে ছুটে বেরিয়ে যায়! অবশেষে সে শেষঅস্ত্র প্রয়োগ করে, 'ওই ঘুষখোর চাকরি করা ছেলে আমি বিয়ে করব না! একদিন না একদিন ঠিক এ ব্যাটা ধরা পড়বে। চাকরি যাবে, জেল হবে। সে বাড়িতে ঘুষের টাকা, চুরির টাকা ঢোকে, সে বাড়িতে পা রাখতেও আমার ঘেন্না করে! শুধু চাকরি হলে না হয় একটা কথা ছিল!'

হরদিৎ মেয়ের রাগ দেখে হেসে ফেলে, 'শোনো মেয়ের কথা! বুদ্ধিসুদ্ধি একেবারে নেই। আরে আজকাল শুধু চাকরিতে চলে? উপরি রোজগার চাই। টাকা এলেই হলো, তা সে যেখান থেকেই আসুক, দেখা দিখি এমন কোন সরকারি চাকরি আছে, যেখানে ঘুষ চুরিজোচ্চুরি নেই?' হাসতে-হাসতেই হরদিৎ কথাগুলো বলে যায়।

পুষ্পর মুখে কিন্তু এক কথা, 'তোমরা যাই বলো, আমি এ-বিয়ে করব না।' অন্য কোনও আলোচনায় না গিয়ে, সে এবার সরাসরি বেঁকে বসে। জেদ ধরে—মা-বাবা ভাবে, পড়া বন্ধ হবে বলে মেয়ে বুঝি বিয়েতে রাজি হচ্ছে না। মেয়ের মন বদলাবার জন্যে তারা হালকা রসিকতাও করে, পাতিয়ালা থেকে বিছানাপত্তর গুটিয়ে আনার কথা বলে। শেষমেষ দয়ালি জানিয়ে দেয়, পুষ্প যেন সত্যি-সত্যিই পাতিয়ালা থেকে বিছানাপত্তর নিয়ে আসে। বিষণ্ণ ম্লান চেহারা পুষ্প পরের দিনই পাতিয়ালাগামী প্রথম বাস ধরে। টাকাকড়িও চায় না। তার নিজের কাছে বেশ কিছু জমানো টাকা আছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যামপাসে যে ব্যাংক, সেই ব্যাংকেই সে টাকা জমা রাখে। বেশ কিছু দিন ধরেই রেখে আসছে, খুব দরকার না পড়লে তোলে না। পাতিয়ালায় পৌঁছে, সব কথা জানিয়ে সে নসিবকে চিঠি লেখে। কথা পাকা হয়ে গেছে, পাত্রপক্ষের পছন্দ হয়েছে, পড়াশোনা ইতি—কিছুই বাদ দেয় না। এবং জানায়, নসিব যেন পত্রপাঠ কলকাতা থেকে চলে আসে। বাকি কাজ কলকাতায় হবে।

চিঠি পেয়ে তো নসিবের মাথায় হাত। সে কদিন ধরেই চিঠির অপেক্ষা করছিল। কী চমৎকার চিঠি লেখে পুষ্প! চিঠি পাওয়ার রোমাঞ্চ চিঠির চেয়েও বেশি। অদ্ভুত একটা অনুভূতি দেহমনে ছড়িয়ে পড়ে। চিঠির কাগজও যেন কথা বলে। সেই সময় কথা বললে তার গলার স্বরও কেমন যেন বদলে যায়। চিঠি যেন নেশা! আশ্চর্য সেই মাদকতা বোঝানো যায় না। কিন্তু, এই চিঠিটা যেন মাথায় হাতুড়ির ঘা মারে! মাথা ঘুরতে থাকে। পাতিয়ালা যাওয়ার জন্যে সে অস্থির, উতলা হয়ে ওঠে। মনে হয়, সে যদি পাখি হতো তাহলে এখনই পাতিয়ালায় উড়ে গিয়ে ডানার নিচে পুষ্পকে লুকিয়ে আবার উড়ে আসত কলকাতায়! এখনও তার প্রোবেসন পিরিয়ড শেষ হয়নি। চাকরি পাকা হয়নি। ছুটি

পাওয়া মুশকিল। তবু বলে-কয়ে চারদিনের ছুটি নেয় সে। চার দিনে লোকে কত কিছু করে। অবশ্য, এর মধ্যে একটা রবিবার আর, একটা ব্যাংকের ছুটির দিনও পাওয়া গেছে। সন্ধ্যের ট্রেন ধরে, একদিন পরই নসিব পাতিয়ালা পৌঁছে যায়। সোজা চলে যায় বিশ্ববিদ্যালয়ের হোস্টেলে। পুষ্পর কামরায় তালা! একটি মেয়ে জানায়, পুষ্পর ভাই এসে তাকে নিয়ে গেছে। কবে ফিরবে বলে যায়নি। দু-চারদিন তো নিশ্চয়ই লাগবে ফিরতে ফিরতে। নসিবের মাথায় যেন বাজ পড়ে। মেয়েটি নসিবকে চুপ করে দেখতে থাকে, পরিচয় জানতে চায় না। নসিব বেরিয়ে এসে, ক্যামপাসের বাইরে একটা চায়ের দোকানে এসে বসে। এখানে থেকেই বাস ধরবে সে। কিন্তু, একটা বাসও থামে না। অতি দুঃখেও একটি কথা ভেবে তার হাসি পায়, 'নসিবের নসীব-এ পুষ্প নেই!' সময় কারও জন্যে দাঁড়িয়ে থাকে না। তার জীবনের বাসও একদিন এইভাবে না থেমে সোজা বেরিয়ে যাবে। অপেক্ষা করেও কোনও লাভ হবে না। মন-মরা হয়ে সে আবার নিজেকে প্রবোধ দেয়: না, এমন অঘটন ঘটবে না। পুষ্প সঙ্গে থাকলে সব মুশকিল আসান হবে। জীবন নিশ্চয়ই তাকে প্রবঞ্চিত করবে না। জীবনের পথ নিশ্চয়ই সুগম হবে। এক দৃঢ় বিশ্বাসে নসিব পুনরায় উদ্দীপ্ত হয়। একটি বাস থামতে উঠে পড়ে। ঘড়ি দেখে, বারনালা থেকে হয়তো সরাসরি একটা বাস পাওয়া যাবে। ধুর গাঁয়ে পৌঁছলে তো আর কথাই নেই। বাকি পথটা হেঁটে মেরে দেবে। পাতিয়ালার গুমটিতে এসে সঙ্গরুর একটা বাস পায় সে। সঙ্গরুরে বারনালার বাস সঙ্গেসঙ্গে পাওয়া যায়। সালাবাতপুরা পৌঁছলে একটা কিছু ব্যবস্থা ঠিক হয়ে যাবে।. . . সালাবাতপুরায় এসে নসিব ট্রাক কিংবা ট্র্যাকটর-ট্রলির অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে থাকে। কোনও বাস নেই। শেষ বাস অনেকক্ষণ চলে গেছে। তবুও, সে আশা ছাড়ে না। ভাইরূপা অবধি কিছু-না-কিছু কী পাওয়া যাবে না? না হলে, হাঁটা ছাড়া উপায় নেই। ভাইরূপা থেকে কোটে—মাঝর.ত হয়ে যাবে। ওই-তো কোটে খড়ক সিং—এমন কী আর দূর? বলতে গেলে দেখাই যায় এখান থেকে। নসিব অস্থির হয়ে ওঠে। কে জানে, পুষ্প কী অবস্থায় আছে এখন। কত দিন তার মুখ দেখেনি। এই মুহূর্তে পুষ্প একা নিঃসহায়। বেচারা! পুষ্পকে কেউ আটকে রাখতে পারবে না। পুষ্পর ভগবান কোথাও বন্ধকী নেই। এই সমাজে পুষ্পর ভূমিকা খুবই জরুরি। হরদিতের জায়গাজমি টাকাকড়ি পুষ্পর এক ফুৎকারে উড়ে গেছে! জাতপাতের বিচার? সে-তো মান্ধাতার আমলের কথা। এখন এসব নিয়ে কে মাথা ঘামায়? সময় এখন বদলে গেছে। মানুষ এখন যুক্তি-বিচারে বিশ্বাসী। না, শেষ অবধি হাঁটতেই হবে দেখা যাচ্ছে। নসিব দোকানে ঢুকে চা খায়, ঘড়ি দেখে। একটু জোরে হাঁটলে ঘন্টা তিনেকের পথ। একটা ট্র্যাকটর-ট্রলি এসে থামে। জনা দশ বারো নারী ও চার পাঁচজন পুরুষ। ট্রলি থেকে নেবে সব টিউবওয়েল থেকে জল খায়। নসিব এক বুড়োকে জিজ্ঞেস করে : 'কোথায় যাবেন আপনারা?'

বুড়ো জবাবে বলে, 'এসেছি সেলবাড়া থেকে, এখান থেকে যাব মকান—'

'মকানের কোথায়?' নসিব কথা বাড়ায়।

'অলকড়। ছেলে মারা গেছে, জোয়ান ছেলে—সবই কপাল।' বুড়ো ফেরত যেতে যেতে পাল্টা প্রশ্ন করে, 'তুই কোথায় যাবি?'

'কোটে। বাস পাচ্ছি না।'

'আমরা তো কোটে হয়েই যাব। আমাদের সঙ্গে চল্ না!'

নসিব হাতে চাঁদ পায়। কোটে পৌঁছতে বেশ অন্ধকার হয়ে যায়। মামার দরজায় কড়া নাড়ে সে। জগিরা সিতি খেয়েদেয়ে শুয়ে পড়েছে। নসিব আসতে আবার আলো জ্বালে। সওয়াল জবাব চলে কিছু সময়। নিশুতি রাতের স্তব্ধতা ভাঙে। সিতি উনুন ধরিয়ে রুটি বানাতে বসে। ডাল গরম করে। মামা-মামি কাছে বসে। ছোট ছোট কথা, ছোট ছোট জবাব। নসিব খেতে-খেতে আলগোছে জবাব দেয় কিংবা হ্যাঁ হুঁ করে। ঢকঢক করে এক নিঃশ্বাসে জল খায়। মামা-মামির আনন্দ ধরে না— কত দূর থেকে ছেলেটা দেখা করতে এসেছে! বিএ পাশ, ব্যাংকে ভাল চাকরি—মামা-মামি এমনিতেই গর্বিত। নিঃসন্তান এই দম্পতির কাছে নসিব আপন সন্তানের মতো। স্বপ্ন দেখে, ধূমধাম করে ওরা একদিন নসিবের বিয়ে দেবে— বাড়িতে পুত্রবধূ আসবে। খেতে-খেতে নসিব কথা বললেও, ওর মন পড়ে আছে পুষ্পর ভাবনায়। ভাবে, এই বুঝি পুষ্প সম্বন্ধে কিছু শুনতে পাবে। কিন্তু কী আশ্চর্য — মামা-মামি কেউই পুষ্প সম্বন্ধে ছিটেফোঁটা কিছু বলছে না। একটা কিছু বললে বাকিটা আঁচ করা যেতে পারত।

নসিবের চোখে ঘুম নেই। ঘন্টা দুই আড়াই ঝিম মেরে থাকার পর চোখ আপনা থেকেই খুলে যায়। ভোর তিনটে—সূর্য উঠতে এখনও অনেক দেরি। পাশ ফিরে শোয় সে। কিন্তু, চোখের পাতা এক হয় না। চোখ বুজিয়ে সে পড়ে থাকে। মাথায় নানা পরিকল্পনা ভিড় করে আসে। পুষ্পর সঙ্গে দেখা করা যায় কীভাবে? দেখা আদৌ হবে কী? দেখা হওয়ার পর কী করবে? দিনের বেলা, লোকের চোখে ধুলো দিয়ে পালানো মুশকিল। সাড়ে চারটে নাগাদ সে বিছানা ছেড়ে উঠে পড়ে। হাতমুখ ধুয়ে কাপড়চোপড় পরে নেয়। পাগড়িটা বেঁধে, হাতে লোটা নিয়ে বেরিয়ে পড়ে। ফেরার পথে হরদিতের বাড়িতে সামনে দিয়ে ফেরে। ছোট-ছোট পা ফেলে। শীত গ্রীষ্ম পুষ্প বাইরের ঘরে শোয়, নসিব এটা জানে। গরমের দিন ফ্যান ছেড়ে দেয় পুরো মাত্রায়। ওদের বাড়ির সামনে এসে নসিব দাঁড়িয়ে পড়ে। সাত-পাঁচ ভাবতে থাকে। হঠাৎ তার হাতে ধরা লোটাটা আচমকা পড়ে যায় রাস্তার ওপর। ঠন্ করে একটা জোরালো অওয়াজ পেতেই পুষ্পর ঘুম ভেঙে যায়। সে সদর দরজা খুলতেই অবাক, এ কী! নসিব! প্রথমটা তার বিশ্বাস হয় না। বাইরের ঘরে পুষ্প একাই শোয়। পাঁচটা বেজেছে। ভোরের আলো আস্তে আস্তে ছড়িয়ে পড়ছে। না, চোখের ভুল বা স্বপ্ন নয়— সত্যিই নসিব। নসিবের হাত ধরে তাকে সে বাইরের ঘরে এনে বসায়। আলো জ্বালায় না। মা-বাবা বারান্দায় ঘুমোচ্ছে। হরিন্দর ছাদে ঘুমোয়। নসিব চটপট বলে যায়, চিঠি পেয়েই সে কলকাতা থেকে রওনা দিয়ে, পাতিয়ালা বিশ্ববিদ্যালয়ের হোস্টেলে পুষ্পর খোঁজ নিয়ে, গত রাতে গ্রামে এসেছে। পুষ্প বলে, 'মহামার ছেলেটার সঙ্গে বিয়ে পাকা। দু-চারদিনের মধ্যেই বিয়েটা হয়ে যাবে— আজই দিনক্ষণ ঠিক হবে। হরিন্দর পাতিয়ালা গিয়ে আমার জিনিসপত্র নিয়ে আসবে—'

'তাহলে?' নসিব কিংকর্তব্যবিমূঢ়।

'আজই আমাকে কলকাতায় নিয়ে যাও।'

'কেমন করে?'

'তুমি রাতে এসেছো কেউ দেখেনি, কেউ জানে না। প্রথম বাস ধরে আজই তুমি রামপুরা চলে যাও। মামা-মামিও যেন টের না পায়। ওখানে গিয়ে তুমি স্যারের বাড়িতে অপেক্ষা কোরো। আমি কোনও-না-কোনও ছুতোয় রামপুরা পৌঁছে যাব। তারপর—'

'কিন্তু তোমার বাড়ির লোক যদি রামপুরা যেতে না দেয়।

'ঠিক ম্যানেজ করে নেব। দশটার সময় পৌঁছে যাব। তুমি চুপচাপ বেরিয়ে যাও কাকপক্ষিও যেন টের না পায়।'

তেইশ

মহামাসকারির পাত্র গুর্জট সিংহের সঙ্গে হরদিৎ দিনক্ষণ ঠিক করে ফেলে। পুষ্পর জিনিসপত্র হোস্টেল থেকে আনার জন্যে হরিন্দরকে পাঠানো হয় পাতিয়ালায়। হরদিৎ পুষ্পকেও মহামা নিয়ে গিয়েছিল বিয়ের দিন পাকা করার জন্যে। ভাল পাত্র— চাহিদা অনুসারেই যৌতুক পাবে। আর, মেয়েকে এম এ করিয়ে কী কচুটা হবে? এমন সোনার চাঁদ ছেলে পাওয়া গেছে যখন! এই রকম জামাই পাওয়ার জন্যেই তো মেয়েকে লেখাপড়া শেখানো। মেয়েকে তো আর রোজগার করে মা-বাপকে খাওয়াতে হবে না। তাছাড়া, একালে চাকরি করা মেয়েও এক ধরনের যৌতুক। বিয়ের যোগ্যতা। শিক্ষিত করার জন্যে কোন্ মা-বাপ মেয়েকে লেখাপড়া শেখায়? ঘেঁচু! পাত্রপক্ষ জানে মেয়েদের ডিগ্রিফিগ্রি থাকলে চাকরির একটা হিল্লে হয়। দুজনের রোজগারে সংসার চলে। আর, মেয়েকে যাতে চাকরি করতে যেতে না হয়, হরদিৎ এমন পাত্রই খুঁজছিল। পেয়েও গেছে—জামাই দুহাতে রোজগার করে, উপরি আয় আছে, আর কী চাই? মেয়েকে চাকরি করতে যেতে হবে না, হুঁ! কথাবার্তা পাকা করেই ওরা ফিরে আসে গাঁয়ে।

বিয়ে বাড়ির কাজকর্মের তোড়জোড় শুরু হয়ে যায়। পুষ্পর বিয়ে ছাড়া আর কোনও ভাবনা নেই কারও। বিয়ে দিয়ে ওকে বাড়ি থেকে যেন তাড়িয়ে দেওয়ার একটা চক্রান্ত চলছে। দয়ালি খোশ মেজাজে চক্কর কাটে, তদারকি করে। জিনিসপত্রের ফর্দ বানায়। মেয়েকে বলে, 'যা খুশি তুই সঙ্গে নিয়ে যা! বাপের সঙ্গে দিনক্ষণও ঠিক করে এসেছিস— আমার ইচ্ছে ছিল মাঘ-ফাগুনের একটা দিন— ওই সময় কাজকর্ম বিশেষ থাকে না— যাক, তোর ইচ্ছেমতোই দিন ঠিক হয়েছে— ভালই হয়েছে।'

পুষ্প হঠাৎ বলে ফেলে, 'তোমাদের ওই ছেলেকে আমার বিয়ে করার একদম ইচ্ছে নেই!'

'ও মা, এ কী কথা! একে করবি না তো কাকে করবি?' মেয়ের কথা শুনে দয়ালি হকচকিয়ে যায়।

'এই ছেলে আমার পছন্দ নয়।'

'কেন? এত ভাল ছেলে। টাকাকড়ি জায়গাজমি আছে, চাকরি করে। আমাদের দুজনেরই পছন্দ।'

'তেমাদের পছন্দ হলেই আমার পছন্দ হবে, এটা ভাবলে কেমন করে?' একটু ঝাঁজিয়েই জবাব দেয় পুষ্প।

'তাহলে তোর কাকে পছন্দ?'

মা মেয়ে ছাড়া আশপাশে কেউ নেই। আসল কথাটা বলতে গিয়ে পুষ্প ঘেমে ওঠে। নাকে ঘাসের বিন্দু জমা হয়। শরীরটা কেমন যেন অবশ হয়ে আসে। তবুও সে সাহসী হয়ে ওঠে। মনের আড়ালে আর একটি মন যেন বলে ওঠে, এই তো সুযোগ। এরপর এ কথা বলার আর সুযোগ পাওয়া যাবে না। কথাটা এখনই বলা দরকার। ছুরির ফলার মতোই কথাটা বেরিয়ে যায়, 'আমি নসিবকে বিয়ে করব।'

'নসিব? কোন্ নসিব?' দয়ালির পায়ের নিচে মাটি কেঁপে ওঠে।

'জগিরার বোনপো। এখন কলকাতায় আছে; ব্যাংকে চাকরি করে।'

দয়ালি থ মেরে যায়। কেউ যেন মাথায় হাতুড়ির ঘা মেরেছে। মাথায় হাত দিয়ে মালুম করার চেষ্টা করে, মাথাটা ঠিক আছে তো! সব কেমন যেন এলোমেলো, তালগোল পাকানো লাগে। সব কিছু যেন ঘুরছে, আকাশটা যেন খান-খান হয়ে ভেঙে পড়ছে জমির ওপর। দয়ালি নিশ্চুপ নির্বাক হয়ে বসে থাকে। পুষ্পও আর কিছু বলে না। কিছু বলার নেই, যা বলার ছিল — বলা হয়ে গেছে। ফাঁকা চোখে সে তাকিয়ে থাকে। দয়ালির চোখ দিয়ে টপটপ করে জল পড়ে। ঠোঁট দুটো কেঁপে ওঠে। নিজেকে সামলে নিয়ে সে উঠে দাঁড়ায়। উঠোনের দিকে হেঁটে যায় আস্তে আস্তে। মুখ থেকে আপনা থেকেই বেরিয়ে আসে দুটি শব্দ: 'হায়, হায়!'

খেতে জলসেচের কাজ চলে জোর কদমে। হরদিৎ সকাল থেকেই খেতে। সঙ্গে খেত মজুরটিও আছে। হরিন্দর পড়তে গেছে। এখনও ফেরেনি। দুপুর পার হয়ে গেছে। দয়ালি রোজকারের মতো চা বানায়। একটি পাত্রের মধ্যে পাঁচ সাত গ্লাস চা ঢেলে মুখটা এঁটে দেয়। তারপর, জুতো গলিয়ে লম্বা-লম্বা পা ফেলে হেঁটে যায় খেতের দিকে। অন্যদিন খেত থেকে লোক আসে চা নিয়ে যাওয়ার জন্যে। আজ আর দয়ালি তার জন্যে অপেক্ষা করে না।

পুষ্প বারান্দায় বসে ছিল। দয়ালি অন্যদিনের মতো আজ তাকে চা দেবে কি না, জিজ্ঞেস করে না। পুষ্পরও অবশ্য চা খেতে ইচ্ছে নেই।

খেতে গিয়ে দয়ালি সবাইকে চা দেয়। হরদিৎকে একটু আড়ালে ডেকে নিয়ে যায়। চোখ মোছে, কিন্তু মুখ দিয়ে কোনও কথা বেরোয় না। হরদিৎ বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করে : 'কান্নাকাটি কেন? কী হয়েছে?'

'বিয়ের তারিখ পিছিয়ে দাও।'

'কেন?'

'গোলমাল হতে পারে।'

'সে কী কথা! ছেলে রাজি হয়ে গেছে। কোন্ শালা গোলমাল করবে?'

'তোমার মেয়ে!'

'মেয়ে!' হরদিৎ যেন বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়।

'জগিরার বোনপো নসিবকে বিয়ে করতে চায় সে।'

'জগিরার বোনপো? শালা নাপতের বাচ্চা!'

হরদিৎ কথাগুলো যেন বিশ্বাস করতে পারে না। শরীরটা যেন হঠাৎ বড় দুর্বল হয়ে গেছে মনে হয়। কেউ যেন ধাক্কা মেরে তাকে মুখ থুবড়ে ফেলে দিয়েছে। খানিক পরেই সে আত্মস্থ হয়। নিজের মনেই গজরাতে থাকে: 'শালা— ছোটলোকের জাত! এত বড় আস্পদ্দা!' দয়ালিকে বলে, 'নাপতের আর দোষ কী? এমন মেয়েকে কেটে ফেলতে হয়! গায়ে জাঠ-রক্ত থাকলে—'

'মেয়েকে কেটে কী হবে? দোষ আমার। আমাকে কাটো।'

'এখন কী করা যায়?'

দয়ালি একটু ভেবে জবাব দেয়, 'আমি বলি কি চট করে বিয়েটা দিয়ে দাও। নসিব এখন কলকাতায় আছে। কালই তুমি মহামা গিয়ে বিয়ের তারিখটা এগিয়ে আনো। পুষ্পকে কিছু বলতে হবে না— নইলে বাড়ির ইজ্জত রসাতলে যাবে।'

হরদিৎ গম্ভীর হয়ে কি যেন ভাবে। খেতের কাজ সেরে বারোমেসে আর অন্য মজুরটি চলে যায়। হরদিৎ ও দয়ালি বাড়ির পথ ধরে। সারা রাস্তা ভাবতে ভাবতে চলে। নিজেদের মধ্যে নিচু সুরে কথা বলতে থাকে, আশপাশে কাউকে দেখলেই চুপ মেরে যায়। বাড়ি ঢুকে দয়ালি চলে যায় বারান্দার দিকে। হরদিৎ বসার ঘরে। পুষ্প খাটের ওপর শুয়ে ছিল। বাবাকে দেখে সে ঝট করে উঠে দাঁড়ায়। হরদিতের চোখ বাঘের মতো জ্বলে। ক্রোধের ছাপ বেশ স্পষ্ট। পা দিয়ে সামনের চেয়ারটা এমন সজোরে সরিয়ে দেয়, যেন ভেঙে খান-খান করে ফেলবে। বাবার মূর্তি দেখে পুষ্প চুপ হয়ে বসে থাকে। খাটের বাজু ধরে কি ভেবে হরদিৎ যেমন হঠাৎ ঢুকেছিল, তেমনই হঠাৎ-ই কামরা থেকে বেরিয়ে আসে। দয়ালির কাছে এক গ্লাস জল চায়।

কাকভোরে নসিব দেখা করেছিল পুষ্পর সঙ্গে। তার পরামর্শমতো রামপুরা চলে গিয়েছিল প্রথম বাস ধরে। নসিব যাওয়ার পর পুষ্প বাড়ি থেকে বেরোবার জন্যে নানা অজুহাত দেখায়। কিন্তু, হরদিৎ বা দয়ালি, এক মুহূর্তের জন্যেও তাকে চোখের আড়াল করতে চায় না। নানা কথার জালে তাকে আটকে দেয়। পুষ্প নিরুপায় হয়ে ভাবে, ছাদে একটা হেলিকপ্টার থাকলে বেশ হতো। সোজা উড়ে যেত রামপুরায়।

'রামপুরায় গিয়ে কী করবি?' বাবা ভালোমানুষের মতো প্রশ্ন করে।

'কাজ আছে। তোমাকে বলা যাবে না। আমি তো আর পালিয়ে যাচ্ছি না।'

'দ্যুৎ পাগলি! তুই পালিয়ে যাবি, একথা কে বলেছে? তা দরকারি কাজ আছে যখন, তখন একটু ঘুরে আয়।' খুব স্নেহের সুরে কথাগুলো বলে হরদিৎ বন্দুকটা তোলে। দয়ালির দিকে আড়চোখে তাকায়, অর্থাৎ নজর রাখো— আর বিশ্বাস নেই। নজরের

আড়ালে যেতে দেবে না। তারপর, দয়ালিকে শুনিয়ে-শুনিয়ে বলে, 'এখন একটু মহামা যেতে হচ্ছে আমাকে।'

বাড়ির বাইরে এসে ভাইরূপার রাস্তায় জগিরার সঙ্গে দেখা হয় হরদিতের। জগিরা যথারীতি সৎশ্রী আকাল জানিয়ে কুশল বিনিময় করে। হরদিৎ জিজ্ঞেস করে, 'তোমার সেই বোনপো— ওকে-তো আজকাল দেখতে পাই না?'

'সে এখন কলকাতায়। ব্যাংকে চাকরি করে। তোমারই দয়া— সেই যে দু হাজার দিতে হলো— তা এখন ভুলেই গেছি। নসিবই এখন মাসে হাজার টাকা পায়। তা ভাই, ছেলেটাকে এখানে বদলির একটা ব্যবস্থা করে দাও না!'

'এ আর এমন কী কথা! হরদিলের কাছে গিয়ে একবার বললেই হলো। চলো, একদিন যাই ওর কাছে। তা, নসিব আসবে কবে?'

'কাল রাতে তো এসেছিল। ভোরে আবার চলে গেছে।'

'রাতে এসে ভোরে চলে গেছে? কোথায়? সাধেড়ে?

'না, না— কলকাতায়।'

'তা গাড়ি ধরবে কোথা থেকে?'

'তাতো বলে যায়নি। সকালে উঠেই বলে, চলি — বোধহয় রামপুরা থেকে কিংবা বারনালা থেকে—'

হরদিতের মনের মধ্যে ঝড় বয়। গোঁফে তা দিতে দিতে নিজেকে সামলে নেয়, তারপর বলে, 'বেশ—ওই কথাই রইল জগিরা—' তারপর লম্বা-লম্বা পা ফেলে এগিয়ে যায় ভাইরূপার বাস-গুমটির দিকে।

চব্বিশ

অধ্যাপক সজ্জন বাড়িতেই ছিলেন। স্নান সেরে, কাপড়চোপড় পরে ছাত্রদের জ্ঞানী ক্লাস নিচ্ছিলেন। একটু পরেই পড়ানো শেষ করে, কলেজে যাবেন। নসিব ড্রইংরুমে এসে বসে। সজ্জনের স্ত্রী, স্কুলে যাওয়ার আগে, নসিবকে এক গ্লাস চা দিয়ে যান। ছাত্র পড়ানো শেষ করে সজ্জন ড্রইংরুমে ঢুকলেন। নসিবকে দেখে খুবই খুশি হলেন, 'আরে বসো, বসো। এতদিন কোথায় ছিলে?'

'আজ্ঞে, আমি এখন কলকাতায় থাকি। ব্যাংকে কাজ করি। আপনার আশীর্বাদে ভালই আছি— কিন্তু, একটু মুশকিলে পড়ে আপনার শরণাপন্ন হয়েছি।'

'কী মুশকিল?' সজ্জন পুরনো কথা মনে করতে পারলেন না।

'ওই যে মেয়েটি, আমার সঙ্গে পড়ত। কোটের মেয়ে—'

'ও হ্যাঁ— মনে পড়েছে। তা এখন পরিস্থিতি কেমন?'

'পুষ্প এখন পাতিয়ালাতে এম এ পড়ছে পাঞ্জাবি সাহিত্যে, কিন্তু বাড়ি থেকে ধরে বেঁধে বিয়ে দিচ্ছে—'

'মেয়ে কী বলে?'

'এ বিয়ে করবে না। আজ এখানে আসবে। বাড়ি থেকে পালানো ছাড়া আর কোনও পথ নেই।'

'পালানো কেন? তার চেয়ে আমরা কোর্টের কোনও ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে যাই চলো। ফুল বারনালা কিংবা ভাটিন্ডাতে একটা উকিল, আর দুটো সাক্ষী, একজন তো আমি আছি—ব্যাস, কোর্ট ম্যারেজ।'

নসিব রাজি। চোখে স্বপ্ন ভেসে ওঠে। পরিকল্পনা করে। বিয়ের পরই কলকাতা চলে যাবে পুষ্পকে নিয়ে। একটা বাড়ি ভাড়া করে থাকবে। বছর দুয়েক পর, পাঞ্জাবে বদলি নিয়ে চলে আসবে। রামপুরা-বারনালার মাঝামাঝি কোথাও বাড়ি বানাবে। সুখি সংসার তৈরি হবে।

রান্নাঘরে গিয়ে অধ্যাপক নিজেই দু প্লেট খাবার সাজালেন। বারান্দার বড় টেবিলে প্লেট রাখলেন। দুজনের মধ্যে টুকরো কথা চলতে লাগল। গুরুত্বপূর্ণ কথাই। তোয়ালেতে হাত মুছে, সজ্জন পকেট থেকে রুমাল বের করে, চশমার মোটা কাঁচ ঘষতে থাকেন। নসিবকে বললেন, 'আজ আর কলেজে যাব না। তুমি পুষ্পর জন্যে অপেক্ষা করো— আমি চট করে একবার বাজারটা ঘুরে আসি। ঘন্টা খানেকের মধ্যেই আসব, তারপর তোমাদের নিয়ে বেরিয়ে পড়ব। কোথায় যাবে বলো তো?'

'সেটা আপনিই ঠিক করুন, স্যার।' নসিব হাত জোড় করে বলে, 'আপনিই আমার মা, আমার বাবা—' বলতে বলতে সে অধ্যাপককে প্রণাম করে।

'আমরা তাহলে ভাটিণ্ডা যাব— ফুল বারনালা বড় কাছাকাছি হয়ে পড়ে।'

'পুষ্প দশটা নাগাদ আসবে বলেছে। আপনি ওই সময় এলেই হবে।'

ঠিক দশটার সময় সজ্জন ফিরে আসেন। পুষ্প এখনও আসেনি। নসিবের সারা শরীরটা যেন কানে পরিণত হয়েছে। সামান্য একটু শব্দ পেলেই সে দরজার দিকে এগিয়ে যায়। এমনকী সজ্জনের পায়ের আওয়াজেও সে চমকে ওঠে। সজ্জন এসে জিজ্ঞেস করেন, 'পুষ্প আসেনি?'

নসিব জবাবে নির্বাক হয়ে ঘড়ি দেখে। সজ্জন বলেন, 'আসতে দেরি হবে বোধ হয়। অপেক্ষা করা যাক।' বলে তিনি সেদিনের দু তিনটে খবরের কাগজ নসিবকে দেন। দুটি পাঞ্জাবি দৈনিক, একটি ইংরিজি। 'তুমি ততক্ষণ এগুলো দেখো' — বলে সজ্জন একটা মোটা প্রবন্ধের বই নিয়ে পড়ার ঘরে ঢোকেন। ইংরিজি কাগজের মোটা হরফের হেডিংগুলি নসিব দেখে। সব কেমন যেন দুর্বোধ্য মনে হয়। গোটা খবর পড়েও কিছুই যেন মাথায় ঢোকে না। ইংরিজি সরিয়ে সে পাঞ্জাবি দৈনিকে চোখ রাখে। এক হরফও বোধগম্য হয় না। সাময়িকী অংশটা পড়ার চেষ্টা করে। গল্প পড়তে ইচ্ছে করে না। একটা কবিতা পড়ে। দুর্বোধ্য। ইংরিজি কাগজের সাময়িকী দেখে একবার—না, সবই কেমন যেন এলোমেলো তালগোল পাকানো মনে হয়। সব বাজে লাগে। মনের অস্থির ভাবটা কিছুতেই যায় না। কলজেটা যেন উপড়ে যাবে মনে হয়। মিনিট কুড়ি এইভাবে কাটে। সজ্জন আবার এসে খোঁজ নেন। নসিব বলে, 'স্যার—আমি একটু লাইব্রেরি থেকে ঘুরে আসি। পুষ্প এলে—'

সজ্জন বোঝেন ব্যাপারটা। বলেন, 'বেশ তো। আমি বাড়িতেই আছি। হাতে অন্য কোনও কাজ রাখিনি। পুষ্প এলেই আমরা বেরিয়ে যাব — তুমি লাইব্রেরি থেকে ঘুরে এসো ততক্ষণে।'

নসিব প্রথমে লাইব্রেরি যায়। লাইব্রেরিতে ঢোকার মুখে যে বড় টেবিলটায় পত্র-পত্রিকা ডাঁই করা আছে, সেগুলো একবার টেনেটুনে দেখে, তারপর লাইব্রেরির সিঁড়ি ধরে এগোতে থাকে। লাইব্রেরির এক ধাপ সিঁড়ি শেষ হয়েছে ফুলের জলসেচের কাছে সাঁকোটার ওপর। নসিব সাঁকো পার হয়ে চলে আসে ফুলের বাস গুমটিতে। বাস দেখতে থাকে, যাত্রীদের দেখে, যদি পুষ্প থাকে এদের ভিড়ে। বেশ কয়েকটা বাস চলে যায়। পুষ্প আসে না। বিমর্ষ হতাশ নসিব এবার বাজারের পথ ধরে। হঠাৎ সে সাধেড়ের সাধু টেকদাসকে দেখতে পায়। স্কুটার ধরে দাঁড়িয়ে আছেন। বোধহয় অপেক্ষা করছেন কারও জন্যে। নসিবকে দেখেই তিনি সোল্লাসে ডাক দিলেন, 'কমরেড— এখানে কোথায়?'

নসিব জোড় হাত করে নমস্কার জানায়। টেকদাসের পরনে কামিজ চাদর বাদামি পাগড়ি। পায়ে গোলাপি কর্ডুরয়ের চপ্পল। সেই প্রসন্ন হাসিমুখ, দীর্ঘ দাড়ি, স্মিত প্রসন্ন চেহারা। নসিব কিছুটা সময় কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। টেকদাসই কথা বলেন, 'কমরেড— তোর চেহারার একী হাল? কী হয়েছে তোর? কেমন আছিস?'

'ভাল আছি।' নসিব তাড়াতাড়ি জবাব দেয়, 'আপনি কেমন আছেন? হঠাৎ এখানে?'

টেকদাস সে কথার জবাব না দিয়েই বলে ওঠেন, 'ভাল আছি বললেই হলো? কী হয়েছে আমাকে খুলে বল।'

'চলুন— একটা কোথাও বসি। সব বলব আপনাকে।' নসিবের কথায় আকণ্ঠ দুঃখ ঝরে পড়ে। সামনের একটা হোটেলে গিয়ে ওরা ঢোকে। টেকদাস বরফি-চায়ের অর্ডার দিলেন কোণের একটা টেবিলে বসে। পরিচারক দু গ্লাস জল দিয়ে যায়। নসিব এক নিশ্বাসে জল খায়। তারপর বলে, 'একটু মুশকিলে পড়েছি। কোটেতে আমার মামা থাকে— আপনি তো জানেনই। ওখানকারই একটা মেয়ে— জাঠেদের বাড়ির— আমার সঙ্গে পড়ত। ওরই সঙ্গে আমার—'

'বিয়ে?'

'হ্যাঁ।'

'মুশকিলটা কোথায়?'

'ওর মা-বাবা মানছে না। আমরা জাতে নাপিত—মেয়েকে ওরা জাঠেদের বাড়িতে দিতে চায়।'

'মেয়ে কী বলে?'

'আমাকে বিয়ে করবে।'

'তৈরি?'

'হ্যাঁ। কথাবার্তা হয়ে গেছে।'

'তাহলে চিন্তা কেন?'

'আজ ওঁর আসার কথা ছিল আমাদের এক অধ্যাপকের বাড়ি—খুবই আধুনিক ও প্রগতিশীল ভদ্রলোক— উনি আমাদের ভাটিন্ডায় নিয়ে গিয়ে কোর্ট ম্যারেজের ব্যবস্থা করেছেন। আজ।'

'ব্যাস। তাহলে তো আর কোনও সমস্যা নেই।'

চা এসে যায়। ওরা আস্তে আস্তে চা খেতে থাকে। কথা এগোয়। টেকদাসের চা শেষ। নসিব বরফির টুকরো আস্তে আস্তে খায়। চুপ করে থাকে। সব কথা বলা হয়ে গেছে। টেকদাস আবার প্রশ্ন করেন, 'কই—তুই তো কোনও সমস্যার কথা বললি না?'

নসিব নিশ্চুপ। টেকদাস জিজ্ঞেস করেন, 'তুই এখন আছিস কোথায়?'

'কলকাতায়। একটা ব্যাংকে কাজ করি।'

'চাকরি পাকা?'

'না। প্রোবেসনে আছি। অফিসার পোস্ট।'

'মাইনে?'

'হাজার। প্রোবেসনের পর বাড়বে। প্রত্যেক বছরে—'

'তবে তো ইনকিলাব করে ফেলেছিস!'

'কোথায় আর ইনকিলাব হলো?'

'হলো না মানে? জাঠিনি ঘরে আনছিস— এর চেয়ে বড় ইনকিলাব আর কী হতে পারে?'

নসিব টেকদাসের রসিকতায় ম্লান হাসে, 'এটা তো ব্যক্তিগত একটা ইনকিলাব, আসল ইনকিলাব কবে আসবে, কে জানে!'

'আরে বোকা— এইভাবেই তো শুরু হয়ে যায়। প্রথমে ব্যক্তিগত, তারপর সেটা ছড়িয়ে পড়ে গোটা সমাজে।' টেকদাস সশব্দে হেসে ওঠেন, তারপর ঈষৎ গম্ভীর হয়ে বলেন, 'তুই লেখাপড়াজানা লোক, জাতপাত কিছু নয় রে— আসল ব্যাপারটা হলো মন। টাকাকড়ি মন বিষিয়ে দেয়। জাঠেদের টাকাপয়সা আছে, তাই ভাবে ওরা উঁচু জাত। ওদের ধারণা নাপিতদের টাকাকড়ি নেই— তাই তারা ছোটজাত। কিন্তু নিজের দিকে তাকিয়ে দেখ— তুই কারও চেয়ে ছোট নয়। লেখাপড়া শিখেছিস, ভাল চাকরিবাকরি করিস, শরীরস্বাস্থ্য ভাল— না, না, ওসব তুই ভুলে যা। গুরু বলেছেন, 'ঈশ্বর সবাইকে একভাবে সৃষ্টি করেছেন। উঁচুনিচু ভেদাভেদ— এসব মানুষেরই করা।' —তোর মতো মানুষই তো এই ভেদাভেদ তুলে দেবে, কমরেড।'

টেকদাসের কথায় নসিবের মনে জোর আসে।

টেকদাস তাঁর বাঙালি-পাঞ্জাবির ভেতরে পরা ফতুয়ার পকেটে হাত ঢুকিয়ে এক তাড়া নোটের বান্ডিল বের করেন। সব একশো টাকার নোট। পুরো বান্ডিলটা তিনি নসিবকে দেন, 'নে— তোর ব্যক্তিগত-ইনকিলাবে আমার সামান্য উপহার!'

নসিব বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে যায়। টাকাকড়ির চিন্তা তারও মনে ছিল। টাকা এমনিতেই কম ছিল, সজ্জনকে বলতে সংকোচও হচ্ছিল। ভাটিন্ডায় কোর্ট ম্যারেজে খরচ

পত্তরের ব্যাপার আছে। ট্যাকসি ভাড়া, উকিল মুহুরির দক্ষিণা, আদালতের আমলাদের খরচ। আদালতে দু-টাকার একটা টুকরো পাওয়ার জন্যে সব কুকুরের মতো হামলে থাকে! এর ওপর আছে, কলকাতা যাওয়ার খরচ।

টেকদাস উঠে দাঁড়ান, 'আচ্ছা কমরেড— আজ উঠি— শুভায় ভবতু! আর টাকার দরকার থাকে তো বল—'

'না। না। এতেই হয়ে যাবে! আপনার আশীর্বাদ—'

'ভাল কাজ করছিস— আমার শুভেচ্ছা তোদের জন্যে সব সময়েই থাকবে। তুই বরং চা-বরফির দামটা দিয়ে দিস—'

টেকদাস বাইরে এসে স্কুটারে স্টার্ট দেন।

নসিব হোটেলের বাইরে এসে— যতদূর চোখ যায় দেখতে থাকে। দুনিয়াতে এমন লোক এখনও আছে!

পঁচিশ

সাধু টেকদাসের সঙ্গে দেখা হওয়ার পরই নসিব মনে বল পায়। কথাবার্তায় বেশ কিছু সময় কেটে গেছে। পুষ্প নিশ্চয়ই এখন অধ্যাপকের বাড়ি চলে এসেছে। হয়তো, অপেক্ষা করে একটু ক্লান্তও হয়ে গেছে। নসিব দ্রুত অধ্যাপকের বাড়ির দিকে পা চালায়। রাস্তায় ঘড়ি দেখে। সাড়ে এগারো— অর্থাৎ দেড় ঘন্টা পার হয়ে গেছে।

সজ্জন তাঁর পড়ার ঘরে বসে একমনে বই পড়ছেন। নসিব যে ঢুকেছে, টের পান না। নসিব ডাকে, 'স্যার— পুষ্প আসেনি?'

'না তো। সাড়ে দশটায় আসবে বলেছিল, না?'

'হুঁ। মনে হচ্ছে, কোনও গোলমালে পড়েছে—বাড়ির লোক হয়তো আটকে দিয়েছে।

'আর একটু অপেক্ষা করে দেখা যাক। তুমি বরং একটু গড়িয়ে নাও। ওপরে চারপাই আছে— আমি এখানেই আছি। পুষ্প এলেই আমরা চলে যাব।'

নসিব ওপরে ওঠে। বারান্দায় চারপাই রাখা। রোদ এসে পড়েছে, নসিব ওটাকে দেওয়ালের দিকে টেনে নেয়। বিশেষ গরম নেই, তবুও সে ফ্যান একে খুলে দেয়। পাগড়িটা রাখে বেঞ্চের ওপর। চারপাইয়ে শুয়ে ঘুমোবার চেষ্টা করে। ঘুম আসে না। মিনিট পাঁচেক পরেই উঠে পড়ে। কী করা যায়?. এখানে অপেক্ষা করাই ভাল। পুষ্প এলে তো এখানেই আসবে। না কী বাড়ি থেকে বেরোতে পারল না? ঘন্টা খানেক সাত-পাঁচ ভেবে কেটে যায়। পাগড়ি চাপিয়ে সে নিচে নেমে আসে। সজ্জনকে বলে, 'স্যার—আমি ফুলের বাসস্ট্যান্ডটা একবার দেখে আসি। যদি অন্য কোনও পথ দিয়ে আসে—'

'বেশ তো। দেড়টার মধ্যে ফিরে এসো— রুটি খেয়ে নেবে।' তারপর একটু থেমে, 'খিদে পায়নি? দুটো রুটি খেয়ে নিতে পার এখন। বানানোই আছে।'

'না স্যার। এখন খিদে নেই। আমি বরং ঘুরে আসি।'

পাবলিক লাইব্রেরির যে দিকটা স্কুলের দিকে, নসিব সেদিকেই যায় বাজারের ভেতর দিয়ে। হঠাৎ সে হরদিৎকে দেখতে পায়। একটু ঘাবড়ে যায় সে। ভাবে, একটা গলির মধ্যে ঢুকে গেলে কেমন হয়। কিন্তু, গা-ঢাকা দিয়েই বা লাভ কী? সামনের দিকে একটু এগোতে, হরদিৎ-ও তাকে দেখতে পায়। সোল্লাসে ডাক দেয়, 'আরে, ভাগ্নে যে! তা এদিকে কোথায়?'

'এখানে একটু কাজে এসেছি, মামা।'

হরজিৎ করমর্দনের জন্যে হাত বাড়িয়ে দেয়।

'তা ভাগ্নে—অনেকদিন দেখিনি। এখন থাকো কোথায়?'

হরদিৎ যেন কিছু জানে না, এমন ভাব দেখায়।

'কলকাতায় থাকি। ব্যাংকে কাজ করি।'

'খুব ভাল। চাকরিবাকরি করছ। তা গাঁয়ে এসেছ নাকি?' নেহাৎ ভালো মানুষের মতো হরদিৎ জিজ্ঞেস করে।

'হ্যাঁ।' নসিব ঢোক গেলে।

'তা চলো — একটু চা-টা খাওয়া যাক।'

সাধেড়ের সাধু টেকদাসের সঙ্গে যে হোটেলে নসিব ঢুকেছিল, সে হোটেলেই আবার ঢোকে ওরা। চা খেতে-খেতে হরদিৎ নসিবের দিকে তাকায়। বলে, 'এখানে কেন?'

'একটু কাজ আছে।' যুৎসই কোনও জবাব নসিব খুঁজে পায় না।

'কাজ হয়ে গেছে? কোর্টে যাবে না কী?'

'না। সাধেড়ে যাব ভাবছি। ওখান থেকে কলকাতা—' জুড়েজাড়ে নসিব জবাব দেয়।

হরদিৎ-ও বোঝে প্রশ্নগুলি অবান্তর। নসিবের জবাবও তাই অবান্তর মনে হয়। পুষ্পর জন্যেই নসিব যে রামপুরায় অপেক্ষা করছে, এটা হরদিৎ অনায়াসেই বুঝে ফেলে। বাজারে সে পুষ্পকেই খুঁজতে বেরিয়েছে। মনে মনে রেগে গেলেও হরদিৎ শান্তভাবে একটা মতলব আঁটে। একবার ভাবে, নসিবকে ধমকে দেয়; আর একবার ভাবে, ভাল করে বুঝিয়ে বলে। তার পরই ভাবে, উঁহু, তাতে সুবিধে হবে না। সামনেই বাসস্টপ — নসিব ঝট করে কেটে পড়বে। হরদিতের মনের মধ্যে ভয়ংকর একটা পরিকল্পনা রূপ নিতে থাকে আস্তে আস্তে। দয়ালিকে বলে এসেছিল মহামা যাবে। রামপুরা থেকে ভাটিন্ডা পৌঁছে যাওয়ার কথা একটা দেড়টায়। ওখান থেকে বাসে গৌনিআনা। গৌনিআনা থেকে মহামা। কিন্তু নসিবের সঙ্গে দেখা হতে পুরো ব্যাপারটাই বদলে গেল। নাপতের ছেলে, এত বড় স্পর্ধা! ইচ্ছে হলো, নসিবকে কেটে সেখানেই পুঁতে ফেলে। ওকে ছাড়া চলবে না। শেষ করে ফেলতে হবে। কী দিনকালই না পড়েছে, নাপতের বাচ্চা চাষ দাগাচ্ছে

জাতেদের মেয়ের দিকে। শালার স্বাধীনতা। শালা কংগ্রেস নীচ ছোটো জাতকে একেবারে মাথায় চড়িয়ে রেখেছে।

চা খেয়ে ওরা ওঠে। হরদিং চায়ের পয়সা মিটিয়ে নসিবকে নিয়ে বাইরে আসে। বলে, 'আগে—চলো, এক জায়গা থেকে ঘুরে আসি। লহুরা-ধুরকিটে একটা ট্র্যাকটর বিক্রির জন্যে পড়ে আছে। আমার সঙ্গে একটু চলো। তুমি লেখাপড়াজানা ছেলে, কাগজপত্রগুলো একটু দেখে দেবে। এখনই চলে আসব, তোমাকে পেয়ে ভালই হলো—বাসে যাব।'

নসিব আর না করতে পারে না। মনে একটা ক্ষীণ আশাও ঝিলিক দেয়। পুষ্পার বাবা! হরদিতের কথার মধ্যে যেন জাদু আছে। প্রায় সম্মোহিতের মতো সে হরদিংকে অনুসরণ করে। অসংলগ্ন কিছু কথা বলতে-বলতে এসে পৌঁছয় বাসস্ট্যান্ডে। ভাটিন্ডার একটা বাসে উঠে পড়ে। লহুরা-ধুরকিট বড় জোড় দু কিলোমিটারের পথ। বাসস্টপ আসতেই ওরা নেমে যায়। রাস্তার ওপর দাঁড়িয়ে চারদিক দেখে নেয় ভাল করে। রাস্তার এদিকে-ওদিকে কিছু লোকের চলাফেরা। হরদিং গাঁয়ের দিকে মুখ করে কিছু সময় দাঁড়িয়ে থাকে। নসিবও দাঁড়িয়ে থাকে। হরদিং হঠাৎ গাঁয়ের বিপরীতে যে রাস্তাটি, সেদিকে মুখ ঘোরায়। রাস্তাটা গেছে মহিরাজ গাঁয়ের দিকে। সামনের দিকে কিছু কুঁড়ে ঘর। নরম তুলোর খেত। আশপাশে লোকজন চোখে পড়ে না। নসিব বলে ওঠে, 'এই তো লহুরা-ধুরকিট। কোন দিকে যাবেন?'

'আমাদের যেতে হবে ওই বাড়িটায়—'

মহিরাজের রাস্তা ধরে হরদিং। পেছনে নসিব। দুজনেই নির্বাক। নির্দিষ্ট বাড়িটার সামনে এসে তারা থামে। আশপাশে লোকজনতো দূরের কথা, জন্তুজানোয়ারও নেই। এমনকি, একটা কুকুরের ডাকও শোনা যায় না। মাটির দেওয়াল, অপলকা কাঠের দরজায় তালা লাগানো একটি দো-চালা ঘর। খেত মজুররাই বানিয়েছে এটা—জিরিয়ে নেওয়ার জন্যে। কাপাস তুলোও রেখে দেয় এখানে। স্থানীয় নাম কাপাস-কোঠি। এর একটি অংশ মহিরাজ গ্রামের, বাকি তিন অংশ ধুরকিটের। কাপাসের সময় এখানে লোকজন থাকত। বোরায় কাপাস বেঁধে-বেঁধে এখানেই জমা করত। আশপাশের খেতে সে-সময় প্রচুর কাপাস হতো। খেতচাষিদের খাওয়াদাওয়া বিশ্রামের ব্যবস্থাও থাকত এখানে। জমা কাপাস এখান থেকেই সরাসরি চলে যেত ব্যবসায়ীদের গুদামে। কিন্তু, আজকাল আর কাপাস চাষ হয় না। বাজার পড়ে গেছে। যার জন্যে কাপাসের বদলে হয় নর্মা তুলোর চাষ। এই তুলোর ঝাড় কাপাসের চেয়েও ঘনবুনটের। রোজগারটা হয় নগদ। তবে বছরখানেক ধরে নর্মারও বাজার মন্দা। মাল বিক্রি হতে তিন-চারদিন লেগে যায়। কিন্তু, আশপাশে যে-চাষই হোক, বাড়িটার নাম কিন্তু থেকে গেছে কাপাস কোঠি।

বাড়ির উঠোনের মাঝামাঝি এসে হরদিং দাঁড়িয়ে পড়ে হঠাৎ। নসিবকে বলে, 'একটু দাঁড়াও এখানে—ওই খেতে আমি একটু 'জঙ্গলপানি' সেরে আসি।'

নসিবের চোখের আড়ালে গিয়ে হরদিং আশপাশটা ভাল করে দেখে। নালার এদিক-ওদিক কেউ নেই। চট করে হরদিং বন্দুকে কার্তুজ পুরে নেয়। তারপর, কাপাস-কোঠির উঠোন লাগোয়া দেওয়াল আড়াল করে বন্দুকটা তাক করে নসিবের দিকে। নসিবের পিঠ দেখা যায়। মুহূর্তের মধ্যে হরদিং ট্রিগার দাবায়। গুলিটা নসিবের কাঁধ ফুটো করে বেরিয়ে যায়। হরদিং চটপট আর একটা কার্তুজ পোরে। নসিব ততক্ষণে মাটিতে লুটিয়ে পড়েছে। হরদিং এগিয়ে এসে নসিবকে কোনও ক্রমে দাঁড় করায় বাঁ হাত দিয়ে, তারপর কানের ওপর দিয়ে আর একটা গুলি চালায়। দ্বিতীয় গুলিতে নসিবের মাথাটা ফেটে চৌচির হয়ে হয়ে যায়। তার শরীরটা মাটিতে কাটা-মাছের মতো ছটফট করতে থাকে। আর বেশিক্ষণ শালা যুঝতে পারবে না, এখুনই শরীরটা ঠান্ডা মেরে যাবে! হরদিং অতি দ্রুত নালার রাস্তায় দৌড়ে আসে। তারপর হাঁটিতে থাকে স্বাভাবিকভাবে। আশপাশে কেউ নেই। গুলির আওয়াজও বোধ হয় কেউ শোনেনি। লহরা-ধুরকিটের বাসস্টপে দু মিনিটও দাঁড়াতে হয় না। রামপুরার বাস এসে দাঁড়ায়। ভাটিন্ডার উদ্দেশে হরদিং বাসে উঠে পড়ে।

চতুর্থ খণ্ড

ট্র্যাক্টরে উঠে হরিন্দর 'সেলফ' দাবায়। ভুগভুগ করে একটু আওয়াজের পরই ট্র্যাক্টর ঝট করে স্টার্ট নেয়। একটু 'রেস' দিতেই ইঞ্জিনের আওয়াজ জোরালো হয়ে ওঠে। চা-পানরত সহকারীকে হরিন্দর চেঁচিয়ে ডাকে: 'চলে আয়।'

গ্লাসের তলানি চা-টুকু এক নিঃশ্বাসে শেষ করেই, গ্লাসটাকে মেজে ধুয়ে গামছায় বেঁধে সে ট্র্যাক্টরের পাশে এসে দাঁড়ায়। হরদিৎ তাকে ট্রলিটা লাগাতে বলে। ট্র্যাক্টরটা ব্যাক করে ট্রলির কাছে নিয়ে আসে। ট্র্যাক্টরে ট্রলি জুড়ে লোহার গেট পার হওয়ার আগে হরিন্দর একবার পেছন ফিরে তাকায়। দয়ালি দু হাত তুলে কি যেন বলছে। বোধ হয় হরদিৎকে ডাকছে। হরিন্দর সহকারীকে বলে, 'শুনে আয় মা কী বলছে।' বলে সে ট্র্যাক্টর থামায়। দয়ালি আবার ভেতরে ঢুকে গেছে।

সহকারী ছেলেটি উঠোনে এসে দাঁড়াতে, দয়ালি আবার বেরিয়ে আসে। উতলা হয়ে বলে, 'আবার সেই রকম মুখ থেকে গাঁজলা উঠছে! কোনও সাড় নেই!'

হরিন্দরও এসে যায় ততক্ষণে। হরদিতের নাকমুখ থেকে গ্যাজলা উঠছে। প্রায় অসাড় শরীর, অতি কষ্টে নিঃশ্বাস নিচ্ছে। হরিন্দর আলতোভাবে নাকটা টিপে ধরে। একটু পরেই হরদিৎ চোখ খোলে। অসহ্য যন্ত্রণায় কাতরে উঠে পাশ ফেরে।

'ব্যাস। এখন ঠিক হয়ে গেছে। একটু পরেই ঠিক হয়ে যাবে··· তুই বরং এখন তোর কাজে যা, সঙ্গে চা নিয়ে যাস।' দয়ালি চিন্তিতভাবে কথাগুলো বলে।

'হরিন্দর—' সহকারী ছেলেটি হরিন্দরের সঙ্গে যেতে-যেতে বলে, 'তোর বাপকে ডাক্তার দেখা— কখন কী ঘটে যায়!'

'এর কোনও চিকিৎসা নেই রে, ভাই।' হরিন্দর জবাব দেয়, 'এইভাবেই কাটাতে হবে।

এটা তো ঠিক মৃগী নয়। যদিও কিছু-কিছু মিল আছে।' কারণটা আমি অবশ্য জানি।

হরিন্দর ট্র্যাকটরে স্টার্ট দিতে, দয়ালি আবার ডাক দেয়। একটু বিরক্ত হয়ে হরিন্দর সহকারীকে বলে, 'আবার কী হলো? যা দেখে আয়।'

দয়ালি চৌকাঠে দাঁড়িয়ে রুটির পুঁটুলিটা এগিয়ে দেয়, 'তোরা এটা নিয়ে যেতে ভুলে গেছিলি। ফের ছুটে আসতে হতো— ঘরে রুগি ফেলে আমি তো যেতে পারতাম না। পরোটা আলুকপির তরকারি একটু শুকনো করে — আমি সব বেঁধে দিয়েছি— দুধের বোতল নিসনি, চা বানাবি কী করে?' এইসব নিয়ে সহকারী ফেরত আসতে, হরিন্দর গজগজ করে, 'বেলা বেড়ে গেল। এতক্ষণে কত গম আমরা 'রসিয়ে' নিতাম . . .'

হরিন্দর সম্পর্কে হরদিৎ সব আশাই ছেড়ে দিয়েছে। হরিন্দর বিএ পাশ করার পর, চাকরির লাইনে না গিয়ে, খেত খামারের কাজ শুরু করে দেয়। সঙ্গে এক বারোমেসে রেখে দেয়। খুবই পরিশ্রমী ছেলে। খেতের সব কাজ নিজের হাতে রেখে হরিন্দর ক্রমশই বাবার আওতা থেকে নিজেকে সরিয়ে আনে। হরদিৎ প্রথম-প্রথম ধমক দিত, রাগারাগি করত, এমনকি গালাগালিজও করত। হরিন্দর কিন্তু এসব গ্রাহ্য করত না। উলটে বাবাকেই জ্ঞান দিত, যেন সে বাবা, আর হরদিৎ ছেলে! রসিকতা করে বলত, 'জানো, উটে কখন জল খায়? তুমি তো এ্যাদ্দিন ধরে দুনিয়াশুদ্ধু লোককে বোকা বানিয়ে তাদের জমিজমা মেরে দিয়েছ! এখন কিন্তু আর পারবে না — লোকে এখন সব বুঝে গেছে। . . . তার চেয়ে, নিজেরটা নিজের কাছে রেখে যার যা পাওনা মিটিয়ে দাও!'

হরদিৎ রেগে যেত। বলত, 'এত্ত সব জমি তোর কথায় বিলিয়ে দেব, সে বান্দা আমি নই! যত্ত সব — আমার মতো একবার করে দেখা দিকি! তোকে ভিক্ষে করতে হবে শেষ অবধি — এই আমি বলে দিলাম, হ্যাঁ!'

হরদিতের একবার ম্যালেরিয়া হলো। আট দিনের জ্বরেই সে কাবু হয়ে পড়ল। এত দুর্বল হয়ে পড়ল যে, চলাফেরার ক্ষমতা অবধি চলে গেল। এই সময়ে দুই জাঠ আসে তাদের বন্ধকী জমি ছাড়াতে। এক-এক জনের দু বিঘে করে জমি বাঁধা ছিল পাঁচ হাজারে। হরদিৎ অসুস্থ বলে হরিন্দরের কাছে আসে তারা। দু-জনেই পাঁচ হাজার করে এনেছিল। হরিন্দর করল কি, একজনের কাছ থেকে আটশো, অন্য জনের কাছ থেকে হাজার টাকা কম নিল। সোজা বলল, 'বাবা তোমাদের কাছ থেকে বেশি নিয়েছিল। অত টাকা যখন নাওনি, তখন তো ফেরত দেওয়ার কথাই ওঠে না! তাছাড়া, তোমাদের জমিতে আমরা যে ফসল তুলেছি, তাতেই তো আমাদের পুষিয়ে গেছে!'

মুকুন্দর ছেলে রমেশ হরিন্দরের কাণ্ড দেখে হাঁ! দুই জাঠের মনে হলো, তাদের সামনে যেন অলৌকিক কিছু ঘটছে। ওরা বেরিয়ে গেলে, রমেশ অন্যদের উদ্দেশে বলে, 'ছেলেটার মাথাটা গেছে! বাপের দফা রফা করে ছাড়বে!'

কথাটা শুনে উপস্থিত মহাজনেরা গম্ভীর হয়ে যায়।

মুকুন্দ মারা গেছে। গদিতে এখন বসে রমেশ। রমেশের দুই ছেলে, এক মেয়ে। ক্লাস টেনের গণ্ডি ছাড়াতেই মেয়ের বিয়ে হয়ে যায়। বড় ছেলে পাতিয়ালায় ডাক্তারি পড়ে। ছোট চণ্ডিগড়ে ইঞ্জিনিয়ারিং। রমেশের দোকান এখনও 'মুকুন্দির দোকান' নামেই গাঁয়ে পরিচিত। মুকুন্দর মতোই রমেশ কাজকারবার চালায়। বাপের মতোই চালচলন স্বভাব। তবুও ছেলেদের সে এই ব্যবসায়ে আসতে দেয়নি। দিনকাল পালটে যাচ্ছে, যাবে—এটা রমেশ বুঝে ফেলেছে। যার জন্যে, ছেলেদের সে গ্রামেও রাখেনি। তারা থাকে চণ্ডিগড় আর পাতিয়ালায়।

ম্যালেরিয়া থেকে সেরে ওঠে হরদিৎ হরিহরের কথা জানতে পারে। কিন্তু কিছু করার থাকে না। সে আরও জানতে পারে, হরিন্দর টাকাকড়ি রাখে [illegible]কে। ছেলের ভাবসাব দেখে হরদিৎ চুপ করে যায়। আর কিছু বলে না। মনে হয়, তার কলজেটা কেউ বোধ হয় মুচড়ে দিয়েছে। হরিহর জায়গাজমি নয়ছয় করে দেবে—এই রকম একটা ভাবনা তাকে পেয়ে বসে। আত্মীয়স্বজনদের জানিয়েও দেয় তার ভাবনার কথা। চন্নবালে গিয়ে হরিহরের মামাকেও সে কথাটা জানায়। প্রত্যেক জায়গাতেই তার একই অনুরোধ: 'ভাই—আমার ছেলেটাকে একটু বোঝাও, এ-রকমভাবে চললে তো আমাদের পথে বসতে হবে। লায়েক ছেলে—ওকে তো আর মারধোর করতে পারি না! শালা গাঁয়ের লোক, ওরা আমাকে জব্দ করতে পারলেই খুশি! ছেলেকে আলফাল বুঝিয়ে কাজ হাসিল করে নেয়—এসব কথা কাকে বলি—'

সবাই অভয় দেয়, 'ভেবো না—আমি গিয়ে তোমার ছেলেকে বুঝিয়ে আসব।'

কিন্তু, শেষ অবধি কেউ-ই আসে না। কার অত দায় পড়েছে? হরদিৎ সারাক্ষণ গুম মেরে থাকে। খেত দেখতে যায়, চৌপালে বসে, কিন্তু কথাবার্তা বলে না। বরং, অন্যের কথাবার্তা মন দিয়ে শোনে। কেমন যেন জড় পদার্থ বনে গেছে সে। কেউ কিছু বললে আনমনা থাকে। সব কিছুই কেমন যেন অচেনা অর্থহীন মনে হয়।... কিছুদিন পর হরদিতের মাথায় একটা নতুন মতলব গজায়। বিয়ে দিলে হয়তো ছেলের চালচলন পালটে যেতে পারে! শ্বশুরবাড়ির লোকই সামলে দেবে ওকে। তবে, বউকে ভাল ঘরের মেয়ে হতে হবে। কিন্তু মুশকিল, হরিন্দর তো বিয়ে করতে একেবারেই রাজি নয়। দয়ালি বিস্তর অনুরোধ উপরোধ করেছে। ছেলের সাফ জবাব, 'এখনই বিয়ে? পাগল না কী? আরে বাবা—আমি কী বুড়ো হয়ে গেছি? ও-সব পরে হবে।'

ছেলে বিয়ে করবে না, এমন তো হতে হতে পারে না। হরদিৎ ভাবে, আজ নয়তো কাল, বিয়ে তো তাকে করতেই হবে। তবে, একটু তাড়াতাড়ি করাতে পারলে আখেরে সুবিধে হবে। বন্ধকী জমি থেকে হরিন্দর যে-ভাবে টাকা ছেড়ে দিচ্ছে, তাতে শেষ অবধি ফতুর হয়ে যেতে হবে। এখন একটা পথই খোলা, তাহলো হরিন্দরকে বিয়েতে রাজি করানো। সম্বন্ধ করার জন্যে কোনও জাঠ আজকাল ধারে-কাছেও ঘেঁষে না। জানাজানি হয়ে গেছে, হরিন্দর এখন বিয়ে করবে না। কোন ডানাকাটা পরীর জন্যে অপেক্ষা করছে কে জানে—এই ভেবে আত্মীয়রা নিশ্চয়ই নিজেদের মধ্যে হাসাহাসি করে।

দুই

হরিন্দরের কথাবার্তা শুনলে হাড়পিত্তি জ্বলে যায়। এমন সব কথা বলে যার মাথামুণ্ডু নেই। যেন, বুদ্ধিশুদ্ধি লোপ পেয়েছে। হরিহর মাঝেমাঝে বাবাকে শুনিয়ে দেয়, 'যাই করো—নিস্তার পাবে না কিন্তু। কৃতকর্মের ফল তোমাকে ভোগ করতে হবে।' হরিন্দর কী তাহলে কিছু আঁচ করেছে? 'কৃতকর্মের ফল' কথা দুটির দুটি মানে হতে পারে। এক, নিঃস্ব লোকের জমি মেরে দেওয়া বা তাদের সুদে টাকা দেওয়া; দুই, জগিরা নাপতের বোনপো নসিবকে মেরে ফেলা। তার আগে মল্লণের নকশালপন্থী ছেলে বলকারকে—পাথরের যোগসাজসে পুলিসের হাতে তুলে দেওয়া ও পুলিশ দিয়ে খুন করানো—এসবই তো 'কৃতকর্মের' মধ্যে পড়ে! নসিব আর বলকার—দু জনেই তো ছিল হরদিতের শত্রু। বলকার বেঁচে থাকলে 'প্রাণে' মারত, আর নসিব 'মানে' মারত। প্রথম-প্রথম হরদিতের মনে হতো, ঘটনাদুটি মনে বোধহয় কোনও রেখাপাত করবে না। কেননা, শত্রুর শেষ রাখতে নেই—শাস্ত্রে বলে। কিন্তু, যত দিন কাটতে থাকে, বছর ঘুরতে থাকে, ততই অনুশোচনায় দগ্ধ হয় হরদিৎ। খুবই অন্যায় হয়ে গেছে। মল্লণের আত্মা—যার ছেলেকে পুলিশ কুপিয়ে মেরেছে, সে কী বলবে? জগিরা কী ভাববে, যদি শোনে, যে বোনপোকে সে ছেলের মতো মানুষ করেছে, তার হত্যাকারী হরদিৎ? জগিরা এখনও জানে না, নসিবকে কে খুন করেছে। হঠাৎ হরদিতের মনে হয়, হরিন্দর নিশ্চয়ই এসব কথা টের পেয়ে গেছে। এই জন্যেই বোধহয় 'কৃতকর্মের ফল' কথা দুটি ঘুরে-ফিরে শুনিয়ে দেয়। সুদ বা বন্ধকী জমির কারবার সম্পর্কে কথাগুলি নিশ্চয়ই খাটে না। কিন্তু, বলকার-নসিব সম্পর্কে হরিহর জানলই বা কেমন করে? হরিহর তো দূরের কথা, গাঁয়ের কাকপক্ষিও জানে না বলকারকে হরদিৎ কীভাবে পুলিশের হাতে তুলে দিয়েছিল। সবাই পাথরকে দায়ী করেছিল। নসিবের ব্যাপারটাও তো কারও জানার কথা নয়। তবে? সব কেমন যেন তালগোল পাকানো লাগে হরদিতের।

আসলে, হরিন্দর কিন্তু ওইসব একেবারেই ভাবেনি। কিন্তু, বাপের সুদের কারবার ও জমি বাঁধা নিয়ে তা মেরে দেওয়ায় দেখে মর্মাহত হয়ে পড়ে। তার বাবার চরিত্র এমন হতে পারে, সে কোনও দিন ভাবতে পারেনি। বি এ পড়ার সময় থেকেই হরিন্দর মার্কসবাদী বন্ধুদের সংস্পর্শে আসে। এই সময় সে যাবতীয় মার্কসবাদী সাহিত্য ও সমাজবাদ সম্পর্কিত বইপত্র পড়ে ফেলে। এইসবের ফলে, বাবার বিরুদ্ধে তার প্রতিক্রিয়া বেশ তীব্র হয়ে ওঠে।

হরদিৎ স্বপ্নের মধ্যেও বলকার আর নসিবকে দেখতে পায়। ওরা যেন দূরে দাঁড়িয়ে হরদিৎকে দেখছে। কখনও একসঙ্গে, কখনও আলাদাভাবে। বলকার স্বপ্নের মধ্যে যেন বেশিক্ষণ থাকে। নসিব একটু দূরে দাঁড়িয়ে থাকে। নসিবকে দেখে হরদিৎ ততটা ভয় পায় না, যতটা বলকারকে দেখে পায়। স্বপ্ন দেখেই তার ঘুম ভেঙে যায়। আর ঘুম আসতে চায় না। সকালে উঠে সে স্বপ্নটা ভুলে যাওয়ার চেষ্টা করে, কিন্তু পারে না। ভাবে, স্বপ্নের মধ্যে ওরা বারে-বারে এমন হানা দেয় কেন—কবে মরে গেছে—কিন্তু স্বপ্নে আসে কেন? তবে কী ওদের বিদেহি আত্মা এখনও ঘুরে বেড়াচ্ছে? নিশ্চয়ই ওদের আত্মা এখনও 'মুক্তি' পায়নি। হরদিৎ এই ধরনের কথাবার্তা নানা জায়গায় শুনেছে। ফলে, সে আরও

ভয় পেয়ে যায় এই ভেবে, অশরীরী এই আত্মারা নিশ্চয়ই ভয়ংকর কোনও ক্ষতি করবে। একদিন সে স্বপ্ন দেখে, বন্দুকের নল তার দিকে রাইফেল তাক করে আছে, গুলিটা যেন এখনই তার বুক ভেদ করে যাবে, আর সে ছটফট করতে-করতে মারা যাবে। প্রচণ্ড ভয়ে মাথায় হাত রেখে সে উঠে বসার চেষ্টা করে, আর্তনাদ করে ওঠে। পাশের খাটে দয়ালি শুয়েছিল, সে হরদিতের আর্তনাদে তাড়াতাড়ি উঠে আসে। হরদিতের বুকের ওপর হাত রাখে। বুক ধড়ফড় করছে, নিঃশ্বাস দ্রুত, চোখমুখ পাণ্ডুর। দয়ালি জিজ্ঞেস করে, 'কী হয়েছে?'

'এক গ্লাস জল দাও।'

জল খেয়ে একটু স্বাভাবিক হয় হরদিৎ। দয়ালি ফের বলে, 'খারাপ স্বপ্ন দেখেছিলে?'

'খারাপ? মেরেই ফেলত আর একটু হলে?'

'কে?'

'মনে হলো—' বলেই হরদিৎ সামলে নেয়, কথাটা ঘুরিয়ে দেয়, 'আরে ছাড়ো — নাঃ, শুয়ে পড়ো।' হরদিৎ আর কিছু বলে না। সেইকাল না নসিব সম্পর্কে দয়ালি কিছুই জানে না। হরদিৎ তাকে কিছু বলেনি। মেয়েদের পেটে কথা থাকে না। ভরসা করা যায় না।

কত বছর হয়ে গেল। রামপুরা থেকে গাড়ি ধরে হরদিৎ ভাটিণ্ডায় যাবে ভেবেছিল, সেখান থেকে গৌনেআনা, তারপর মহামা। মহামায় গিয়ে পুষ্পার বিয়ের তারিখটা ঠিক করে আসবে কথা ছিল, কিন্তু রামপুরায় দেখা হয়ে গেল নসিবের সঙ্গে। প্রথমে তো চিনতেই পারেনি। মনে মনে অবশ্য নসিবের সঙ্গে দেখা হোক, এই রকমটাই চাইছিল হরদিৎ। ঠিকই করে নিয়েছিল নসিবকে সে খতম করে দেবে, যাতে সে জীবনে পুষ্পার ছায়া মাড়াতে না পারে। মহামার গুর্জিতের সঙ্গে পুষ্পার [illegible] নির্বিঘ্নে হয়ে যাবে।

যা ভেবে রেখেছিল, তাই হলো শেষ পর্যন্ত [illegible] রামপুরা থেকে সে নসিবকে পাকড়াও করে আনে লহরা-দুর্গাকোটে। নসিব [illegible] কাপাস-কোঠির উঠোনে নসিবকে গুলি করে মেরে সে ওখান থেকে [illegible] ভাটিণ্ডা। গিয়ে শোনে গুর্জিত ফেরেনি। আগে অবিশ্যি রোজই ফিরত [illegible] মহামায়। পরের দিন দুপুর অবধি ছিল। গুর্জিত আসেনি। লোক পাঠিয়ে [illegible] পোস্টিং হয়েছে ভাটিণ্ডায়। ভাটিণ্ডাতে-ও গুর্জিতের পাত্তা পাওয়া গেল না। অগত্যা, [illegible] কোটেও ফিরে এলো। গাঁয়ে বিশেষ হইহল্লা শোনা গেল না। দু-দিন পর পুলিশ এলো [illegible] থেকে। তারা গাঁয়ে গাঁয়ে জনে-জনে জানিয়ে গেল নসিবের লাশ পুলিশ-চৌকিতে রাখা হয়েছে শনাক্তকরণের জন্যে।

যেদিন নসিব খুন হয়, সেদিন কাপাস-কোঠির আশপাশ দিয়ে সন্ধ্যে অবধি লোক চলাচল করেছে। কিন্তু, ভেতরে গিয়ে কেউ কিছু দেখেনি। সারা রাত ধরে লাশ একভাবে পড়ে থাকে। নসিব যে কীভাবে ছটফট করে মরেছে, তা কেউ জানে না। পরের দিন রোদের কড়া আলোয়, ব্যাপারটা লোকের চোখে পড়ে। লাশ দেখে কুকুর চিৎকার শুরু করে, তাদের একটানা চিৎকারে গাঁয়ের কিছু কৌতূহলী ছেলে দরজা ফাঁক করেই লাশটা দেখতে পায়। তারপরই সব জেনে যায় ঘটনাটা। গাঁয়ের নম্বরদার, চৌকিদার নিয়ে ঘটনাস্থলে হাজির হয়। তারাই রামপুরায় পুলিশকে খবর দেয়। অতঃপর, রামপুরার পুলিশ

এসে লাশ তুলে নিয়ে যায় পোস্টমর্টেমের জন্যে। হাসপাতালে পোস্টমর্টেমের পর লাশ রেখে দেওয়া হয় পুলিশ চৌকিতে।

সন্ধ্যের দিকে গ্রামের কিছু তরুণ পুলিশ চৌকিতে আসে নিছক কৌতূহলে। তাদেরই একজন লাশ চিনতে পারে: 'আরে এতো কোটে খড়ক সিং-এর নসিব! আমার সঙ্গে কলেজ পড়ত।'

তখন তিন দিন কেটে গেছে। খবর পাওয়ামাত্র জগিরা দুজনকে নিয়ে রামপুরামণ্ডিতে চলে আসে। হ্যাঁ, নসিবই। জগিরা পাগলের মতো আছড়ে পড়ে নসিবের বুকের ওপর। জগিরার সেই কান্না ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। পুলিশ ভাবে, নসিব বুঝি জগিরারই ছেলে। জগিরার সঙ্গে এসেছিল নম্বরদার পাখরের ছেলে মেহের আর হরদিৎ। নম্বরদার বলেই জগিরা মেহেরকে নিয়ে এসেছিল। হরদিৎ-কে এনেছিল আমলা পুলিশ ইত্যাদির সঙ্গে কথা বলার সুবিধে হবে ভেবে। কেননা, পুলিশ মহলে হরদিতের প্রভাব প্রতিপত্তি বেজায়। ব্যক্তিগতভাবে সে জগিরার বন্ধুও— অনেকদিনের বন্ধু। হরদিৎ বিত্তবান লোক, কখন কোন কাজে লাগে—এই ভেবেই জগিরা বন্ধুত্ব বজায় রেখেছিল। দুপুরের দিকে পুলিশ লাশ ছেড়ে দেয়। একটা ট্রাকে চড়িয়ে নসিবের লাশ আনা হয় গাঁয়ে। ভাড়া হরদিৎ দেয়। বিকেলে সেই মৃতদেহ দেখে লোকে হায়-হায় করে ওঠে। কেউই বুঝে উঠতে পারে না, এমন ঘটনা ঘটল কীভাবে। জগিরার সঙ্গে কারও শত্রুতা নেই। নসিবও ভাল ছেলে, কেউ কোনও দিন তাকে উঁচু গলায় কথা বলতে অবধি শোনেনি। পুরো ব্যাপারটাই কেমন যেন দুর্বোধ্য মনে হয়। গ্রামের সবাই মিলে নসিবের দাহ কাজ সম্পন্ন করে।

তিন

কেউ জানত না নসিব কাকভোরে, চুপিচুপি পুষ্পর সঙ্গে দেখা করে গিয়েছিল। ঠিক করেছিল, অধ্যাপক সজ্জনের বাড়িতে এসে বিয়ে করে চলে যাবে কলকাতায়।

কিন্তু, দয়ালি নানা কৌশলে পুষ্পকে আটকে রাখে, বেরোতে দেয় না। পুষ্পও সাহস করেনি জোরজবরদস্তি করে বাড়ি থেকে বেরিয়ে বুর্জগিল্লার বাসস্ট্যাণ্ডে যেতে; শুধু ইচ্ছে হয়েছিল কোনও পাখি বা জানোয়ারে পরিণত হয়ে অধ্যাপকের বাড়ি পৌঁছে নসিবের বুকে ঝাঁপিয়ে পড়তে। বাবা বাড়ি নেই—কাঁধে বন্দুক নিয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়েছে। মহামায় গিয়ে বিয়ের তারিখ পাকা করে আসবে, এটা জানত শুধু দয়ালি। পুষ্প কিছুই জানত না। বাড়িতে সে আর মা। পালাবার চেষ্টা করলে মা কী আটকাতে পারত? কিন্তু, পুষ্প সে চেষ্টাই করেনি। দগ্ধ-পক্ষ পাখির মতো অসহায়ভাবে বসে থাকে। দয়ালি অবশ্য মেয়ের ওপর নজর রেখে যায়। ফলে, পুষ্প শেষ অবধি আর বেরোতে পারেনি। সেই মুহূর্তে দুর্গের মতো প্রকাণ্ড বাড়িটা যেন এক জেলখানায় পরিণত হয়। মনে হয়, এই জেলখানার বাইরে সে বোধহয় আর জীবনে যেতে পারবে না। এখানেই মরতে হবে শেষ অবধি।

বারোটা নাগাদ সে নিজের কামরায় চলে আসে। লেপ মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়ে। মনে হয় লেপটা যেন কবরের মাটি। সেই মাটির নিচে সে মরে পড়ে আছে। এরই ফাঁকে একটা স্বপ্নও দেখে। সে যেন অধ্যাপক সজ্জনের বাড়ি পৌঁছে গেছে। অধ্যাপক ও নসিব, দুজনে মিলে কী যেন পরামর্শ করছে। ঘণ্টাখানেক ধরে পুষ্প স্বপ্নটি দেখে যায়। বাইরে একটি আওয়াজ হতে ঘুমটা ভেঙে যায়। ঘরে এসে ঢোকে সহপাঠিনী জলি। পুষ্প বাড়ি এসেছে খবর পেয়ে দেখা করতে এসেছে। বিএ পাশ করে জলি এখনও নিষ্কর্মা। বিয়ে কবে হবে ঠিক নেই। একটা ট্রেনিং নেবে ভাবছে। না হলে বিএড পড়বে। এই সব ব্যাপারে পরামর্শ নেওয়ার জন্যে তার পুষ্পর কাছে আসা। জলি এসে পুষ্পর মুখ থেকে লেপটা সরিয়ে দেয়।

পুষ্প জলির দিকে তাকিয়ে থাকে ফ্যাল ফ্যাল করে। কোনও কথা বলে না। পুষ্পর অবস্থা দেখে জলি তার গালে টুসকি মারে: 'কী হয়েছে তোর? শরীর খারাপ?'

পুষ্প তবুও চুপ করে থাকে।

জলি পাশে বসে। এক টানে লেপটা সরিয়ে দেয়, 'কী রে, কথা বলছিস না কেন?'

পুষ্পর চোখে জলে টলটলে। জলি অবাক হয়ে যায়। আবার জিজ্ঞেস করে, 'কী হয়েছে তোর?'

তবুও পুষ্পর মুখ থেকে কোনও কথা বেরোয় না। আহত, বোবা জন্তুর মতো একটা শব্দ করে অস্পষ্টভাবে। ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠে। জলি কোনও দিন তাকে এইভাবে কাঁদতে দেখেনি। পুষ্পকে জড়িয়ে ধরে সে বলে, 'আমাকে সব খুলে বল—আমার দিব্যি! তোর জন্যে যা করতে হয়, আমি সব করব—'

পুষ্প চোখের জল মোছে। একটু চুপ করে থেকে বলে, 'বাবা আজ গেছে।'

'কোথায় গেছে?'

'মহামায়—বিয়ের তারিখ ঠিক করতে—আমার পাকা দেখা হয়ে গেছে—'

'তাতে কান্নার কী আছে?'

'নসিবও এসেছিল।'

জলি ওদের সম্পর্কটা জানে। পুষ্পই বলেছিল। খুব অল্প বয়স থেকেই জলি পুষ্পর বান্ধবী। জলিকে সব কথাই সে বলে। জলি আর পুষ্পর মধ্যেই সেই সব কথা চাপা থাকে।

'হ্যাঁ। ভোরবেলায়। কথা বলে চলে গেছে।'

'কেউ জানে না?'

'না। রামপুরায় থাকবে। প্রোফেসরের বাড়িতে নিশ্চয়ই আমার জন্যে অপেক্ষা করছে।'

'তারপর?'

'মা আটকে দিয়েছে। বেরোতে দেয়নি। সারাক্ষণ নজরে-নজরে রেখেছে। বাবা তারিখ পাকা করে এসে জোরজবরদস্তি করে যদি আমার বিয়ে দেয়—'

এসে লাশ তুলে নিয়ে যায় পোস্টমর্টেমের জন্যে। হাসপাতালে পোস্টমর্টেমের পর লাশ রেখে দেওয়া হয় পুলিশ চৌকিতে।

সন্ধ্যের দিকে গ্রামের কিছু তরুণ পুলিশ চৌকিতে আসে নিছক কৌতূহলে। তাদেরই একজন লাশ চিনতে পারেঃ 'আরে এতো কোটে খড়ক সিং-এর নসিব! আমার সঙ্গে কলেজ পড়ত।'

তখন তিন দিন কেটে গেছে। খবর পাওয়ামাত্র জগিরা দুজনকে নিয়ে রামপুরামণ্ডিতে চলে আসে। হ্যাঁ, নসিবই। জগিরা পাগলের মতো আছড়ে পড়ে নসিবের বুকের ওপর। জগিরার সেই কান্না ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। পুলিশ ভাবে, নসিব বুঝি জগিরারই ছেলে। জগিরার সঙ্গে এসেছিল নম্বরদার পাখরের ছেলে মেহের আর হরদিৎ। নম্বরদার বলেই জগিরা মেহেরকে নিয়ে এসেছিল। হরদিৎ-কে এনেছিল আমলা পুলিশ ইত্যাদির সঙ্গে কথা বলার সুবিধে হবে ভেবে। কেননা, পুলিশ মহলে হরদিতের প্রভাব প্রতিপত্তি বেজায়। ব্যক্তিগতভাবে সে জগিরার বন্ধুও— অনেকদিনের বন্ধু। হরদিৎ বিত্তবান লোক, কখন কোন কাজে লাগে—এই ভেবেই জগিরা বন্ধুত্ব বজায় রেখেছিল। দুপুরের দিকে পুলিশ লাশ ছেড়ে দেয়। একটা ট্রাকে চড়িয়ে নসিবের লাশ আনা হয় গাঁয়ে। ভাড়া হরদিৎ দেয়। বিকেলে সেই মৃতদেহ দেখে লোকে হায়-হায় করে ওঠে। কেউই বুঝে উঠতে পারে না, এমন ঘটনা ঘটল কীভাবে। জগিরার সঙ্গে কারও শত্রুতা নেই। নসিবও ভাল ছেলে, কেউ কোনও দিন তাকে উঁচু গলায় কথা বলতে অবধি শোনেনি। পুরো ব্যাপারটাই কেমন যেন দুর্বোধ্য মনে হয়। গ্রামের সবাই মিলে নসিবের দাহ কাজ সম্পন্ন করে।

তিন

কেউ জানত না নসিব কাকভোরে, চুপিচুপি পুষ্পর সঙ্গে দেখা করে গিয়েছিল। ঠিক করেছিল, অধ্যাপক সজ্জনের বাড়িতে এসে বিয়ে করে চলে যাবে কলকাতায়।

কিন্তু, দয়ালি নানা কৌশলে পুষ্পকে আটকে রাখে, বেরোতে দেয় না। পুষ্পও সাহস করেনি জোরজবরদস্তি করে বাড়ি থেকে বেরিয়ে বুর্জগিল্লার বাসস্ট্যাণ্ডে যেতে; শুধু ইচ্ছে হয়েছিল কোনও পাখি বা জানোয়ারে পরিণত হয়ে অধ্যাপকের বাড়ি পৌঁছে নসিবের বুকে ঝাঁপিয়ে পড়তে। বাবা বাড়ি নেই—কাঁধে বন্দুক নিয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়েছে। মহামায় গিয়ে বিয়ের তারিখ পাকা করে আসবে, এটা জানত শুধু দয়ালি। পুষ্প কিছুই জানত না। বাড়িতে সে আর মা। পালাবার চেষ্টা করলে মা কী আটকাতে পারত? কিন্তু, পুষ্প সে চেষ্টাই করেনি। দগ্ধ-পক্ষ পাখির মতো অসহায়ভাবে বসে থাকে। দয়ালি অবশ্য মেয়ের ওপর নজর রেখে যায়। ফলে, পুষ্প শেষ অবধি আর বেরোতে পারেনি। সেই মুহূর্তে দুর্গের মতো প্রকাণ্ড বাড়িটা যেন এক জেলখানায় পরিণত হয়। মনে হয়, এই জেলখানার বাইরে সে বোধহয় আর জীবনে যেতে পারবে না। এখানেই মরতে হবে শেষ অবধি।

বারোটা নাগাদ সে নিজের কামরায় চলে আসে। লেপ মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়ে। মনে হয় লেপটা যেন কবরের মাটি। সেই মাটির নিচে সে মরে পড়ে আছে। এরই ফাঁকে একটা স্বপ্নও দেখে। সে যেন অধ্যাপক সজ্জনের বাড়ি পৌঁছে গেছে। অধ্যাপক ও নসিব, দুজনে মিলে কী যেন পরামর্শ করছে। ঘণ্টাখানেক ধরে পুষ্প স্বপ্নটি দেখে যায়। বাইরে একটি আওয়াজ হতে ঘুমটা ভেঙে যায়। ঘরে এসে ঢোকে সহপাঠিনী জলি। পুষ্প বাড়ি এসেছে খবর পেয়ে দেখা করতে এসেছে। বিএ পাশ করে জলি এখনও নিষ্কর্মা। বিয়ে কবে হবে ঠিক নেই। একটা ট্রেনিং নেবে ভাবছে। না হলে বিএড পড়বে। এই সব ব্যাপারে পরামর্শ নেওয়ার জন্যে তার পুষ্পর কাছে আসা। জলি এসে পুষ্পর মুখ থেকে লেপটা সরিয়ে দেয়।

পুষ্প জলির দিকে তাকিয়ে থাকে ফ্যাল ফ্যাল করে। কোনও কথা বলে না। পুষ্পর অবস্থা দেখে জলি তার গালে টুসকি মারে: 'কী হয়েছে তোর? শরীর খারাপ?'

পুষ্প তবুও চুপ করে থাকে।

জলি পাশে বসে। এক টানে লেপটা সরিয়ে দেয়, 'কী রে, কথা বলছিস না কেন?'

পুষ্পর চোখে জলে টলটলে। জলি অবাক হয়ে যায়। আবার জিজ্ঞেস করে, 'কী হয়েছে তোর'?

তবুও পুষ্পর মুখ থেকে কোনও কথা বেরোয় না। আহত, বোবা জন্তুর মতো একটা শব্দ করে অস্পষ্টভাবে। ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠে। জলি কোনও দিন তাকে এইভাবে কাঁদতে দেখেনি। পুষ্পকে জড়িয়ে ধরে সে বলে, 'আমাকে সব খুলে বল—আমার দিব্যি! তোর জন্যে যা করতে হয়, আমি সব করব—'

পুষ্প চোখের জল মোছে। একটু চুপ করে থেকে বলে, 'বাবা আজ গেছে।'

'কোথায় গেছে?'

'মহামায়—বিয়ের তারিখ ঠিক করতে—আমার পাকা দেখা হয়ে গেছে—'

'তাতে কান্নার কী আছে?'

'নসিবও এসেছিল।'

জলি ওদের সম্পর্কটা জানে। পুষ্পই বলেছিল। খুব অল্প বয়স থেকেই জলি পুষ্পর বান্ধবী। জলিকে সব কথাই সে বলে। জলি আর পুষ্পর মধ্যেই সেই সব কথা চাপা থাকে।

'হ্যাঁ। ভোরবেলায়। কথা বলে চলে গেছে।'

'কেউ জানে না?'

'না। রামপুরায় থাকবে। প্রোফেসরের বাড়িতে নিশ্চয়ই আমার জন্যে অপেক্ষা করছে।'

'তারপর?'

'মা আটকে দিয়েছে। বেরোতে দেয়নি। সারাক্ষণ নজরে-নজরে রেখেছে। বাবা তারিখ পাকা করে এসে জোরজবরদস্তি করে যদি আমার বিয়ে দেয়—'

'তুই রাজি না হলে বিয়ে কী করে হবে?'

'আমার আর রাজি, গররাজি! কে গ্রাহ্য করে?'

'একটা উপায় আছে।'

পুষ্প উৎকর্ণ হয়ে ওঠে। জলি বলে, 'আমি ছেলেটাকে একটা চিঠি দিয়ে সব সাফ সাফ জানিয়ে দিচ্ছি—একটা খাম দে—নাম ঠিকানাটা বল—'

'গুর্জিট সিং, এফ সি আই ইনস্পেকটর, পোস্ট মহামাসকারি, ভায়া গৌনিআনা, জেলা ভাটিন্ডা।'

জলি চিঠি লিখতে বসে যায়। নসিবকেই যে পুষ্প বিয়ে করবে এবং ওদের জানাশোনা যে কত গভীর, তা সে বেশ গুছিয়েই লেখে। চিঠির নিচে অবশ্য নাম দেয় না। তারপর, জলি বাড়ি গিয়ে একটা অজুহাত দেখিয়ে আবার বেরিয়ে পড়ে। ভুইরূপা থেকে বাস ধরে রামপুরা এসে চিঠিটা ডাকবাকসে ফেলে। তারপর যায় অধ্যাপক সজ্জনের বাড়ি। নসিব নেই, অনেকক্ষণ হলো বাজারে যাবে বলে বেরিয়েছে। এখনও ফেরেনি। অধ্যাপক কৌতূহলী হয়ে জানতে চান জলি এত খোঁজখবর নিচ্ছে কেন। জলি জবাব দেয়: 'পুষ্পি আমাকে পাঠিয়েছে। বাড়িতে আটকে দিয়েছে—এইটা আপনাদের জানাতে এসেছিলাম।'

'য়্যাঁ! সর্বনাশ!' সজ্জন বইটা সশব্দে টেবিলের ওপর রাখেন। চশমার কাঁচ মোছেন রুমাল দিয়ে। ধীরে ধীরে বলেন, 'আমিও অপেক্ষা করছিলাম পুষ্পর জন্যে। কিন্তু — না, তুমি এখন বরং গাঁয়ে ফিরে যাও। সন্ধ্যে হয়ে আসছে—নসিব এলে আমি বলে দেব। ও তো আসবেই এখানে, কিন্তু এত দেরি হচ্ছে কেন—' অধ্যাপক একটু যেন চিন্তিত।

'স্যার—নসিব এলে ওকে গাঁয়ে যেতে বলবেন। আমার সঙ্গে যেন আগে দেখা করে—'

জলির সমমর্মিতায় অধ্যাপক খুশি হলেন।

'আরে, তুমিও তো দেখছি আমার দলে। আমরা ঠিক কাজটা করে ফেলব, কী বলো?'

সন্ধ্যের দিকে জলি ফিরে আসে কোটিতে। পুষ্পর সঙ্গে দেখা করে সব কথা জানিয়ে দেয়। পুষ্পর মনের ভার অনেকটা হালকা হয়ে যায়। বারবার জিজ্ঞেস করে, 'খামের মুখ ঠিকমতো এঁটেছিলি তো?'

অদৃষ্টের খেলায় কেউ কখনও জিততে পারে না। সব কায়দাকৌশল পরিকল্পনা অদৃষ্টের কাছে বানচাল হয়ে যায়। অদৃষ্টই কখনো অবস্থাকে অনুকূলে রাখে, কখনো প্রতিকূলে ঠেলে দেয়। আর, এরই মধ্যে সত্যাসত্য লুকিয়ে পড়ে। অদৃষ্ট সব কিছুকেই ওলোট-পালোট করে ছাড়ে।

তৃতীয় দিন, কুকুর-কামড়ে ক্ষতবিক্ষত, গাঁয়ে নসিবের লাশ পৌঁছবার খবর পেয়েই পুষ্প অজ্ঞান হয়ে পড়ে। দয়ালি ধুনোর ধোঁয়ায় মেয়ের জ্ঞান ফেরার চেষ্টা করে। পুষ্পর দাঁতে দাঁত লেগে গেছে। দয়ালি বলে, 'মেয়েটাকে কেউ নজর দিয়েছে।' পুষ্পর দাঁত

খুলেই আবার লেগে যায়। কারণ বুঝতে দয়ালি ও হরদিতের অসুবিধে হয় না। তাদের শঙ্কাও হয়, মেয়েটার প্রাণ না বেরিয়ে যায়। ভয়ও হয়, মেয়ের মুখ ফসকে যদি নসিবের নামটা বেরিয়ে আসে! তাহলে তো কেলেংকারির একশেষ হবে। মানইজ্জত সব যাবে, লোকের মুখে-মুখে বদনাম চাউর হয়ে যাবে।

জলি খবর পেয়েই ছুটে আসে। বান্ধবীকে সামলাবার চেষ্টা করে।

চার

নসিব-হত্যার খবর পাঞ্জাবি দৈনিকে ছাপা হয়। 'পুলিশি অনুসন্ধান' চললেও হত্যাকারীর হদিশ পাওয়া যায়নি। এর ঠিক পনেরো-কুড়ি দিন পর হরদিৎ মহামায় যায়। গুর্জটকে বাড়িতেই পায়। অনেক বোঝানো সত্ত্বেও সে কিন্তু বিয়েতে রাজি হয় না। নানা টালবাহানার পরও হরদিৎকে নাছোড়বান্দা দেখে সরাসরি বলে দেয়, পুষ্পকে সে বিয়ে করতে রাজি নয়ঃ 'দয়া করে কারণ জিজ্ঞেস করবেন না।'

জলির চিঠি গুর্জট পায়। এবং স্বাভাবিকভাবেই পুষ্পকে বিয়ে করার ইচ্ছা বিসর্জন দেয়। তারপর, নসিব-হত্যার খবরটা একটা প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে তার মনে। যে মেয়ের জন্যে লোক খুন হয়, তাকে বিয়ে কদাপি নয়!

হরদিৎ নিরাশ হয়ে গ্রামে ফিরে আসে।

বাড়ি এসে দেখে পুষ্প হরিন্দরকে সঙ্গে নিয়ে পাতিয়ালা চলে গেছে। জিনিসপত্র কাপড়চোপড় নিয়ে গেছে। যাওয়ার সময় বলে গেছেঃ 'আমার বিয়ে দেবার চেষ্টা কোরো না। আমি এম.এ পড়ব। ক্যামপাসের ব্যাংকে আমার হাজার খানেক টাকা জমা আছে। ওই টাকাটা ফুরোলে আমি হরিন্দরকে চিঠি দেব। হরিন্দর এসে আমাকে টাকা দিয়ে যাবে। এখানে আর আমি ফিরব না। আমার কোনও ব্যাপারে তোমরা আর মাথা ঘামাবে না। বিয়ে, আমি সময় হলে যাকে খুশি করব। আমি কারও কাছে বন্ধকী নই। বাবাকে কথাগুলো জানিয়ে দেবে—জোরজুলুম করলে তোমাদের মানইজ্জতের দফারফা করে ছেড়ে দেব।'

পাতিয়ালা যাওয়ার আগে পুষ্প কাঁদতে-কাঁদতে হরিন্দরকে সব কিছু বলে। হরিন্দর তার এই দিদিটিকে ভীষণ ভালবাসে। দিদির জন্যে সে প্রাণ দিতেও তৈরি। হরিন্দর আর আগের মতো ছেলেমানুষ নয়; যুবক, অর্থাৎ বড় হয়েছে। সব কিছুই বুঝতে পারে। দিদিকে ভরসা দেয় সে, 'এখন কী করতে হবে, বল্।'

'আমাকে পাতিয়ালা নিয়ে চল্। একা যেতে পারতাম, কিন্তু সাহস পাচ্ছি না। বড় ক্লান্ত হয়ে পড়েছি।' (মনে পড়ে, 'নসিবকে কথা দিয়েছিলাম...')

এরপর হরিন্দর মার কাছে থেকে টাকা চায়। বাড়ির টাকা এখন গ্রামের ব্যাংকে বা রামপুরার ব্যাংকে থাকে। তবে দয়ালির কাছে পাঁচশো-হাজার টাকা সব সময়েই মজুত থাকে। বাকসো সিন্দুক কৌটো কিংবা ডিবেতে দয়ালি টাকা ছড়িয়ে রাখে। হরদিতৎও

দয়ালির কাছ থেকেই টাকা নেয়। হরিন্দর পাতিয়ালা যাওয়ার জন্যে পাঁচশো টাকা নেয়। টাকাপয়সা সঙ্গে থাকা ভাল; কখন কি দরকার হয়।

হোস্টেলের সে কামরায় পুষ্প থাকত, সেটিই আবার পাওয়া গেল। ওর অনেক জিনিষপত্র এখনও কামরাতেই আছে। নেই শুধু বাদ-পড়া ক্লাসের লেকচার-নোটস। অসুবিধে হবে না, নোট কারও খাতা থেকে টুকে নেওয়ার জন্যে পুরো বছরটাই পড়ে আছে।

হোস্টেলে অন্য মেয়েদের পুষ্প বলে : 'অসুখে পড়েছিলাম, তাই এতদিন আসিনি' পুষ্পর হতশ্রী চেহারা দেখে কেউ অবিশ্বাস করে না। আড়চোখে দেখলেও কেউ কৌতূহল প্রকাশ করে না। পদ্মা, এক ক্ষত্রিয় বাড়ির মেয়ে, পুষ্পর সঙ্গে কলেজে পড়ত, এবং সব খবরই রাখত, সে-ও কিছু বলে না। শুধু অবাক চোখে পুষ্পর ম্লান চেহারা ও নিষ্প্রভ চোখ দুটি দেখে যায়। নিষ্প্রভ সেই চোখে টলটলে জলও পদ্মার চোখ এড়ায় না। একান্তে সে সান্ত্বনা দেয় পুষ্পকে। হরিন্দরকেও পদ্মার ভাল লাগে।

ওদিকে, হরদিৎও দমবার পাত্র নয়। মহামায় ছেলে হাত থেকে বেরিয়ে গেছে তো কী হয়েছে, আর কী ছেলে নেই না কী! তবে, পুষ্পর এইভাবে পাতিয়ালা চলে যাওয়াটা হরদিতের ভাল লাগেনি: ঠ্যাটা মেয়ে! আক্কেল বলে কিছু নেই। ছেলেদের চেয়ে মেয়েদের বিগড়ে যাওয়াটা বড় সাংঘাতিক। কিছুতেই সিধে করা যায় না। দয়ালিকে হরদিৎ একটি কথাই ঘুরে-ফিরে বলে, 'আহা, ওদের একটু আটকাতে পারলে না?' দয়ালি একই জবাব দেয়: 'তোমার মেয়ে তো এমনিই একরোখা, জেদি—কতক্ষণ আর পেরে উঠি ওর সঙ্গে?' হরদিৎ প্রসঙ্গান্তরে যায়, 'মহামার ছোকরা কিছুতেই রাজি হলো না। ভেবেছিলাম আরও কিছু টাকা ছাড়ব—কিন্তু ছেলেটা রাজি হলো না।'

'অন্য ছেলের খোঁজ করো। ছেলের তো আর আকাল পড়েনি—কিন্তু তোমার মেয়ে যদি রাজি না হয়?'

হরদিৎ চুপ পরে কি যেন ভাবে। তারপর জবাব দেয়, 'ঠিক আছে। পুষ্পি এখন পড়তে চায় পড়ুক। এখনই তো আর বুড়ি হয়ে যাচ্ছে না!'

দয়ালিও স্বামীর কথায় সায় দেয় : 'আমার মেয়ে তো আর পাঁচটা মেয়ের মতো নয়। ভাল মেয়ে—' তারপর একটু নিচু গলায়, 'নাপতের ছেলেকে—তা সে কাঁটা তো ভগবানই তুলে দিয়েছেন। আমাদের মানইজ্জত বেঁচে গেছে। কী অঘটনই না ঘটত!'

হরদিৎ আঙুল দিয়ে কান চুলকোয়। কাঁটা কী এমনিই উঠে গেছে? শালা নাপতের বাচ্চা! কাঁটা না তুলে ছাড়তাম? কান থেকে আঙুল বের করে হরদিৎ গলা সাফ করে পায়ের ওপর থুতু ফেলে।

পুষ্পকে পাতিয়ালা পৌঁছতে গিয়ে হরিন্দর সেই রাতটা ওখানেই থেকে যায়। পদ্মা আসতে দেয়নি। বলেছে : 'পুষ্পার মন ভাল নেই, যদি কিছু ঘটে যায়—' তারপর একটু হালকা সুরে, 'পালাই-পালাই করছ কেন? মেয়েদের হোস্টেল বলে ভয় লাগছে? ভাবছ, তোমাকে সব গিলে খাবে? ভয় নেই—গেস্টরুমে তোমার থাকার বন্দোবস্ত করে দিচ্ছি, ভোরে উঠে চলে যাবে।' পুষ্পও হরিন্দরকে থেকে যেতে বলে। হরিন্দর ফিরতে মা-বাবা স্বাভাবিকভাবেই মেয়ের খবর নেয়। হরিন্দরের ভয় ছিল, বাবা হয়তো চেঁচামেচি করবে। কেন বাবার অনুমতি ছাড়া দিদিকে নিয়ে গেল? না, সে-রকম কিছুই ঘটল না। দয়ালি

জানতে চায় : 'ঠিকঠাক পৌঁছেছিলি তো? কবে ফিরবে তোর দিদি?' হরদিৎ জিজ্ঞেস করে, 'হ্যাঁ রে, পুষ্পির হাতে টাকাপয়সা আছে তো?' দয়ালি জানিয়ে দেয় পুষ্পকে যাওয়ার সময় পাঁচশো টাকা দেওয়া হয়েছে। হরিন্দর জানায়, 'ব্যাংকে দিদির কিছু টাকা আছে—ফুরিয়ে গেলে চিঠি দেবে বলেছে। আমি গিয়ে টাকা দিয়ে আসব।'

'কেন? সে তো নিজেও আসতে পারে। ওর ঘাবড়াবার কিছু নেই। এখানে এলে তো মেয়েটার সঙ্গে একটু সুখ-দুঃখের কথা বলা যাবে।'

'পুষ্পি এ-মুখো হবে না বলে গেছে।' দয়ালি বলে ওঠে।

'ছেলেমানুষ! অভিমান হয়েছে। আরে, আমরা কী ওকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিয়েছি নাকী? সামনের মাসে না এলেও, পরের মাসে বেটি ঠিক আসবে। বাপের ওপর রাগ করে কতদিন থাকবে?' হরদিৎ নিজেকে যেন সান্ত্বনা দেয়। দয়ালিও প্রবোধ দেয়, 'এখন পড়াশোনা করুক। এক সময় ঠিক আসবে। হরিন্দরই না হয় টাকা নিয়ে যাবে, দিদিকে নিয়েও আসবে এখানে!'

এরপর থেকে, হরিন্দর প্রত্যেক মাসেই পাতিয়ালা যেত। পুষ্পকে টাকাকড়ি দিয়ে চলে আসত। সঙ্গে নিয়ে যেত সর্ষের তেলের বোতল ও আরও নানা টুকিটাকি। শীতকাল আসি-আসি, দয়ালি তিল মক্কা আর গমের রকমারি খাবার-দাবার টিন ভর্তি করে মেয়ের কাছে পাঠিয়ে দেয়। হরিন্দর গেলেই পদ্মা তাকে থেকে যেতে বলে। হরিন্দর কিন্তু থাকে না। কেমন যেন লজ্জা-লজ্জা করে। আর, পাতিয়ালা এমন কী দূর? সকালে গিয়ে সন্ধ্যেতেই ফিরে আসা যায়। পুষ্পর সঙ্গে ঘণ্টা দুয়েক কথা বললেই তো কাজ শেষ। কিন্তু, হরিন্দর এলেই পদ্মা কোনও না কোনও ছুতোয় পুষ্পর কামরায় চলে আসে। ঘোরাফেরা করে। হরিন্দর একটু বিব্রত বোধ করে, আবার ভালও লাগে। ব্যাপারটা যেন বুঝেও বুঝতে পারে না। হরিন্দরের সঙ্গে নানা বিষয় নিয়ে কথা হলেও, পুষ্প ভুলেও মা-বাবার কথা জানতে চায় না। বাড়ি যাওয়ার কথাও বলে না। হরিন্দরও এ-বিষয়ে উচ্চবাচ্য করে না অবধি। পাতিয়ালা আসতে পারলেই সে খুশি। শহরের নানা জায়গায় ঘুরে বেড়ায়, মনে মনে খুব ইচ্ছে হয় বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হতে, আবার নতুন করে পড়াশোনা করতে।

পাঁচ

ডিসেম্বর মাসের একটি দিন। ঠাণ্ডাটা বেশ জাঁকিয়ে পড়েছে। দয়ালি হরিন্দরকে পাতিয়ালা পাঠায়। বলে, 'অনেকদিন হলো, দিদিকে এবার নিয়ে আয়। কতদিন দেখিনি! শীতকালে সর্ষে-শাক আর মক্কার রুটি খেতে বেচারা খুব ভালবাসে। শহরে এসব ওকে কে দেবে?'

ডিসেম্বরের ছুটি হব-হব। হরিন্দর দুদিন আগেই যায়। কিন্তু, পুষ্প আসতে একেবারেই রাজি নয়। পদ্মা বুঝিয়ে বলে, 'হোস্টেলে একা থেকে কী করবে? সবাই বাড়ি যাবে, তুমিও যাও।'

পুষ্প জবাব দেয়, 'বাড়িতে থাকা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। ফাঁকা-ফাঁকা লাগবে সব'

'কিন্তু, হোস্টেলে তো আরও ফাঁকা লাগবে! কেউ থাকবে না—ফাঁকা লাগবে না তোর?' হরিন্দর জিজ্ঞেস করে।

পুষ্প নিরুত্তর। হরিন্দর পীড়াপীড়ি করতে একটু রেগেই যায় : 'বলছি না আমি যাব না! ছুটিতে এখানেই পড়াশোনা করব—আমার অনেক নোট করা বাকি আছে। বাড়ি গেলে অসুবিধে হবে। আর, বাড়িতে আছেই বা কী? এখানে আমি বেশ আছি।'

দিদির ভাবসাব দেখে হরিন্দর আর কিছু বলে না। পদ্মা বলে, 'ঠিক আছে। ওর কাজ আছে যখন, নোটস—'

পুষ্প হঠাৎ চোখ তুলে পুষ্পর দিকে তাকিয়ে হেসে ফেলে। হরিন্দর সেই কাঁধ-ঝোলাটা নিয়ে 'দিদি আজ যাই তাহলে' বলতে পুষ্প বলে ওঠে :

'উহুঁ। ফুলে একটা ভাল ছবি এসেছে। তিনটে ছটার শো-টা দেখে আসব আমরা। পদ্মাও যাবে।'

প্রস্তাব শুনে পদ্মা ও হরিন্দর হতভম্ব হয়ে পরস্পরের দিকে তাকায়, 'না' বলতে পারে না। সেদিন হরিন্দরকে রাতে থেকে যেতে হলো। ছবি দেখে ওরা ফেরে সন্ধ্যের দিকে। পদ্মা মেসে তিনজনের খাওয়া রাখার কথা বলে গিয়েছিল। পুষ্পর ছবিটা মন্দ লাগেনি। পদ্মার আবার নায়িকাকে ঠিক ভাল লাগেনি। হরিন্দরের কাছে 'প্যার মহব্বতের' গল্প বড় বস্তাপচা লেগেছে। ফলে সে স্পষ্ট মতামত দেয়, 'একদম ঝুল! একপেশে ডায়ালগ, একঘেয়ে গান, আড়াই তিন ঘণ্টা ঝাড়া বোর হতে হলো!'

জবাব দেয় পুষ্প, 'ও-সব তুই বুঝবি কি—একদম গেঁইয়াই থেকে গেলি!'

হরিন্দর রেগে গিয়ে বলে, 'তুই বড় বুঝদার হয়েছিস! তোর গায়ে এখনও কোটে খড়কের গন্ধ, দুদিন পাতিয়ালায় থেকে বড় শহুরে বনে গেছিস!' হরিন্দরের রাগ দেখে পুষ্প-পদ্মা, দুজনেই হেসে ফেলে। ছদ্ম গাম্ভীর্যে পুষ্প একটা জবাব খাড়া করার চেষ্টা করে। পদ্মা কিন্তু হেসেই যায়।

পুষ্প কিন্তু ছবির কথা একবারও ভাবেনি। ছবির বিষয়বস্তু তাকে নসিবের কথা নতুন করে মনে করিয়ে দিয়েছে। এইসব ভাবতে ভাবতে আনমনা হয়ে, সে আর থালা থেকে রুটি তোলে না। হরিন্দর ওর হাতটা ছোঁয়, 'কীরে রুটি খাচ্ছিস না!'

পুষ্প সচেতন হয়ে ওঠে, রুটির টুকরো মুখে দেয়। পদ্মার দিকে তাকিয়ে হাসে। তারপর বলে, 'আর খাব না—বড়ো ঘুম পাচ্ছে! শুয়ে পড়ব এখন।'

'আজব ব্যাপার!' পদ্মা হেসে মন্তব্য করে, 'মহারানীর আজ দশটার সময় ঘুম পাচ্ছে—অন্যদিন তো বারোটা অবধি জাগো—আজ একী হলো? হরিন্দর বেচারা ভোরেই চলে যাবে—একটু কথাটথা বলো অন্তত!'

'ওই ভূতটার সঙ্গে আবার কী কথা!' পুষ্প সহজ হওয়ার চেষ্টা করে। পদ্মা আবার হাসে। পুষ্প বলে, 'আমি বাপু এখন ঘুমোব—তুই বরং ওই ভূতটার সঙ্গে কথা বল!'

পুষ্পর সরস মন্তব্যে হরিন্দর ও পদ্মা একটু অবাক হয়।

হরিন্দরের বিছানা গেস্টরুমে। পুষ্প নিজের কামরায় ঢুকে লেপ মুড়ি দেয়। পদ্মা হরিন্দরকে নিজের কামরায় নিয়ে যায়। গল্প করে নানা বিষয়ে। পদ্মা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকদের চালচলন নকল করে দেখায়, হরিন্দর তার কলেজের। পদ্মা একসময় অধ্যাপক সজ্জনের কথা উল্লেখ করে। সজ্জনের উল্লেখে হরিন্দর একটু গম্ভীর হয়ে যায়। তবুও, পদ্মা সজ্জন সম্পর্কে আরও কিছু জানতে চায়, শুনেছে এত ভাল লোক নাকী হয় না। ছাত্রদের সঙ্গে একেবারে বন্ধুর মতো মিশে যান। এ-হেন অধ্যাপকের সঙ্গে আলাপ করতে পদ্মার খুব ইচ্ছে। এ লোকের পায়ের ধুলোও পবিত্র। পুষ্পর কাছ থেকেই পদ্মা অধ্যাপক সম্পর্কে অনেক কিছু জেনেছে।

হরিন্দরের চোখে ঘুম আসে। পদ্মা বলে, 'যাও শুয়ে পড়ো।' হরিন্দরকে গেস্টরুম অবধি সে পৌঁছে দেয়। আশপাশের কামরায় মেয়েরা ঘুমিয়ে পড়েছে। দু একটা কামরায় আলো জ্বলছে। হয়তো পড়ছে, না হলে আলো না নিভিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে।

পরের দিন থেকে ডিসেম্বরের ছুটি। ভোর হতেই মেয়েরা জিনিসপত্র গোছগাছ করতে লেগে যায়। দুটি পিরিয়ড হয়েই ছুটি—তারপর সবাই দৌড়বে ট্রেন কিংবা বাস ধরতে। রাতে দেরিতে শোয়ার ফলে হরিন্দরের ঘুম ভাঙতে দেরি হয়। ঘুম থেকে উঠেই বিছানা বগলে সে পুষ্পর কামরায় চলে আসে। পুষ্প দেওয়ালে একটা বালিশ রেখে, তাতে পিঠ ঠেকিয়ে একটা বই পড়ছিল। হরিন্দর সামনের চেয়ারটায় বিছানা রেখেই বলে, 'চা?'

'হুঁ।' পুষ্প বইটার পাতা মুড়ে পাশে রাখে। ভাইয়ের দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসে।

'হুঁ-ফু নয়! আগে চা দে নইলে আমি চলি—ঘুমে এখনও চোখ টানছে!'

'চান করবি না? বাথরুমে যাবি না?'

'সব পরে। এখন চা—'

পুষ্প হিটারে জল চাপায়। হরিন্দর খাটের ওপর থেকে একটা পত্রিকা টেনে পাতা ওলটায়। পুষ্প যায় পদ্মার কামরায়। পদ্মা এখনও লেপের নিচে। পুষ্প ডাকতেই উঠে বসে : 'য়্যাঁ—এত বেলা হয়ে গেছে!'

'রাতে শুয়েছিলি কখন?'

'মনে নেই। গল্পে-গল্পে দেরি হয়ে যায়।' তারপরই জিজ্ঞেস করে, 'হরি চলে গেছে?'

'না—মহাপ্রভু তো এখন ঘুম থেকে উঠলেন! হুকুম দিলেন, চা চাই—চা খেয়ে উনি তবে যাবেন! আমি চায়ের জল চাপিয়ে এসেছি।'

পদ্মা ও পুষ্পর চা-পাতা এক জায়গায় থাকে। ফলে, পদ্মা পুষ্পকে অনুসরণ করেই কামরায় ঢোকে। হরিন্দরের সঙ্গে চোখাচোখি হতে হাসে। সদ্য ঘুম ভাঙা পদ্মাকে বড় সুন্দর মনে হয় হরিন্দরের। এলোমেলো চুল, আলস্য-শিথিল চেহারা, গভীর হাসিভরা চোখ। তিনজনেই একসঙ্গে চা খেতে বসে যায়। ওরা দু পিরিয়ডের জন্যে তৈরি হয়। হরিন্দর ইতিমধ্যেই স্নান সেরে নেয়। হিটারে জল গরম করে পদ্মা ও পুষ্প হাতমুখ ধুয়ে নেয়। এই ঠাণ্ডায় কে চান করে? ওরা এমনিতেই চান করে তিন চার দিন অন্তর, তাও রবিবার কিংবা ছুটির দিনে। পদ্মা যাবে সঙ্গরুর। পুষ্প বলে, 'বাড়ি গিয়ে কী করবি, এখানে থাকলে অন্তত পড়াশোনাটা করতে পারবি—মেয়েদের চিল্লামিল্লি থাকবে না।

'দুদিন পরেই চলে আসব। আমরাও বাড়ি যেতে ইচ্ছে করে না।' মাথায় চিরুনি চালাতে-চালাতে হরিন্দরের উদ্দেশ্যে প্রশ্ন করে, 'তুমি কখন যাবে?'

'আমি যাওয়ার জন্যে তৈরি। দিদি বললেই—'

'দিদি 'না' বললে?'

পুষ্প জবাব দেয় মাঝখান থেকে, 'বটে! দিদি 'না' বললে—আরে, তুইও যদি 'না' বলিস, ভূতটা যাবে না'

পদ্মা সঙ্গে সঙ্গে জবাব দেয়, 'আমি তাহলে না-ই বলব!

হরিন্দর বেশ বিব্রত বোধ করে। ব্যাগটা কাঁধে নিয়ে বলে, 'আমি তাহলে মানে-মানে কেটে পড়ি।'

'কটা বেজেছে?' পদ্মা জিজ্ঞেস করে।

'নটা বাজে।'

'আর তিন ঘণ্টা থেকে যাও। আমি বারোটার সময় আসব—যাব সঙ্গরুর—আমার সঙ্গে যেয়ো, প্লিজ। এখন লক্ষ্মী ছেলের মতো ব্যাগটা রেখে দাও। একটু গড়িয়ে নাও কিংবা একটু ঘুরে এসো।'

পুষ্প ফোড়ন কাটে : 'কী রে, এখন তো দেখি নড়ার ক্ষমতা নেই!'

হরিন্দর কিছু জবাব দেওয়ার আগেই পদ্মা তার কাঁধ থেকে ব্যাগটা নামিয়ে নেয়। টেবিলের ওপর রেখে দেয়।

ওরা বেরিয়ে যাওয়ায় পর হরিন্দর ব্যাগ থেকে একটা উপন্যাস বের করে। গতকাল গাঁ থেকে বেরোবার সময়ই সে উপন্যাসটা পড়া শুরু করেছিল। বারনালা অবধিও বইটা ঠিক সুবিধের লাগেনি। তিরিশ পয়ঁত্রিশ পাতা পর্যন্ত গল্প দানা বাঁধেনি। একবার মনে হয়েছিল বই পড়া বন্ধ করে বারনালা বাসস্ট্যাণ্ড থেকে একটা পত্রিকা কিনে নেবে। তারপর কি ভেবে, পত্রিকা না কিনে বইটাই পড়তে থাকে। লেখক নামজাদা বাঙালি ঔপন্যাসিক। মূল বাংলা থেকে পাঞ্জাবি ভাষায় অনুবাদ। হরিন্দরের মনে হয় অনুবাদটা ভাল হয়নি। তবুও সে পড়ে যায়, আর কী আশ্চর্য আরও কিছুটা পড়ার পরই, নিজের অজান্তে সে গল্পের মধ্যে ডুবে যায়! পাতিয়ালা পৌঁছতে-পৌছঁতে দুশো পাতা শেষ, এখনও দেড়শো পাতা আছে। পুষ্প ও পদ্মা ফেরার আগেই বইটা শেষ হয়ে যায়। বইটা শেষ করে খাটে রাখতে-রাখতে নিজের মনেই সে বলে ওঠে : 'শরৎচন্দ্র—জিন্দাবাদ!'

ঠিক সেই সময় ঢোকে পদ্মা ও পুষ্প। পদ্মা জিজ্ঞেস করে, 'জিন্দাবাদ'?

হরিন্দর নিরুত্তর থাকে। পদ্মা জিনিসপত্র গোছাতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে।

ছয়

কেন্দ্রে জনতা পার্টি কোনও ক্রমে আড়াই-পৌনে তিন বছর টিকে থাকে। নিজেদের মধ্যে ওরা খেয়োখেয়ি শুরু করে দেয়। ফের লোকসভার নির্বাচন হতে ইন্দিরা গান্ধির কংগ্রেস—অর্থাৎ ইন্দিরা কংগ্রেস—জিতে যায়। প্রায় সব রাজ্যেই ইন্দিরা-কংগ্রেস ক্ষমতায় আসে। পাঞ্জাবের লোক হাসাহাসি করে মন্তব্য করে, 'ইন্দিরা এসে গেছে।'

কংগ্রেসের বিকল্প দিতে-দিতে বামপন্থীদের অবস্থা কাহিল। বোদ্ধারা অভিমত দেয়, 'এদেশে আর কিস্যু হবে না। সব জোড়াতালি দিয়ে চলবে। পাগড়ির রং বদলাবে কখনও নীলে, কখনও শাদায়। ছেলেরা বাপু ঠিক লিখেছিল দেওয়ালে 'চিট্টে বগুলে নীলে মৌর—ওভি চৌর, ওভি চৌর!' কালো পাগড়ি আর লাল ঝাণ্ডাওয়ালা—সবাই এখন কাত—'

কংগ্রেসের চুনোপুঁটি নেতাদের বাজারও এখন বেশ রমরমা। ছোটখাট সে সব নেতারা কংগ্রেস ছেড়েছিল, তারা এখন আবার কংগ্রেসে ভেড়ার তালে ঘুরছে।

হরদিল এবার অকালি টিকিট পায়নি। অতএব, ভেতরে-ভেতরে লাইন করে কংগ্রেসে ভিড়ে যায়। ঠিক করে সে, কালকের ছোকরা অকালি প্রার্থীকে জবর শিক্ষা দেবে, কিন্তু হলো না, সেই ছোকরাই শেষ অবধি জিতে যায়। কংগ্রেসি হরদিলকে দেখে লোক হাসে। বলে, 'হরদিল ঠিক জায়গায় গেছে এবার—'

'ও শালার আবার পার্টি। শালা চোর!'

'লুটপাট চুরিজোচ্চুরি করে সারাজীবন কাটিয়ে দিল! তবে, এবার টিকিট পাবে—'

গৌদি ও গৌদির স্ত্রী মারা গেছে। ছেলে বদ্রিনারায়ণ ঝুতিরের কাছে ঘুড্ডুবালে এক প্রাইমারি স্কুলে শিক্ষকতা করে। এখন শিক্ষক ইউনিয়নের কাজে ব্যস্ত থাকে সারাক্ষণ। এখনও বিয়ে-থা করেনি। মনপ্রাণ দিয়ে ট্রেড ইউনিয়ন করে যায়। অত্যন্ত সৎ এই যুবক, কাঁধে ঝোলা নিয়ে—কি দিন কি রাত—টইটই করে ঘুরে বেড়ায় ইউনিয়নের কাজে। চমৎকার বক্তৃতা দিতে পারে। বিতর্কিত আমলা সম্বন্ধে যখনই মুখ খোলে, তীক্ষ্ণ বিশ্লেষণে তাকে তুলোধোনা করে ছেড়ে দেয়। বিক্ষুব্ধ সরকারি বা আধা-সরকারি কর্মী, মজুর কিংবা কিষান, খবর পেলেই হলো বদ্রি ঝাণ্ডা নিয়ে ঠিক পৌঁছে যাবে! এই সবের জন্যে মাঝেমধ্যে জেলটেলও খাটে। খাওয়াদাওয়া জামাকাপড় সম্বন্ধে উদাসীন। পেট হয়তো খিদেয় চুঁই চুঁই, জামার কলার ফেটে গেছে, চপ্পলের ফিতে ছিঁড়ে গেছে—বদ্রি কিন্তু নিস্পৃহ। দু একদিন খেতে না পেলেও তার কিছু যায় আসে না। বাসে উঠতে গেলে বন্ধুবান্ধবের কাছ থেকে গোটা পাঁচেক টাকা চেয়ে নেয়। জনতা পার্টি হেরে যাওয়ার পরই কংগ্রেস গদিতে বসতে, বদ্রিনারায়ণ একটা প্রচণ্ড ঘা খায়। কমরেডি ছেড়ে সে চলে যায় জলন্ধরে। একটা কাগজে সাব এডিটরের চাকরি নেয়, তারপর মাস ছয়েক পর গাঁয়ে আসে। সপ্তাহ খানেক থেকে পৈতৃক এক খণ্ড পতিত জমি এক জাঠকে বেচে, সেই টাকায় অর্ধেক বন্ধকী জমি ছাড়িয়ে নেয়। ওই জমিতে সে সফেদা চাষের ভার দেয় কন্নু চামারকে। একশো টাকা মাইনেতে কন্নুর এক সহকারীও রাখা হয়। এরপর দু তিন মাস অন্তর এসে-এসে বদ্রি চাষবাস তদারকি করতে থাকে। পাড়াপড়শির তাক লেগে যায় বদ্রির কাজকর্ম

দেখে : 'গৌদি বামুনের ব্যাটা তো আমাদের তাজ্জব করে দিচ্ছে রে! বলে কি, তিন বছরের মধ্যে এইসব সফেদা বিক্রি হয়ে যাবে এক একটা চার পাঁচশো টাকায়! সফেদা ফলেছেও বটে—চার পাঁচ হাজারের বেশি তো কম নয়! এতো দেখি রাতারাতি লাখপতি বনে যাবে!'

'আরে বাবা—পেটে বিদ্যে আছে! বুদ্ধিমান, জাতপাতের ধার ধারে না—বলিয়ে-কইয়ে ছেলে—সাত বছরে অন্তত তিনটে ফসল তুলবে।'

'চাল গমের চাষে আর কিছু হবে না! সফেদার রসায়নবিদ্যেটা জানা থাকলে কোনও ঝামেলা নেই, তবে মাথার কাজ আছে রে ভাই!'

কিছুদিন পরই বদ্রি এক বিএড অধ্যাপিকাকে বিয়ে করে ফেলে। অধ্যাপিকার চাকরিটি সরকারি। আগে কমিউনিস্ট পার্টি করতেন। জন্ম নাপিত-শিখের ঘরে। বাবা অবসরপ্রাপ্ত ফৌজি। বদ্রির চেয়ে অধ্যাপিকা তেরো চোদ্দ বছরের ছোট। বদ্রি কোটেতে এলেই লোকে তাকে আপ্যায়ন করে চৌপালে বসায়। নানা কথা জানতে চায়। যেমন :

'বদ্রি, তোমার কাগজ কী বলে?'

'কেন? কাগজ পড়লেই তো জানতে পারবে।'

'না। আমরা ভাবছি ইন্দিরা-কংগ্রেস যদি নতুন কিছু—'

'নতুন কিছু করে? পাগল নাকী? কংগ্রেস প্রথমে কী করেছে? দেশটাতো এখন রাজনৈতিক দালালদের পকেটে, এই অবস্থায় নতুন কিছু কী হতে পারে?'

'মানে?'

'এই ধরো এমপি—কংগ্রেসেরই হোক, বা অন্য যে পার্টিরই হোক, জেতে শুধু টাকার জোরে। টাকা দেয় কে? পুঁজিপতিরা। ফলে পুঁজিপতিরা যা চায়, যেমন খুশি আইন বানিয়ে ফেলে লোকসভায়।'

'মানে, কুকুরকে মাংসের টুকরো দিয়ে বশ করা।' একজন মন্তব্য করে।

'দালাল ধান্দাবাজদের আবার পার্টি কি? ন্যায় নীতি ধর্মের বালাই নেই। স্রেফ চুরি করে টাকা মারা ছাড়া আর কোনও কাজ নেই। এমপি হওয়ার জন্যে লড়তে গেলে টাকা লাগে—টাকাটা আসে কোথা থেকে?' বদ্রি ব্যাখ্যা করে দেয়।

'এই বেশ্যাগিরি চলবে—আর আমরা সাক্ষিগোপাল হয়ে দেখে যাব।' একজন তিক্তভাবে অভিমত প্রকাশ করে।

'আমাদের পাঞ্জাবের কথাটাই ধর—' বদ্রি বলতে থাকে, 'এখনকার রাজ্যপাটের মালিক কে? যাদের বেশি জমিজমা আছে, তারা আর, ব্যবসায়ীরা। শিখ কংগ্রেসি—জুড়িদার হলো গিয়ে অকালি—জমিদার কিংবা জোতদার—লেজুড় হিন্দু-কংগ্রেসি আর জনসঙ্ঘী! যাদের আর এক নাম ভারতীয় জনতা পার্টি—ওপরে আছে তাবড়-তাবড় ব্যবসায়ী, বড়-বড় মিলের মালিক। সরকার যেই করুক আসল লড়াই এদের মধ্যে—কে গদি দখল করবে? কিষান মজুরের জন্যে কে আছে? কেউ নেই!'

'পণ্ডিত—একটা কথার জবাব দাও। তোমার পার্টি কিছু করছে না কেন? লাল ঝাণ্ডার কী হলো?' মাথা চুলকে একজন প্রশ্নটা সোজা ছুঁড়ে দেয়।

'কমিউনিস্ট পার্টি আর করবেটা কী? ছোট্ট একটা হিসেব নাও—ভোটাভুটির সময় কংগ্রেস বা অকালিদের কাছে কত কি থাকে, বাস জিপ মোটরগাড়ি, এমনকী হেলিকপ্টারও—আর কমরেডদের? স্রেফ একটা ঝড়ঝড়ে টুটাফুটা সাইকেল, ক্যারিয়ারে লাউড-স্পিকার—'

একজন শ্রোতা কথাটা শেষ করতে দেয় না, টিপ্পনি কাটে : 'তোমাদের কাছে যদি একটা কানা গাধাও না থাকে, তাহলে খামোকা ভোটে দাঁড়াও কেন?'

'মানুষকে আমরা বিশ্বাস করি বলেই! লোকের কাছে যাই, বুঝিয়ে বলি—'

'কথা তো তোমাদের বেশ চোখাচোখা। শুনতে বেশ লাগে। কিন্তু লোকে তোমাদের বিশ্বাস করে ভোট দেয় না কেন?'

'লোকে এখনও বুঝতে পারছে না। জাঁকজমক চাকচিক্যে তাদের মন ভুলে যায়। ছোট-ছোট কিছু ব্যাপার আছে। তাতে আটকা পড়ে। প্রথমেই জাতপাতের ব্যাপার এমনভাবে তুলে ধরা হয় যে লোক উলটোপালটা বুঝে বসে। প্রকৃত অবস্থাটা ঠিক আঁচ করতে পারে না।'

সমবেত শ্রোতারা বদ্রিকে সমর্থন জানিয়ে ঘাড় নাড়ে : হক কথা বলেছে সে। এরই মধ্যে একজন হরদিতের নাম করে বলে, 'আমাদের হরদিৎকে দেখো না! শালা জোঁকের মতো আমাদের রক্ত শুষে খায়। এতটুকু দয়ামায়া নেই—ওর দোসর আবার হরদিল সিং—একবার নীল পাগড়ি, একবার শাদা, একবার বেগুনি! শুয়োরের বাচ্চাটা খালি রং বদলায়,—লোকের সর্বনাশ করে আবার শহিদ বেদি বানায়!'

আর একজন জুড়ে দেয়, পাখশুই বা কম কীসে? নাম কিনতে টাকা দেয় সেলবাড়ার গুরুদ্বারে—আর জাঠেদের ঠকিয়ে জমিজমা মেরে সেই টাকায় বাড়ি বানায় মাইসর খানায়—শালা এক পয়সা ছাড়ে না কাউকে! লোকের রক্ত চুষে খায়—আবার গুরুদ্বারে টাকা দিয়ে পুণ্যি করে। লোককে দেখায়, দেখো, আমি কত বড় ধর্মাত্মা—পরমাত্মার দিকে আমার কত টান! বাঞ্চৎটা মরলে পোকা পড়বে ওর মুখে, বোনভাতারি . . . !'

সাত

প্রীতম মারা গেছে। বাড়িতে এমনিই থাকত না। কালেভদ্রে যেত। নন্দ কৌর একাই থাকত। কোনও রকমে দুটো রুটি বানিয়ে খেয়ে নিত। প্রীতম বাইরে চেয়েচিন্তে রুটি খেত, কেউ কেউ চা-ও দিত। আর কোথাও কিছু না পেলে সোজা চলে যেত পরাগদাসের ডেরায়। শতছিন্ন ময়লা পোশাক, হতশ্রী চেহারা—লোকে তবুও ওকে ভালবাসত। প্রীতমের সবচেয়ে বড় গুণ ছিল সত্যি কথা বলা। তার সত্যি কথায় লঙ্কার ঝাঁজ থাকলে, কেউ কেউ তাকে মারধোর করেছে, এমনকী হাড়গোড় অবধি ভেঙে দিয়েছে। কিন্তু, তার সত্যি কথা বলার অভ্যেসটি কেউ ভাঙতে পারেনি। ফলে, কার কাছ থেকে মার খেল, কেন খেল—সবই জানাজানি হয়ে যেত এক সময়।

চৌপালে মাঝেমাঝে নন্দ আসত প্রীতমকে বোঝাতে। কিন্তু, কাকস্য পরিবেদনা! প্রীতম নিরুত্তরে সব কথা শুনে যেত। দীর্ঘশ্বাস ফেলে নন্দ এক সময় উঠে পড়ত। প্রীতমের দুই মেয়ের একজনও বাড়ি এলে, হাত ধরে বাবাকে বাড়ি নিয়ে যেত। মেয়ে যত কথাই বলুক না কেন, বাপের মুখ দিয়ে একটি শব্দও নির্গত হতো না। সে কেঁদে ফেলত। কাঁদতে-কাঁদতে মেয়ের হাত ছাড়িয়ে চলে যেত। মেয়ে আবার বাবাকে ধরলে, সে শুধু ম্লান হেসে বলত : 'সবই আমার কর্মফল!' মেয়ে মাকে বোঝাতো, 'বাবা কর্মফল নিয়ে থাকুক, কি আর করা যাবে—কিন্তু তোমাকে তো ভেঙে পড়লে চলবে না। বাবা আর শোধরাবে না—তুমি এখন নিজের দেখ্‌ভাল নিজেই করো।'

সারা দিন প্রীতম যেখানেই থাকুক, রাত হলে চলে যেত পরাগদাসের ডেরায়। শীতকালে ওখানে একটা পুরু লেপ পড়ে থাকত। মারা যাওয়ার দু দিন আগে প্রীতম আর কোথাও যায়নি। ওই লেপ মুড়ি দিয়ে শুয়েছিল চুপচাপ। কারও কাছ থেকে কিছু চায়নি। চা রুটি, কিছু খায়নি। তিন দিনের দিন সকালে ডেরার সবাই দেখে প্রীতম মরে পড়ে আছে। নন্দর কাছে সঙ্গে সঙ্গে খবর পৌঁছে যায়। নন্দ আবার আত্মীয়স্বজনকে খবরটা জানিয়ে আসে। সবাই এসে প্রীতমের শবদেহ দাহ করে আসে। নন্দ অবশ্য বলেছিল, 'মেয়েদের খবরটা পাঠিয়ে দাও।' কিন্তু, কেউ নন্দর অনুরোধ রাখেনি। জবাব দিয়েছিল, 'অত দূর কে যাবে তোমার মেয়েদের খবর দিতে? ওদের আসতে-আসতে রাত পুইয়ে যাবে, তাছাড়া আমাদের তো কাজকর্ম আছে।' এরপর, মৃত প্রীতম সম্পর্কে আত্মীয়স্বজনদের মধ্যে সরস রসিকতা চলে।

'প্রীতম ছিল মালস্য মাল!'

'মালস্য মাল? হুঁ—যন্তরের হাত-বাকসো! স্রেফ মাল খেয়ে আক্কা জায়গাজমি উড়িয়ে দিল—তারপর, ব্যোম ভোলা সেজে একদম দাগু পাগলা! যাকে যা খুশি বলে দিত, লাজলজ্জা আকঢাক—কিচ্ছু না!'

'কিন্তু প্রীতমকে একা দোষ দিয়ে কী হবে? ওর সব্বনাশটা তো করল প্রথমে ঝাগুা, পরে ঝাগুার ব্যাটা হরদিৎ। একদম টুঁটি টিপে প্রীতমের দফারফা করে দিল।'

'ওটাই তো জমি হাতাবার জন্যে হরদিতের চাল—'

'নইলে, এত জমি শালা পায় কোথা থেকে?'

পুরনো দিনের কথা ওঠে। স্মৃতিচারণ শুরু হয়।

'ছিল তো চার পাঁচ বিঘে। বাকি স্রেফ হাতিয়ে নেওয়া—'

'কেমন করে?'

'নাজরের ঘরে ওই যে হরনামি বুড়ি? বুড়ি প্রীতমকে 'ভাই' বলে ডেকে ওর হাতে জমি তুলে দেয় দেখাশোনা করতে—হরনামির সঙ্গে প্রথম বিয়ে হয়েছিল যোগিন্দর সিং 'যোগী'-র—হরনামিই যেগিন্দরকে পথে বসায়। কাগজপত্রে যোগিন্দর মরে গেছে দেখিয়ে, প্রীতম জমির মালিক হয়ে বসে। হরনামি তখন যোগিন্দরকে ছেড়ে অন্য জায়গায় ভিড়েছে—বাড়ি নেই—'

পুরনো কথা শুনে নতুন শ্রোতারা অবাক হয়ে যায়।

প্রীতমকে দাহ করার পরের দিনই তার দুই মেয়ে চলে আসে। শ্মশানে গিয়ে যথারীতি ক্রিয়াকর্মাদি করে। গুরুদ্বারে গিয়ে ভোগ দেয়। দুই জামাই-ও হাজির থাকে। খরচ করে ভাগাভাগি করে। মেয়েরা মার কাছে থেকে যায়। জামাইরা চলে যায়। মেয়েরা মাকে যেন একটু বেশি ভালবাসা দেখিয়ে ফেলে। থেকে-থেকেই মার শরীর কেমন লাগছে জানতে চায়। মাথা টিপে দেয়, পা টিপে দেয়, স্নানের জন্যে জল গরম করে দেয়, মাথার তালুতে সর্ষের তেল ঘষে দেয়, খিচুড়ি রেঁধে দেয়, মুগের ডাল বানিয়ে দেয়, অনেক রাত অবধি গল্পসল্প করে—এক কথায় যত্নআত্তির ত্রুটি রাখে না। ব্যাপারটা খোলসা হয়ে যায় দু একমাস পর দুই জামাই কোটেতে আসতে। প্রীতমের চার-পাঁচ বিঘে জমি এখনও বাঁধা আছে মুকুন্দর ছেলে পরমজিতের কাছে। যোগিন্দরের কাছ থেকে হাতিয়ে নেওয়া ছ-সাত বিঘে এখন হরদিতের কাছে। জামাইরা দৌড়ঝাঁপ করে সমস্ত জমি নন্দর নামে করিয়ে নেয়। পাটোয়ারি তহসিলদারকেও ঘুষ দিয়ে বিনা বাধায় জমি নন্দর নামে নবীকরণ হয়ে যায়। এরপরই, জামাইরা ব্যস্ত হয়ে ওঠে জমি বেচার জন্যে। হরদিতের ছেলে হরিন্দর এখন বিএ ফাইনাল ইয়ার করছে, বাপের জায়গাজমির তদারকি করে। ব্যাপারটা বুঝেও যায় চটপট, কেননা ছেলেকে 'মানুষ' করার জন্যে বাবা আশপাশের পারিবারিক তথ্য আগেই দিয়ে দেয়। প্রীতমের জমি কেনার জন্যে পরমজিৎ ও হরদিৎ, এই দুই ঘাঘু খদ্দের তৈরি হয়ে থাকে। পরমজিতের চাকরিটা পাটোয়ারির কিন্তু সে নিজে কিছু করে না, কাজ করায় চাকরি থেকে বরখাস্ত হওয়া অন্য এক পাটোয়ারিকে দিয়ে। মাইনে তার মাসে দুশো টাকা। পরমজিতের নিজের ট্রাকটর আছে, আর আছে এক বারোমেসে ও দু জন খেতমজুর। নতুন তহসিলদার এলে পরমজিৎ তাকে ঠিক কবজা করে নেয় ভাল রকম দাদন দিয়ে। প্রথমেই দু বস্তা গম 'উপহার' দেয় একেবারে বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে! তারপর খানাপিনার আতিশয্যে তহসিলদারের মুখ একেবারেই বন্ধ করে দেয়। এইভাবেই, তহসিলদার কোটের সম্পন্ন অভিজাতদের একজন মধ্যমণি হয়ে দাঁড়ায়। ফি বছর নতুন জমি কেনে, জমি বাঁধা নেয়। পরমজিতের পাটোয়ারির নেকনজর এবার পড়ে প্রীতমের দশ-এগারো বিঘেয়। জমিটা জলের দামে নির্ঘাৎ পাওয়া যাবে। বিষয়ী লোক হলে কেউ অবিশ্যি এ জমি বেচত না। কিন্তু, বুড়ি নন্দ কৌর অতশত বোঝে না। সে শুধু বোঝে এই জমি বেচে মেয়ের কাছে গিয়ে থাকবে, ঝামেলাও থাকবে না, আবার খাইখরচের টাকাও

থাকবে। মায়ের এই ইচ্ছের আড়ালে মেয়েদের প্রভাবও কাজ করেছে। জামাইদের নিজস্ব জমি ভালই আছে। কম থাকলে, জামাইরা এই জমি না বেচে নিজেরাই এখানে থেকে যেত। দু জন আচমকা খদ্দের ভিড়ে যাওয়ায় জমির দামটা একটু চড়ে যায়। হরিন্দররের কানে কথাটা যেতে সে বাবাকে বলে, 'এত গাদাগুচ্ছের জমি নিয়ে কী হবে? আমাদের যা আছে, তা যথেষ্ট। তুমি বরং বন্ধকী বাবদ যে টাকাটা পাবে—সেইটুকুই নাও।' স্বভাবতই হরদিৎ ছেলের এই মনোভাব মেনে নিতে পারেনি। ছেলের গায়ে কলেজি হাওয়া লেগেছে, হুঁ! হরিন্দরের বন্ধুরা সমাজবাদী দর্শনে বিশ্বাসী। বিষয়সম্পত্তিকে বিষ বলে মনে করে। হরিন্দরও আজকাল বাবাকে ভয়ডর করে না। মুখের ওপর জবাব দেয় সব কথার। শেষ অবধি হরদিৎ হরিন্দরের কথাই শোনে। বন্ধকীর পাওনা টাকাটা নিয়ে গ্রামেরই ব্যাংকে জমা দেয়। পরমজিৎ পুরো জমিটা কিনে নেয়। দুই জামাইয়ের সঙ্গে নন্দ চলে যায়। কয়েকদিন পর দুই জামাই আবার আসে কোটেতে। ট্রাকটর-ট্রলিতে নন্দর মালপত্র তুলে নিয়ে যায়। প্রীতম ও যোগিন্দরের বাড়ি দুটি—মাঝখানে দেওয়ালসহ—কিনে নেয় পাখর নম্বরদারের ছেলে মেহের। জলের দামেই কেনে সে। নন্দর সঙ্গে বড় জামাইও হাজির থাকে। মেহের আগে থাকত একটা ঘুপচি অন্ধকার ঘরে। এখন, খোলামেলা একটা জায়গা পায়। মাঝখানের দেওয়ালে একটা দরজা বসিয়ে নেয় সে।

গ্রামের চৌপালে আলোচনা চলে।

'একেই বলে কপাল! প্রীতম নিজেকে সেয়ানা ভাবত—আট বিঘে জমি বাড়ি—সব হাওয়ার মতো উড়ে গেল!'

'হারামের জিনিস শালা হারামেই যায়!'

একজন একটু উত্তেজিত হয়ে বলে, 'উঁহু' এসব ওই শালা হরদিতের কারসাজি। প্রীতমকে চুল্লু ধরিয়ে পথে বসিয়েছে!'

'দেখো—হরদিতের কী হয় শেষ অবধি। ছেলেমেয়ে—দুটোই একেবারে বাপের উলটো। গরিবদের কথা ভাবে।'

'আসল কথাটা হলো, যতদিন উঁচুনিচু দুর্বল আর বলশালীর ভেদাভেদ থাকবে—ততদিনই এসব চলবে। যারা বলশালী তারা দুর্বলদের মারবে। যতদিন না এইসব ফারাক—অর্থাৎ ছোট-বড় জোরি-কমজোরি পয়সাওয়ালা গরিবের ফারাক ঘোচে, ততদিনই আমাদের এসব সহ্য করতে হবে। জমিতে সবার সমান অধিকার কায়েম হলেই পৃথিবী সুখি পৃথিবী হয়ে উঠবে।'

'কথাটা ঠিক, তবে কি জানো ভাই—আমাদের দেশে দালাল যতদিন থাকবে, ততদিন কিছু হবে না।'

আট

পাঞ্জাবি ভাষায় এমএ-তে ফার্স্ট ক্লাস পায় পুষ্প। বাড়িতেই সারাক্ষণ থাকে। বড় একটা বেরোয়-টেরোয় না। কারও বাড়ি বা রামপুরা—কোথাও সে যায় না। বাড়ির বৈঠকখানায়, আগে যেমন থাকত, সেই রকমই থাকে। কথাবার্তাও বলে খুব কম। সারাদিন ধরে পড়েই যায়—অনেক রাত অবধি। মাঝে বার কয়েক চা খেয়ে নেয়। হিন্দি পাঞ্জাবি পত্রিকা বই—এসবের মধ্যেই ডুবে থাকে। হরিন্দর রামপুরা থেকে বই পত্রপত্রিকা দিদির জন্যে নিয়ে আসে। কোন বই চাই—পুষ্প বলে দেয় ভাইকে। রামপুরায় পাবলিক লাইব্রেরি থেকে হরিন্দর বই আনে। লাইব্রেরিতে প্রচুর বই আছে। হিন্দি উর্দু ইংরিজি পাঞ্জাবি। অনেকদিনের পুরনো এই পাঠাগার। একদা, উৎসাহী কিছু পড়ুয়া এটি প্রতিষ্ঠিত করে। এখন প্রত্যেক বছরে সরকারি অনুদান আসে। এলাকার কেউ মন্ত্রিটন্ত্রী হলে—যে পার্টিরই হোক—লাইব্রেরির কার্যকরী সমিতি তার কাছ থেকে পাঁচ হাজার টাকা অন্তত আদায় করবে। ধর্মীয় সংস্থা বা রাজনৈতিক দলের সঙ্গে পাঠাগারের কোনও সম্পর্ক নেই। এখানে, প্রত্যেক পাঠকের সমান অধিকার, এবং প্রত্যেক ব্যক্তিমানসের উপযোগী বই মজুত থাকে।

পুষ্পর আড়ালে, দয়ালি আর হরদিৎ নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে : বিয়ের কথাটা পাড়লে কেমন হয়? তিরিশ পার হয়ে গেছে। মেয়ে হয়তো আমাদের কথা মেনে নেবে। এরপর বিয়ে দেওয়া তো অসম্ভব ব্যাপার হয়ে দাঁড়াবে। কিন্তু ওইটুকুই, মা বাবা—কেউই মেয়ের কাছে ঘেঁষে না। মনে মনে মেয়েকে ভয় পায়।

সেদিন পাঞ্জাব পাবলিক সার্ভিস কমিশনের একটি বিজ্ঞপ্তি বেরোয় কাগজে। পাঞ্জাবি ভাষার কলেজ লেকচারার চাই। বারোটা পদ। পুষ্প পাতিয়ালা থেকে ফর্ম এনে আবেদনপত্র পাঠিয়ে দেয়। ফর্ম এনে দেয় জলি। জলি নিজেও [illegible] করে রেখেছে। সে-ও আবেদনপত্র পাঠায়। এর আগেও সে আবেদনপত্র পাঠিয়েছে—ইন্টারভিউও দিয়েছে, কিন্তু মনোনীত হয়নি। এবারে একটা সুযোগ থাকলেও থাকতে পারে। সে পুষ্পকে বলে, 'ভেতর থেকে একটু পুস্ করলে, হয়ে যেতে পারে।'

'কী রকম?'

'হাজার ছয়েক লাগে। সিলেকসন বোর্ডের চেয়ারম্যান নেয় না—নেয় তার সাঙ্গপাঙ্গরা। টাকা পেলেই সিলেকশন পাকা!'

'তাহলে দিচ্ছিস না কেন?'

'এবার আরও বেশি চাইবে। সব কিছুর দর বাড়ছে তো। তাছাড়া, আমার হয়ে কে টাকা দেব, বল? এসব তো বাবারাই করে। ভাইয়ের সংসারে আছি—এমনিতে কষ্টেসৃষ্টে চলে। বউদি তো খিটিরমিটির করেই যায়—'

পুষ্প বিষয়টি নিয়ে ভাবতে থাকে। মা-বাবার সঙ্গে বিশেষ সদ্ভাব অবশ্য নেই। তবে মার সঙ্গে মোটামুটি কথাবার্তা হয়। দয়ালিকে সে কথাটা জানায়। দয়ালি মহা খুশি! মেয়ে যা-হোক এতদিন পর মুখ ফুটে একটা কিছু চেয়েছে। দয়ালি হরদিৎকে জানাতে হরদিৎ বলে, 'এ আর এমন কী! আমি যাচ্ছি হরদিলের কাছে। এখন কংগ্রেসি রাজ—হরদিলের কথা ফেলে কার সাধ্যি!'

পরের দিনই হরদিলের কাছে যায় হরদিৎ। সব শুনে হরদিল বলে, 'ইন্টারভিউয়ের চিঠি এলে যোগাযোগ কোরো। কিন্তু, কথাটা হলো গিয়ে—আগে শালারা লুকিয়ে-চুরিয়ে টাকা নিত, এখন সরাসরি নয়। ভয়ডর লজ্জাসরম নেই—ওখানে গিয়েই একটা বন্দোবস্ত করব—হাজার হোক, তোমার ব্যাপার!'

'বেশ। ইন্টারভিউয়ের চিঠি এলে আপনার সঙ্গে দেখা করব।'

এরপর, কি ভেবে হরদিৎ নিজেই পাতিয়ালা চলে যায়। গাঁয়ে ছিবোর নাতি পাতিয়ালার ডিসি দপ্তরে কেরানি। ছোটবেলায় থাকত কোটেতে। প্রাইমারি স্কুলে পড়ত। পরে, হাইস্কুলে ক্লাস টেন অবধি পড়ে টাইপ শিখে কেরানির কাজ পায়। মাঝেমধ্যে কোটেতে এসে দাদু-দিদিমার সঙ্গে দেখা করে যেত। হরিন্দরের সঙ্গে পড়াশোনার আলোচনা করত। হরদিৎ একদিন তাকে কথায়-কথায় জিজ্ঞেস করে, 'তা এখন কী করছো-টরছো?'

জবাবে সে জানায় ডিসি দপ্তরে কাজ করে। হরজিৎ তার সদাসঙ্গী পকেট ডায়রিটা দিতে, তাতে নিজের নাম ঠিকানা, কোন্ দপ্তরে কাজ করে—সব লিখে দেয়। তারিখ দেখার জন্যে হরদিৎ এই ডায়েরি সব সময়ই পকেটে রাখে। কখন কি কাজে লাগে, ঠিক নেই। পাতিয়ালা বাসস্ট্যাণ্ডে এসে হরদিৎ ডায়েরিটা খোলে। লেখাপড়া জানে বলে মনে হয়, এই রকম একটি লোকের কাছে গিয়ে সে ডায়েরির পাতাটা দেখায় : 'দেখো তো ভাই—এই দপ্তরটা কোথায় হবে?'

'আরে সর্দারজি—এতো ডিসির অফিস। আপনি একটা রিকশা নিন—রিকশাওয়ালাই আপনাকে পৌঁছে দেবে।'

ডিসি দপ্তরে এসে খোঁজ নিতে, একটি ছেলে বলে, 'নছত্তর সিং? ওই সামনের কামরা—চাপরাশিকে বললেই হবে।'

হরদিৎকে দেখে নছত্তর সসম্মানে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ায়। সৎশ্রী আকাল-এর পর কুশল বিনিময় করে। চাপরাশিকে চা আনতে পাঠায়। চা খেতে-খেতে হরদিৎ কথাটা পাড়ে : 'আমার মেয়ে পুষ্প এমএ পাশ করেছে। কলেজে লেকচারার চাকরির জন্যে দরখাস্ত দিয়েছে। ইন্টারভিউ পাতিয়ালায়।'

নছত্তর সহকর্মীকে জিজ্ঞেস করে, 'লেকচারারের ইন্টারভিউ কার হাতে?'

'পি পি এস—পাঞ্জাব পাবলিক সার্ভিস কমিশন—কেন?'

'ইনি আমার মামা। গাঁ থেকে এসেছেন, মেয়ে দরখাস্ত দিয়েছে। তাই—'

নছত্তরের সহকর্মী নতুন একটা সিগারেট ধরায়। চশমার ফাঁক দিয়ে হরদিৎকে লক্ষ করে। হরদিৎ-ও লক্ষ করে। ছোকরার গাল কামানো, গোঁফটা বেশ কায়দার। মাথায় পিঁয়াজি রঙের পাগড়ি। পাগড়ির ধরন দেখে মনে হয়, মাথার চুলও ছাঁটা। এক গাল ধোঁয়া ছেড়ে সে বলে, 'একটা সোজা কথা বলব, সর্দারজি?'

'আরে, সেটা শুনতেই তো আসা।'

নছত্তর বলে, 'মামা—লালা খুব কাজের লোক।'

লালা আড়চোখে নছত্তরকে দেখে, তারপর হরদিৎকে বলে, 'আসলে, চাবিকাঠি চেয়ারম্যানের বউয়ের হাতে। তার সঙ্গে দেখা হলেই কাজ হয়ে যাবে।'

'তাহলে, মামা—' নছত্তর ইতস্তত করে।

'আরে বাবা, কথাটা খোলসা করে বলোই না—'

'আজ্ঞে টাকা লাগবে।' নছত্তর সরাসরি জবাব দেয়।

লালা মুচকি হেসে বলে, 'আগে, সর্দারজি, কাজ হতো সুপারিশে, এখন ঘুঁষে। থোক একটা বারোর বান্ডিল, ব্যাস! এক একটা পোস্টের এক একটা রেট। মন্ত্রিদেরই এই কারবার।'

নছত্তর লালাকে নিচু গলায় জিজ্ঞেস করে, 'চেয়ারম্যানের বাড়ি তাহলে কখন যাওয়া যায়?'

'আজই।'

নছত্তর ঘড়ি দেখে হরদিৎকে জানায়, 'মামা—একটু বসো। আমরা সাড়ে চারটের সময় চেয়ারম্যানের বাড়ি যাব। আজ আমার ওখানেই তুমি থাকবে। কাল বাড়ি যাবে।'

পৌনে পাঁচটায় তিনজনেই চেয়ারম্যানের বাড়িতে হাজির হয়। বাইরের ঘরে হরদিৎ ও নছত্তরকে বসিয়ে, লালা সোজা ঘরের ভেতর চলে যায়। চেয়ারম্যানের বউ বাড়িতেই ছিলেন। চেয়ারম্যান কোনও কাজে বাইরে গেছেন। লালাকে দেখে মহিলা জিজ্ঞেস করলেন, 'কী ব্যাপার? কাদের এনেছ?'

'সর্দারজি—আমার কোলিগের মামা। আপনার সেলামি আমি সর্দারজির কাছ থেকে আদায় করে নেব—এই হাজার দশেক—আপনি শুধু কাজটা করে দিন।'

'কবে আসবে আবার?'

'ইন্টারভিউয়ের দিন। ওই দিনেই 'লেফাফা' নিয়ে দেব।'

'ঠিক আছে ভাই সোহনলাল—তোমার লোক যখন!'

সোহনলাল লালা জবাবে হি-হি করে হাসে।

দু মাস পরই পুষ্পর কাছে ইন্টারভিউয়ের চিঠি এসে যায়। ইন্টারভিউয়ের তারিখ পড়েছে দশদিন পরে। একশো টাকার বাণ্ডিলে বারো হাজার টাকা নিয়ে হরদিৎ চলে আসে পাতিয়ালায় নছত্তরের বাড়ি। পৌঁছতে সন্ধ্যে হয়। নছত্তর খাতির করে বসায়, 'মামা—তুমি বউমার হাতে চা খাও, আমি ততক্ষণে সাইকেলে করে সোহনলালের কাছ থেকে একবার ঘুরে আসি। ওকে পাকড়াও করে আমরা চেয়ারম্যানের কাছে যাব।'

সোনহলাল বাড়িতেই ছিল। বাড়িতে তৈরি দুর্গা মন্দিরে আরতি করছিল। নছত্তরের সঙ্গে কথা বলে সে প্রায় সঙ্গে সঙ্গে তৈরি হয়ে যায় ও নছত্তরের বাড়ি আসে। বারো হাজার টাকার বান্ডিল নিয়ে তিন জনেই এবার আসে চেয়ারম্যানের বাড়ি।

চেয়ারম্যানও বাড়িতে ছিলেন। বাড়ির পেছনের লনে মেয়ের সঙ্গে ব্যাডমিন্টন খেলছিলেন। চেয়ারম্যানের বউ আরামকেদারায় গা এলিয়ে, বাড়ির গাড়োয়ালি চাকরকে সন্ধ্যেবেলার খানা তৈরির নির্দেশ দিচ্ছিলেন। পা দুটো সামনের একটা তেপায়া চৌকির ওপর। হাতে একটা মেয়েদের পত্রিকা।

সোহনলাল সামনে এসে 'সেলাম' জানিয়ে দাঁড়ায়। মহিলা সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়ান, সোহনকে সঙ্গে নিয়ে ড্রয়িংরুমে ঢোকেন। সোহন বারো হাজারের বান্ডিল থেকে দু

হাজারের থোক দু পকেটে রেখে বাকিটা মহিলাকে দিয়ে দেয়। চোখের পলক পড়ার আগেই মহিলা দশ হাজারের বাণ্ডিল গোদরেজের আলমারিতে ঢুকিয়ে দেন।

সোহনলাল অতঃপর মহিলার ডায়রিতে নোট করায় : পুষ্পিন্দর কৌর, ডটার অফ সর্দার হরদিৎ কৌর, ভিলেজ কোটে খড়ক সিং, তহসিল ফুল, ডিসট্রিক্ট ভাটিন্ডা। পোস্ট : লেকচারার ইন পাঞ্জাবি। এম এ ফার্স্ট ক্লাস।

নয়

পুষ্পর ইন্টারভিউয়ের দু তিন মাস পর জলিরও ইন্টারভিউ হয়। কিন্তু, এবারেও বেচারার কিছু হয় না। পুষ্পর সিলেকসন হয়ে যায় ভাটিন্ডা কলেজে। ভাটিন্ডাতেই মাঝারি ভাড়ায় একটা ঘর ভাড়া নিয়ে পুষ্প কলেজে যাতায়াত শুরু করে দেয়। সে জলিকে পরামর্শ দেয় অঙ্কের একটা আলাদা পরীক্ষায় বসতে। তাতে হয়তো অঙ্ক-শিক্ষিকার একটা চাকরি জুটে যেতে পারে। নইলে জলির যোগ্যতার যে চাকরি, তার উমেদার অজস্র—কার ভাগ্যে কখন শিকে ছেঁড়ে ঠিক নেই!

পুষ্প গাঁয়ে আসতে জলি দেখা করে। কলেজের পর পুষ্পর একা থাকতে ভাল লাগে না—যার জন্যে জলিকে সে সঙ্গে নিয়ে যায়। ওখানে, এক অধ্যাপকের কাছে জলি টিউশন নেয়—সে ব্যবস্থাও পুষ্প করে। এমনকি পরীক্ষার বসার ফিজ-ও জমা দেয়। অঙ্কের ওই অধ্যাপক জলিকে খুব খাটান। ক্লাস টেন অবধি জলি অঙ্কে ভালই ছিল। বীজগণিত পাটিগণিত বুঝত। অঙ্কের অধ্যাপক টিউশন করতেন দিনরাত। ভোর চারটে থেকে সকাল নটা, তারপর বিকেল তিনটে থেকে রাত দশটা। ভদ্রলোকের হাঁফানির টান ছিল বেজায়। শরীরটা এমন টলমল করত যে, মনে হতো এখুনই বুঝি হুমড়ি খেয়ে পড়বেন। আসলে, ভদ্রলোকের টাকার নেশা ছিল প্রবল; কুকুর যেমন হাড়ের স্বাদ পেলে হন্যে হয়ে পড়ে, ভদ্রলোকও তেমনই টাকার গন্ধে হন্যে হয়ে পড়তেন। ঠাণ্ডা গরম শীত গ্রীষ্ম বর্ষা—ভদ্রলোকের রুটিন এক। রাত দশটা থেকে ভোর চারটে—এই ছ ঘণ্টা ঘুমোতেন। ঠিক ছ ঘণ্টাও নয়, সাকুল্যে পাঁচ ঘণ্টা। এক ঘণ্টা কেটে যেত প্রাতঃকৃত্যাদি ও স্নান-আহারে। দুপুরের খাওয়াটা যে কখন খেতেন, কেউ জানে না। কোনও ছাত্রই তাঁকে খেতে দেখেনি। টিউশন করতে করতেই চা খেতেন বেশ কয়েকবার। তবুও, অধ্যাপকের হাতযশ ছিল কিংবদন্তির মতো। 'কার কাছে পড়িস?'—'গঞ্জা স্যারের কাছে।'—'ব্যাস, আর দেখতে হবে না, একদম ম্যাজিক!' কলেজের স্টাফ-রুমেও গঞ্জাস্যার ছিলেন আলোচনার বিষয়। কেউ মজা করত। কেউ তাঁর পরিশ্রমের ক্ষমতা দেখে অবাক হয়ে যেত। কেউ তির্যক মন্তব্য ছুঁড়ত : 'গঞ্জার এত পয়সা খাবে কে? একটা ছেলে নেই। পাঁচ পাঁচটা মেয়ে—তায় আবার জাতে বেনিয়া!'

'গঞ্জা যেদিন পটল তুলবে, দেখবি অঙ্ক কষতে-কষতেই . . .!'

একজন সহানুভূতি জানায়, 'পাঁচটা মেয়ে মানে বেচারাকে খেটেখুটে পাঁচ লাখ তৈরি রাখতেই হবে!'

'টাকা তৈরি রাখতে গেলে তো তাহলে চুরিডাকাতিও করতে হয়।' একজন পালটা মন্তব্য করে।

পুষ্প ও জলির মধ্যেও এই নিয়ে আলোচনা হয়। জলি বলে, 'আমি বাপের এক মেয়ে—আর গঞ্জার পাঁচ!'

'গঞ্জা গঞ্জাই!' পুষ্প জবাব দেয়, 'পাঁচ লাখ বানিয়ে ছাড়বে, তবে মরবে! আর তোকে তো দেওয়ার কেউ নেই—সব তোকে নিজে করতে হবে। তোদের মধ্যে তফাত অনেক রে, জলি!' পুষ্প উৎসাহিত করে জলিকে। কখনও-কখনও নসিবের কথাও ওঠে। কথা আর শেষ হতে চায় না। মাঝরাত হয়ে যায়। জলি সান্ত্বনা দেয়, 'ভেবে আর কি হবে—কপালে যা ছিল, তাই ঘটেছে। ভগবান টেনে নিয়েছেন। এখন ভবিষ্যতের কথা ভাব।'

'ভবিষ্যৎ আর কী ভাবব? নসিবকেই আমি যথার্থ অর্থে বিয়ে করেছিলাম। এখন কেউ আমায় বিয়ে করলে, শরীরটাই পাবে—মনটা নয়। মন আমার মরে গেছে।' বলতে বলতে পুষ্প কেঁদে ফেলে।

'দূর! কাঁদে না!' জলি আবার সান্ত্বনা দেয়, বোঝায়, 'তোর এখনও পুরো জীবনটাই পড়ে আছে—ভেঙে পড়লে চলবে কেমন করে?' জলি বলে চলে, 'তোদের বাড়িতে কোনও অভাব নেই। তুই প্রোফেসর—সারা দুনিয়াটা তোর সামনে পড়ে আছে। একবার শুধু হ্যাঁ বললেই—'

তবুও পুষ্পর কান্না থামে না। জলির কোনও কথাই তার কানে ঢোকে না। এর মধ্যে, পদ্মা দু বার আসে সঙ্গরুর থেকে। ওর এমএ শেষ হয়নি। হয়তো একদিন পুষ্পর মতো অধ্যাপিকা হয়ে যাবে। পুষ্পর সঙ্গে কথা বলতে-বলতে সে অবাক হয়ে যায় তার মনের বিস্তৃতি দেখে। দুজনে মিলে নসিবের স্মৃতিচারণ করে। আচমকা পদ্মা জিজ্ঞেস করে, 'হরিন্দরের খবর কী? এখানে আসে না?'

'হরিন্দর? খ্যাপা একেবারে—কখন আচমকা এসে পড়ে কোনও ঠিক নেই। তবে, রামপুরা এলেই এখানে একবার টুঁ মেরে যায়!' পুষ্প হালকাভাবে জবাব দেয়।

অনেকদিন আগে, পুষ্পের ফার্স্ট ইয়ারে, ডিসেম্বরের ছুটিতে হরিন্দর পদ্মার সঙ্গে এক বাসেই সঙ্গরুর অবধি এসেছিল। পথে অনেক গল্প হয়েছিল। সারা দুনিয়ার গল্প। হরিন্দরকে খুবই ভাল লেগেছিল পদ্মার, হরিন্দরের পদ্মাকে। সঙ্গরুর বাসস্ট্যাণ্ড থেকে পদ্মা জোর করেই তাকে বাড়ি নিয়ে যায়। হরিন্দর না-করলেও পদ্মা শোনেনি। হরিন্দরের টিকিট ছিল ধুর-বারনালা অবধি। পদ্মার বাড়িতে এসে হরিন্দরের মন খারাপ হয়ে যায়। ছোট বাড়ি—অভাবের ছাপ বেশ স্পষ্ট। পদ্মার মা নেই। বাবা প্রাইমারি স্কুলের অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক। বয়স সত্তর, বাতের ব্যথায় পঙ্গু। পদ্মার ওপরে দু ভাই—বিবাহিত। ছেলেপুলে আছে। বড় মিউনিসপ্যাল অফিসে কেরানি। ছোট এক প্রাইভেট স্কুলের শিক্ষক। দুই ভাই

খুবই খাতির করে হরিন্দরকে বসায়। বাবাও দু চার কথা বলেন। বউয়েরা আড়চোখে হরিন্দরকে খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে দেখে। হরিন্দর অস্বস্তি বোধ করে এই চোরাচাউনিতে। পদ্মার বাবা কথায়-কথায় জেনে নেন তাঁর মেয়ের সহপাঠিনীর ভাই হরিন্দর। সেই রাত তিনি হরিন্দরকে থেকে যেতেও অনুরোধ করেন। কিন্তু, হরিন্দর ভদ্রতা করে দুটি রুটি খেয়েই চলে যায়। এরপর জানুয়ারি মাসে হরিন্দর পাতিয়ালায় গিয়ে আর পদ্মার দেখা পায়নি। শোনে, পদ্মার বাবা মারা গেছেন। ভাইয়েরা তার পড়া ছাড়িয়ে দিয়েছে। বাবাই তো সব... খবরটা পেয়ে হরিন্দরের খুব মন খারাপ হয়ে যায়। পদ্মা যেন একটা গন্ধের মতো তাকে জড়িয়ে রেখেছিল। ইচ্ছে হয়েছিল সঙ্গরুর গিয়ে পদ্মার সঙ্গে একবার দেখা করে আসে। এমনকী একটা টিকিটও কাটে, তারপর কি ভেবে, আবার বারনালার টিকিট কাটে।

পদ্মা এখন এক মডেল স্কুলে পড়ায়। মাসে দুশো টাকা মাইনে। স্কুলটা নার্সারি থেকে ক্লাস ফাইভ অবধি। এই জাতীয় মডেল স্কুল আজকাল অলিগলিতে। মাধ্যমিক বিএ, এমনকী এমএ পাশ মেয়ে চাকরি না পেয়ে, বিয়ের সম্ভাবনা সুদূরপরাহত দেখে, এই সব স্কুলে দুশো একশো টাকার বিনিময়ে শিক্ষকতা করে। স্কুলগুলো চলে দোকানের মতো। অবশ্য, তার কারণও আছে। সরকারি প্রাইমারি স্কুলে ক্লাস ফাইভ অবধি পড়ার ব্যবস্থা থাকলেও সেখানে পড়ে কেউ তিনটি পাঞ্জাবি হরফ ঠিক মতো ধরতে পারে না, এক থেকে দশ অবধি পড়তে পারে না! ছাত্র একবার এসে ভর্তি হয়, তারপর পাঁচ বছরের মধ্যে স্কুলে না গিয়েও, ক্লাস ফাইভ অবধি পড়ার সার্টিফিকেট পেয়ে যায়। ফেল করার বালাই নেই। নাম কাটা যাওয়ার ভয় নেই। অর্থাৎ, শিক্ষা-দপ্তর এইটাই প্রমাণ করতে চায় পাঞ্জাবের নব্বই জন ছেলেমেয়ে প্রাথমিক শিক্ষায় 'শিক্ষিত'! যার জন্যে, একটু সচেতন মা-বাবারা ছেলেমেয়েদের পাঠিয়ে দেন এইসব 'মডেল' স্কুলে। শহরের মতো গাঁয়েও এই মডেল স্কুল খুব চালু হয়ে গেছে। শহরের বেকার মেয়েরাই এখানে শিক্ষিকা। এই স্কুলের ছেলেমেয়েরা ক্লাই ফাইভ অবধি পড়ে সরকারি স্কুলের ক্লাস এইটের ছেলেমেয়েদের চেয়েও ইংরিজিটা বেশি জানে, হিন্দিতে পোক্ত হয়ে ওঠে, পাঞ্জাবিটাও ভাল শেখে, চট করে অঙ্ক করতে পারে। আর, সব চেয়ে বড় কথা, তাদের চালচলন কথা বলার ভঙ্গি, জামাকাপড়ের কায়দা—সরকারি স্কুলের ছাত্রদের চেয়ে অনেক বেশি সপ্রতিভ।

দশ

হরজিৎ ও দয়ালি বসে বসে একটা কথাই ভাবে, মেয়েকে কী করে বিয়েতে রাজি করানো যায়। এখন তো আর জোরজবরদস্তি করা যায় না। লেখাপড়া জানা মেয়ে, অধ্যাপিকা, নিজে রোজগার করে—কাজেই জোর করার কথাই ওঠে না। পুষ্প মাঝে মধ্যে কোটেতে আসে, কিন্তু এক রাতের বেশি থাকে না। রবিবার সকালে এসে সন্ধ্যেতে চলে যায়। একদিন দয়ালি-হরজিৎ দু জনেই ভাটিন্ডায় পুষ্পর কলেজে এসে হাজির হয়। মা-বাবার এইভাবে আসার কারণ পুষ্প অনায়সেই আঁচ করে নেয়। জানে, ওদের মনে এখন আর অন্য কোনও চিন্তা নেই। পুষ্প ওদের স্টাফরুমে বসায়। কেউ টেরও পায় না ওরা পুষ্পর মা বাবা। পুষ্প বলে, 'তোমরা একটু বসো। একটা পিরিয়ড বাকি আছে—ওটা সেরেই বাসায় যাব। ওখানেই চা খাওয়া যাবে।'

পুষ্প এক একটি চল্লিশ মিনিটের দুটি ক্লাস করে। মা বাবা ভাবে : বসিয়ে রেখে মেয়ে পালালো না তো? এমনিতেই তো বিয়ের প্রসঙ্গ এড়িয়ে চলে। কোনও কথাই তো কানে তোলে না।

বেলা একটায় পুষ্প মা-বাবাকে নিয়ে কলেজ থেকে বেরিয়ে দুটো রিকশা নেয়। একটায় হরদিৎ, অন্যটায় মা-মেয়ে। বাসায় পুষ্প এখন একা। জলি চার মাস থেকে, পরীক্ষা দিয়ে গ্রামে গেছে। সকালে রুটি বানাবার জন্যে একটা মেয়ে আসে। খুবই গরিব ঘরের। এখান থেকেই সে রুটি খেয়ে যায়। পুষ্প তাকে মাইনে দেয় পঞ্চাশ টাকা। সকালে এসে মেয়েটি যথারীতি রুটি বানিয়ে চলে গেছে। পুষ্প ঢুকেই স্টোভ ধরায় চা বানাবার জন্যে। বাড়িওয়ালার ছেলেটিকে ডেকে হোটেলে পাঠায় তরকারি আর দই আনতে। তারপর নিজেই আটা মাখতে বসে যায়। দয়ালি বাধা দেয়, 'এতো গরমে খেটেখুটে এলি। তুই বরং বাবার কাছে বস—আমি রুটি বানাই।'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ—' হরদিৎ সায় দেয়, 'এখনই রুটি করার দরকার কী? আমরা তো. তাছাড়া, খেয়েদেয়েই এসেছি। তুই বরং কিছু খেয়ে নে।' হরজিৎ মেয়ের দিকে তাকিয়ে হাসে।

দয়ালি রুটি বানায়। পুষ্প হরদিতের পাশে গিয়ে বসে। হরদিৎ রসিকতা করে, 'হ্যাঁ রে পাগলি, এরকম একা-একা আর কতদিন থাকবি? দেখে মনে হচ্ছে যেন স্টেশনে রাত কাটাচ্ছিস!'

বাবার রসিকতায় পুষ্প হাসির ভান করে।

'এখন আর তোর কোনও বায়নাক্কা আমরা শুনব না—তোকে হ্যাঁ করতেই হবে এবার!' হরদিৎ হাসতে হাসতে কথাগুলো বলে।

'হ্যাঁ করলে তোমার কী করবে?' পুষ্পও হেসেই জবাব দেয়। তারপর, উত্তরের অপেক্ষা না করে সহসা উঠে দাঁড়ায়, নিচে চলে যায়। বাড়িওয়ালার ফ্রিজ থেকে দু বোতল জল বের করে, কিন্তু জল নিয়ে ওপরে উঠতে আর মন চায় না। বাড়িওয়ালার বউ ইতিমধ্যে জেনে নিয়েছে অভ্যাগতদের সম্পর্কে। এটাও বুঝেছে পুষ্প ইচ্ছে করে ওপরে

যেতে দেরি করছে। বাড়িওয়ালার বউ বলে, 'মা বাবা এসেছেন। আর কিছু দরকার থাকলে এখান থেকে নিয়ে যেয়ো। ফ্রিজে ফলও আছে।'

পুষ্প আস্তে আস্তে ওপরে ওঠে। মার রুটি বানানো হয়ে গেছে। টেবিল লাগিয়ে তিনজনেই এবার খেতে বসে। কেউ কোনও কথা বলে না। পুষ্প কলেজ সম্বন্ধে দু চার কথা বলে। হরদিৎ হ্যাঁ-হুঁ করে চলে। দয়ালি একবার মেয়ের, আর একবার স্বামীর মুখের দিকে তাকায়। হরদিৎও দয়ালির মুখের দিকে তাকায়। খাওয়া শেষ হলে, পুষ্প নিচে থেকে চারপাই আনায়। তিনজনে তিনটি চারপাইয়ে শুয়ে পড়ে। পুষ্প ঘুমোবার চেষ্টা করে। দয়ালি এপাশ-ওপাশ করে উঠে বসে। ভাবে, এখানে তো শোয়ার জন্যে আসা হয়নি। হরদিৎ ফ্যানের দিকে তাকিয়ে থাকে। মাঝেমাঝে দীর্ঘশ্বাস ফেলে। যেন, কিছু বলতে চায়। দয়ালি আর চুপ করে থাকতে পারে না। পুষ্পকে বলে ওঠে, 'কী রে, এমন চুপচাপ পড়ে থাকবি? কথা-টথা বল। আমরা এলাম তোর সঙ্গে দুটো কথা বলতে।'

পুষ্প নিশ্চুপ। যেন শুনতে পায়নি। তারপর চারপাইয়ের ওপর উঠে বসে প্রশ্ন করে, 'কী কথা বলব?'

'গাঁয়ের লোক নানা কথা বলছে। আমাদের সামনে অবিশ্যি কিছু বলে না। কিন্তু, আমরা তো বুঝতে পারি। তুই একটু আমাদের অবস্থাটা ভেবে দ্যাখ—' দয়ালি মিনতি করে।

পুষ্প নিষ্পলক হয়ে দড়ির বিনুনি দেখে যায়।

হরদিৎ দয়ালির কথার সুতো ধরে, 'আমরাও তো বয়েস হলো; কতদিনই বা আর বাঁচব? বুড়ো বয়েসে আমাকে কষ্ট দিচ্ছিস কেন? আমাদের তো কোনও অভাব নেই। বিয়ে কর—ছেলে আমি খুঁজে আনব। তোর বিয়েটা হলে আমরা একটু শান্তি পাই। বিয়েতে লাখ, দেড় লাখ খরচ হোক—কোনও পরোয়া নেই। তুই শুধু রাজি হলেই হবে।

মেয়ে বাপের মুখের দিকে সোজাসুজি তাকায়। চোখ দুটো রাগে দপদপ করে ওঠে। বাবা নিজে হাতে নসিবকে খুন না করলেও লোক দিয়ে যে করিয়েছে—এটাই তার স্থির বিশ্বাস। নসিবের মৃত্যুর কারণ সে নিজে, কাজেই তার বাবা ছাড়া আর কেউ নসিবকে মারতে পারে না। কেননা, নসিবকে মেরে অন্য কারও স্বার্থ সিদ্ধি হওয়ার কথা নয়। কারও সঙ্গে তার শত্রুতা ছিল না। নসিব আর তার সম্পর্কের কথা কেউ জানত না। পুষ্প যে তার বাবাকেই খুনি হিসেবে সন্দেহ করে—এই নিয়ে জলির সঙ্গেও আলোচনা হয়েছে। এই মুহূর্তে বাবার চোখে চোখ রেখে পুষ্প যেমন রেগেও যায়, একটু খুশিও হয় বাবার অস্বস্তি অনুভব করে। নসিবকে খুন করার শাস্তি আইন আদালত তার বাবাকে দিতে পারবে না, কিন্তু মেয়ের কাছ থেকে তীব্র ঘৃণা—এটা কী কম শাস্তি? পুষ্প মুখে কিছু বলে না। মনে মনে বলে, 'আরও কষ্ট পাও—তোমার ছটফটানি দেখে আমার মন ঠাণ্ডা হবে।

'তুই এত লেখাপড়া শিখলি। চাকরিবাকরি করছিস—কিন্তু ঘরে থাকিস না। একটা বিয়ে কর—' দয়ালি সরলভাবে কথাগুলো বলে।

'আর—' হরদিৎ বলে, 'চাকরির দরকার কী তোর? যাদের কোনও উপায় নেই, তারাই চাকরি করে। আমার তো সবই আছে।' কথা এগিয়ে দেয় হরদিৎ। দয়ালি মেয়ের পাশে এসে বসে। মাথার চুলে বিলি কাটে : 'কী রে, জবাব দিচ্ছিস না যে! একটা কিছু বল।'

পুষ্প তবুও নিশ্চুপ। শুধু মাথা নেড়ে জানায় : কিছু বলার নেই। নিরাশ হয়ে দয়ালি উঠে যায়। জলে চোখ ভরে আসে। হরদিৎও চুপ করে যায়। উঠে দাঁড়ায়, তারপর ঝুঁকে হাঁটু সোজা করতে-করতে মেজের ওপর বসে পড়ে বলে, 'দ্যাখ, আমার আর গায়ে জোর নেই। বেশিদিন আর বাঁচব না। আমি বলি কি, তুই না হয় তোর পছন্দমতো একটা ছেলে বেছে নে। এতদিন আইবুড়ো থাকবি—এটা ঠিক নয়, বিশেষ করে আমাদের বাড়িতে—লোকে কী বলবে?' হরদিতেরও চোখে জল। মেয়ে পাথরের মতো বসে থাকে। নিশ্চুপ নিঃশব্দ। চোখ শুকনো খটখটে। সব কান্না শুকিয়ে গেছে। এদের কাছে কেঁদে কী হবে?—হরজিৎ মেজে থেকে আবার উঠে বসে চারপাইয়ে। দয়ালি রেগে যায়, 'তুই তাহলে আমাদের মরা মুখ দেখতে চাস?'

পুষ্প কোনও জবাব না দিয়ে আবার শুয়ে পড়ে। ওদের দিকে পিঠ করে পাশ ফিরে শোয়। হরদিৎ খাট থেকে উঠে পড়ে পায়ে জুতো গলায়, দয়ালিকে বলে, 'চলো। এখানে থেকে আর কী হবে? আমাদের কথা শুনবে না যখন—'

দয়ালি আর সামলাতে পারে না। ভর্ৎসনার সুরে বলে ওঠে, 'খেলা একটা দেখালো বটে তোমার মেয়ে! প্রথমে এক নাপতের পেছনে আঠার মতো লেগে রইল, এখন আবার বৈরাগী! যত্ত সব!' তারপর পুষ্পর উদ্দেশ্যে : 'তুই আর কোটেতে পা রাখিসনি। আমরা বুঝব আমাদের মেয়ে মরে গেছে।' অতঃপর, হরদিৎকে, 'যেচে মান কেঁদে শোক! হাড়পিত্তি জ্বলে যায় ব্যাপারস্যাপার দেখে—এখন বাড়ি চলো—খুব হয়েছে!'

বাইরে এসে হরদিৎ একটা রিকশা ধরে, 'বাসস্ট্যান্ডে কত নিবি?'

দয়ালি বাধা দেয়, 'হেঁটে যাই চলো—এমন কিছু দূর নয়।'

'কিন্তু, এই অলিগলিতে আমি রাস্তা চিনতে পারব না।'

রিকশাওয়ালা জানায়, দু টাকা লাগবে। ওরা রিকশায় উঠে পড়ে। নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে।

—এমন জানলে আমি পাতিয়ালা গিয়ে বারো হাজার টাকা দিয়ে আসতাম না। একদম বরবাদ হলো টাকাটা।

—আমিও ভাবিনি এই রকমটা হতে পারে।

রামপুরার বাসে উঠে ওরা আলোচনা চালায় হরিন্দর সম্পর্কে।

—এখন একমাত্র ভরসা হরি। ওকে একটা ভাল জায়গায় বিয়ে দিতে পারলে—

—হুঁ। কিন্তু, আমার তো মাথায় ঢুকছে না পুষ্পি কেন এতো বেঁকে বসেছে। কার ওপর ওর এই রাগ?

দয়ালি যেন হতবুদ্ধি হয়ে যায়। সব কেমন যেন গোলমেলে লাগে।

দিন শেষ হয়ে আসে। বাস চলে। অসংখ্য যাত্রী। সিট সব ভর্তি। পাঁচ সাতজন মাঝামাঝি জায়গাটায় দাঁড়িয়ে আছে। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে আর কোনও কথা হয় না।

এগারো

পুষ্প অনেকক্ষণ একভাবে থুম মেরে বসে থাকে। তারপর শুয়ে পড়ে। মনের মধ্যে চিন্তাগুলো জট পাকায়। একদিকে মা-বাবার প্রতি ভালবাসা, কৃতজ্ঞতাবোধ; অন্যদিকে নিজের স্বাধীনতা। তার কী নিজের জীবনসঙ্গী বাছার অধিকার নেই? জাতপাত কেন? জাতপাতের বিচারেই বাবা নসিবকে খুন করেছে, তার সারা জীবনের স্বপ্নকে ধূলিসাৎ করেছে। এতে ঘাতক-বাবার কী লাভ হয়েছে? বরং, যে মেয়েকে নিয়ে এই ঘটনা তার বিয়ে করার ইচ্ছা জীবনের মতো বিদায় নিয়েছে। এতে মা-বাবারও শাস্তি হচ্ছে। তাছাড়া, এখন বিয়ে করলে, সেকী আর ভালবাসতে পারবে? স্বামী শরীরটাই পাবে—মন নয়। তার মনে এখন নসিব। নসিব—তার মধ্যে এমন কী দেখেছিল যে শেষ অবধি প্রাণ পর্যন্ত দিল? ফিল্‌মের ছবির মতো পুরনো দৃশ্যগুলো ভেসে আসে। নসিব তো প্রথমে বিয়ে করতে চায়নি। পুষ্পই তাকে এক রকম বাধ্য করে। বুঝে উঠতে পারেনি, এটাই শেষ অবধি নসিবের মৃত্যুর কারণ হবে। পুষ্পর চোখ থেকে টপটপ করে জল ঝরে। ফুঁপিয়ে ওঠে সে : 'হে ভগবান, শেষ বারের মতো আমাকে কাঁদিয়ে দাও। সারা জীবন ধরে কেঁদে যেতে হবে আমাকে—আমার কান্না থামিয়ে দিতে কাউকে পাঠিয়ে দাও—হে ভগবান!' এক সময় কান্নার মধ্যেই নিজেকে সান্ত্বনা দেয় সে, 'আমার ভালবাসাই আমার ধর্ম, নসিব আমাকে এই ধর্মেই দীক্ষিত করে গেছে। নসিব আমার মুক্তি, আবার আশ্রয়। ভালবাসার চেয়ে বড় ঐশ্বর্য দুনিয়ার আর কী আছে? সবার কাছে এই ঐশ্বর্য থাকে না—আমার কাছে আছে।'

সিঁড়িতে একটা পায়ের আওয়াজ শোনা যায়। কে এলো? কমলা? পুষ্প আন্দাজ করার চেষ্টা করে। নিশ্চয়ই কমলা, পরিচারিকা মেয়েটি। কিন্তু, এই ভর সন্ধ্যেয় সে রুটি বানাতে আসছে কেন? চৌকাঠের কাছ থেকে একটা জোরালো হাসির শব্দ আসে। পুষ্প ঘাবড়ে যায়। কোনও অশরীরী আত্মা ঢুকল নাকী তাকে বিদ্রূপ করতে? হাসির আওয়াজটা তার হৃদয়কে যেন ছিন্নবিছিন্ন করে দেয়।

চৌকাঠে দাঁড়িয়ে পদ্মা! সঙ্গরুর থেকে এসেছে পুষ্পর সঙ্গে দেখা করতে। ঘরে ঢুকে কাঁধ-ব্যাগটা রেখে দিয়ে, সে পুষ্পর পাশে বসে পড়ে। জড়িয়ে ধরে আদর করে, চুমু খেয়েই চমকে ওঠে—গালে একটা নোনতা স্বাদ। পদ্মা বিস্মিত হয়ে দেখে পুষ্পর চোখ জলে টলটল করছে। যেন, এখনই আবার কেঁদে ফেলবে। কী আশ্চর্য—এত কাঁদার পরও চোখের জল শুকোয়নি! পদ্মা ওর চোখের জল মুছিয়ে দেয়, 'আমার দিব্যি—আর কেঁদ না—'

পুষ্প নিথর হয়ে বসে থাকে। পদ্মা জিজ্ঞেস করে, 'জলের ঘড়াটা কোথায়?'

পুষ্প উঠে দাঁড়ায়। ভাঙা গলায় বলে, 'নিচে থেকে জল আনতে হয়ে—ঘড়ার জল ঠাণ্ডা নয়। নতুন একটা ঘড়া কিনব—'

নিচে যাওয়ার আগে, ঘড়ার জলে পুষ্প চোখমুখ ধুয়ে নেয়। তারপর, দুটো ফাঁকা বোতল নিয়ে নিচে চলে যায়। ফ্রিজ থেকে দু বোতল জল বের করে আবার ওপরে উঠে আসে। পদ্মা এক নিঃশ্বাসে বোতলের জল অর্ধেক করে দেয়। খুবই তেষ্টা পেয়েছিল তার, পুষ্প বাকিটা খায়। পদ্মা জিজ্ঞেস করে, 'নিচে কার সঙ্গে কথা বলছিলে?'

'বাড়িওয়ালার বউ কথা বলছিল। জানতে চাইল, মা-বাবা এসেই চলে গেল কেন। রাতে থেকে গেলেই তো পারত। . . . তোর আসার আধ ঘণ্টা আগে মা-বাবা এসেছিল।
'

'তাই নাকী? তা চলে গেলেন কেন?' পদ্মা কৌতূহলী হয়ে ওঠে। পুষ্প সব কথা খুলে বলে। পদ্মা, সব শুনে বলে, 'আমার একটা কথা শুনবে? মা-বাবা তো যথেষ্ট সাজা পেয়েছে—আর কষ্ট দিচ্ছ কেন? পুরনো দিনের কথা ভুলে যাও। বিয়ে—'

'অসম্ভব। বিয়ে? বিয়েতে কী আছে?' পুষ্প বিরক্তি প্রকাশ করে, 'তার চেয়ে তোর বিয়ের কথা বল। কবে করছিস?'

'আমার বিয়ে? কেউ করলে তো!'

'বউদিরা কী বলে?' পুষ্প পদ্মার সঙ্গে রসিকতা করে নিজের দুঃখ ভুলতে চেষ্টা করে।

'বউদিরা আর কি বলবে? আমাকে তাড়াতে পারলে বাঁচে। বিয়ের ফাঁসিকাঠে আমাকে তুলতে পারলে ওদের হাড় জুড়োয়!'

'তোর ইচ্ছেটা কী?'

'আমার ইচ্ছে—' পদ্মা হেসে ফেলে।

এমন সময় কমলা আসে। দুজনকেই সে সংশ্রী আকাল জানায়। রোগাটে, দীর্ঘ চেহারা। উন্নত গ্রীবা। গায়ের রঙ বাদামি। বড় বড় গভীর চোখ। তার দিকে এক ঝলক তাকিয়েই লোক চোখ নামিয়ে নেয়। পদ্মা বলে ওঠে, 'বাঃ! এ তো বেশ প্রিয়দর্শিনী দেখি!'

'প্রিয়দর্শিনী তো নিঃসন্দেহে।' পুষ্প জবাব দেয়।

কমলার কাছে 'প্রিয়দর্শিনী' শব্দটা খুবই অচেনা। ফলে, কথাটা শুনে সে ভ্যাবাচাকা খেয়ে যায়। পুষ্প হেসে বলে, 'প্রিয়দর্শিনী সাহেবা—আটাটা মেখে ফ্যালো, তারপর সবজি।

'তাতো মাখব, কিন্তু এই প্রিয়দর্শিনী জিনিসটা কী?' কমলা কৌতূহলী হয়ে জানতে চায়। পুষ্পর সঙ্গে তার সম্পর্ক খুবই সহজ সরল। প্রায় বন্ধুর মতো।

'বাঃ! এ তো দেখি বেশ চারুবাকও।' পদ্মা কমলাকে আর একটু বিব্রত করার চেষ্টা করে। কমলা চালাকিটা ধরে ফেলে। বেশ সপ্রতিভভাবেই জবাব দেয়, 'যে নামেই ডাকো আমাকে, এখন বলো কত আটা মাখতে হবে?'

কমলা আটার টিনে হাত বাড়ায়। রান্নাঘরে গিয়ে আটা মাখতে বসে। পুষ্প ও পদ্মা কমলাকে নিয়ে আলোচনা করে। পুষ্প বলে, 'বড় গরিব। আমার এখানে দু বেলা রুটি

বানায়। জলখাবারও এখানে খায়। বাবা বা ভাই নেই। এক ছোট বোন আছে। মা সুতোর ফ্যাক্টরিতে কাজ করে।'

'মেয়েটা তো বেশ ডাগর। মা নিশ্চয়ই বিয়ের চেষ্টা করছে?' পদ্মা জানতে চায়। সহমর্মিতা প্রকাশ করে।

'নিশ্চয়ই করছে।' পুষ্প পালটা জিজ্ঞেস করে এবার। 'তোর বিয়েটা হচ্ছে না কেন, শুনি?'

'কী করে হবে? সব পাত্রই চায় পাত্রী সরকারি চাকুরে হবে। চাকরি না করলে কোনও-না-কোনও ট্রেনিং থাকা চাই।'

'তুই তাহলে বি এডটা করে নে। মাস্টার্নি হয়ে যাবি।'

'বিএড করব কী করে?'

'কেন?'

'খরচের ব্যাপার আছে না? কে দেবে?'

'কেন, তোর ভাইরা।'

'তাহলেই হয়েছে! আরে, ওরা খরচ দিলে আমি তো এমএ পাশ করে প্রোফেসারি করতাম!'

পুষ্প পদ্মার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকে। তারপর বলে, 'এক কাজ কর। তুই বিএডে ঢুকে পড়—মাসে মাসে আমি তোকে খরচ পাঠিয়ে দেব। রাজি?'

প্রস্তাব শুনে পদ্মা অবাক। পুষ্প যেন তার হাতে কুবেরের রাজ্য তুলে দিচ্ছে! সে জবাব দেয়, 'কিন্তু—'

'কিন্তু-টিন্তু নয়—আজই তুই ফর্ম ফিল-আপ করে দে—আমি দুশো টাকা করে দেব—বাকিটা না হয় ভাইদের কাছ থেকে নিস—হাজার হোক ভাই তো!'

কমলা রুটি বানিয়ে স্টিলের থালায় সাজিয়ে রাখে। স্টোভের ওপর কড়া চাপিয়ে বেগুন ভাজে। চৌকাঠে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করে, 'তোমাদের খেতে দেব?'

'না রে। আমরা নিজেরা খেয়ে নেব—তুই বরং খেয়ে নে।' পুষ্প জবাব দেয়, 'তাছাড়া, আমাকে চানটান করতে হবে। পদ্মা, তুই?'

'আমি বরং আগে চানটা সেরে নি। বাথরুম ওপরে?'

'না নিচে—ওই আলমারিতে তেল সাবান আছে—সিঁড়ির নিচেই বাথরুম—তুই যা তাহলে।'

পদ্মা চান করে চলে আসে। তারপর পুষ্প যায়। কমলা ইতিমধ্যে রুটি খেয়ে চলে যায়। পুষ্প টেবিলের ওপর কমলার সাজানো রুটির থালাগুলো রাখে। দুজনে খেতে খেতে গল্প করে। পদ্মা হঠাৎ উঠে দাঁড়ায়, 'যাঃ! একেবারে ভুলে গিয়েছিলাম, আমি তোমার জন্যে আম এনেছি—ছুরিটা দাও—আম কাটি।'

'ধ্যুৎ! আগে রুটি খেয়ে নে। পরে আম খাওয়া যাবে।'

খাওয়া সেরে ওরা রান্নাঘরে বাসনকোষন রেখে আসে। সকালে কমলা এসে পরিষ্কার করবে। পুষ্প পদ্মাকে বলে, 'আম কিছুক্ষণ জলে ফেলে রাখ—চারপাইটা বাইরে বের করে বিছানা পেতে আরাম করে আম খাওয়া যাবে।'

বারান্দাটা বেশ লম্বা চওড়া। চারপাইটা বের করে ফেলে ওরা। বাড়িটা এক বেনিয়া পরিবারের। লোকজন খুবই ভাল। পুষ্পকে ওরা বাড়ির লোকের মতোই দেখে। চারপাইয়ের ওপর বিছানা পেতে আমের প্লেট নিয়ে বসে ওরা। বেশ মিষ্টি আম। সিঁড়ির মুখে কার পায়ের শব্দ শোনা গেল। এ-সময় আবার কে এলো? পুষ্প আঁচ করার চেষ্টা করে। দরজার দিকে চোখ রাখে সে। পদ্মাও তাকায় : কে?

হরিন্দর। পরনে ময়লা প্যান্ট, বুশ শার্ট। পাগড়িটা কোনও রকমে পেঁচানো। চপ্‌পলে ধুলোর আস্তরণ। কাঁধের ঝোলা ব্যাগটা একেবারে ঠাসা। কোথায় ছিল এতদিন, কে জানে। পুষ্প আমের প্লেট রেখে জিজ্ঞেস করে, 'বাড়ি থেকে আসছিস না বুঝতে পারছি, কিন্তু কোথায় ছিলি?'

চারপাইয়ে ঝোলাটা রেখে হরিন্দর বসে পড়ে। একটু হেসে গম্ভীরভাবে বলে, 'সালাম আলেকুম!'

'জল আনব?' পুষ্প জিজ্ঞেস করে।

'হ্যাঁ, আগে জল খাই, তারপর আম খাব।'

পুষ্প জল নিয়ে এসে বলে, 'খেয়ে নে—জলটা ঠাণ্ডা আছে।'

'ঠিক আছে, জনাব!' জলের গ্লাস নিয়ে সে পদ্মাকে জিজ্ঞেস করে, 'কব তশরিফ লায়ে?'

হরিন্দরের কথা বলার ধরণে পদ্মা হেসে ওঠে। আমের প্লেট এগিয়ে দেয়। পুষ্প আর একটা আম কাটে। অতঃপর তিনজনেই আম খেতে থাকে। পুষ্প জিজ্ঞেস করে, 'কোথা থেকে আসছিস, বললি না?'

'গাঁ থেকে।'

'আজ এখানে থাকবি, না—'

'শুধু থাকব না, খাবও!'

'রুটি খাবি তো?'

'না-হলে কী এই আম খেয়ে পেটে কিল মেরে থাকব?'

'আমাদের খাওয়া হয়ে গেছে। এখন রুটি পাব কোথা থেকে? তাড়াতাড়ি এলে—'

'ঠিক আছে বাবা! তাহলে খাটিয়াটা পেতে দে—অন্তত একটু ঘুমিয়ে নিই!'

'হরিন্দর সত্যিই রুটি খাবে?' পদ্মা জিজ্ঞেস করে পুষ্পকে। পুষ্প খাটিয়া বের করতে করতে বলে, 'না—' পুষ্প এবার আর কিছু না বলে ঘরের ভেতর ঢুকে পড়ে। এদিক-ওদিক তাকায়। পুষ্প জিজ্ঞেস করে, 'কী খুঁজছিস?'

'দু একটা আলু হবে?'

'ওই ঠোঙার মধ্যে—কিন্তু আলু নিয়ে কী করবি?'

পদ্মা ততক্ষণে আটার টিনে হাত রেখেছে। জবাব দেয়, 'দুটো রুটি বানিয়ে একটু আলুর তরকারি করে দিচ্ছি। বেচারা না খেয়ে থাকবে—'

'তুই ওর মাথাটা খাবি দেখছি! জানিস না, একবার দিলেই ওটা ওর অভ্যেস দাঁড়িয়ে যাবে।' তারপর বারান্দায় এসে বলে, 'লোকের এটিকেট জানা দরকার—'

'বটে! খিদে পেলে আবার এটিকেট কী, মহাশয়া?'

'আমি হলে কিছুতেই রুটি বানাতাম না! পদ্মার মাথা খারাপ!'

পদ্মা রান্নাঘরে ব্যস্ত হয়ে ওঠে। পুষ্প জানতে চায়, 'কীরে—আমি যাব নাকী?'

'না। না। এই হয়ে এলো ব'লে।'

বারো

খাওয়া সেরে হরিন্দর ওদের সঙ্গে কিছুক্ষণ গল্প করে, তারপর যে যার মতো শুয়ে পড়ে। ঘণ্টা দুই পরেই পুষ্পর ঘুম ভেঙে যায় চেঁচামেচির আওয়াজে। নিচের তলা থেকে আওয়াজটা আসছে। একটি নারী কণ্ঠ, অন্যটি পুরুষ। পুষ্প উঠে বসে হরিন্দরকে ডাকে। হরিন্দর ঘুমের মধ্যেই প্রশ্ন করে, 'কী হলো?' ওদের কথার আওয়াজে পদ্মারও ঘুম ভেঙে যায়। বাড়িওয়ালার ঘর থেকে চেঁচামেচির আওয়াজটা আসছে। উঠোনে আলো জ্বলছে। একজন বলছে, 'ধর ধর জল-জল—হাত ধরে বসা, শালা খ্যাপা!' মিশ্রিত কলরবে ঠিক বোঝা যায় না কী ঘটছে। হরিন্দর রেলিং থেকে মাথা ঝুঁকিয়ে নিচেটা দেখে। উঠোন ভর্তি লোকজন। সব এদিক ওদিক ছোটাছুটি করছে। দু জন, খাটিয়ার ওপর একজনকে চেপে ধরে আছে। যাকে চেপে ধরা হয়েছে, সে মেয়ে। ওদের বাড়িরই মেয়ে। হঠাৎ হলো কী ওর? এমনিতো ওকে কোনও দিন অপ্রকৃতস্থ বলে মনে হয়নি। পুষ্প হরিন্দর পদ্মা—তিনজনেই এবার নিচে নামে। মেয়েটিকে ততক্ষণে একটা খাটিয়ার ওপর শোয়ানো হয়েছে। একজন পা, একজন মাথাটা ধরে রেখেছে। মেয়েটির জিভ বেরিয়ে এসেছে। নিঃশ্বাস পড়ছে ধীরে ধীরে, কিন্তু জোরালোভাবে। ভাবলেশহীন শূন্য চোখ দুটি খোলা। বাড়ির ভেতর থেকে থালা হাতে এক প্রৌঢ়া বেরিয়ে আসেন। থালার ওপর কিছু জড়িবুটি গোলা। তিনি মেয়েটির নাকের কাছে একবার থালাটি ধরেন, তারপর খাটার চারপাশটা প্রদক্ষিণ করেন। মেয়েটির নিঃশ্বাস একটু স্বাভাবিক হয়। প্রৌঢ়ার নির্দেশে মেয়েটির পা মাথা যারা ধরে রেখেছিল, তারা সরে দাঁড়ায়। মহিলা এবার মেয়েটির নাক টিপে ধরেন। মেয়েটি এবার মুখ দিয়ে নিঃশ্বাস নিতে থাকে। প্রৌঢ়া চামচ দিয়ে জল খাওয়ান মেয়েটিকে। খাটিয়ার আশপাশে দাঁড়িয়ে থাকা লোকজন নিশ্চুপ হয়ে দেখে চলে। মহিলার ইশারায় একসময় তারা বসে পড়ে। মেয়েটি পাশ ফিরে শোয়, মুখ দিয়ে একটা অস্ফুট গোঙানির আওয়াজ বেরোয়। অর্থাৎ, তার জ্ঞান ফিরেছে। 'কেমন লাগছে?' মেয়েটির মা সন্তর্পণে জিজ্ঞেস করে। মেয়েটি জবাবে বলে, ঘুম পেয়েছে, তাকে যেন কেউ ডাকাডাকি না করে।

উঠোনের এক জায়গায় জড়ো হয়ে সবাই মেয়েটির কথা আলোচনা করে। খুব নিচু স্বর, যাতে মেয়েটির ঘুম না ভাঙে। একটু ঘুমোতে পারলে সব ঠিক হয়ে যাবে। মেয়েটির মা বলে ওঠে, 'পইপই করে চান্দেরিকে মানা করেছিলাম মরা লোকের ঘরে না যেতে—কিন্তু আমার কথা কানেই তোলেনি।'

অবিবাহিত একটি মেয়ে বলে, 'এত মাস পরে এমনটা হতে পারে—তা বোধহয় চান্দেরি ভাবতে পারেনি।'

'তাবিজে কোনও কাজ হলো না। আর একটা তাবিজের জন্যে এখন ছুটতে হবে মারাঝ-রামপুরায়। একটা নতুন তাবিজ দিতে না পারলে, মেয়েটার আর ভাল হবে না। ' মেয়ের মা ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করে।

'এই প্রথম এ রকম হলো?' পুষ্প জিজ্ঞেস করে।

'এখানে এই প্রথম। শ্বশুরবাড়িতে কয়েক দফা হয়েছে। বছর চারেক বিয়ে হয়েছে। শ্বশুরশাশুড়ি খুবই ভাল। আমার মেয়েকে কোনও দিন ডেঁটে কথা বলেনি—কিন্তু এই রোগটা যে কোথা থেকে জুটল—'

'কাচ্চাবাচ্চা আছে?' পদ্মা আস্তে আস্তে জিজ্ঞেস করে।

'না। তবে, বয়েস তো এখনও ঢের পড়ে আছে—আর কাচ্চাবাচ্চা দেওয়া তো ভগবানের হাত।'

পদ্মা মাথা নাড়ে, 'ঠিকই তো, ভাবি।'

'চান্দেরির কাকি বাচ্চা বিয়োবার সময় মারা যায়—বছর দুই পর বাচ্চাটাও মরে। ওই কাকির আত্মাই এখন চান্দেরিকে 'ভর' করেছে।'

'কাকা কী আবার বিয়ে করে?' অবিবাহিত মেয়েটি প্রশ্ন করে।

'তাতো করেই! তবে তার রঙঢঙই আলাদা। থাকেও আলাদা।'

'তাহলে এক নম্বর কাকির আত্মা তাকে ভর না করে চান্দেরিকে ভর করল কেন?' মেয়েটি কৌতূহলী হয়ে ফের জিজ্ঞেস করে।

'সবাই 'ওনাদের' মর্জি, ভাই! কার ওপর কখন ভর করে, তা কী কেউ বলতে পারে? চান্দেরির তো কোনও অভাব নেই শ্বশুরবাড়িতে!'

হরিন্দর চুপচাপ এই সব আলোচনা শুনে যায়—কোনও মন্তব্য করে না। লোকজন যে যার খাটিয়ায় শুয়ে পড়ে। সবারই ঘুম পেয়েছে। ঠিক হয়, মেয়েরাই শুধু জেগে থাকবে। পুষ্পরা ওপরে উঠে আসে। বারান্দায় পাতা চারাপাইটার ওপর বসে। হরিন্দর টিপ্পনি কাটে : 'পাবলিক বটে একখানা! এসব ভূতপেত্নি আছে নাকী?'

'আছে কীনা দেখতেই তো পেলি।' পুষ্প জবাব দেয়।

পদ্মা অভিমত দেয়, 'ভূতপেত্নিপ্রেত বলে সত্যিই কিছু নেই—এসব হলো এক ধরনের মানসিক রোগ! যে কোনও মনোবিজ্ঞানী এই রোগের চিকিৎসা করতে পারে।'

'তাহলেই হয়েছে! এইসব তাবিজ টোটকা বশীকরণ থালা-চালাচালিতে যারা বিশ্বাসী —তারা কোনও মনোবিজ্ঞানীকে পাত্তা দেবে? আসলে ওদের মনের মধ্যেই ভূত!' হরিন্দর মন্তব্য করে।

'শ্রীলঙ্কায় এক তুখোড় পণ্ডিত আছেন', পদ্মা বলে ওঠে, 'ভদ্রলোক গত পঞ্চাশ বছর ধরে এক নাগাড়ে, একটা পর একটা পরীক্ষা চালিয়ে, প্রমাণ করে যাচ্ছেন এগুলো ভেল্‌কি আর জোচ্চুরি ছাড়া আর কিছুই নয়।'

'নাম কী ভদ্রলোকের?' হরিন্দর অনুসন্ধিৎসু হয়ে ওঠে।

'ডকটর আব্রাহাম কাভুর—বইও লিখেছেন একটা, 'বী গন্ গডমেন!' —আড়াইশো পাতার মতো। ডকটর কাভুর উদ্ভিজবিদ্যার অধ্যাপক, খুবই যুক্তিবাদী। ভদ্রলোক সম্বন্ধে একটা মজার গল্প আছে। উদ্ভিজ বিজ্ঞানের সঙ্গে উনি বাইবেলের ক্লাসও নিতেন। দেখা গেল তাঁর ছাত্ররা বাইবেল পরীক্ষায় মোটা নম্বর নিয়ে পাশ করে যাচ্ছে! প্রিন্সিপ্যাল ডকটর কাভুরকে বাইবেল পড়াতে বারণ করলেন। ডকটর কাভুর কারণ জানতে চাইলে প্রিন্সিপ্যাল বললেন—'আপনার ছাত্ররা বাইবেলে ভাল নম্বর তুললে কি হবে, তাদের ধর্মবিশ্বাস একেবারে চলে গেছে'!'

'তবে তো দারুণ লোক ডকটর কাভুর!' বিস্মিত হরিন্দর বলে ওঠে।

পদ্মা ডকটর কাভুর সম্পর্কে আরও কিছু জানায়। রাত বেড়ে চলে। পুষ্পর কিন্তু ঘুম আসে না। সে বলে ওঠে, 'ব্যাস, আজকের মতো অধিবেশন শেষ। সকালে কলেজ আছে আমার—তোরা তো ঘুমোতে পারবি—কিন্তু আমাকে ছুটতে হবে সাত সকালে।'

'জয় কুম্ভকর্ণা!' বলে হরিন্দর শুয়ে পড়ে। কিন্তু, বেশিক্ষণ চুপ করে থাকা তার ধাতে সয় না। মিনিট দুই পরেই সে বলে ওঠে, 'লঙ্কাই হোক, ভারতই হোক, কুসংস্কার থেকে ছাড়া পাওয়া বড় কঠিন। যন্ত্রমন্তর তুকতাক জ্যোতিষীকে গভর্ণমেণ্ট প্রশ্রয় দেয়—রাজনীতিতে অবধি এদের যড় আছে—'

'এইটাই তো রেওয়াজ,' পদ্মা বিশ্লেষণ করে, 'ওদের বিরুদ্ধে গেলেই ঝামেলা। জংলিরা তো গ্যালিলিয়োকে আদালতে নিয়ে গিয়েছিল, গ্যালিলিয়ো মাপ চেয়ে ছাড়া পান। সক্রেটিসকে বিষের পেয়ালায় চুমুক দিতে হয়েছিল। ডকটর কাভুরকে তিনবার খুন করার হুমকি দেয় তান্ত্রিক জ্যোতিষীরা। ইংরিজি কাগজে সে খবর ছাপা হয়। অনেকে আবার ডাকে শেকড়বাকড় পাঠায়, যা শুঁকে কাভুর মারা যেতে পারেন! কিন্তু, কাভুর সবাইকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে দিব্যি বহাল তবিয়তে রইলেন। কাউকে তোয়াক্কা করেননি—ভূতবাঙলোয় রাত কাটিয়ে এলেন, দত্যিদানো ভূতপেত্নির খোঁজে কবরখানা অবধি ধাওয়া করলেন। আবার, লাখ টাকা পুরস্কারও ঘোষণা করেছেন অশরীরী অস্তিত্বের কেউ প্রমাণ দেখাতে পারলে! কিন্তু কোনও পির গুরু বা সিদ্ধযোগী এই চ্যালেঞ্জ এখনও গ্রহণ করেনি।
'

'এক লাখ টাকা তো বিস্তর টাকা—ডকটর কাভুর পেলেন কোথা থেকে?' হরিন্দর একটু সন্দিগ্ধ হয়ে প্রশ্নটা করে। পদ্মা জবাব দেওয়ার আগেই পুষ্প বলে ওঠে, 'তোরা গল্প করবি তো চারপাইটা বাইরে নিয়ে যা—'

পদ্মা বলে ওঠে, 'হরিন্দর—ক্রমশ প্রকাশ্য! বাকিটা কাল।'

'ক্ষ্যামা দে বাপু! এখন ঘুমো।' পুষ্প মন্তব্য করে। ওরা দু জনে এবার ঘুমোবার চেষ্টা করে।

সকাল সাতটায় পুষ্প উঠে পড়ে। পদ্মা-হরিন্দর গভীর ঘুমে অচেতন। পুষ্প চা বানিয়ে ওদের ডেকে তোলে। ওরা চা খেতে খেতে টুকটাক কথা বলে যায়। পুষ্পই অবশ্য বেশি বলে। হরিন্দর ও পদ্মা শুনে যায়, হ্যাঁ হুঁ করে। পুষ্প সাবান তোয়ালে নিয়ে নিচে বাথরুমে চলে যায়। ওপরে উঠে দেখে, পদ্মা ও হরিন্দর আবার টানটান হয়ে শুয়ে পড়েছে। ঘুমোচ্ছে—নিশ্চয়ই রাতে অনেকক্ষণ ভূতপ্রেত নিয়ে বকবক করেছে! ওদের জাগানোটা ঠিক হবে না। কমলাও এসে পড়ে গুটিগুটি পায়ে। ওদের ঘুমোতে দেখে, এক গাল হেসে জিজ্ঞেস করে করে, 'ই বাবা—এখনও ঘুমচ্ছে!'

'আর বলিস কেন—রাত জেগে ভূতপ্রেতের গল্প করেছে, এখন ওঠার নাম নেই। তুই গোটা ছয়সাত পরোটা বানিয়ে রাখিস—চা-ও—আমার দেরি হয়ে গেছে। পরোটার পর রুটি বানাস তিন জনের—'

'দুপুর অবধি এরা থাকবে?'

'তুই তো রুটি বানিয়ে রাখ—দুপুর অবধি থাকলে খাবে। মনে তো হচ্ছে, থাকবে।

আর একবার চা খেয়ে পুষ্প ওদের জাগিয়ে দেয়। 'ওঠ, ওঠ, আর কতক্ষণ ঘুমোবি? রোদ উঠে গেছে। হাতমুখ ধুয়ে আয়, কমলা পরোটা বানাচ্ছে।'

চোখ কচলাতে-কচলাতে ওরা উঠে পড়ে। হরিন্দর ব্যাগ হাতড়ে টুথব্রাশটা খোঁজার চেষ্টা করে। কিন্তু, পায় না। অগত্যা, ব্যাগের সব জিনিস বের করে সে চেয়ারের ওপর রাখে। জিনিসপত্রের হাল আর ময়লা কাপড়চোপড় দেখে পুষ্প জিজ্ঞেস করে, 'কোথায় ছিলি বল তো? তুই তো গাঁ থেকে আসছিস না। বাড়ি থেকে এলে কাপড়চোপড়ের এই হাল হয়?
মা-ই তো তোর কাপড়চোপড় ধুয়ে দেয়—'

'আমি নিজেই ধুয়ে নিয়েছি।'

'তাই বল—তাহলে তুই ছিলি কোথায়? মনে হচ্ছে যেন কোনও ক্যাম্প থেকে আসছিস!'

'ক্যাম্প? কী ক্যাম্প?' হরিন্দর স্পষ্টই বিষয়টি এড়িয়ে যেতে চায়। পুষ্প তীক্ষ্ণ চোখে তাকায়। আর কিছু না বলে, ব্রাশে পেস্ট লাগিয়ে হরিন্দর তোয়ালে নিয়ে বাথরুমের উদ্দেশে হাঁটা দেয়। পুষ্পও পোশাক পরে নেয়, পদ্মাকে জিজ্ঞেস করে, 'তোরা কখন যাবি?'

'তোরা? আমি তো একাই যাব। চান করে—'

'আজ স্কুল আছে তোর?'

'না। ছুটি—আজ বুধবার না!'

'ও হ্যাঁ। তুই বলেছিলি বটে বুধবার তোর ছুটি থাকে। তা স্কুল নেই যখন, এখন গিয়ে কী করবি? তার চেয়ে বরং থেকে যা। কলেজ থেকে আমি একটা দেড়টায় ফিরব। তাছাড়া, হরিন্দর তো আছে—তোর সময়টা কেটে যাবে—তুই না হয় সন্ধ্যের দিকে, না, না, কাল সকালেই না হয় যাস। ভোর সাড়ে পাঁচটার প্রথম বাসটা ধরতে পারবি।'

পুষ্প ওর বটুয়া ব্যাগটা তুলে নেয়। সেই সঙ্গে দুটো বই, একটা নোটের খাতা। ঘড়িটা দেখেই সিঁড়ি দিয়ে দ্রুত নেমে যায়।

তেরো

হরিন্দর চান করে আসার পর পদ্মা যায়। ব্রাশ করে মুখ ধুয়ে আসে। চুল ধোয়ার ব্যাপার আছে, চান পরে করবে। কমলা দুপুরের রুটি তরকারি বানিয়ে ফেলেছে। পদ্মা হেসে বলে, 'সুন্দরী! আমার চা?'

'ঠাণ্ডা হয়ে গেছে।'

'গরম করে দে, লক্ষ্মীটি!'

স্টোভ নেভায়নি কমলা। চা গরম করে দেয়। তারপর, চারটে পরোটা প্লেটে সাজিয়ে টেবিলের ওপর রাখে। ছোট্ট একটা বাটিতে আমের আচার, একটা কাঁচা পেঁয়াজের টুকরো। ওরা পরোটা খেতে থাকে। রান্নাঘরের সব কাজ কমলা ইতিমধ্যেই সেরে ফেলেছে। বাকি কাজ শেষ করে, রান্নাঘরের মেজেয় বসে, সামান্য তরকারি নিয়ে তিন চারটে রুটি খেয়ে নেয় সে। ততক্ষণে পদ্মা-হরিন্দরের চা খাওয়া হয়ে যায়। কমলা চলে যায়। হরিন্দর ব্যাগ গোছাতে বসে। ইয়ারকি করে বলে, 'পদ্মা দেবী—আমিও এবার কাটি!'

'কোথায় যাবে?'

'গাঁয়ে। আর যাব কোথায়, বলো?'

'না, না। এখন নয়—তোমার দিদি আসুক, তারপর যেয়ো—নইলে, আমাকে একা থাকতে হবে। আমি বরং চানটা সেরে নি। হ্যাঁ—তোমার কাপড়চোপড়গুলো ছেড়ে দাও—ধুয়ে দিই। এত নোঙরা কাপড়চোপড়—মাগো!' পদ্মার কথায় একটা অদ্ভুত জাদু আছে। হরিন্দর একটু বিব্রত হয়ে বলে, 'আমিও তাহলে মাথা ধুয়ে চানটান করে নেব—কিন্তু—কাপড়চোপড় তুমি ধুলে—না, না, তার চেয়ে বরং আমি গাঁয়ে গিয়ে—'

পদ্মা ততক্ষণে প্যান্ট বুশশার্ট পাগড়ি নিয়ে নেয়, বলে, 'ওই কুর্তা পাজামা, বেনিয়ানটাও ছেড়ে দাও!'

'মানে?'

'মানে আবার কী? নির্বেশকরণ!' সার্ফ সাবান ও কাপড়চোপড় তোয়ালের মধ্যে বান্ডিল করে পদ্মা কলতলায় চলে যায়। আরও এক ঘণ্টা জল থাকবে। খুব চটপট কাপড় ধুতে শুরু করে সে। যাঃ! পুষ্পর কাপড়টাতো ধোয়ার দরকার ছিল, তোয়ালেটাও। প্যান্ট বুশশার্ট পরিষ্কার জলে কেচে পদ্মা ওপরে উঠে আসে। পুষ্পর ছাড়া কাপড় আর তোয়ালেটা খোঁজে। সেগুলো নিয়ে যেতে গিয়ে পদ্মার চোখে পড়ে হরিন্দর একটা চাদর জড়িয়ে সাধুবাবার মতো বসে আছে! হাতে একটা বই। পদ্মা না হেসে পারে না। হরিন্দর

বই থেকে মুখ সরিয়ে বলে 'ম্যাডাম—আমার কুর্তা পাজামাটা আগে শুকিয়ে দাও।' তারপরই, গম্ভীরভাবে বইয়ের পাতায় চোখ রাখে।

পদ্মা হাসতে হাসতেই নিচে নেমে যায়। হরিন্দরের কুর্তা পাজামা কেচে তারের ওপর মেলে দেয়। তারপর, বাকি কাপড়চোপড় ধুতে মন দেয়। এক এক করে সেগুলো তারের ওপর মেলে দেয়। ধোয়াধুয়ির পর্ব শেষ করে, চুল ধুয়ে নিজেও চান করে নেয়। সব জিনিস গুছিয়ে আবার ওপরে উঠে আসে। সদ্যস্নাতা পদ্মাকে দেখে তাজা গাজরের মতো মনে হয় হরিন্দরের। তবুও সে গম্ভীরভাবে বই পড়ার চেষ্টা করে। কিন্তু মন বসে না। বড় সুন্দর দেখাচ্ছে পদ্মাকে। সে কপট গাম্ভীর্যে মন্তব্য করে, 'তুমি কী শুধুই ছবি'? মাথার চুল তো দেখি মহাদেবের জটার মতো। যেন, এখনই নদী নামবে—'

'নদীতো মেয়েদের চোখেই থাকে!'

'চমৎকার বর্ণনা!' হরিন্দর সপ্রশংস দৃষ্টিতে তাকায়।

'কেননা, একটি মেয়েকে তো সারা জীবনই কাঁদতে হয়।'

'এটা তো ঠিক এ-যুগের মতো কথা হলো না।'

'এটাই তো সত্যি কথা! দিদির সঙ্গে এ-নিয়ে তোমার কোনও কথা হয়নি?'

'না।'

'আমার বাড়ি তো তুমি নিজের চোখেই দেখেছো। বাবাও মারা গেলেন। আমার দুঃখী জীবন শুরু হলো। কোথায় শেষ হবে, কে জানে!'

'তোমার আবার দুঃখ কী?'

'এমএ পড়াটা মাঝপথে থেমে গেল। পুষ্প প্রোফেসারি [illegible]ছে—আমি কোনও ট্রেনিং-ও নিতে পারিনি। ট্রেনড নই—কাজেই সরকারি চাকরি পাব [illegible] বেকার হয়ে বসে আছি। বিয়ে থা-ও হওয়ার আশা নেই।'

'তোমার জীবনের লক্ষ্য কী বিয়ে করা?'

'এই সমাজে মেয়েদের আর কী লক্ষ্য থাকতে পারে?'

'আশ্চর্য মেয়ে! ডকটর কাভুরের আলোচনা করো, মগজে বিদ্যে ঠাসা না, না বিএ পাশ করার কথা বলছি না। তোমার নিজের বিদ্যে বুদ্ধি তো যথেষ্ট, ট্রেনিং-এর দরকার কী তোমার? তোমাকে যে বউ হিসেবে পাবে, সে তো মহা ভাগ্যবান!'

'এ সবই হলো শাব্দিক ব্যায়াম—কাজের কাজ হয় না।'

'শাব্দিক ব্যায়াম! বাপস্! তোমার কথা দিয়ে তো কবিতা লেখা যায়—'

'যাক ওসব কথা। চা বানাবো?'

'হুঁ।'

পদ্মা চুলের চুড়োটা খুলে চুল ঝাড়ে। হাওয়ায় জলের ফোঁটা ছিটকে পড়ে এদিক ওদিক। হরিন্দরের হাতের ওপর-ও জলের ফোঁটা পড়ে। পদ্মা রান্নাঘরে যেতে, হরিন্দর সেই ফোঁটা মাথায় মোছে। অলৌকিক এক স্নিগ্ধ স্পর্শ অনুভব করে সে। মাথার মধ্যে একটা চিন্তা যেন ক্রমাগত ঢুকে পড়ার চেষ্টা করে।

পদ্মা দু গ্লাস চা নিয়ে আসে। হরিন্দর খাটিয়ার ওপর সটান ব'সে, যেন নতুন কোনও সাধুর চেলা। পদ্মা চেয়ার টেনে বসে। মাথার ঘন কালো চুল কাঁধের ওপর দিয়ে বুকের ওপর এসে পড়েছে। ফুঁ দিয়ে চা ঠাণ্ডা করে খায় সে। হরিন্দর দেখে পদ্মা তাকে আড়চোখে লক্ষ করছে। সে রসিকতা করে, 'তুমি কোনও প্রেতিনী নও তো, খালি লক্ষ করে যাচ্ছ?'

পদ্মা জবাবে হাসে। চোখ তুলে নামিয়ে নেয়। হঠাৎ বলে, 'ভূতের কথায় মনে পড়ল, তুমি জানতে চাইছিলে ডকটর কাভুর লাখ টাকা পেলেন কোথায়? আসল কথাটা হলো, অত টাকা তখন ওঁর কাছে ছিল না। আর এটাও জানতেন, কেউ ভূতপ্রেতের প্রমাণ দিতে পারবে না। তাছাড়া, লাখ টাকার চ্যালেঞ্জ করলে লোকে ওঁকে ধনী মনে করবে ও গুরুত্ব দিতে বাধ্য হবে!'

'খুবই সাহসী ও বুদ্ধিমান লোক।'

'হ্যাঁ—এমনকি ভারতেও যত অন্ধ বিশ্বাস আছে, তার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ান। একবার এক রেল স্টেশনের পাম্প থেকে বোতলভর্তি জল নিয়ে মাকে বলেন, গঙ্গার জল—কলকাতা থেকে এনেছি। এই জল কারও গায়ে ছিটোলে সব রোগ সেরে যাবে, এই ধারণায় বহু লোক তাঁর বাড়িতে ভিড় করে। ডকটর কাভুর তার মজাদার অভিজ্ঞতা লেখার পর বলেছেন, এ সবই এক ধরণের মানসিক রোগ। হিপনোটাইজ করেও ডকটর কাভুর অনেকের রোগ সারিয়েছেন।'

'অসাধারণ মানুষ!'

'উনি বলেছেন, এ-সব ব্যাপারগুলোই আদতে জোচ্চুরি! আর মজার ব্যাপারটা হলো চোরজোচ্চর ডাকাত চোরাকারবারি গাঁটকাটা—সবাই এই ভেল্‌কিতে বিশ্বাস করে! ধর্মের দোহাই দিয়ে এইসব জোচ্চুরি, আইন করে নিষিদ্ধ করা উচিত।'

'পদ্মা, এই বইটা তুমি কোথায় পেয়েছিলে?'

'সঙ্গরুরে আমার এক বন্ধু বইটা পড়তে দিয়েছিল। জন্মদিনে এক অধ্যাপিকা বইটা উপহার দিয়েছিলেন।'

'বইটা মেয়েদেরই বেশি করে পড়া উচিত। অনেক অন্ধ বিশ্বাস কেটে যাবে। আমি বলি কি, বইটা তুমি পাঞ্জাবি ভাষায় অনুবাদ করো। অনেকেই তাহলে বইটা পড়তে পারবে।'

'আগে তুমি পড়ে দেখো।'

'বইটা পাঠিয়ে দিও। আমি নিশ্চয়ই পড়ব।' হঠাৎ হরিন্দরের একটা কথা মনে পড়ে যায়। কথায় কথায় অনেক সময় কেটে গেছে। তাড়াতাড়ি চপ্পলটা পায়ে গলিয়ে সে বাইরে আসে। তারে মেলা জামাকাপড় শুকিয়ে গেছে। এক কোণে গিয়ে হরিন্দর চটপট কুর্তা পাজামা পরে নেয়। চাদরটা হাতে নিয়ে সে আবার ঘরে ঢোকে। বেশ খিদে পাচ্ছে। খাটিয়ায় বসে পদ্মার সঙ্গে কথা বলতে বলতে পুষ্পর জন্যে অপেক্ষা করতে থাকে।

চোদ্দ

নকশালপন্থী আন্দোলনের জেরে, মল্লণের ছেলে বলকার তথাকথিত 'পুলিশি সংঘর্ষে' মারা যায়। বলকার বি এসসি পাশ করেছিল। মল্লণ আশা করেছিল ছেলে কোনও সরকারি অফিসে চাকরি পেলে, হাজার তিরিশ টাকা দিয়ে হরদিতের কাছ থেকে বন্ধকী জমিটা ছাড়িয়ে নেবে। তাতে মল্লণ আবার নতুন করে নিজের পায়ে দাঁড়াবার জোর পাবে। কিন্তু, মানুষ ভাবে এক, আর হয় আর এক। এ-রকম ভয়াবহ একটা ঘটনা ঘটতে পারে, মল্লণ ভাবতে পারেনি। সে বসে বসে ভাবে : কী দরকার ছিল বলকারকে কলেজে পাঠাবার। দশ ক্লাস অবধি পড়ানোই তো যথেষ্ট ছিল। ভাটিন্ডা কলেজই ওর কাল হলো। ওখানে গিয়েই বলকার বদলে গেল। লেখাপড়া না শিখলে, কিংবা একটু কম শিখলেই ভাল হতো। খেতে কাজ করে অন্তত বেঁচে বর্তে থাকত। এতদিনে হয়তো বিয়ে করে সংসারধর্ম করত। বাপ-বেটা মিলে খেতের রঙ ফিরিয়ে দিত। তিরিশ হাজারের ঠিক একটা বন্দোবস্ত হয়ে যেত। সব জমিই ছাড়িয়ে নিত এক সময়।

মল্লণ সর্বক্ষণই বলকারের কথা ভেবে যায়। অন্য কিছু আর ভাবতে পারে না। কেউ কিছু জিজ্ঞেস করলে হুঁ-হ্যাঁ গোছের জবাব দেয়। মনে হয় যেন স্বপ্নের মধ্যে কথা বলছে। মল্লণের স্ত্রী কোনও ক্রমে নিজেকে সামলে রেখেছিল মনটাকে কঠিন করে। আড়ালে সে কাঁদত, কিন্তু বাইরে সে মল্লণকে সান্ত্বনা দিত। তাকে সামলে ওঠার সাহস জোগাতো। বলত, 'ভাবো ভগবান আমাদের ছেলে দেননি। যাদের ছেলে নেই—তাদের কী করে চলে? আমাদের তিন মেয়ে তিন ছেলের মতোই!'

কিন্তু, মল্লণ এ-সব শুনেও অপরিবর্তিতই থাকে। আরও বেশি বিমর্ষ, অবসাদগ্রস্থ হয়ে পড়ে। ঘণ্টাবন্নের লাগোয়া টাহলি খেতের দশবিঘে আর মুরাবাদ্দির আট বিঘে—তিরিশ হাজারে বাঁধা আছে হরদিতের কাছে। মল্লণের হাতে আছে ভাইরূপার ছয় বিঘে, মুরাবাদ্দির চার বিঘে। বাড়ির গবাদি পশু বিক্রি করে দিয়েছে। খেত জোতার কাজ অনেক আগেই ছেড়ে দিয়েছে। বাড়িতে আছে স্রেফ একটি গোরু। তা দিয়েই চায়ের দুধ, নিজেদের খাওয়ার দুধ হয়ে যায়। শাকসবজি ভাইরূপার খেত থেকে যা পাওয়া যায়—তাতেই দুটি প্রাণীর চলে যায়।

মল্লণ একনাগাড়ে বলকারের কথাই চুপ করে ভেবে যেত। রাতে ঘুমোত না। রাত্রের খাওয়াদাওয়া এক রকম ছেড়ে দিয়েছিল। মুগের ডালের সঙ্গে দু টুকরো বা এক টুকরো রুটি দলা করে খেয়ে নিত। দুধ খেত না। চা দু এক চুমুক দিয়ে রেখে দিত। আর, এইভাবেই সে একদিন মারা যায়। বাড়িতে চাঁদ এখন একা। বাড়িটাকে মনে হয় যেন লাশকাটা ঘর। রাতে কেমন যেন গা ছমছম করে। মনে হয়, আশপাশে স্তূপীকৃত লাশ পড়ে আছে। মেয়েদের কেউ এলে চাঁদ যেন একটু স্বস্তি পায়। মেয়েরা এসে পাঁচ-সাত দিন থেকে চলে যায়। জামাইদের কেউ এলে, তার খাটিয়ার পাশে বসে চাঁদ বহুক্ষণ ধরে কথা বলে যায়। কথা যেন আর ফুরোতে চায় না। মেয়ে হয়তো বলে, 'চলো না মা—আমাদের সঙ্গে থাকবে।' ধুরকিটের মোতির চেয়ে, মৌনিবাধের দুই মেয়ে, লক্ষ্মী আর জিতি—একটু বেশি পীড়াপীড়ি করে। মেয়েদের আগ্রহ দেখে চাঁদ একটু বিচলিত হয়। মেয়েরা তাদের মায়ের জন্যে কতই না ভাবে! সঙ্গে সঙ্গে বলকারের মুখ ভেসে ওঠে। সবাই আছে—নেই

শুধু বলকার। চোখের জল আর বাধা মানে না, দু চোখ ছাপিয়ে গড়িয়ে পড়ে। জামাই সান্ত্বনা দেয়, 'মা—আমারাও তো আপনার ছেলে। আপনি কী আমাদের ছেলে বলে মনে করেন না? আমরা কী আপনার কেউ নই?'

একদিন ধুরকিটের জামাই তো জিপে বসিয়ে চাঁদকে জোরজার করে নিয়ে যায় তাদের বাড়ি। কোনও রকমে সে মাস দুয়েক কাটায় সেখানে। সারাদিন শুধু মল্লণ আর বলকারের কথাই মনে পড়ে। কেঁদে সারা হয়। একদিন সে আর পারল না। মেয়েকে বলে, 'এখানে থাকলে আমি মারা পড়ব রে—আমার মন পড়ে আছে কোটেতে। আমাকে তোরা কোটেতে পাঠিয়ে দে। মরলে আমি ওখানেই মরব—যেখানে তোদের ভাই মরেছে, বাবা মরেছে—'

চাঁদের জেদাজিদিতে জামাই বাধ্য হয়ে তাকে গাঁয়ে রেখে আসে আবার। তারা যা ভেবেছিল, তা আর হয় না। বুড়িকে দিয়ে জায়গাজমি নিজেদের নামে লিখিয়ে নেবে—সে গুড়ে বালি! চাঁদ যে ব্যাপারটা আঁচ করেনি, তা নয়। ধুরকিটের জামাইকে সে মুখের ওপর বলে দেয়, 'দেখো, আমার কাছে তিন মেয়েই সমান। কেউ কমবেশি নয়—কাজেই যা করেছ, করেছ—আর চালাকি কোরো না। ওটা আমি ঠিক বরদাস্ত করব না।'

বুড়ির কথা শুনে জামাই মাথা হেঁট করে। একটু সপ্রতিভ হয়ে বলার চেষ্টা করে, 'আপনি ভুল বুঝেছেন, মা। আপনার দেখ্‌ভালের জন্যেই—এই যে আপনি চলে আসতে চাইলেন—আমারা কী আটকেছি? তেমন ফন্দি থাকলে—'

'ও-সব কায়দা আমার জানা! জেনে রেখো, জোর করে কেউ আমার টিপসই নিতে পারবে না। আমি একা হলেও বিশ জনের মতোই ক্ষমতা রাখি।' তারপর, একটু রাগ পড়তে : 'যাও বাছা—বাড়ি যাও। এসব নিয়ে তোমাদের ভাবতে হবে না—তিন মেয়ের কেউই ফাঁকি পড়বে না—এইটুকুই জেনে রেখো।'

যে দু-মাস চাঁদ ধুরকিটে ছিল, সেই সময় মৌনিবাধের জামাই-ও বার দুয়েক ঘুরে যায়। এরপর, দশ পনেরো দিন পালা করে কেউ না কেউ আসে। কখনও লক্ষ্মী, কখনও মোতি, জামাই অথবা নাতি। ধুরকিটের মেয়ে-জামাইকে আটকাবার কোনও কারণ ছিল না। ওরা সবাই আসে কুশল বিনিময়ের অছিলায়। সামনাসামনি আসল কথাটা কেউই পাড়ে না—না মৌনিবাধ, না ধুরকিট। কিন্তু, এইসব বৈষয়িক, ভাগ-বাটোয়ারার ব্যাপার আর কাঁহাতক ভাল লাগে? চাঁদ গাঁয়ের এক বিচক্ষণ কিন্তু ভাল লোকের পরামর্শ নেয়। তারই পরামর্শ অনুসারে, ভাইরূপার চার বিঘে সে দশ হাজার টাকায় বাঁধা রাখে পরমজিৎ পাটোয়ারির কাছে। গাঁয়ের ব্যাংকেই টাকাটা রেখে দেয়। পাশবইটা সামলে রাখে সিন্দুকের মধ্যে। শুধু ব্যাংকে গেলে, ম্যানেজারের সামনে রুমালে জড়ানো পাশবইটা বের করে, ফর্মে টিপসই দিয়ে টাকা তোলে খরচ চালাবার জন্যে।

চাঁদ টের পেয়েছিল সে আর বেশিদিন বাঁচবে না। ব্যাংকে জমার অঙ্কটা বিশেষ কমেনি। এরই মধ্যে একদিন—মেয়ে-জামাইদের কিছু না জানিয়ে, গাঁয়ের সরপঞ্চ আর নম্বরদার মেহের সিংকে নিয়ে সে যায় ফুলের তহসিলদারের কাছে। নির্দেশনামায় জানিয়ে দেয়, তার মৃত্যুর পর জায়গাজমি যেন তিন মেয়েকে সমানভাবে ভাগ করে দেওয়া হয়।

ঘটনাটি নিয়ে বেশ সোরগোল পড়ে যায় : বাহাদুর বুড়ি চাঁদ কৌর—নিজেই সব বিলি বন্দোবস্ত করে এসেছে। মেয়ে-জামাইদের তোয়াক্কা করেনি—অথচ সবাইকে সমান অংশ দিয়েছে—একদম শের কি বাচ্চি!

মেয়েরাও খবর পেয়ে যায়। তিন মেয়েই ছুটে আসে। খুশি হলেও ঠিক ততটা খুশি হয় না যেন। প্রত্যেকেই একযোগে ভাবে, মা আমাকে একটু বেশি দিলে পারত! মৌনিবাধের দুই মেয়ে এক রকম জোর করেই মাকে তাদের সঙ্গে নিয়ে যায়। মাস ছয়েক চাঁদ ভালই থাকে। হঠাৎ, একদিন শরীরটা ভীষণ খারাপ লাগে। যা খায়, বমি হয়ে যেতে থাকে। চাঁদ তার অন্তিম ইচ্ছা ব্যক্ত করে : 'আমাকে তোরা কোটেতে নিয়ে গিয়ে চিতেয় দিস। আমার ছেলে, ছেলের বাবা যে শ্মশানে পুড়েছে—আমাকেও তোরা ওই শ্মশানে পোড়াস। বাপ-বেটার মাটি যেন আমার গায়ে লেগে থাকে।'

চাঁদের মৃতদেহ ট্রলিকে করে কোটেতে নিয়ে আসা হয়। প্রতিবেশীরা অল্পস্বল্প কান্নাকাটি করে। কাঠ চেলা করে শ্মশানে গিয়ে তারা চাঁদের সৎকার করে। ধুরকিটের মেয়ে-জামাইরাও হাজির থাকে। গাঁয়ের তরুণরা সবাই শ্মশানে যায়, নিজেদের মধ্যে বলাবলি করে : 'শহিদের মা চাঁদ কৌর—ছেলে তো শহিদ—মাও কী কম কুরবানি করেছে?'

মল্লণের বাড়ির চাতালে বসে সবাই চাঁদ সম্বন্ধে আলোচনা করে। মা বাবা বংশের স্মৃতিচারণ। চাঁদের বাবা ছিলেন প্রাইমারি স্কুলের শিক্ষক। শিক্ষকতার সঙ্গে পোস্টমাস্টারি-ও করতেন। ভিন গাঁয়ের লোক। মল্লণকেই জামাই হিসেবে বেছে নেন। অন্যান্য আত্মীয়স্বজনের কথাও ওঠে। হঠাৎ একজন প্রশ্ন করে, 'আচ্ছা মুদেড়ের রামদাস—বুড়ির কে হয়?'

মুদেড়ের রামদাস! নামটাতো একেবারে অচেনা। কেউ আগে শোনেনি। গ্রামের পোস্টমাস্টার জানান, 'চাঁদ কৌর চার পাঁচ মাস অন্তর একশো টাকা করে মানিঅর্ডার করত মুদেড়ের রামদাসকে। দু একবার মানিঅর্ডার ফেরতও আসে। কিন্তু বুড়ি ঠিক পাঠিয়ে যেত। কয়েক বছর ধরে। মানিঅর্ডার ফর্মে শুধু ঠিকানা থাকত : রামদাস গ্রাম মুদেড় জেলা ভাটিন্ডা—ব্যাস! কে এই রামদাস আমি জানি না। রামদাসের কোনও চিঠিপত্তরও আসত না, যে চিঠি থেকে কিছু জানা যাবে।'

খবরটা শুনে সবাই অবাক। কে এই রামদাস, কেন তাকে চাঁদ টাকা পাঠাত, সবটাই যেন এক প্রহেলিকার মতো। জায়গাজমির কাগজ চাঁদ নিজের কাছেই রাখত। মৌনিবাধ যাওয়ার সময় শুধু সেগুলি নিয়ে যায়। মেয়ে-জামাই তা আবার ফেরত নিয়ে আসে। দিন ছয়েকের মধ্যেই সরপঞ্চের সঙ্গে যোগাযোগ ক'রে, পাটোয়ারির সঙ্গে যোগাযোগ করে, তিন জামাই, যথাবিহিত দক্ষিণাসহ দাবি দাখিল করে। শ্রাদ্ধের দিন তিন জামাই সবাইকে লাড্ডু বিতরণ, গরিব নিঃস্বদের 'পুষ্পদান' করে। শ্রাদ্ধের দিন অবধি মেয়ে-জামাইরা কোটেতেই থাকে। প্রত্যেকের মনে ভয়, হঠাৎ যেন কোনও বিপত্তি না ঘটে বসে! জায়গাজমি খুব একটা কম নয়। বারো বিঘের মতো। শ্রাদ্ধ-শান্তি চুকে যাওয়ার দু একদিন পরেই সব ভাইরূপায় যায়। পাটোয়ারির লেখা দলিল অনুসারে, তহসিলদারের কাছে বারো বিঘে জমি তিনজনের নামে রেজিস্ট্রি করে আসে। তহশিলদার তো প্রথমে দলিল ছুঁড়ে ফেলে দেয়, কিন্তু পাটোয়ারি তহশিলদারের কানে-কানে কিছু একটা বলতে, তহসিলদার নিজেই দলিলটা তুলে নিয়ে নির্দেশনামায় সই বসিয়ে দেয়।

পনেরো

রেজিস্ট্রি হওয়ার মাস দুই পরে খবর চাউর হয়ে যায়, মল্লণের জামাইরা সব জমি বেচে দেবে। প্রধানরা বললেন, 'এ তো জানা কথা। অজানা গাঁয়ে এসে কে আর খেতি করবে? তাছাড়া, বাবাজীবনদের নিজেদের জমি আছে—ধুরকিটের জামাইয়ের তো প্রচুর আছে আর, এই জমি তো পড়ে পাওয়া চোদ্দ আনা! মৌনিবাধওয়ালারা এখানে কোন দুঃখে আসবে?'

কেউ কেউ আবার ক্ষুব্ধ হয় একটু, 'সবই সময়ের খেলা! ঘণ্টাবন্নের লাগোয়া জমিটা কিনেছিল মল্লণের বাবা। জঙ্গল আগাছায় ভর্তি জমিটার হাল একেবারে ফিরিয়ে দেয়।'

'শুনেছি। মল্লণের বাবা ছিল ফৌজি—রিসলদার করম সিংহ। পেনশনের পর ওই জাঠ টাকার মুখ দেখে। মজবুত, তাকতদার লোক ছিল।'

'সেই জমির যে এই হাল হবে, কে ভেবেছিল, করম যেমন মল্লণকে বড় করে, মল্লণও তেমনি তার ছেলে বলকারকে বড় করে, কিন্তু সেই ছেলে যে নকশাল হয়ে যাবে, তা কী ভাবতে পেরেছিল কোনও দিন? এত খেটেখুটে যে জমি, সবই উড়ে গেল তিন মেয়ে জামাইয়ের হাতে! কে করম, কে মল্লণ—কে আর খবর রাখে?'

এরই ফাঁকে কয়েকজন ধুরকিট থেকে ঘুরে আসে। মৌনিবাধে যায়। সবারই ধান্দা জমি কেনা। দু জায়গাতেই তারা কথা চালচালি করে। জমি কেনার জন্যে কোর্টের কিছু লোক মুখিয়ে থাকে। জামাইরা চেনাজানা ফড়ে পাঠায় : ভাবগতিক দেখে এসো খদ্দেরদের। উনিশ-বিশ দামের তফাতে কিছু এসে যাবে না।

মজার ব্যাপার, যারা ক্রেতা নয় তারাই বেশি কথাবার্তা বলে। সন্তর্পণে নিজেদের মধ্যে দরদাম যাচাই করে নেয়। ধুরকিটের লোক যায় হরদিতের বাড়ি। হরদিৎ একটু নিচু গলায় বলে, 'ভাই জমির দাম তো এখন পড়তির মুখে। আর, এত জমি রেখেই বা কী হবে?'

পরমজিৎ-ও নিস্পৃহ ভঙ্গিতে বলে, 'আমার নিজের জমিই ঠিকমতো দেখতে পারি না। তোমরা বরং অন্য কারও সঙ্গে যোগাযোগ করো। তা, চা চলবে?' ভাবটা এমন যেন ওদের এড়িয়ে যেতে পারলেই বাঁচে!

ওরা যায় মেহের নম্বরদারের বাড়ি। মেহের বাড়ি নেই। হরদিৎ ওদের পেছনে তার বারোমেসেকে যেতে বলে, 'যা দেখে আয় ওরা কার-কার কাছে যায়, কি কথাবার্তা বলে।' বারোমেসে ওদের অনুসরণ করে পরমজিতের বাড়ি আসে। শোনে, একটু আগেই ওরা এসেছিল। হরদিতের বারোমেসেকে দেখে পরমজিৎ একটু নড়ে চড়ে বসে। বারোমেসে খবর পায়, মল্লণের জামাই গিল্লদের বাড়ি উঠেছে। ওখানেই থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা হয়েছে। গিল্লদের বাড়ি জামাইয়ের এক পিসতুতো ভাইয়ের শ্বশুরবাড়ি। কুটুম্বিতা বেশ ঘনিষ্ঠ। এখানেও জামাই জমি বেচার কথা পেড়ে রেখেছে; কিন্তু গিল্লর সে সামর্থ্য নেই। বেচারা আড়াই-চালা ঘরে থাকে। হরদিতের বারোমেসে সেখানে বসে পড়ে। জামাই জমি বিক্রির কথাই আলেচনা করছে। পরমজিৎ-ও এসে গেছে। ওরা পরমজিৎকে বাড়ির ভেতরে নিয়ে যায়। বারোমেসেকে কেউ লক্ষ করে না। পরমজিৎ কথা বলে চলে যাওয়ার পর, মেহের

আসে। সৎশ্রী আকাল বিনিময়ের পর মেহের সোজাসুজি জিজ্ঞেস করে, 'তোমরা জমি বেচতে চাইছ কেন? তিন জনের একজন এখানে থেকে গেলেই তো পারো! এত বড়ো বাড়ি, জন্তুজানোয়ার রাখতে পারবে। তাছাড়া জাঠেদের জমি বেচাটা ঠিক নয়!'

জামাই উত্তর দেয়, 'সবই বুঝলাম নম্বরদার, কিন্তু চার বিঘের জন্যে এখানে কে থাকবে? তাতে তো মজুরিই পোষাবে না— তার ওপর ভিন গাঁ—'

'বেশ। বিঘে প্রতি কত চাও?'

'এখানে সে দর চালু। বেশি চাই না।'

বুড়ি চায়ের গ্লাস দিয়ে যায়। হঠাৎ মেহেরের নজর পড়ে হরদিতের বারোমেসের দিকে। মেহের তার উদ্দেশে বলে, 'এই— তোর গেলাস আন— চা নিয়ে যা।'

হরদিতের বারোমেসে এবার গিল্লদের বারোমেসের গ্লাসটি খুঁজে পেতে নিয়ে আসে। চা খেতে খেতে এদের কতাবার্তা শুনে যায়। মেহের বলেছ :

'এই গাঁয়ে জমির দাম দস্তুর এক-এক রকমের। জমির অবস্থা থেকে দাম পনেরো-ষোলো থেকে বিশ-বাইশ হাজারও হতে পারে।'

মল্লণের জামাই দার্শনিকের ঢঙে আকাশের দিকে চায়। তারপর একটু ভেবে বলে, 'খরিদ্দার না হলে আসল দামটা জানা শক্ত।'

'আরে, খরিদ্দার তো আসবে— কিন্তু দামটা বলো। সামর্থ্যে কুলোলে আমিও কিনতে পারি।'

'আমাদের গাঁয়ে যে দর চালু সেটা হলো বিঘে প্রতি তিরিশ হাজার—আশপাশে অর্থাৎ কাহানিকে ধোলা হন্ডিয়া লক্ষ্মী রুড়েকা-নহরি—জমির দাম সব এক। দু এক হাজার কম বেশি, এই যা।'

মেহের বোঝে জামাই বিঘে প্রতি আটাশ থেকে ত্রিশ হাজার চায়, অর্থাৎ পঁচিশ-ছাব্বিশ অবধি নামবে। মেহের উঠে দাঁড়ায়, হাত বাড়িয়ে দেয়, 'ঠিক আছে। তোমার জমি বিক্রি হয়ে যাবে।' একটু হেসে মেহের বেরিয়ে যায়। হরদিতের বারোমেসেও উঠে পড়ে। জামাই বুড়িকে জিজ্ঞেস করে, 'ছেলেটা কে?'

'হরদিতের বারোমেসে। তোদের কথাবার্তা শুনে গেল।'

মানে, হরদিৎ-ও কিনতে চায়। জামাইয়ের কাছে ছবিটা এবার স্পষ্ট হয়। বুড়ি বলে, 'জমি দাঁওয়ে পেলে আর কে ছাড়ে? জাঠেদের দেদার টাকাকড়ি। এখন চক্কর মারছে স্রেফ দাঁও মারার জন্যে। তুই বাপু মাথা ঠান্ডা রেখে কাজ করিস। বেশি গা দেখাবি না!' এ-সব বিষয়ে বুড়ির জ্ঞান বেশ প্রখর। হরদিতের বারোমেসে দ্রুত হেঁটে যায় হরদিতের বাড়ি।

রাস্তার মোড়ে তিন চারজন যুবক আড্ডা মারছিল। দু একজন লেখাপড়া জানা। হরিন্দরও ছিল তাদের মধ্যে। হরিন্দর বারোমেসেকে দেখেই ডাক দেয়, 'কন্নু! কোথায় গিয়েছিলি?'

'গিল্লদের বাড়ি।' কন্নু না থেমে জবাব দেয়।

'দাঁড়া ব্যাটা! পালাচ্ছিস কেন?' হরিন্দর এগিয়ে এসে তার হাত ধরে। জিজ্ঞেস করে, 'কেন গিয়েছিলি?'

'তোমার বাবা পাঠিয়েছিল জমি বেচার কথা শোনার জন্যে। জামাই জমি বেচবে। ' জবাব দিয়েই হরিন্দররের হাত ছাড়িয়ে সে দৌড় দেয়।

হরিন্দর বন্ধুদের কাছে ফিরে আসে। মুখ চোখ বেশ গম্ভীর। কি যেন ভাবে। বন্ধুদের একজন বলে ওঠে, 'কী রে, তোর হলোটা কী? এক মিনিটের মধ্যে মুখ বিগড়ে গেল যে!'

হরিন্দর বন্ধুদের কথায় জোর করে হাসে। দাড়ি চুলকোয়। অন্যমনস্ক হয়ে জিজ্ঞেস করে, 'কী যেন বলছিলি তোরা?'

'বলা শেষ হয়ে গেছে!'

একটু পরেই বন্ধুরা চলে যায়। হরিন্দরও বাড়ির দিকে হাঁটা দেয়। মনে একটা চাপা রাগ। বারোমেসেকে আশপাশে দেখা যায় না। হরিন্দর সোজা বাবার কাছে যায় : 'তোমাকে কতবার না বলেছি আমাদের আর জমির দরকার নেই। তবু জমির ওপর থেকে তোমার লোভ গেল না? ফের কন্নুকে পাঠালে গিল্লদের বাড়ি!'

'না, মানে—মানে—' হরদিৎ আমতা-আমতা করে।

'মানেটা কী?' হরিন্দর ঝাঁজিয়ে উঠে, 'আমি সব বুঝি। মল্লণের জমি কেনার ফন্দি আঁটছ বসে বসে! জমি কিনলেই আমি অশান্তি করব বলে দিচ্ছি!'

হরদিৎ চুপ করে থেকে জবাব দেয়, 'ঠিক আছে তোর কথাই রাখব। কিন্তু, ব্যাংকে টাকা রেখে কী হবে? ওই পাঁচ-ছ টাকা সুদের পয়সায় তো পেঁয়াজও কেনা যায় না। জমিতে সোনা ফলে। যাক, তোর যা ইচ্ছে— আমি তো তোদের কথা ভেবেই—'

'আমাদের কথা আর তোমাকে ভাবতে হবে না! জমি চাই না!' হরিন্দর গলা চড়িয়ে জবাব দেয়।

ছেলের বিদ্রোহী চেহারা দেখে হরদিৎ নির্বাক হয়ে যায়।

ষোলো

বেশ কয়েকদিন ধরে জমিব দাম নিয়ে দরদস্তুর চলে। ধুরকিটের জামাই গিল্লদের বাড়িটাই সদর সপ্তর হিসেবে ব্যবহার করে। বারো বিঘের দাম বেশ একটা মোটা অঙ্কের টাকা। একজনের পক্ষে থোক দাম ধরে দেওয়া সহজ নয়। ভাইরূপার চার বিঘে পরমজিৎ নেয়, বিঘে প্রতি কুড়ি হাজারে। ঘন্টাবন্নের আট বিঘে নেয় মেহের আর তিরথ— এই দুজনে মিলে; বিঘে প্রতি পঁচিশ হাজারে। জমিটা ভাইরূপার জমি থেকে অনেক ভাল। ফুলের তহসিলদারের সামনে ক্রেতা-বিক্রেতা দুই তরফই হাজির হয় সইসাবুদের জন্যে। পঞ্চায়েতের লোকজনও থাকে। জমি রেজিস্ট্রির কাজ শেষ করে, সব হোটেলে ঢুকে গরম

জিলিপি ও চা সহযোগে তৃপ্তির ঢেকুর তোলে। হাসি ঠাট্টা মসকারা চলে সমানে। জামাইরা, সঙ্গে পরমজিৎ, তিরথ ও মেহের যেন নেশাগ্রস্ত! তবে, এ নেশা সাধারণ নেশা নয়, জমির নেশা! তিন মেয়ে শুধু চা খায়, জিলিপিতে কামড় বসাতে পারে না। কোথায় যেন একটা ব্যথা। ওরা তাই কিছুটা গম্ভীর বিষণ্ণ। তিন জনেরই চোখ কিন্তু শুকনো খটখটে। চোখের জল যেন শুকিয়ে গেছে।

পাওয়া গেছে দু লাখ আশি হাজার। তিরিশ হাজার পাবে হরদিৎ বন্ধকী বাবদ। পরমজিৎ আগেভাগেই তার দশ হাজার কেটে নেয়। এরপর টাকা তিনভাগ হয়ে, এক একজনের ভাগে পড়ে আশি হাজার। খরচপত্তরের জন্যে কিছু রেখে, তিনজনই ফুলের এক ব্যাংকে টাকা জমা দেয়। প্রত্যেকের কাছ থেকে দশ-বিশ টাকা বকশিশের বিনিময়ে ব্যাংকের এক কেরানি আধ ঘন্টার মধ্যে সব কাজ করে পাশবই ধরিয়ে দেয়। তিন দম্পতি সন্ধ্যে বেলায় ফিরে আসে কোটেতে। ধুরকিটের জামাই মাখন পরের দিনই চলে যায় রমেশ বেনিয়ার দোকানে হরদিতের সঙ্গে দেখা করতে। হরিন্দরও আসে বাপের সঙ্গে। মেহের তিরথ আগেই এসে বসে ছিল। হরিন্দর রমেশকে বলে, 'কই হে লালা— খাতাটাতা খোলো!' খাতার নির্দিষ্ট পাতা উলটে রমেশ হিসেবনিকেশ পড়ে-পড়ে শোনায়। মাখন তিরিশ হাজারের বাণ্ডিলটা দেয় হরিন্দরের হাতে। টাকা গুনতে-গুনতে হরিন্দর আড় চোখে রমেশের মুখটা দেখে, তারপর বলে, 'লালা— লেখো, সব শোধ হয়ে গেছে।

রমেশ সেই মতো লেখে। হরদিতের তরফ থেকে মল্লণের টাহলির খেত ছাড়ান দেওয়া হয়। মল্লণের তিন জামাই, ধুরকিটের মাখন ও মৌনিবাধের সাধু আর গুরমেল, তাদের সঙ্গে হরদিৎ, বুড়ো আঙুলে টিপসই মারে পাতার ওপর। রমেশ খেরো খাতাটা সুতলি জড়িয়ে বেঁধে ফেলে আগের মতো। তারপর, রমেশের দোকান থেকে বেরিয়ে যে যার বাড়ি চলে যায়। হরদিৎ-ও বাড়ি ফেরে কি যেন ভাবতে ভাবতে। মনে মনে কারও সঙ্গে যেন কথা বলে। চেহারায় কোনও রাগ ভাব চোখে পড়ে না। হরিন্দর বাড়ি না গিয়ে, যায় ব্যাংকে। নতুন একটা অ্যাকউন্ট খুলে তিরিশ হাজার জমা দেয়। হরদিৎ বাড়ি ফিরে দয়ালির হাতে একটা চিরকুট দিয়ে আলমারিতে রেখে দিতে বলে। তারপর, বৈঠকখানায় গিয়ে চুপচাপ শুয়ে পড়ে। দয়ালি চিরকুটটা আলমারিতে রেখে ঘরের কাজে হাত দেয়। রুটি বানোনো হয়ে গেছে। কন্নুও খাওয়াদাওয়া সেরে চলে গেছে। দয়ালিও খেয়ে নিয়েছে। বাকি আছে শুধু বাপ-ব্যাটা। হয়তো ওরাও খেয়ে নিত। কিন্তু রমেশের দোকানে যেতে হলো সে-সময়। হরিন্দর বোধ হয় কোনও গাঁয়ে গেছে, এখনও ফেরেনি। এত বেলা হয়ে গেছে, দয়ালি ভাবে, বাপ-ব্যাটার রুটি খাওয়ার কোনও চাড়ই নেই। ছেলে তো ফেরেনি; ছেলের বাবা-ও ঝিম মেরে শুয়ে পড়েছে! ছেলেকে নিয়ে ভাবার কিছু নেই, সাধারণত সে নিজেই এসে রুটিটুটি খেয়ে খেতে চলে যায়। দয়ালি বৈঠকখানায় ঢোকে : 'রুটি আনব?'

'না।' হরদিৎ আনমনা হয়ে জবাব দেয়।

'কেন? এখানে নিয়ে আসি না?'

হরদিৎ একটু বিরক্ত হয়ে খাটিয়ার ওপব উঠে বসে। এক হাতে দাড়ি চুলকোয়, অন্য হাতটায় খাটের একটা ধারের ওপর রাখে। কি যেন বলব-বলব করে কিন্তু শেষ

অবধি বলে না। দয়ালি একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকে। হরদিৎ একটু পরে বলে, 'আচ্ছা—যাও, রুটি নিয়ে এসো।'

দয়ালি থালায় রুটি সাজিয়ে এনে রেখে যায়। চারটি রুটি, বাটিতে মাখন, গেলাসে টক লস্‌সি কাটা পেঁয়াজ আর আমের আচার। হরদিৎ খাটিয়ায় ওপর থালাটা রাখে। দড়ির ফাঁকে লস্‌সির গেলাসটা আটকে দেয়। এক টুকরো রুটিতে মাখন লাগিয়ে মুখে পোরে, তারপর লস্‌সির গ্লাসে চুমুক দেয়। গলা দিয়ে রুটি যেন নামতে চায় না। পিঁয়াজের টুকরোতে কামড় দেয়— আচারে হাতও দেয় না। শেষ অবধি, আধ গ্লাস লস্‌সি খেয়ে হরদিৎ থালাটাকে টেবিলের ওপর রেখে দেয়। তারপর খাটে শুয়ে ছাদের দিকে শূন্য চোখে তাকিয়ে থাকে। দয়ালি আর একটা রুটি ও এক লোটা জল নিয়ে ঢোকে।

'এ কী! খাওনি? আমি তো আর একটা রুটি এনেছি। কী হয়েছে তোমার? এমন মনমরা হয়ে পড়ে আছ কেন?'

হরদিৎ উঠে বসে, দয়ালির দিকে হাত বাড়িয়ে দেয়, 'হাতে একটু জল দাও। খিদে নেই। খেতে ইচ্ছে করছে না।'

দয়ালি ভাবনায় পড়ে। হাতে জল দিয়ে উদ্বিগ্ন হয়ে ফের জিজ্ঞেস করে, 'কী হয়েছে তোমার?'

হরদিৎ কুলি করতে, করতে জবাব দেয়, 'এমনিই, কিছু হয়নি আমার।'

'খাওয়াদাওয়ার গোলমাল?'

'হতে পারে।' হরদিৎ আবার শুয়ে পড়ে। দীর্ঘশ্বাস ফেলে। দয়ালি থালা নিয়ে রান্নাঘরে চলে যায়। লস্‌সি গেলাসটা ভরে নিয়ে হরদিতের অভুক্ত রুটি খেতে বসে। খাবার নষ্ট করা ঠিক নয়। হরিন্দর এখনও আসছে না কেন?

একটু পরেই হরিন্দর আসে। এসেই হাঁক দেয়, 'খেতে দাও!' দয়ালির উনুনের কাজ চুকে গিয়েছিল। হরিন্দরের হাঁক শুনে তাড়াতাড়ি রুটি ডাল মাখন গরম করে থালা নিয়ে বেরিয়ে আসে। বারান্দায় বসে রুটি খেতে খেতে হরিন্দর মল্লণের তিন জামাইয়ের কীর্তিকাণ্ড মাকে শোনায়। মাঝে মাঝে হাসে, জামাইদের সম্বন্ধে কিছু কটুকাটব্যও করে, দয়ালি নির্লিপ্ত হয়ে সব শুনে যায়। শুধু বলে, 'কতক্ষণ ধরে বসে আছি রুটি নিয়ে—এভাবে চললে ঘরসংসার চালাবি কী করে? বিয়ে কর, বুঝবি মজা! দেখব, বউ তোর জন্যে কতক্ষণ রুটি নিয়ে বসে থাকে! পরের বাড়ির মেয়ের হাতেই তুই সিধে থাকবি— হ্যাঁ!'

'পরের বাড়ির মেয়েকে আমিই যদি সিধে করে আনি? তখন—?' মার সঙ্গে এই ধরনের মজা, রসিকতা হরিন্দর প্রায়ই করে।

'কিন্তু আমার তো একটা কথাও তুই শুনিস না!'

'ব্যাস! বাকি কথা পরে হবে। এখন খেতে কাজ আছে।'

'আমি তো আর খাটতে পারছিনা রে। একটা বউ আন—'

হরিন্দর হেসে ওঠে : 'এই কথা? আমার বিয়ের বয়েস কী পালিয়ে যাচ্ছে? আরে বাবা, তুমি চোখ বুজোবার আগেই বউ দেখে যেতে পারবে!'

কী ছেলে! কথায় পেরে ওঠা শক্ত। হরিন্দর জানতে চায় তার জুড়িদার কখন খেতের কাজে গেছে। দয়ালি জবাব দেয়, খেয়েদেয়েই চলে গেছে, সঙ্গে কোদালও নিয়ে গেছে— আর হরিন্দরকে ট্রাকটর ও ট্রলি নিয়ে যেতে বলে গেছে।

হরিন্দর ট্রাকটরে স্টার্ট দেয়। ট্রলি জোড়াই ছিল গতকাল থেকে। হরিন্দর ট্রাকটরের মুখ খেতের দিকে ঘোরায়, দয়ালি, যতদূর চোখ যায় ছেলেকে দেখে। তারপর, পায়ে পায়ে বৈঠক খানায় আসে আবার। হরদিৎ বসেই আছে। বারবার দরজার দিকে তাকাচ্ছে। দয়ালি আসতে খাটিয়া ছেড়ে উঠে দাঁড়ায় ধীরে ধীরে। জুতোটা গলায়, পাগড়িটা খুলে আবার বাঁধে। তারপর, কি ভেবে আবার বসে পড়ে। পাগড়িটা হাঁটুর ওপর রাখে। দয়ালির দিকে তাকিয়ে কি যেন বলতে চায়, কিন্তু বলে না। দয়ালিও হতবাক হয়ে যায় হরদিতের ভাবভঙ্গিতে। কি বলবে ভেবে পায় না। নতুন আর কী-ই বা বলার আছে? হরিন্দরের বিয়ের কথা? কিন্তু, হরিন্দর তো গ্রাহ্যই করে না এ-সব কথা। হাসি ঠাট্টা করে হালকা করে দেয় বিষয়টা। কিন্তু, হরদিৎ আজ এত বিমর্ষ কেন?

শেষ অবধি হরদিৎ-ই বলে, 'একটু চা আনো। খাব।'

'আনছি।' দয়ালি বেরিয়ে যায়। হরদিৎ ভাঁজ খুলে আবার পাগড়িটা বাঁধতে থাকে।

সতেরো

সেপ্টেম্বর-অক্টোবর মাস। দশেরা সবে শেষ হয়েছে। মাঝরাতের পরই ঠাণ্ডা পড়ে। কেউ কেউ বাড়ির মধ্যে শোয়। উঠোনে যারা শোয়, তারা সঙ্গে একটা মোটা চাদর রাখে। হরদিৎ দয়ালি শোয় রান্নাঘরের লাগোয়া বারান্দায়। হরিন্দর বৈঠকখানায়। শীত-গ্রীষ্ম- হরিন্দর ওখানেই শোয়। গরমের দিন সারারাত ফ্যান চলে। ঘুমোবার আগে কিছু পড়া ওর বহুদিনের অভ্যাস। বৈঠকখানায় আলো আছে, ফলে অসুবিধে হয় না। পড়াটাও ভাল হয়— বাইরের ঝুটঝামেলা থাকে না।

সেদিন রাতে রুটি খেয়েই দয়ালি শুয়ে পড়ে। হরদিৎ গোরুমোষের ভূসি দেখে এসে শুয়ে পড়ে। হরিন্দর যথারীতি বৈঠকখানায় বই পড়ে যায়। দেওয়ালে টিউবলাইট জ্বলে, পাখা চলে এক নম্বরে। বইটা অনেকখানি পড়া হয়ে গেছে পরিচ্ছেদটা শেষ হলেই সে শুয়ে পড়বে। এমন সময়, বাইরে লোহার গেটে একটা শব্দ হয়। কেউ ঢুকছে মনে হয়। একটু পরে শব্দটা আর একটু জোরে হয়। হরিন্দর চারপাই থেকে উঠে চট করে বেরিয়ে আসে। অস্পষ্ট কয়েকটা ছায়া! নিজেদের মধ্যে নিচু গলায় কি যেন বলাবলি করে, হাসাহাসি করে। নিশ্চয়ই চেনা লোক। হরিন্দর এগিয়ে এসে গেট খুলতে দুটি ছায়ামূর্তি এগিয়ে আসে। 'কে?' হরিন্দর জিজ্ঞেস করে। তারা কোনও জবাব না নিয়ে বৈঠকখানার দিকে গটগট করে হেঁটে যায়, যেন এ-বাড়ি তাদের খুব চেনা! হরিন্দর কিন্তু ওদের একেবারেই চিনতে পারে না, গলার অস্পষ্ট আওয়াজটাই একটু চেনা-চেনা লাগে। আলো পড়তেই হরিন্দর চিনে ফেলে। একজন আজমের ধালিওয়াল, বাড়ি দীনা-কাংড়া গ্রামের

আশপাশে। পাতিয়ালা বিশ্ববিদ্যালয়ে ফিজিকসে এম এসসি। অন্যজন রামদাস, বিএ পাশ করে পড়া ছেড়ে দেয়। এ সেই রামদাস, সে বলকারের সহপাঠী। একটি এক-কামরা ঘর ভাড়া নিয়ে গ্রামের এক প্রান্তে থাকত। মুদেড়ের রামদাস! এদিক ওদিক ঘুরতে ঘুরতে ওরা হরিন্দরের সঙ্গে দেখা করতে এসেছে। পার্টির পাঠচক্রেও এদের কয়েকবার দেখাসাক্ষাৎ হয়। এই আকস্মিক সাক্ষাৎকার তিনজনেরই বেশ ভাল লাগে। হরিন্দর বলে, 'তোরা একটু বস—আমি গেটটা বন্ধ করে আসি।'

হরিন্দর ফিরতে ধালিওয়াল বলে, 'খিদে পেয়েছে। রুটির বন্দোবস্ত কর।'

'রুটি হয়ে যাবে। তোরা ঠিকঠাক হয়ে বস।'

'একটু গরম জল চাই যে।' রামদাস বলে ওঠে 'ঠ্যাং ব্যথা করছে, হাত-পা টনটন করছে।'

'সব ব্যবস্থা হয়ে যাবে।' হরিন্দর আশ্বস্ত করে, 'আর কী খবর?'

'রুটির পর চা পাওয়া যাবে তো?' ধালিওয়াল হাসতে হাসতে জিজ্ঞেস করে, তারপর জুড়ে দেয়, 'আমরা দিনভর শুধু চা খেয়ে যাই!'

'মাকে জাগাই আগে। রুটি করতে তো সময় যাবে, তোরা আগে বরং চা খা।'

'হ্যাঁ—একটু বাড়তি গরম জলও—হাতমুখ ধুয়ে নেব।' রামদাস অনুরোধ জানায়।

হরিন্দর মার খাটের কাছে যায়। মাকে আস্তে আস্তে জাগায়। দয়ালি রান্নাঘরের দিকে পা বাড়ায়। হরিন্দর নিচু গলায় বলে, 'দুজন আছে। সাত আটটা রুটি বানালেই হবে। সঙ্গে একটু আলুর তরকারি। পেঁয়াজ আর আচার তো আছেই . . . '

'এমন অসময়ে এলো—' দয়ালি কৌতূহলী হয়, 'এরা কারা?'

'আমার বন্ধু।'

'বন্ধু করেছিস বটে! এটা কী লোকের বাড়ি আসার সময় হলো? আর সময় পেল না!'

'এসেছে তো কী হয়েছে?'

'মাঝরাতে নিজের বউকে একবার জাগালে বুঝতিস কত ধানে কতচাল! মাঝরাতে রুটি বানানো—হুঁ!' দয়ালি গজগজ করতে-করতে উনুন ধরায়।

'ঠিক আছে, বাবা!' হরিন্দর মাকে শান্ত করে, 'আস্তে কথা বলো, নইলে বাবা উঠে পড়বে। বাবা উঠলে আর রক্ষে থাকবে না— এক ঘন্টা ধরে বকবক করে যাবে।' আচ্ছা, চায়ের জল চাপাও আগে — আমি ততক্ষণে ওদের জন্যে একটু জল নিয়ে আসি।'

হরিন্দর জল আনতে চলে যায়। দয়ালি চায়ের জল বসায়। হরিন্দর জল আনতে, রান্নাঘরে সেই জল-ও দয়ালি গরম করে দেয়। গরম জলের বালতি, সেই সঙ্গে একটি তোয়ালে নিয়ে, হরিন্দর বৈঠকখানায় আসে। একটু পরে, একটা ঠাণ্ডা জলের বালতিও আনে। ওরা হাত মুখ ধোয়। হরিন্দর ওদের জন্যে বিছানার ব্যবস্থাও করে ফেলে। তিন বন্ধুই গল্পে মেতে ওঠে।

দয়ালি উনুনে আলুর তরকারি, ডাল চাপায়। উনুনে গনগনে আঁচ। মাঝেমধ্যে দয়ালি তাতে শুকনো কাঠের চ্যালা ঢুকিয়ে দেয়। এরই ফাঁকে, আটা মেখে, বেলে— চাটুতে নুন লংকা ছড়িয়ে রুটি ফেলে সে। পেঁয়াজ কাটে ছোট-ছোট টুকরো করে। ডাল ঘাটতে-

ঘাটতেই আলুর খোসা ঠাণ্ডা জলে ডুবিয়ে ছাড়িয়ে ফেলে। আলুর দমে মশলা ঢালে। উনুনটা উসকে দেয়।

হরিন্দর রান্নাঘরে এসে দেখে যায়। দুটো রুটি এর মধ্যেই হয়ে গেছে। বয়াম থেকে আচার বের করে সে তড়কার সঙ্গে একটু ঘি ঢেলে, আলু ফেলে— দুটো বাটিতে সব সাজিয়ে গুছিয়ে নেয়— তারপর একই থালায় চারটি রুটি, দুটি বাটি, আচার পেঁয়াজ নিয়ে বৈঠকখানায় চলে আসে। খাবার রেখে জলের গেলাস ও দুটি জাগ আনে। সঙ্গে, আরও দুটি রুটি। চিনি চা দুধের কৌটো আনতেও ভোলে না। পুষ্পিন্দরের স্টোভ যেমনকার ছিল; তেমনই থেকে গেছে। পড়তে-পড়তে যখনই ইচ্ছে হতো, পুষ্প ওই স্টোভে চা বানিয়ে খেত। দিদি যাওয়ার পর, হরিন্দরই এখন স্টোভটা সদ্ব্যবহার করে একই ভাবে। হরিন্দর বলত, 'এখন যখন খুশি চা খেতে পারব!'

রামদাস হঠাৎ বলে, 'আমি বাইরে থেকে একটু ঘুরে আসি।'

'এত ঘুরেও তোর ঘোরার সখ গেল না! এতক্ষণ তো পায়ের ব্যথায় কাঁকাচ্ছিলি বাঞ্চৎ!' রামদাসের সঙ্গী ধালিওয়াল মন্তব্য করে, 'তোর সখ হয়েছে—তুই যা। আমি যাচ্ছি না, বাপু!'

শেষে কিন্তু তিনজনেই বেরিয়ে পড়ে।

ফেরার পথে, দূরের কোনও গাঁ থেকে ভেসে আসা ঢোলের আওয়াজ কানে আসে তাদের; কোলাহলের রেশ। ধালিওয়াল সবিস্ময়ে বলে ওঠে, 'এ-তো রাতেও কেত্তন চলছে?'

হরিন্দর কান পেতে আওয়াজটা শোনে। বলে, 'উঁহু, এটা কেত্তন নয়— চামারপাড়ায় কারওর বোধহয় 'ভর' হয়েছে— ওঝা এনে ভূত তাড়াচ্ছে!'

'য়্যাঁ! তোদের গ্রামে এইসব ভেল্‌কি চলে?' রামদাস-ও অবাক হয়ে যায়।

'এদের গ্রামে কেন?' জবাব দেয় ধালিওয়াল, 'সব গ্রামেই এসব চলে। এই জন্যেই তো এদেশে বিপ্লব-টিপ্লব হচ্ছে না! ভূতপ্রেত দত্যিদানো দেবাদেবি জড়িবুটি তুকতাক, এ-সবই একটা প্রকান্ড চাল লোককে রুটির কথা ভুলিয়ে দেওয়ার। এদের মন থেকে ভূত তাড়াতে না পারলে কিচ্ছু করা যাবে না।'

'তাড়াবেটা কে?' হরিন্দর উত্তর দেয়, 'তাহলে তো আমাদের সরকার বাহাদুরের গদি বেদখল হয়ে যাবে! ভূতপ্রেত আছে বলেই তো সরকারের গদি অক্ষত আছে!'

খাটিয়ার ওপর বসে ধালিওয়াল বলে: 'লঙ্কার ডকটর আব্রাহাম কাভুর একটা বিখ্যাত বই লিখেছিলেন, বী গন্ গডমেন। তিনি এইসব অলৌকিক ব্যাপারস্যাপার একেবারে নস্যাৎ করে দিয়েছেন। বইটার পরিচিতিতে বোম্বের হরিহরণ পুজ্জার একটি সুন্দর কথা লিখেছেন— 'এই ভ্রমের বিরুদ্ধে ক্রমাগত লড়াই চালাতে পারলে প্রোলেতারিয়েটদের জয় অনিবার্য। সে সমাজ এই অলৌকিতার জন্ম দেয়, সেই সমাজই তাকে একদিন খতম করে দেয়'— সমাজকে বদলে দেওয়ার জন্যে আমরা এখন যে লড়াই চালাচ্ছি, তাতে এগুলি আপনা থেকেই চলে যাবে। সামাজিক স্তরে লড়াই চালাতে

গেলে ডকটর কাভুরের বই আমাদের ভীষণ সাহায্য করবে। বইটার একটা পাঞ্জাবি অনুবাদ খুব দরকার। দেখি, কে করে—'

হরিন্দরের মনে পড়ে পদ্মার কথা। পদ্মা তো এসব অনেক আগেই তাকে শুনিয়ে দিয়েছে। ধালিওয়াল কাভুর সম্পর্কে আলোচনা থামিয়ে বলে ওঠে, 'অনেক বকলাম, এবার চা খাওয়া!'

হরিন্দর স্টোভ জ্বেলে চায়ের জল বসায়। রামদাস প্রশ্ন করে, 'ধর্ম ভাঙিয়েই এইসব আজব কাজকারবার হয়। ধর্মবিশ্বাসের জন্যেই মানুষের মনে এই মারাত্মক ব্যাধি ঢুকে পড়েছে। কিন্তু, এই ধর্মবিশ্বাস মন থেকে যাবে কী করে?'

'ঠিক— আসলে, ধর্মটা কী লোককে বোঝাতে হবে। পৃথিবীর কোনও ধর্মই মানুষের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করার কথা বলে না। পরস্পরের বিরুদ্ধে লড়াই শেখায় না। সব ধর্মের সারকথাঃ পরমাত্মা এক। সৃষ্টিকর্তা এক। সব মানুষ ভাই-ভাই। বিভেদ সেদিনই হলো মতলববাজেরা যেদিন ধর্ম আর রাজনীতি জড়িয়ে দিল, অর্থাৎ রাজা হওয়ার জন্যে, ক্ষমতায় আসার জন্যে, তারা এইসব ভেল্‌কি দেখিয়ে লোককে বুদ্ধু বানিয়ে ছাড়ল!'

'লোক তো বুদ্ধু বনে গেছে', রামদাস জবাব দেয়, 'ধান্দাবাজেরা কাজ গুছিয়ে ক্ষমতায় এসে গেছে— রাজনীতির খেলাও এই ধর্মবিশ্বাস ভাঙিয়ে—'

হরিন্দর চা এগিয়ে দেয়।

ধালিওয়াল রামদাসকে বলে, 'এটা বিজ্ঞানের যুগ। মানুষ সব রহস্যের সমাধান খুঁজে পাওয়ার চেষ্টায় ব্যস্ত। ঈশ্বর বা ধর্ম, কোনওটাই এখন মানুষের দরকার নেই। বজ্র বিদ্যুৎ মেঘ পাহাড় সমুদ্র— মানুষ কী না আবিষ্কার করছে, কোথায় না যাচ্ছে! তবুও মানুষ কিন্তু মীথোপজীবী, মীথ অবলম্বন করে, কাল্পনিক কোনও ঈশ্বর সৃষ্টি করে প্রাকৃতিক-সামাজিক ভয় বিপর্যয় এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। খারাপ করার ইচ্ছা থাকলেও, ঈশ্বর বিশ্বাস করে বলেই, কাজটা করতে পারে না। আজকের বিজ্ঞান প্রাকৃতিক প্রত্যেক নিয়মকে ব্যাখ্যা করতে পারে।'

'ঈশ্বর যে মানুষের কল্পনা— এটা মানুষকে বোঝানো দরকার। তাহলে, অনেক ভুল ধারণা কেটে যাবে।' হরিন্দর তার অভিমত ব্যক্ত করে।

রামদাস সায় দেয়, 'এটাই মানুষকে বোঝানো দরকার— পৃথিবীর যাবতীয় সৃষ্টি মানুষেরই সৃষ্টি। ভগৎ সিং 'আমি কেন নাস্তিক'-এ লিখেছেন 'সমাজে মূর্তিপূজা ও ধর্ম যেমন ভ্রষ্টাচারের বিরুদ্ধে লড়াই, ঠিক সেই রকমই সমাজকে এখন ঈশ্বর-বিশ্বাসের বিরুদ্ধে লড়তে হবে' ।'

ধালিওয়াল আলোচনা করে: 'গ্যালিলিয়ো-ই প্রথম ধর্মবিশ্বাসে ঘা দিয়েছিলেন—পৃথিবী ঘোরে, এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকে না। রুশ আমেরিকা মহাকাশে কত রকম অভিযানই না করেছে। মানুষের অজানা এখন কিছু নেই। দেবদেবি ঈশ্বর ভূতপ্রেত এখন 'অলৌকিক' নয়— অলৌকিক বরং মানুষ নামের জীব!'

চা খেতে-খেতে ধালিওয়াল বিশ্লেষণ করতে থাকে: 'পুঁজিপতি স্বার্থের হালফিল চালটা হলো, মুখে হিন্দু মুসলিম শিখ ভাই-ভাই— ধর্মীয় স্তরে গরিব-বড়লোক কিন্তু সব এক—এখন বলো, এই যে দাঙ্গাহাঙ্গামা চলে, সেটা কোন ধর্ম নিয়ে? সামাজিক স্তরে দুটি

বর্গ নিখুঁতভাবে সাজানো, এক, লুটেরা— দুই, যার লুট হচ্ছে। ধর্ম দিয়ে সব সম্বন্ধই এখন এক করে দেওয়ার রেওয়াজ। পুঁজিপতি-জায়গিরদার, হিন্দুই হোক, মুসলমানই হোক—জাত কিন্তু এক, অর্থাৎ লুটেপুটে খাও। মজুর কিংবা গরিব চাষি, পুঁজিপতি কিংবা জায়গিরদার— সে যার ধর্মে একই কাজ কারবার চালিয়ে যায়!'

চা শেষ করে ধালিওয়াল বলে, 'যে জন্যে তোর কাছে আসা—কিছু 'ফান্ড' হবে? ভোরবেলাতেই চলে যাব।'

'কত?'

'যা পারিস। একটা কাজ আছে।'

'সকাল দশটি অবধি তাহলে তোদের থাকতে হবে। দুপুরের খাওয়াটাও সেরে যাবি।'

রাত অনেক হয়েছে। ওরা শুয়ে পড়ে। ধালিওয়াল জবাব দেয়, 'ঠিক আছে। কাল আমাদের রামপুরা যেতে হবে। দুপুরের দিকেই যাব না হয়।'

হরিন্দর আলো নেভায়। ছোট-ছোট কথা বলতে বলতে তিন জনেই একসময় ঘুমিয়ে পড়ে।

আঠারো

ভোরে উঠেই রামদাস বলে, 'সুস্থ সমাজ গড়তে গেলে দরকার যথার্থ শিক্ষক, টিচার। শিক্ষকেরা মাঝেমাঝেই হইচই করেন, সমাজ নাকী তাঁদের যোগ্য সম্মান দেয় না। লোকেরা তাঁদের পাত্তাই দেয় না। মাইনে কম। সরকার কেয়ার করে না। এখন সব ভান্ডাবাজির দিন, শিক্ষকরা ডাণ্ডাবাজি করতে পারেন না বলে কেউ তাদের আমল দিতে চায় না। কথাগুলো বেঠিক নয়। সমাজ তৈরি করেন এই শিক্ষকরাই। মুদেড় গ্রামে আমার মাস্টারমশাই— প্রাইমারি স্কুলে— ছিলেন করমচাঁদ, এখানকার গ্রামেই থাকতেন। খুবই সৎ ও সজ্জন মানুষ। মদ তো দূরের কথা, তামাকও ছুঁতেন না। তাঁর স্ত্রী কিন্তু হুঁকো টানতেন। কী একটা রোগ ছিল মহিলার — তামাকে স্বস্তি পেতেন। তিন বছর আমি করমস্যারের কাছে পড়েছিলাম, আর এই তিন বছরেরই তিনি আমাকে নাস্তিক করে দেন!'

রামদাসের কথা শুনে হরিন্দর হেসে ফেলে, 'গাধা! ক্লাস থ্রি-ফোরে তোর এমন জ্ঞান ছিল যে নাস্তিক-আস্তিক বুঝতে পারছিস!'

রামদাসও হেসে জবাব দেয়, 'সেইটাই তো বলব তোদের। ন বছর বয়েসে আমি ক্লাস ওয়ানে ভর্তি হই, কিন্তু ন বছর বয়েস হলে কি হবে, তেরো-চোদ্দ বছরের ছেলের মতো আমি তখন, যাকে বলে, 'পেকে' গেছি। মাস্টারমশাই একদিন বোঝালন গাছ বড় হয় মাটির রসে, ক্রমাগত মাটি থেকে রস টেনে টেনে, কিন্তু রস শুকিয়ে গেলে গাছ আর

হয় মাটির রসে, ক্রমাগত মাটি থেকে রস টেনে টেনে, কিন্তু রস শুকিয়ে গেলে গাছ আর মাটি থেকে রস টানতে পারে না। মরে যায়। মানুষও ঠিক এমনি মাটি থেকে জন্মায়, আবার মাটিতেই মিলিয়ে যায়। এর মধ্যে স্বর্গ নরক আত্মা বলে কিছু নেই। আমাদের মনের ভেতরে যে মন, সেইটাই হলো আত্মা। শরীর চলে গেলে, ওটাও চলে যায়। ইহকাল-পরকাল বলে কিছু নেই। গরমের ছুটিতে নিজের গ্রামে আমাদের নিয়ে গিয়ে এ-সব বোঝাতেন। পরে, কলেজে গিয়ে এই কথাগুলি আমরা শুনি, কিন্তু করমস্যার অনেক আগেই আমাকে এ-সব শিখিয়ে দিয়েছিলেন—'

রাতে সব দুধ খরচ হয়নি। হরিন্দর সেই দুধ দিয়ে আবার চা বানায়। তিন জনে চা খেয়ে প্রাতঃকৃত্যাদির জন্যে বেরিয়ে পড়ে। যখন ফেরে, তখন বেশ বেলা চড়েছে। হরিন্দর সেদিন খেতের কাজে যায় না। খেতে তার যে সহকারী, সে এসে কথা বলে চলে যায়। গমের বীজ ফেলার কাজ শেষ হয়েছে। বপনের শেষ পর্যায়ের কাজটুকুই শুধু বাকি। এছাড়া বিশেষ কোনও কাজ নেই। তবুও একটা টহল দেওয়ার দরকার আছে। হরদিৎ তাই বারোমেসে কন্নুকে নিয়ে খেতে যায়। ঘুরে ফিরে দেখে বীজ ঠিকমতো পড়েছে কী না। লুধিয়ানা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আনানো এই বীজ একটু নতুন ধরনের। শেষ অবধি হয়তো কোনও গমই হবে না! হরদিৎ ঘুম থেকে উঠেছিল একটু বেলায়। চা খেয়ে চানটান করে নেয়। হরিন্দর আগেই অবশ্য চানের পাট চুকিয়ে বৈঠকখানায় বসে যায়। হরদিৎ হরিন্দরকে অতিথিদের পরিচয় জিজ্ঞেস করেনি। বৈঠকখানায় উকি দিতে ছেলে দুটির সঙ্গে অবশ্য চোখাচোখি হয়। তারা সৎশ্রী আকাল জ্ঞাপন করতে, হরদিৎ-ও অস্ফুটস্বরে প্রত্যুত্তর দেয়।

দয়ালি নোনতা পরোটা নামিয়ে ফেলে। ছেলেরা আমের আচার দিয়ে পরোটা খায়, সঙ্গে অবশ্য মাখন ও টক লস্‌সি ছিল। সাড়ে নটা বাজে। হরিন্দর ওদের বসিয়ে ব্যাংকে চলে যায়।

দয়ালি বৈঠকখানায় ঢুকে ছেলেদের সঙ্গে কথা বলে। যেন, অনেকদিনের চেনা। দয়ালি জিজ্ঞেস করে, 'তুই কোথায় থাকিস? আর, তুই?' দয়ালি বুঝে নিয়েছে ছেলে দুটি হরিন্দরের খুবই ঘনিষ্ঠ বন্ধু, নইলে রাত কাটাতো না। আর একটা কথা মনে হয়, হরিন্দর নিশ্চয়ই এদের কথা এড়াতে পারে না, বা পারবে না। হরিন্দরের বিয়ের কথাটা এদের কাছে পাড়লে কেমন হয়? কাজেই দয়ালি বলে বসে, 'হ্যাঁরে— তোদের বন্ধুকে একটা বিয়ে করতে বল্‌ না— আমার কথা তো কানেই তোলে না!'

দয়ালির কথা শুনে ওরা প্রথমটা হাসে, তারপর গম্ভীরভাবে মাথা নাড়ে। মা তো জানে না হরিন্দর কোন পথে চলে গেছে। ধালিওয়াল ভেবেচিন্তে জবাব দেয়, 'কিছু ভেবো না মা — আমরা হরিন্দরকে রাজি করাব— তোমার ঠিক বউ চলে আসবে।'

হরিন্দর ফিরে এসে দেখে, মা ওদের সঙ্গে বেশ জমিয়ে গল্প করছে। হরিন্দর আসতেই দয়ালি চলে যায়। ওরাও প্রায় তৈরি ছিল। ঝোলা তুলে নেয় কাঁধে। ধালিওয়ালের হাতে একটা মোটা পেপারব্যাক। ফ্রান্সের প্রসিদ্ধ লেখক জাঁ-পল সার্ত্রর দ্য ফ্লাই-এর পাঞ্জাবি অনুবাদ: 'মক্ষিকা'।

হরিন্দর জিজ্ঞেস করে, 'কী বই?'

'গুরুশরণ সিংহের নাটক 'যখন শিখা জ্বলে' দেখেছিস?'

'কয়েকবার।'

রামদাস জবাব দেয়, 'গুরুশরণ দেখিয়েছেন রাষ্ট্র ও ধর্ম মানুষকে কীভাবে শুষে খায়— গুরুশরণকে প্রভাবিত করেছে সার্ত্রর এই নাটক। বইটা রেখে দে—পড়ে দেখিস।

হরিন্দর বইটা রেখে দেয় আর, একটা খাম তার পকেটে ঢুকিয়ে দেয়। বলে, 'হাজার আছে। দরকার হলে আবার আসিস।'

দু জনেই উঠে পড়ে। হরিন্দর পাশের বাড়ি থেকে একটা সাইকেল নিয়ে আসে। ওদের বুর্জগিল্লার বাসস্টপ অবধি পৌঁছে দিয়ে ফিরে আসে। বাড়ি ফিরে হরিন্দর আর বসে না— খেতের কাজ দেখতে চলে যায়। এক বন্ধুর সঙ্গে কথা বলতে থাকে।

ওদিকে, হঠাৎ হরদিতের নজরে পড়ে কন্নু একদৃষ্টে কি যেন দেখছে। হরদিৎ-কে দেখেই সে এগিয়ে আসে, গমের বীজ, অঙ্কুর ইত্যাদি দেখায়। কোনও-কোনও জায়গায় অনেক দূর অবধি কিছু দেখা যায় না। কন্নু মাটি সরিয়ে হরদিৎ-কে অঙ্কুর দেখায়। হরদিৎ খুশি হয়— কয়েক পা এগোয়, তারপর দাঁড়িয়ে পড়ে। আর এগোতে পারে না। কেন জানি, আর এগোতে ইচ্ছে করে না। সে কন্নুকে বলে, 'তুই দেখ। আমি ওই ঢালু জায়গাটায় একটু বসি, জিরই। হাঁটুটা বড় টনটন করছে।'

ঢালু জায়গাটার নিচে, খালের ঘাস আর বালির ঢিবির ওপর বসে হরদিৎ হাঁটুর মালাইচাকিটা টিপতে থাকে। একটি গুল্মের পাতা ছিঁড়ে মুখে ফেলে চিবোতে থাকে।

পাতার কসা স্বাদে জিভটা যেন ছুলে যায়। বিরক্ত হয়ে হরদিৎ মুখ থেকে পাতাটা ফেলে দেয়। সঙ্গে সঙ্গে মাথায় নানা আজগুবি চিন্তা আসে। এই জমিজিরেতের জন্যে কত কিছুই না করতে হয়েছে। চুরি জোচ্চুরি বাটপাড়ি ঠকবাজি বেইমানি— কী বাদ নেই? প্রথমে ছিল তো স্রেফ বিশ বিঘে, এখন পঞ্চাশ বিঘে। তিরিশ বিঘে বন্ধকী নেওয়া। লোকের কাছ থেকে কত সুদ আদায় হয়, কত ব্যাংকে জমা, তার কোনও হিসেব নেই। ফেলে ছড়িয়ে লাখ টাকা তো সব সময়েই এদিক-ওদিক করে। কিন্তু লাভ কী হলো শেষ অবধি? যদি জানত জমির হাল এই হবে, তাহলে এত কিছু করত না, আর পাঁচজন সাধারণ জাঠের মতো খেয়ে পরে দিন কাটিয়ে দিত। হরিন্দরের মতিগতি বোঝে কার সাধ্য? বাপের একেবারে উলটো। তিরিশ বিঘে বন্ধকী যেভাবে ছেড়ে দিল, তা কোনও পির-পয়গম্বরও ছাড়ত কীনা সন্দেহ! সুদে টাকা খাটানো ব্যবসাটাও হরিন্দরের জন্যে বন্ধ হয়ে গেছে। বিয়ে যে কবে করে, তারও ঠিক নেই। পুষ্প তো বাপের সঙ্গে সম্পর্কই রাখে না। ছেলেই এখন যা কিছু আশা ভরসা। মেয়ে বিয়ে করল না—বড় বদনামের ব্যাপার। লোকেরা নিশ্চয়ই এ নিয়ে কানাঘুষো করে। শরিকরা তো এমনিই দেখতে পারে না। পুষ্প কীনা জাত-কুজাত দেখল না। এক নাপতের ছেলেকে পছন্দ করে বসল। ফাঁড়া তো কেটে গেল, কিন্তু মেয়েটা এখনও বিয়ে থা করছে না কেন? সোজা জবাব দিয়ে দিয়েছে মুখের ওপর, কোনও ঢাকঢাক গুড়গুড় করেনি। . এইসব ভাবতে-ভাবতে বেলা গড়িয়ে যায়। খেতমজুর তার কাজ শেষ করে চলে যায়। অন্য কোনও কাজে গেছে বোধ হয়। হরদিৎ উঠে দাঁড়িয়ে কয়েক পা এগোয়। না, মজুরটি যায়নি, দূরের একটি আলে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

হরদিৎ তাকে হাঁক দিয়ে ডাকে, কিন্তু গলা থেকে আওয়াজ বেরোয় না। নিজের কাছেই গলাটা যেন কেমন মরা-মরা লাগে। না, মজুরটাকে আর ডেকে কাজ নেই। বিশেষ কোনও কাজ করাবার নেই যখন। নিজেই ফিরে আসবে সময়মতো।

বাড়ি ফেরার পথে হরদিৎ হঠাৎ ঠিক করে, ব্যাংকটা একবার ঘুরে গেলে কেমন হয়। ব্যাংকের ম্যানেজার এক কেরানির সঙ্গে কি যেন আলোচনা করছিলেন। হরদিৎ সৎশ্রী আকাল জ্ঞাপন করে একটা বেঞ্চে বসে। ম্যানেজার কেরানির সঙ্গে কথা শেষ করে হরদিৎকে বললেন, 'সর্দারজি— কী মনে করে?'

'পরশু হরিন্দর তিরিশ হাজার জমা দিয়ে গেছে?'

ম্যানেজার একটু ভেবে বললেন, 'হ্যাঁ। একটা নতুন অ্যাকাউন্ট খুলে গেছে ওই টাকায়।'

'নতুন অ্যাকাউন্ট?'

'হ্যাঁ। নিজের নামে।'

হরদিৎ একটু বিস্মিত হয়। হরিন্দর আবার এটা করল কেন?

ম্যানেজার লেজার খুলে দেখান। জিজ্ঞাসু চোখে তাকান। হরদিৎ বলে ওঠে, 'ঠিক আছে। ঠিক আছে। এইটাই আমি জানতে এসেছিলাম।'

হরদিৎ উঠে দাঁড়ায়। শরীরটা ভীষণ খারাপ লাগে। বাড়ি ফিরে চারপাইটার ওপর বসার সঙ্গে সঙ্গে মনে হলো কে যেন পেছন থেকে প্রচণ্ড জোরে এক ধাক্কা মারছে। চারপাইটার বাঁদিকে হরদিৎ টলে পড়ে। আওয়াজ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দয়ালি ছুটে আসে। 'কী হয়েছে?'—কোনও সাড়া নেই। হরদিৎ সংজ্ঞাহীন।

এই প্রথম হরদিৎ এইভাবে জ্ঞান হারায়।

উনিশ

বলকারের কথা মনে পড়লেই হরিন্দরের খুব রাগ হয় গ্রামের ওপর। নম্বরদার পাখর কোন আক্কেলে বলকারকে পুলিশের হাতে তুলে দিয়েছিল? সে ঘুণাক্ষরেও টের পায়নি, বলকারকে ধরাবার জন্যে পাখর যতটা না দায়ী, তার চেয়ে বেশি দায়ী তার বাবা। হরিন্দর কেন, গ্রামের কেউই এটা জানে না। পাখর এই গোপনীয়তাকে সঙ্গে নিয়েই মারা যায়। গাঁয়ের লোকের ওপর রাগ হলেও, একটা কথা ভেবে সে সান্ত্বনা পেত, বলকারকে মেরে পাখরও রেহাই পায়নি। গ্রামের লোক তারে মেরে প্রতিশোধ নিয়েছে। বলকারের বাবার বন্ধকী জমি এতদিনে মুক্ত হলো। ওই তিরিশ হাজার টাকা হরিন্দরের কাছে বিষবৎ মনে হয়। সে জানে, তার বাবা হরদিৎ ওই তিরিশ হাজারের জন্যে মল্লণকে কত কষ্টের মধ্যেই না ফেলেছে। ওই টাকা ঘরে ঢোকালে অমঙ্গল হবে, পাপ হবে। এই জন্যেই টাকাটা সে নিজের নামে ব্যাংকে জমা দেয়, ইচ্ছে এই টাকা দিয়ে একটা 'বলকার স্মারক

তহবিল' খুলবে। বলকারের অসমাপ্ত কাজের জন্যেই সে টাকাটা খরচ করবে। বলকারের পার্টির কেউ, টাকার দরকারে যখনই আসবে, সে এই তহবিল থেকে টাকা তুলে দেবে। দিতও তাই, কিন্তু কেউ জানত না একথা। এমনকী, পার্টির লোকজনও না।

এক এক সময় তার মনে হয়, বাপের এই বিশাল জায়গাজমি বৈভব লোক-ঠকানো চুরি জোচ্চুরি ঠগবাজিতে বানানো এক দৈত্যাকৃতি প্রাসাদ—বিরাট এক বটগাছের মতো, যার জটা, শিকড় ছড়িয়ে পড়েছে নানা দিকে, অপ্রয়োজনীয় ও অপ্রাসঙ্গিকভাবে। এতে কারও কোনও কাজ হয় না, উপরন্তু তার ছায়ার নিচে কোনও গাছ গজালে, সেই গাছকেও সে মেরে ফেলে! কাজেই, এই বটগাছকে শিকড়শুদ্ধ উপরে ফেলা উচিত। এই জন্যেই বাবার জমি বাড়াবার প্রচেষ্টাকে সে আটকে দিয়েছে। বটগাছের ঝুরি যেভাবে কাটা হয়, ঠিক সেইভাবেই হরিন্দর পৈতৃক জমি কাটছাঁট করে যাচ্ছে। লোকের প্রয়োজনের বেশি টাকা থাকা উচিত নয়। সমাজবাদের পাঠ এই কথাই বলে। বিপ্লব আসে এইভাবেই। বাবাকে না হয় সামলানো গেল, কিন্তু গাঁয়ে বাবার মতো আরও যারা আছে? তাদের সম্বন্ধে কী করা যাবে? পাটোয়ারি পরমজিৎ, নম্বরদার মেহের কিংবা তিরখ? ওরা-ও তো হরিদতের মতোই। কোন্ দীক্ষায় শ্রেণীহীন সমাজ তৈরি হবে? যাতে কোনও গ্রামেই হরদিৎ পরমজিৎ মেহেরদের আর অস্তিত্ব থাকবে না?

কমিউনিস্ট পার্টি এটি বুঝলেও, তার কোনও নির্দিষ্ট সংকল্প বা কার্যক্রম নেই। পুঁজিপতিরা তাদের এগোতে দেয়নি—পা টেনে রেখেছে। বলকারের পার্টির তরুণরাই শুধু বিপ্লবের গুপ্ত প্রস্তুতি নিয়ে যাচ্ছে। বই পড়িয়ে কী তরুণদের বিপ্লবের পথে আনা যায়? না, আগে দরকার লোককে বুঝিয়ে দেওয়া মানুষে মানুষে কোনও শ্রেণী হতে পারে না। বলকারের পার্টি যদি শাসক ও শাসিত—এই দুইয়ের তফাত লোককে বুঝিয়ে দিতে পারে, তাতেও অনেক কাজ হবে। মানুষ যে এক—এই বৃহৎ সত্যটি মানুষকেই খুঁজে বের করতে হবে। সত্যের এই লড়াই এখনই শুরু করা দরকার—জিত এক সময়ে হবেই।

ধালিওয়াল ও রামদাস বেশ কয়েকমাস আগে হাজার টাকা নিয়ে গেছে পার্টির কাজে। তারপর আর আসেনি। এলে ভাল হতো। ওদের কথাবার্তা শুনতে হরিন্দরের খুব ভাল লাগে। বারবার শুনতে ইচ্ছে করে। চব্বিশ ঘণ্টা যদি ওদের সঙ্গে কাটানো যেত! কিন্তু, তা-তো সম্ভব নয়, হরিন্দরের পক্ষে অন্তত। ইনকিলাব ব্যাপারটি কাছাকাছি তো নয়ই, এমনকী বেশ কিছু দূরেও লক্ষ করা যায় না। যে দেশের পিরপয়গম্বর পুঁজিপতিদের হাতের পুতুল, যে দেশ এখনও জাতপাত বশীকরণ মারণ উচাটন ঝাড়ফুঁক—অস্তিত্ববিহীন কোনও পরমাত্মায় বিশ্বাসী, সে-দেশে এত চট করে ইনকিলাব আসবে কী করে? এর মধ্যেই জায়গা করে নিয়েছে সমাজের সুবিধাবাদী শ্রেণী—তাদের মুখেই সামাজিক পরিবর্তনের বুকনি খই ফোটায়! কিন্তু, হরিন্দর চিন্তা করে, এসব ভেবেই বা কী হবে? নিজের ঘর ভাঙলেই তো ইনকিলাব আসবে না—আবার নিরাশ হয়ে হাল ছাড়াটাও ঠিক হবে না। তাহলে 'লাইন' কী হবে? তার চেয়ে, হরিন্দর সিদ্ধান্ত নেয়, নিজের সামর্থ্য মতো যতদূর সম্ভব সে এগোবে। 'লাইন' তো পুজো করার ব্যাপার নয়!

একদিন বেশ ভোরে হরিন্দরের ঘুম ভেঙে যায়। চোখ পিটপিট করে টাইমপিসটা দেখে: এখনও চারটে বাজেনি। সূর্য উঠতে দেরি আছে। চোখ বুজিয়ে সে আর একটু

ঘুমোবার চেষ্টা করে। ঘুম আসে না। অগত্যা সে উঠে পড়ে, স্টোভ জ্বেলে চা বানায়। মনটা যেন কোথায় হারিয়ে গেছে! সে প্রাতঃকৃত্যাদির জন্যে খেতের দিকে চলে যায়। ফিরে এসে চানটান করে জামাকাপড় পরে নেয়। পাগড়িটা বাঁধতে-বাঁধতে একটা গানও গায় গুনগুন করে। মনে মনে একটা সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে সে, যার জন্যে মনটা খুব হালকা লাগে। ঘুম থেকে ওঠার অবসাদও উধাও হয়ে গেছে। বৈঠকখানা থেকে বাইরে পা বাড়ায় সে। মা এখনও শুয়ে আছে। বাবা-ও। মার বাঁ হাতটা ধরে হরিন্দর আস্তে আস্তে বলে, 'আমি একটু বেরোচ্ছি। ফিরতে সন্ধ্যে হবে।' মা ঘাড় নাড়ে: আচ্ছা। হরিন্দর উঠোন পার হয়ে যায়, মা চেয়ে থাকে। ভোরবেলার ফুটফুটে রোদ। হরিন্দরের পিঠটা বেশ সুন্দর—দয়ালির মনে হয়। উঠোন পেরিয়ে হরিন্দর আর একবার বৈঠকখানায় ঢোকে, আয়নায় মুখটা এক ঝলক দেখে নেয়। নিজের চেহারাটা বেশ সুশ্রী মনে হয়।

ভাইরূপার ডিপো থেকে হরিন্দর সালাবাতপুরার বাস ধরে। সালাবাতপুরা থেকে বারনালার। বারনালা থেকে সঙ্গরুর। সঙ্গরুরের বাজার পার হয়ে নাভা গেট। একবারই এখানে এসেছিল। পথঘাট ঠিক চেনা নয়। গলিটা আন্দাজ করে দরজায় এসে টোকা দেয়। দরজা খোলে পদ্মা—নটা বেজেছে, স্কুলে যাওয়ার জন্যে তৈরি হচ্ছিল সে। শাদা সালোয়ার-কামিজ-শাদা চুন্নি। শাদা কাপড়ে বেশ ফর্সা লাগে পদ্মাকে। একেবারে বরফশাদা! পদ্মা হরিন্দরকে ভেতরের ঘরে নিয়ে গিয়ে বসায়। দুই ভাই-ই বেরিয়ে গেছে। বউদিরা ছেলেমেয়েদের স্কুলে পাঠাবার তোড়জোড় করছে। হরিন্দরকে সোফায় বসিয়ে পদ্মা পুষ্পর কথা জিজ্ঞেস করে। পদ্মার 'মডেল স্কুল' ওই গলির-ই মুখে। বউদিদের চায়ের জল বসাতে ব'লে, পদ্মা হরিন্দরকে বলে, 'একটু বোসো—আমি ম্যাডামকে একটু বলে আসি।

একটু পরেই পদ্মা ফিরে আসে। ততক্ষণে চা বানানো হয়ে গেছে। ফেরার পথে দোকান থেকে কিছু খাবার জিনিসও পদ্মা আনে। চা খেতে-খেতে দু জনে দুজনের দিকে তাকায়। চোখের ভাষাতেই ভাব বিনিময় হয়ে যায়। চোখের ভাষা ঠোঁটে আসে: 'আমার চিঠি পেয়েছিলে?'

'হ্যাঁ। সেই জন্যেই তো এলাম।'

'তার আগের চিঠি?'

'পেয়েছিলাম।'

'জবাব দাওনি যে।'

'হুঁ।'

'মানে—ইচ্ছে করেনি?'

'ন্‌না।'

'তবে?'

'ভাবলাম, চিঠির জবাব চিঠিতে না দিয়ে নিজেই 'জবাব' হয়ে আসব!'

'ও।' পদ্মা একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলে। 'ও' শব্দটি যেন এক প্রশ্নচিহ্নের মতো। জল না পেয়ে মাছ যেমন ছটফট করে, হরিন্দরের বুকের ভেতরটা সেইরকম ছটফট করে ওঠে।

চা যেন গলা দিয়ে নামতে চায় না। গ্লাসটা সে বুকের ওপর চেপে ধরে। গরম কাঁচের তাপেও কিন্তু ছটফটানি যেতে চায় না। মনে হয়, চায়ের তরল পানীয় চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়বে। হঠাৎ হরিন্দর জিজ্ঞেস করে : 'অ্যাটাচি হবে একটা?'

একী অদ্ভুত প্রশ্ন! পদ্মা বিস্মিত হয়ে চেয়ে থাকে।

হরিন্দর নিজেই বলে, 'অ্যাটাচিতে জামাকাপড় ভরে নিয়ে আমার সঙ্গে চলো!'

পদ্মার মনে হয় সে বোধ হয় এবার পাগল হয়ে যাবে, নাকী হরিন্দরই পাগল হয়ে গেছে?

পনেরো-বিশ মিনিটের মধ্যেই পদ্মা তৈরি হয়ে যায়। অ্যাটাচির মধ্যে দরকারি কিছু জিনিস আর জামাকাপড় পুরে ফেলে। যাওয়ার সময় বউদিকে বলে, 'আমি যাচ্ছি।'

বউদি একেবারের জন্যেও জিজ্ঞেস করে না, পদ্মা কোথায় যাচ্ছে, কেন যাচ্ছে। শুধু হরিন্দরকে এক পলক দেখে নেয়। ব্যাস, এইটুকুই।

কুড়ি

একটু বেলার দিকে হরিন্দর ও পদ্মা ভাটিন্ডায় এসে পৌঁছয়। পুষ্পর কলেজে আর যায় না। একটা রিকশা ধরে সোজা চলে আসে তার বাসায়। চাবি বাড়িওয়ালার স্ত্রীর কাছে থাকে। পুষ্প যখনই বেরোয়, চাবি মহিলার কাছে রেখে যায়। একটা-দেড়টা বেজেছে। পুষ্প এই সময়ে কলেজ থেকে ফেরে। হরিন্দর পদ্মাকে নিয়ে বাড়িওয়ালার বৈঠকখানাতেই অপেক্ষা করতে থাকে। বাড়িওয়ালার পরিবার পরিজন হরিন্দরকে চেনে। অনেকবারই সে এখানে এসেছে। বাড়িওয়ালার স্ত্রী পদ্মাকে দেখে। চা দিয়ে আপ্যায়নও করে। পুষ্প আসে ঠিক দুটোর সময়। হরিন্দর-পদ্মাকে দেখে তার তো গাছ থেকে পড়ার যোগাড়! হরিন্দর হাসে দিদির অবস্থা দেখে, পদ্মা কিন্তু গম্ভীর। পুষ্প ওদের তাড়াতাড়ি ওপরে নিয়ে যায়। সিঁড়ি ভেঙে উঠতে উঠতে পদ্মার মনে নানা চিন্তার হিজিবিজি ঝিলিক মারে। খুশি হয়, তার ভাই অন্তত মধ্যবিত্তিক জটিলতা কাটিয়ে উঠেছে। ওদের বসিয়ে পুষ্প জানতে চায়, 'তোরা একসঙ্গে এলি কী করে?'

হরিন্দর নিরুত্তর থাকে। পদ্মা উঠে এসে পুষ্পর চিবুকটা ধরে আদর করে, প্রণামের ভঙ্গিতে হাঁটুটা ধরতে যায়। পুষ্প বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মতো সচকিত হয়ে ওঠে। জিভটা তালুতে গিয়ে ঠেকে একটিই শব্দ বেরোয়: তোবা!

পদ্মা এবার ওকে জড়িয়ে ধরে।

'য়্যাঁ! তোরা করেছিস কী!' পুষ্প এবার ব্যাপারটা বুঝতে পারে ও পদ্মাকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরে অজস্র চুমু খায়, আদর করে। তারপর পদ্মাকে ছেড়ে, চুপচাপ বসে থাকা হরিন্দরের গালে একটা টোকা মারে ছোট্ট করে। ঘড়া থেকে জল গড়িয়ে প্রথমে দু জনকে দেয়, তারপর নিজেও খায়। বলে, 'দাঁড়া—রুটির ব্যবস্থা করি। সারাদিন কিছু পেটে পড়েনি তো?'

পদ্মা ও পুষ্প এবার রুটি বানাতে বসে যায়। স্টোভে সাত আটটা রুটি বানিয়ে ফেলে। কমলা সকালে যে তরকারি করে গিয়েছিল, তা তিনজনের পক্ষে যথেষ্ট। আচার তো আছেই। বাড়িওয়ালার ছেলেকে দিয়ে পুষ্প দইও আনায়।

রুটি খেতে-খেতে কথাবার্তা চলে। পদ্মার কথায় ঈষৎ সঙ্কোচ, ঈষৎ জড়তা ফুটে ওঠে। খাওয়া শেষে তিনজনে আলোচনায় বসে। হরিন্দর তার পরিকল্পনাটা জানিয়ে দিতে পুষ্প বলে, 'ঠিক আছে। চা খেয়ে আমরা যাব প্রোফেসর গুরবক্স সিংহের কাছে। গুরবক্স আমার সহকর্মী। ওর চেনাজানা উকিল আছে—'

গুরবক্স গণিতের অধ্যাপক। সিভিল লাইনসের একটি কোয়ার্টারে থাকেন। এক মেয়ে আছে, নাম বিন্দু। ক্লাস নাইনে পড়ে। বিন্দুর বয়স যখন দুই তখনই তাঁর স্ত্রী তাঁকে ছেড়ে চলে যান। তারপর আর অধ্যাপক বিয়ে করেননি। জীবন যাপন করেন ফকিরের মতো। কলেজের এক কোনায় বসে নিজের মনে শুধু বই পড়ে যান। রুশি উপন্যাস পড়তে খুব ভালবাসেন।

পুষ্পরা যখন যায়, গুরবক্স তখন সবে শুয়েছেন। বিন্দু অন্য কামরায় একা-একাই ক্যারাম খেলছে। পুষ্প দরজাতে টোকা দিতেই সে দরজা খোলে। তিন জনেই ভেতরে ঢোকে। বিন্দুরগালে হাত দিয়ে আদর করে পুষ্প জিজ্ঞেস করে, 'বাবা কখন শুয়েছেন?'

'এই একটু আগে।'

'আমি চা বানাই—ততক্ষণে নিশ্চয়ই উঠে পড়বেন।' হরিন্দর-পদ্মাকে সেই ঘরে বসিয়ে পুষ্প ভেতরে ঢুকে যায়। বিন্দু কিন্তু ক্যারাম ছেড়ে ওঠে না। নিজের মনে স্ট্রোক মেরে চলে। পুষ্প রান্নাঘরে গিয়ে স্টোভ ধরিয়ে চায়ের জল চাপায়। হরিন্দর ও পদ্মা বুঝতে পারে, পুষ্প এখানে নিয়মিত যাতায়াত করে। এদের কথাবার্তায় আওয়াজে গুরবক্সের ঘুম ভেঙে যায়। পায়ে চপ্পল গলিয়ে তিনি এদিক ওদিক তাকান। পুষ্পকে রান্নাঘরে দেখতে পান। গুরবক্সকে জাগতে দেখে পুষ্প কামরায় ঢোকে। খুব চটপট হরিন্দর-পদ্মার বিষয়টি জানিয়ে দেয়। গুরবক্স প্রথমে হাসেন, তারপর গম্ভীর হয়ে কি যেন ভাবেন। চা খাওয়ার পর হরিন্দর ও পদ্মাকে ভেতরে আসতে বললেন।

'আরে, বিসকুট খাও!' গুরবক্স পুষ্পকে বলেন।

পুষ্প নিশ্চুপ হয়ে বিন্দুর দিকে তাকায়, তারপর চায়ে চুমুক দেয়। বিন্দু বিসকিটের প্যাকেট খোলে। পুষ্প বিন্দুর দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসে।

'এখানে এক ম্যাজিস্ট্রেট আছে। তাঁর মেয়েকে আমি অঙ্ক শেখাতাম গত বছরে। খুবই ভাল লোক। আমি একটু কথা বলে দেখি—' গুরবক্স বললেন।

'নিশ্চয়ই!' পদ্মা সোৎসাহে জবাব দেয়। হরিন্দর ও পদ্মার চেহারা একটু রক্তিম হয়ে ওঠে।

চা শেষ করে গুরুবক্স পাশের কামরায় গিয়ে নাইটস্যুট ছেড়ে প্যান্টস বুশশার্ট পরে নেন। পাগড়িটাও গুছিয়ে বাঁধেন। পুষ্প একটু পরে, যে ঘরে হরিন্দর ও পদ্মা বসেছিল, সেই ঘরে এসে জানায়, 'সব ঠিকঠাক করে একটু পরেই ফিরে আসবেন।'

পরের দিনই ম্যাজিস্ট্রেটের কোর্টে ওদের বিয়ে হয়ে গেল।

সন্ধ্যেতেই হরিন্দর পদ্মাকে নিয়ে কোটেতে চলে আসে। সঙ্গে গুরবক্স, পুষ্প ও বিন্দু। খবর পেয়েই দয়ালি ছুটে আসে। সাদরে ছেলের বউকে অভ্যর্থনা জানায় তার মাথার ওপর জল ছিটিয়ে। বধূবরণ যেন আর শেষ হতে চায় না।

হরদিৎ যেন বজ্রাহত। পুরো ঘটনাটাই তার কাছে মূর্তিমান দুঃস্বপ্ন বলে মনে হয়। নীরবে, নিশ্চুপ হয়ে হরদিৎ দাঁড়িয়ে থাকে। তারপর, শ্লথ অবসন্ন পা ফেলে-ফেলে ঘরের মধ্যে ঢুকে, মোটা একটা চাদর মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়ে। কপালে আর কী দুর্গতি আছে—বুঝতে পারে না। পড়শিরা ততক্ষণে এসে যায়। কেউ পদ্মার হাত ধরে, কেউ চিবুক। সুন্দরী বটে! হরদিতের ছেলে অবশেষে বউ এনেছে—খবরটা সারা গাঁয়ে চাউর হয়ে যায়।

গুবক্সরা সেইদিন ওখানেই থাকে। দয়ালি বহু কিছু রান্না করে। গাঁয়ের হালুইকরকে ডেকে ঢালাও হালুয়া বানিয়ে তা পাড়াপড়শিদের মধ্যে বিতরণ করে। পরের দিন, প্রথম বাস ধরে গুরবক্স ও পুষ্প ভাটিন্ডা চলে যায়। কলেজ আছে, বিন্দুর স্কুল আছে।

•

এরপর হরদিৎকে আর বাইরে দেখা যেত না। সারাদিনই ভেতরের ঘরে চুপচাপ পড়ে থাকত। রুটি-টুটি খাওয়া প্রায় ছেড়ে দিয়েছিল। চা-ও কম খেত। এইভাবে দিন চারেক পরেই হরদিৎ খুব অসুস্থ হয়ে পড়ে। গত তিনবারের চেয়ে এবারর মাত্রাটা যেন অনেক বেশি। একদিন দুপুরবেলায় হরদিতের আর নিঃশ্বাস পড়ে না।

দয়ালি উচ্চৈস্বরে কেঁদে উঠতে পাড়াপড়শিরা ছুটে আসে। দয়ালি বিলাপ করে ওঠে: 'ছেলের হাতে জল অবধি নিল না—আমাকে ছেড়ে চলে গেল!'

পুষ্প যাওয়ার পর, হরিন্দর সেইদিনই ব্যাংকে থেকে টাকা তোলে। তার কিছু পরেই পদ্মাকে নিয়ে বেরিয়ে যায়। মাকে বলে, 'আমি দিন দশেক পরে ফিরব। চিন্তা কোরো না।

পদ্মাও দয়ালিকে প্রণাম করে অনুমতি চায়।

হরদিতের শ্রাদ্ধের ঠিক আগের দিন ওরা ফেরে।

গ্রামের 'গবেষণা' যথারীতি চলে:

—ঢঙের লেখাপড়া জানা মেয়ে! কোন অজাত কুজাতের কে জানে!

—খানদানি ঘর হলে যৌতুকে ঘর ঠেসে দিত! এসেছে তো এক-কাপড়ে!

—হরদিতের ইজ্জত একেবারে ধুলোয় লুটিয়ে দিল গো!

—এইজন্যেই তো হরদিৎ মরল! শোকে।

—ডাইনি! ডাইনি! এসেই বাণ মেরেছে হরদিৎকে, নইলে চারদিনের শরীর খারাপে কেউ মরে?

পাল্টা অভিমতও প্রকাশ হয় অবশ্য।

—এরাই এ যুগের খাঁটি লোক। জাত-বেজাতের ধার ধারে না!

—হরিন্দর করে দেখিয়ে দিয়েছে।

—আমিও এ-রকম করব।

হরিন্দর আরও কিছু চোখে পড়ার মতো কাজ করে। বাড়ির ভেতর দিকের অংশটা ভাঙচুর করে একটা পাকা ঘর বানিয়ে ফেলে। গ্রামের শিক্ষিত তরুণদেরও জড়ো করে। এদের দিয়ে নতুন বাড়িতে সে স্থাপন করে 'বলকার স্মৃতি-গ্রন্থাগার'। গ্রন্থাগারের জন্যে 'পঞ্চায়েত ফাণ্ড' ছাড়া তিন চারটি পাঞ্জাবি দৈনিক রাখার ব্যবস্থাও করে। ভাইরূপায় রোজ কাগজ আসে। কোটে থেকে যাতে একজন রোজ ওখানে গিয়ে কাগজ আনতে পারে, সে ব্যবস্থাও হয়। গ্রামেরই এক পড়ুয়া ছেলেকে জলন্ধরে নিয়ে গিয়ে হরিন্দর সেখান থেকে প্রচুর পাঞ্জাবি বইপত্র কিনে আনে। উপন্যাস গল্পসংগ্রহ প্রবন্ধ কবিতা রুশ গ্রন্থের পাঞ্জাবি অনুবাদ — সব ধরনের বই। এ-সবের জন্যে সে টাকা খরচ করে গোপন 'বলকার তহবিল' থেকে। ভেতরের ঘরের কামরাটা দু-ভাগ করে একদিকে রিডিং রুম করা হয়েছে, অন্যদিকে বইপত্রের আলমারি রাখা হয়েছে। তার মধ্যে একটি টেবিল, দুটি চেয়ার। গ্রন্থাগারিক জ্ঞানী যোগিন্দর। যোগিন্দর লিখিত ও কথ্য পাঞ্জাবি ভালই জানে। বই লেনদেনের একটা রেজিস্ট্রারও আছে। গ্রামের সবাই এখানে পড়াশোনা করতে আসে। এক পড়ুয়া বেরিয়ে গেলে আর এক পড়ুয়া ঢোকে। গ্রাহক-দক্ষিণা বলে কিছু নেই। যোগিন্দরকে যে পঞ্চাশ টাকা বেতন দেওয়া হয়, তা হরিন্দর ব্যক্তিগতভাবে দেয়।

নাজর মারা গেছে। হরনামি এখনও বেঁচে। যোগিন্দর হরনামির বাড়িতেই থাকে। চৌপালে বসে পুরনো মানুষ স্মৃতিমন্থন করে, হাসাহাসি করে। পুরনো গল্পের নতুন শ্রোতারা অবাক হয়ে যায় যোগিন্দর-হরনামির পুরনো সম্পর্কের কথা শুনে।

পরাগদাসের ডেরা নষ্ট হয়ে গেছে। রাতে ওখানে আজকাল কেউ আর থাকতে চায় না। বছর কয়েক আগে, অজানা কিছু লোক পরাগদাসের সর্বস্ব লুট করে চলে যায়। তারপরেও ওরা আর একবার হানা দেয়। কিছু না পেয়ে, পরাগদাসকে বেধড়ক পিটিয়ে চলে যায়। পরাগদাস অবশ্য এক সময় কোটে ও আশপাশের গাঁয়ের লোককেও ভাল রকম লুটেছিল তার নিজস্ব ঢঙে। বেগতিক দেখে পরাগদাস রাতারাতি গা ঢাকা দেয়। কয়েকমাস পর খবর আসে পরাগদাস কাহানগড়ে তার ভাইপোদের কাছে আছে।

হরিন্দর, সব তরুণদের একসঙ্গে করে, পরাগদাসের ডেরার ভোল একেবারে পালটে দেয়। একটা ঘর পুরো ভেঙে ফেলা হয়। মাঝখানের কুয়োটা বুজিয়ে দেওয়া হয়। ধুপধুনো দেওয়ার জন্যে যে মজবুত ও পাকা দালানটি ছিল, সেটা একই রকম রেখে—পাশের ঘর দুটিও রেখে দেওয়া হয়। দালানের সামনের অংশটিতে এক বড়সড় মাঠ হয়ে যায়।

ইতিমধ্যে, পাঞ্জাবের কোনও-কোনও জায়গায় নাট্য আন্দোলন শুরু হয়ে যায়। নাট্যকর্মীরা গ্রামে গ্রামে নাটক করে বেড়ায়। মানুষের মনে নতুন চেতনার জাগৃতি বেশ স্পষ্ট। এইসব কারণে কোটের তরুণরা পরাগদাসের ডেরায় এক স্থানীয় নাটমঞ্চ বানিয়ে ফেলে, ওখানে বহু নাটক মঞ্চস্থ করায়। কোটের এই 'তরুণ সভা' একটি গ্রামীণ মেলার আয়োজন করে একদিন। দু-রাত গুরুশরণের নাটক মঞ্চস্থ হয়। আশপাশের গাঁ থেকে বহু মানুষ আসে নাটক দেখতে। ভাটিন্ডা থেকে গুরবক্স ও পুষ্পও আসে। গুরবক্স দু দিনই নাটক আরম্ভ হওয়ার আগে, নাটক সম্বন্ধে দু চার কথা বলেন। সেই আলোচনা দর্শকদের ভীষণ ভাল লাগে। মনে হয়, গুরবক্স যেন তাদের একান্ত আপনজন। আর, আপনজন বলে মনে হবে না-ই বা কেন, গুরবক্স তো তাদের গাঁয়েরই জামাই!

Printed at Shivam Offset Press, A-12/1 Naraina Indl. Area, Phase-I, New Delhi-110 028